শারদীয়
পরিচয়
১৪১৫

কামারহাটি পৌরাঞ্চলের উন্নয়নে নবদিগন্ত উন্মোচনের সারণী

- বেলঘরিয়া স্টেশনের উড়ালপুল।
- ৩০ মিলিয়ন জল প্রকল্প স্থায়ী জল সমস্যা সমাধানে বিরাট পদক্ষেপ।
- নজরুল মঞ্চ, সমাজসদন ও পুরসভার ত্রৈমাসিক মুখপত্র পুরপথিক প্রকাশ সাংস্কৃতিক চর্চায় এনেছে অনবদ্য গতিবেগ।
- বেলঘরিয়া বাজার প্রকল্প নাগরিকদের গর্ব।
- আরিয়াদহ 'সপ্তপর্ণা' আত্মনির্ভরতার প্রতীক।
- দক্ষিণেশ্বর পৌরবাজার প্রকল্প এলাকার পরিবেশ পরিবর্তনে নিয়ে আসবে নতুন দিন।
- বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহের অভিযান সফল মানুষের কর্মসূচীতে পরিণত।
- দক্ষিণেশ্বরে নবনির্মিত 'উৎসর্গ' অতিথিশালা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উদ্বোধিত হয়েছে।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শববাহী গাড়ি জনসাধারণের জন্য উৎসর্গিত হয়েছে।

আগামী দিনের আরও উজ্জ্বলতর পরিকল্পনা পরিষেবার ক্ষেত্রে নিয়ে আসুক নতুন প্রাণ।

প্রবীর মিত্র
(উপ-পৌরপ্রধান)

গোবিন্দ গাঙ্গুলী
(পৌরপ্রধান)

শুভেচ্ছা সহ

পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বি. এফ-১৪২, লবণ হ্রদ, সেক্টর-১

কলকাতা-৭০০০৬৪

www. wbut.ac.in

জনগণের সক্রিয় সহায়তা ও অংশগ্রহণে পশ্চিমবঙ্গসহ পূর্বভারতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য (MNGO), গ্রাম ও বস্তি উন্নয়ন, গণচেতনা, বিপর্যয় মোকাবিলা প্রভৃতির মাধ্যমে নারী, শিশু এবং সমষ্টি উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সাহায্যে সমাজগঠনে অগ্রণী সংস্থা গণ উন্নয়ন পর্ষদ-এর বিভিন্ন প্রকাশনাসমূহ।

গণশিক্ষা সিরিজ

বর্তমান কালে গান্ধীজীর চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা (অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভূমিকাসহ)	মলয় দেওয়ানজী	৬.০০ টাকা
সমাজ পুর্নগঠ ন স্বামী বিবেকানন্দ	হরিপদ মজুমদার	২.০০ টাকা
তরল আগুন (মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, নাটিকার সঙ্কলন)		৫.০০ টাকা
ভারতের নবজাগরণ ও বিদ্যাসাগর)	ডঃ সন্তোষকুমার অধিকারী	৮.০০ টাকা

অন্যান্য প্রকাশনা

বাংলার ইতিহাসে নারীর ভূমিকা ও সংগ্রাম (ভূমিকা ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য)	অধ্যাপিকা আরতি গঙ্গোপাধ্যায়	৬০.০০ টাকা
মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন কেন?		৬.০০ টাকা
তসলিমার লড়াই ও অন্যান্য (ভূমিকা : সুতপা দেওয়ানজী)	অমল রায়	৫.০০ টাকা
Gandhi's Message to the Modern World	Mankumar Sen	Rs. 60.00
চির চেনা চীন থেকে ফিরে	সুতপা দেওয়ানজী	১৫.০০ টাকা
চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন-১৯৯৫, বেজিং ফিরে দেখা		১০০.০০ টাকা
মহিলা সমাজকর্মী প্রশিক্ষণ সহায়িকা		৫০.০০ টাকা
ব্যক্তিগত আইন, আইন পরিষেবা ও মহিলা জীবন	সীমা মজুমদার (সংকলন)	৫০.০০ টাকা
হিন্দু আইন-বিবাহ, খোরপোষ ও সম্পত্তি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা		৫০.০০ টাকা
ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা-অগ্রপথিকদের ভাবনা		১০.০০ টাকা
মানবী (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)		

আবেদন

ক্রমবর্ধমান কাগজের দাম ও ছাপার খরচ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৮০ টাকাই রেখেছি। বর্তমানে বছরে ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও মোট আয়তন বেশি হচ্ছে এবং সাদা কাগজ ও অফসেটে ছাপতে গিয়ে ছাপা খরচও অনেকে বেড়েছে। তাই বাধ্য হয়ে বর্তমান গ্রাহক চাঁদা—

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১২০ টাকা
সডাক ১৫০ টাকা

(কমপক্ষে একত্রে পাঁচটি সংখ্যা নিতে হবে)

পরিচালকমণ্ডলী
পরিচয়

পরিচয়

৭৮ বছরে পা দিয়েছে।

সহযাত্রী বন্ধুদের নিয়ে

নিজের এতকালের ঐতিহ্য বজায় রাখতে

পরিচয়

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

পরিচয়

বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৫
মে-অক্টোবর ২০০৮
১-৩ সংখ্যা ৭৮ বর্ষ

প্রবন্ধ

কবিতাগুচ্ছ—১

গল্প—১

কবিতাগুচ্ছ—২

গল্প—২

প্রচ্ছদ চিত্র
নন্দলাল বসু

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

নিবেদন

'পরিচয়' শারদ-সংখ্যা প্রকাশিত হল। পরিচয়-এর একদা অন্যতম উপদেশক প্রয়াত কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এই সংখ্যায় একটি বিশেষ রচনা ও একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল। প্রয়াত সহযাত্রী বন্ধু জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েও একটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই আমাদের দায়বদ্ধতা ছিল। পাঠকেরা আরও লক্ষ করবেন, নিয়মিত লেখকদের পাশাপাশি এবার কয়েকজন নতুন লেখকের গল্পও ছাপা হয়েছে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত স্মরণ-সংখ্যা প্রকাশের পরই সম্পাদকমণ্ডলী একটি সমালোচনা-সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিছু কিছু লেখকের সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছিল। কেউ কেউ লেখাও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু পরিচয়-এর পূর্ব প্রকাশিত এই জাতীয় সংখ্যার ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখেই পরিকল্পনাটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেই সমালোচনা সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পুনরাবৃত্তি হলেও বলা প্রয়োজন যে, আটাত্তর বছরে পা দেওয়া পরিচয় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বা কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা নয়। যাঁদের সহায়তায় এটি এতদিন টিকে আছে তাঁরা একে কেউ সাধারণ পত্রিকা হিসেবে দেখেন না, একে একটি সাংস্কৃতিক-আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবেই দেখেন। এই সব অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক, লেখক এবং মুষ্টিমেয় বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি পরিচয় আজীবন কৃতজ্ঞ। এই সহায়তার ঐতিহ্যটি অব্যাহত থাকুক এটাই প্রার্থনা।

বিনীত
সম্পাদকমণ্ডলী
পরিচয়

বুদ্ধদেব বসুর সর্বেশ্বরী

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রমনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে সহব্রতী যুবক বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারণায় রত সেই যুবকের বুকে ছিল অসীম প্রত্যয়, কিন্তু চোখে ছিল অনিশ্চয়তা। ক্রমেই ধীরে ধীরে সে যুবক সেদিন এ কথা বুঝেছিল, এখানে নয়, চলে যেতে হবে কলকাতায়। কিন্তু কলকাতা তাঁকে প্রথমেই অভ্যর্থনা করে নেয়নি। এক উৎসুক অনিশ্চয়তায় তিনি পদে পদে হোঁচট খাচ্ছেন। আমরা স্মরণ করতে পারি কলকাতাকে বলা তাঁর কথাগুলি :

কোনো কথা তুমি দাওনি আমাকে, শুধু ডাক দিয়েছিলে,
আমারও কোনো যৌতুক ছিল না, উৎসুক অনিশ্চয়তা ছাড়া ;
তবু তাই—তাই তোমার রাস্তার বাঁকে বাঁকে
আমার চোখের সামনে
খুলে গেল ভবিতব্যের দুয়ার।

কলকাতাই তাঁর নিয়তি। তাঁর সকল কিছুর ভূমিকাপীঠ। রমনার দিনগুলি কি হারিয়ে গেল। না, তারা রইল স্মৃতিতে গচ্ছিত। আপাতত সম্মুখের চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করলেন। 'অমাবস্যা পূর্ণিমার পরিণয়ের' পুরোহিত, নিজেকে নতুন প্রত্যয়ে শাপভ্রষ্ট দেবশিশু বলে অভিহিত করলেন। ক্রমশ বদলে যেতে লাগল তাঁর জীবনের প্রথম পাঠ। এবারে নতুন পালা। কলকাতায় তিনি পেলেন জীবিকার তিক্ততা। রিপন কলেজের কণ্ঠবাদন—জীবন ও জীবিকার টানাটানি। তবু এর মধ্যে তার জীবনে ঘটেছে রানু সোমের সঙ্গে পরিণয়। জীবনে এসেছে নতুন জোয়ার। কল্কাবতীর সমুচ্ছ্বসিত উল্লাস পদচারণায় তিনি তখন উদ্বেজিত। শেলী নয়, কীট্‌স নয়, এমনকি এলিয়টও নয়। হাক্সলি এবং ইংরেজ প্রিয়্যাফেলাইটদের পরোক্ষ প্রভাব পড়ল তাঁর বাঁচনে। তাঁর কাছে তখন সত্যই রবীন্দ্রযুগ অবসিত। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হলেও কথাটি তিনি এভাবে বলেননি। তাঁর কথা ছিল রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করা যায় না। আসল কথাটি হল :

> Some said that it was a travesty of truth to say that the age of Tagore was long over. The learned professor came back and explained that what he had said was that the age that had produced Tagore was long over and not the 'age of Tagore' was long over. Others retorted that the difference between the two statements was hairsplitting and that Prof. Bose was suffering from a confurition of ideas.

প্রতিবাদীরা এ কথা বুঝতে পারেননি যে বুদ্ধদেবের বলবার কথাটি ছিল সময় স্থাণু নয়। রবীন্দ্রনাথ সময়কে অতিক্রম করে গিয়েছেন। বুদ্ধদেবের যদি রবীন্দ্রবিরোধী কোনো বক্তব্য

থেকেও থাকে তাহলে তিনি তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা'কে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত গদ্যছন্দের প্রায় মুখপত্র করে তুলবেন কেন?

আমরা মনে রাখি কল্লোলের কেউই রবীন্দ্রবিরোধী নন। বোধহয় সকলের হয়েই অচিন্ত্যকুমার রবীন্দ্রনাথকে এই বলে প্রণাম জানিয়েছিলেন, তুমি ছাড়া কে পারিত নিয়ে যেতে অবারিত মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির সন্ধানে, তুমি ছাড়া আর কার এ উদাত্ত হাহাকার হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনোখানে। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেবের কবিতার পালাবদল ঘটছে। তিনি দময়ন্তীতে কঙ্কাবতীতে যা লিখলেন তা প্রেমের কবিতা। প্রেমিকের কবিতা। এইবার যৌবনের কলতান, জলে স্থলে মত্ত তোলপাড়। চিত্রকল্পের বিকাশ মুঞ্জরনের ভিতরে একই শব্দ নতুন নতুন ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করছে। আশ্চর্যের বিষয় এই পর্যায়ে গদ্যছন্দ কম ব্যবহৃত হল। ছয়মাত্রার কলাবৃত্ত অধিক প্রশ্রয় পেল। যেমন :

(ক) তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার
(খ) আমারি প্রেমের মতন গহন অন্ধকার
(গ) তোমারি চুলের বন্যার মতো অন্ধকার
(ঘ) কোটি কোটি মৃত সূর্যের মতো অন্ধকার

পুনরুক্তিময় শব্দপুঞ্জ ক্রমশই নতুন নতুন-ভাবে অর্থের মাত্রা এবং অন্তর্গূঢ়তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এইবার তিনি তিনি নিজেকে চিনছেন গভীরভাবে। তিনি বুঝেছেন কদর্য বাস্তবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যেমনটি বুঝেছিলেন 'বন্দীর বন্দনা'য় সেটা তাঁর কাজ নয়। তিনি প্রেমেই আশ্রয় খুঁজলেন। বুঝলেন অন্তত তখনকার মতো বুঝলেন যে প্রেমেই তিনি আশ্রিত। এই সময়ে এসেছে সেই সময় যখন সময় হয়েছে ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক কবিতায় বুদ্ধদেব বললেন সময়ের হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নানাভাবে এ কথাটি এসেছে। যেমন :

(১) এসো, চলে এসো; যেখানে সময় সীমানাহীন
হঠাৎ ব্যথায় নয় দ্বিখণ্ড রাত্রি দিন
যেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন।
কক্ষা শঙ্কা কোরোনা।

(২) ঝড় তুলে দাও জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,

(৩) কোটি কোটি মৃত সূর্যের মতো অন্ধকার
তোমার আমার সময় ছিন্ন বিরহ ভার,

(৪) সময় ছিন্ন বিরহে কাঁপেনা রাত্রিদিন

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে মহামন্দা। সেই ভয়ঙ্কর কালবৈগুন্যে বুদ্ধদেব প্রেমকেই ভেবেছেন সময়ের প্রতিস্পর্ধী। সময়ের প্রতিযোগী। অথচ এর পরেই বেরুল 'নতুন পাতা'। শান্ত হয়ে এল চিত্রল পল্লবতা, ছন্দের উল্লাস। রানু সোম-বুদ্ধদেব পর্যায়ে সংবৃতসংযমে তিনি লিখলেন :

জোয়ার! জোয়ার!
উদ্দীপ্ত উৎসুক বসন্তের মতো,
বসন্তের গাছের মধ্যে সবুজ সতেজ প্রাণরসের উৎসাহের মতো
জোয়ার! জোয়ার।

সে জোয়ার বুদ্ধদেব অনুভব করলেন তাঁর মধ্যে। একটা বোধ তাঁকে পেয়ে বসছে—তিনি আঁধারের স্বাধীন সন্তান। একটা প্রশ্নের মুখোমুখি তাঁকে হতেই হত, তিনি তা হলেনও বটে। কবিতা কী দিতে পারে—তিনি জানলেন চতুর্দিকে যত বিশৃঙ্খলা, যত এলোমেলো অবস্থা তার মধ্যে কবিতার মধ্যেই আছে সৌষম্য সামঞ্জস্য। এ সামঞ্জস্য এবং শৃঙ্খলা সংসারের বাস্তবতার মধ্যে যদি নাও থাকে, তবে তা আছে কবিতার একটি সুগঠিত পংক্তিতে। আছে কবির অতিনিবিষ্ট উচ্চারণে। কী দিতে পারে সে? দিওতিমা যা দিয়েছিল হোয়েলডারলীনকে—সুষমা সৌন্দর্য সামঞ্জস্য। কিশোরণ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এবার তাঁর নিজ হৃদয়ের কাছে ফিরে আসা।

এইবারই সময় এসেছে—যাঁর কাছে তিনি সর্বস্ব নিবেদন করবেন সেই কবিতাকে বললেন তাঁর সর্বেশ্বরী। এই নামে 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতাও আছে। সেই দেবীর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন 'যা তোমার সেব্য নয় কিছুতেই আমি তা পারিনা।' রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানের বিষয় যেমন গান, বুদ্ধদেবের অনেকগুলি কবিতার বিষয় তেমনি কবিতা। তিনি যখন বলেন :

হয়তো বা আমাকেও তবে
অন্তরের ক্ষমাহীন তিলোত্তমা, রূপের বাস্তবে
ধরা দেবে একদিন—শুধু যদি অপেক্ষার ধৈর্য না ফুরায়।

এই অপেক্ষার অপর নাম অনলস দুরূহের সাধনা। একটি মিল খুঁজে সারাদিন কাটানো, এই সাধনার জন্যই তাঁর সর্বেশ্বরীকে তাঁর জিজ্ঞাসা, যা প্রত্যেক দহন যন্ত্রণায় মথিত কবির জিজ্ঞাসা—

বলো দেখি আর কতকাল
একই সঙ্গে হতে হবে দাক্ষাপুঞ্জ, বকযন্ত্র, শুঁড়ি ও মাতাল।

কবির অন্তর্মন্থনকে এমন প্রতীকী শব্দের সমাবেশে অব্যর্থ করে তোলাও এক বিশিষ্ট কবিকর্ম। সেই সর্বেশ্বরীর প্রেরণায় কবিকে অপ্রমুদ্ধ থাকতে হবে। আর কেউ নয় তার লক্ষ্য সে নিজেই—

যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত—সে গেছে মোমের মতো জ্বলে,
আপনারে আলো দিয়ে, নামহীন প্রাচীন অনলে।

নিজের যন্ত্রণাকে তিনি বলেছিলেন 'কোনো এক অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন। আঁধারের স্বাধীন সন্তান মুক্তি চান। কিসের থেকে মুক্তি? এইখানটায় কবির সীমাবদ্ধতা। তিনি তাঁর যন্ত্রণার কোনো বহিরাশ্রয়ের হদিশ দিতে পারলেন না। তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষের জল হাওয়ার স্পর্শ মিলবে না। তার অবৈকল্যে আমাদের সন্দেহ জাগে না বটে কিন্তু

তার প্রাতিস্বিকতার মূল কোথায় তা আজও আমাদের খুঁজে চলতে হচ্ছে। চলতে হবে যতদিন কবিকে আমরা বাস্তব সন্ধানী রূপে পাচ্ছি। অথচ টেক্‌নিকের উপর প্রভূত প্রভুত্ব নিয়ে আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিক কবিতা তিনি লিখলেন 'ব্যাং'—যা সাফল্যে সুধীন্দ্রনাথের কুক্কুটের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। টেকনিকে নয়, বুদ্ধদেব সত্যের সন্ধান পেয়েছেন বিষয়ের বিভায়। সেই বিভাকে চেনার জন্য আমরা বুঝে নিতে চাইব তাঁর সর্বেশ্বরীকে। তাঁর সর্বেশ্বরী এবং বিষ্ণু দে-র কবিতার 'তুমি' দুজনেই আর্থ পরিধিতে বিস্তারিত। প্রগাঢ় তাদের ব্যঞ্জনা। তাঁদের সঙ্গে কি আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার মিল খুঁজতে যাবো? কদাচ নয়। কবির জীবনার্থকে তিনি গড়ে তুলেছেন নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন কবির নিয়তি। 'কবি তার কমতার প্রতি'নামক কবিতায় বুদ্ধদেব বলেন :

> এখন মধ্যপথে, এখনো কি আসেনি সময়?
> পারিনা কি তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে, যেখানে মলয়
> মরে যায় বরফের ষড়যন্ত্রে—সেই গর্ভে সারাৎসার ঢেলে
>
> ক্ষীণ ছোটো প্রচ্ছন্ন দুর্বল হয়ে যদি কোনো দূরতর মেঘে
> কাটিয়ে কঠিন রাত্রি, একদিন বীজের আবেগে
> ফলে উঠি নিটোল উজ্জ্বল পূর্ণ একটি আপেলে।

এই পূর্ণত্বই কবির কাঙ্ক্ষিত।

দেখা যায় তাঁর দীর্ঘ কবিতা যতখানি দীর্ঘ ততখানি আঁটসাট নয়। সেক্ষেত্রে তাঁর ছোট কবিতাগুলি তাঁর কাঙ্ক্ষিত আপেলের মতোই নিটোল। আমরা মনে করতে পারি 'রাত তিনটের সনেট : ১'-এর প্রথম উক্তির বিস্ময়কর স্বগতোক্তি—শুধু তাই পবিত্র যা ব্যক্তিগত।'—

> যিশু কি পরোপকারী
> ছিলেন, তোমরা ভাবো? নাকি বুদ্ধ কোনো সমিতির
> মাননীয় বাচাল, পরিশ্রমী অশীতির
> মোহগ্রস্ত সভাপতি?

এই কবিতার শেষ দুটি পংক্তির মোক্ষম উচ্চারণে আছে সুগভীর প্রগাঢ় জীবন দর্শন:

> যে সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর
> আধঘন্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।

বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতা যেন আমাদের বুঝিয়ে দেয় তাঁর স্বোপার্জিত মন্ময়তার আছে তন্নিষ্ঠ তন্ময়তা। 'বেশ্যার মৃত্যু'-র মতো কবিতা বাংলা সাহিত্যে আর কেউ কখনো লিখেছেন বলে আমরা জানি না। টেকনিকের দিক থেকে কবিতাটি অসামান্য। প্রথমেই লক্ষণীয় কবিতাটির নামকরণ। 'একটি বেশ্যার মৃত্যু' নয়—'একটি' এই বিশেষণকে বাদ দিয়ে বেশ্যাকে সাধারণ করে তোলা হয়েছে। বুদ্ধদেব ঠিকই জেনেছিলেন কোনো পুরুষ বেশ্যার শবদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে যায় না। কেন যায় না তা জানি না, তবে

প্রথা নেই। বুদ্ধদেব প্রথম পংক্তিতে তারই বোন সতিনেরা কাঁধে করে নিয়ে এল তাকে। সারা জীবন পুরুষরা যে শরীরটাকে কামার্ত নখে ছিঁড়েছে লাঞ্ছিত করেছে, সেই মেয়েটির মৃত্যুর পর তার সঙ্গিনীরা আজ সেই দেহে পুরুষের হস্তক্ষেপকে অনভিপ্রেত জ্ঞান করেছে। হয়তো এও এক ধরনের পুরুষ উপেক্ষা, মৌন কিন্তু ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ। তার পর এক আধটা অর্থবহ চিত্রকল্পের সাহায্যে অনুপুঙ্খগুলি কবিতাটিকে ভিতরের দিক থেকে প্রসারিত করে তোলে। প্রথম স্তবকে বাহিত শবের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু কোনো বর্ণনা নেই। কোথাওই নেই। বর্ণনা আছে শববহনকারীদের। তাদের চোখে জল নেই, আছে ঘাম। দুর্বল তাদের পদক্ষেপ। তারা তাদের অভ্যস্ত নিশাচারণ ক্ষেত্র ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে—'গুটি-কয় গম্ভীর বালিকা যেন অকস্মাৎ ভুলে গেছে খেলা—ঈষৎ বিব্রত হল আকাশ ও লোকজন দেখে।' দ্বিতীয় স্তবকে নতুন অনুপুঙ্খ যোগ করা হল। অনভ্যস্ত রৌদ্রলোকে তারা যেন অনাবৃত :

> অচেনা অস্বস্তিকর আশাতীত লজ্জার আবৃত
> পরস্পরে ভর দিয়ে কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেল তারা।

তৃতীয় স্তবকে কবিতাকে ভিতরের দিক থেকে আরো গভীরে নিয়ে যাওয়া হল। এইবার সময় হল মৃত মেয়েটিকে কবিতায় হাজির করার :—

> যেহেতু কোথাও আর নেই কোনো কামুক পুরুষ।
> এক বোবা নিশ্চল দুপুর শুধু, আর যেন মদ গিলে বিলুপ্ত, বেহুঁশ'
> অনাক্রমণীয় ঘুমে মগ্ন একজন।

ওই মগ্ন একজনই কবিতাটির মূল লক্ষ্য। তাই চতুর্থ স্তবকটিতে 'তার' এই সময় একটি অব্যর্থ সর্বনাম :

> তার সব সজলতা চেটে নেয় বিদগ্ধ আগুন
> ছড়িয়ে রসিক জিহ্বা গ্রাস করে স্তন, জানু, যোনি ;
> যে সব গোপন রন্ধ্রে কোনো মত্ত নাগর নামেনি,
> সেখানেও লালসায় খুঁটে নেয় অবশিষ্ট নুন।

এই কবিতার প্রত্যেকটি বিশেষণ গভীরের ব্যঞ্জনাবহ। এবার শেষ স্তবক। মেয়ে কটি অর্থাৎ শ্মশান সঙ্গিনীরা ফিরে চলেছে। শহরে অন্ধকার নামছে। ল্যাম্পপোস্ট এদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে। গলির চেনা গন্ধে তাদের পরিচিত পরিবেশে তারা স্বস্তি পায়।

> পায়ে শক্ত মাটি পেয়ে ভগিনীরা আবার দাঁড়ায়
> দগ্ধ হতে ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার অনলে।

তাদের জীবন জীবিকার চাকা আবার পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। দেবতা যখন ঘুমান তখন তাদের দিন শুরু হয়। 'ভগিনীরা আবার দাঁড়ায়' এই উক্তি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। মৃত মেয়েটি নয়, তার শ্মশান সঙ্গিনী সমব্যবসায়ী মেয়েরাই কবিতাটি মর্বিডিটির হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার জরিপ কখনোই সম্পন্ন হবে না, সম্পূর্ণ হবে না যদি না

আমরা তাঁর কাব্যনাটক—বলা ভাল নাট্যকাব্যগুলির মুখোমুখি হই। রামায়ণ মহাভারতের বহু পঠিত কাহিনীর পুনর্বিন্যাস ও পুনর্নির্মাণ ভিত্তিকে মান্য করে নূতনার্থ আবিষ্কার এই অন্তর্দর্শী রচনাগুলির ঐশ্বর্য। 'প্রথম পার্থ'-তে কর্ণ ও দ্রৌপদী সংলাপের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য অবিস্মরণীয়। এই কাব্যনাটকগুলির ভিতর দিয়ে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে তাঁর কাব্যনাট্য অবশ্যই তাঁর কবিকৃতিরই নাট্যময় প্রকাশ। কবিতার মতোই তাঁর এসব নাটকের কুশীলবদের ভাষাও অন্তর্গূঢ়। তিরিশের কবিদের মধ্যে এক্ষেত্রে তিনি একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে আমাদের একবারটি দেখে নেওয়া দরকার বুদ্ধদেবের কবিতার সঙ্গে তাঁর নাটকের যোগ কোথায় এবং কতটা। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছিলেন লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দা করে তারই প্রভাবে দুজন লোক নিষ্ক্রান্ত হল পুণ্যের পথে। আমাদের অবশ্যই মনে পড়ে যাবে তাঁর যাত্রারম্ভের কালে কবীর কল্পনা-র এই অমোঘ উচ্চারণ—'তুমি মোরে দিয়েছ কামনা অন্ধকার অমারাত্রিসম, তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।' কামনার অভিঘাতে পরিবর্তিত হওয়া এবং কামনাকেও পরিবর্তিত করে তোলা এই কবিতা এবং নাটকের দুই প্রান্তের মিলনাত্মক দিক। অমাবস্যা পূর্ণিমার পরিণয়ের পুরোহিত নাটকের ক্ষেত্রে আরো আরো অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, আরো ধ্যানমগ্ন।

ততদিনে তিনি পার হয়েছেন 'কালসন্ধ্যা'। তাঁর অর্জুন ধীরে ধীরে কালপ্রান্ত কৃষ্ণের লীলাবসানে এবারে হয়ে উঠেছে অনর্জুন। তাই অর্জুন যখন ব্যাসদেবের কাছে শ্মশান বৈরাগ্যের পাঠ নেয় :

> তুমি শুধু নিক্ষেপ করেছ শর
> যারা হত তাদের উদ্দেশে।
> তুমি নও ধনঞ্জয় জিষ্ণু পরন্তপ—
> সব তিনি।

অথবা

> যা কিছু সময়োচিত তাই যথাযথ।

অথবা—

> যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর
> কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য ঘাতকের স্থান বিনিময়

অনার্মী অঙ্গনার প্রথম পার্থ কিন্তু কোনো শ্মশান বৈরাগ্যের পাঠ দেয়নি। প্রথমেই লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তী সংবাদের কর্ণের মতো বুদ্ধদেবের কর্ণ কোনো হ্যামলেটীয় নির্বেদে খিন্ন নয়। সে মানব চরিত্রে অভিজ্ঞ। সে জানে যারা যারা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তারা এসেছে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে। কুন্তী, দ্রৌপদী কৃষ্ণ, এদের সকলকেই আমরা জানি। কর্ণ সমীপে উপনীত চরিত্রগুলি আমাদের বিস্ময় জাগায় না। তাই দ্রৌপদীকে কর্ণসমক্ষে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে প্রেক্ষাগৃহ, আলোড়িত হয়ে ওঠে প্রেক্ষকমণ্ডলী। আশ্চর্য এই নাটকীয় যোজনা। একদিকে কর্ণ তার অভিজাত নৈঃসঙ্গ্যে অটল। অন্যদিকে দ্রৌপদী

কিন্তু এ কোন দ্রৌপদী। মহাভারতের সেই অগ্নিসম্ভবা নারী তো এ নয়। নাথবতী অনাথবৎ যে দ্রৌপদীর কটিবাস খুলে যারা দ্রৌপদীকে দেখতে চেয়েছিল, যাদের মধ্যে কর্ণের খলখল হাসি, দ্রৌপদীর ভুলে যাবার কথা নয়, এ কি সেই দ্রৌপদী? সে দ্রৌপদীর উদ্দেশে সতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'কৃষ্ণা' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। যেখানে ধর্মচ্যুত লম্পট সভায় অবমাননা ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে এই নারী বুঝেছিল এই সভায় পুরুষ কেউ নেই। সব সমান। 'ক্রূর নগ্নোর দুর্যোধন তো বিমূঢ় গদারু ভীমেরই ভ্রাতা।' এই সেই নারী যার এলোচুলের ঝড়ে অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী কুরুক্ষেত্রে বাহিনী পড়বে। সেই নারী জেনেছিলেন দ্রোণ আর দৌবারিকে কোনো তফাত নেই—'কী পার্থক্য কর্ণে পার্থে?' সেই জ্বলন্ত হুতাশন থেকে আগুনের শিখা যে ছিনিয়ে নিতে চায় সে গতাসু। কিন্তু একে? বুদ্ধদেবের নাটকে যে যাচিকার মতো, প্রার্থিনীর মতো দাঁড়িয়েছে—বিনম্র তার ভাষণ, বিনীত তার নিবেদন। সে বলছে :

> <u>মাঝে মাঝে</u> গুঞ্জন পতঙ্গের
> <u>মাঝে মাঝে</u> মর্মর—পল্লবের।
> তা ছাড়া আর শব্দ নেই।
> <u>সম্ভব নয় কি</u> কর্ণ, <u>সম্ভব নয় কি</u>
> এখানে এই আকাশের তলে, নির্জনতায়
> <u>মুহূর্তের জন্য</u>, কয়েক <u>মুহূর্তের জন্য</u>
> তুমি ভুলে যাবে আমি তোমার বৈরী পত্নী
> আমি ভুলে যাবো তোমার উপর আমার আক্রোশ।
> <u>সম্ভব কি নয়</u>, <u>সম্ভব কি নয়</u>
> মুহূর্তের জন্য কয়েক মুহূর্তের জন্য
> তোমার আর আমার মধ্যে প্রীতি বিনিময়

এক অভিনব কৌশলে বাচনিক ছন্দোবদ্ধতা অপেক্ষা পুনরাবৃত্ত ধ্বনির সাহায্যে ভাবনার গভীরতাকে নির্দিষ্ট করে তোলা হল। 'সম্ভব নয় কি' এই শব্দগুচ্ছে ক্রমান্বয়ে আভাসিত হয়েছে শঙ্কিত প্রস্তাব। আকুল আবেগ, আন্তরিক আবেদন, মধুর মিনতি।

কবি নাট্যকার পুরাণের অনুমেয় সম্ভাব্যতাকে আশ্রয় করে ফুটিয়ে তুললেন যেন এক আধুনিক নারীর যন্ত্রণাদিগ্ধ ব্যক্তিত্বের সূচ্যগ্র প্রতিরূপ। আমার নিম্নরেখা চিহ্নিত শব্দগুচ্ছগুলি যথার্থ আবৃত্তিশিল্পীর কণ্ঠে আলাদা আলাদা 'টোন' বা মাত্রা নিয়ে আসে। মৃদুবাচনেই নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য যুগপৎ হয়ে ওঠে হার্দিক এবং বৌদ্ধিক।

কেউ কোনোদিন বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যকে বাথরুম সাহিত্য নাম দিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন। বুদ্ধদেব তা নিয়ে বিচলিত বা বিরক্ত কিছুই হননি। বাথরুম তাঁর কাছে হয়েছিল, তাঁর কাছে ছিল নির্জনতার প্রতীক। সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার একমাত্র জায়গা বাথরুম। হোক না তা স্বল্প পরিসর, হোক না তা বিলাস বাহুল্য বর্জিত,

হয়তো তা অপরিচ্ছন্নও বটে। তবু সে দিতে পারে জনসংঘট্ট থেকে ছুটি। সে দিতে পারে সেই বিরল লভ্য অবকাশ, যে অবকাশে ব্যক্তি নিজের মুখোমুখি হতে পারে। সেখানে সে নিজেকে দেখে, আর সেই সুবর্ণ সুযোগে জন্ম নেয় দু-একটা ভাবনার কণিকা যা পরবর্তী কোনো পরিকল্পনার উপক্রমণিকা, যার জন্ম বাথরুমের এই ক্ষুদ্র কিন্তু ঠাস নির্জনতা ছাড়া সম্ভব ছিল না। সমস্ত পৃথিবীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করা যায় একমাত্র বাথরুমে ঢুকলে। তখন সে ব্যক্তি আর কারো ধার ধারে না। সে আপনাতে আপনি স্বরাট। ব্যক্তির নিগূঢ় স্বর্গ এই বাথরুম।

নির্জনতা জীবনানন্দের স্বাভিজ্ঞান। বুদ্ধদেবের নির্জনতা স্বোপার্জিত, স্বরচিত। জীবনানন্দের নির্জনতা কোনো নেতিবাচক ব্যাপার নয়। সে একটা সজীব সত্ত্ব। সেইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে 'নির্জনতা' আছে। এ নির্জনতাকে জীবনানন্দ থেকে আলাদা করা যাবে না। তাহলে কি আমি বুদ্ধদেবের নির্জনতাকে কৃত্রিম বলছি? অবশ্যই নয়। বুদ্ধদেবকে তাঁর নির্জনতা গড়ে নিতে হয়। জীবনানন্দ এবং নির্জনতা সহজাত। নির্জনতায় তাঁর অস্তিত্ব—তাঁর অস্তিত্বই নির্জনতা। নির্জনতা এবং জীবনানন্দ অবিচ্ছেদ্য।

তথাপি আমরা কী করে ভুলব রাত তিনটের সনেটকে—সেই মায়াবী টেবিলের রচিত নির্জনতাকে?

প্রভু ও সময়

সৌরীন ভট্টাচার্য

"The book of Job is the story of a good man who suffers total disaster— he loses all his children and property and is afflicted with a repulsive disease."

[The book of Job, Introduction;
Good News Bible :Today's English version]

তার ছিল সাত ছেলে আর তিন মেয়ে। সাত হাজার ভেড়া ছিল তার আর তিন হাজার উট। গোধন ছিল এক হাজার। গাধা পাঁচশো। মেলাই দাসদাসী। এতদঞ্চলে তার চেয়ে ধনবান আর সুখী কেউ ছিল না আর।

সাত ছেলের এক একজন এক একবারে ভোজ খাওয়াত সবাইকে। সে এক এলাহি ব্যাপার। দূর দূর গ্রাম থেকে আসত সবাই। তেপান্তর পেরিয়ে নেমন্তন্ন হত সবাকার। ভোজের ভার যেবার যে-ভাইয়েরই হোক না কেন সব বোনেদের নেমন্তন্ন থাকত। তিন বোনই ছিল ভাইয়েদের সমান আদরের ধন। আর এসব দেখেশুনে তার চিত্তে সুখ হত। ভোজের পরদিন সে খুব ভোরবেলায় জেগে যেত। সাত ছেলের নামে সে আলাদা আলাদা করে ভুক্তি উচ্ছগ্‌গু দিত। যদি কারো কাজে কথায় কারো কোনো দোষত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকে। যদি পাপ স্পর্শ করে তার ছেলেদের কাউকে। তাই তাদের মঙ্গল কামনায় সে তার অর্ঘ্য দিত। ছেলেরা কেউ ইচ্ছে করে খারাপ কিছু করবে না, এ বিশ্বাস তার ছিল। কিন্তু না জেনে না বুঝে যদি ঘটে কিছু। বলা তো যায় না। সে তাই সবার হয়ে নোয়াত তার নিজের মাথা।

আজ সমাগত সেই দিন। সবাই এসে দাঁড়াল চারপাশে। সময় এসে দাঁড়াল ঠিক মাঝখানে। প্রভু দেখে নিলেন এ পাশ ও পাশ। সময়ের চোখে চোখ রেখে সটান তিনি জিজ্ঞেস করলেন তাকে : কী করা হচ্ছে আজকাল? সময় বলল : ঘুরে বেড়াচ্ছি এ ধার ও ধার। দেখে নিচ্ছি এই দুনিয়ার হালচাল।

—তুমি কি দেখেছ তাকে। যে আমার অনুগত চিরকাল?
অত অনুগত আর সুসংহত, অতই নির্বিকার ভালো,
এই দুনিয়ায় কেউ নেই আর। সেবাকর্ম নিত্য করে সে,
অকল্যাণ ভাবনা তার মনে আসে না কখনো।

সময় জবাব দিল : এত যে সেবাধর্ম তার, বলতে চাও কিছুই সে
পায় না বিনিময়ে? চিরকাল তুমি তাকে
রক্ষা করে গেছ, দু-বেলা দিয়েছ আশ্রয়,
তা যত সম্পত্তিধন, পরিবার পরিজন

আগলে রেখেছ সব অসীম মমতায়—
বলতে চাও এ সবের কোনো প্রতিদান নেই?
সে জানে তোমার আশীর্বাদ কত মূল্যবান।
যে-বিপুল গোসম্পদে ভূষিত করেছ তাকে
আশেপাশে সাত গাঁয়ে তার কোনো জুড়ি আছে নাকি?
—তুমি ভাব এ সবই দেওয়া-নেওয়া স্বার্থের হিসেব।
ঠিক আছে, এখন থেকে তুমি তার ভার নাও,
তার যা কিছু নিজের বলতে আছে সবই তোমার জিম্মায়—
শুধু দেখো
শরীরে তার কোনো ক্ষতি কোরো নাকো।

তার দিনকাল তো সুখেই কাটছিল। একদিন তখন তার বড়ো ছেলের বাড়িতে ভূরিভোজ চলছিল। ভাইবোনেরা সবাই মিলে হইহুল্লোড় করছে। এমন সময় তার কাছে এল এক ভগ্নদূত। তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ নীচু করে আস্তে আস্তে সে বলে গেল : গোরু নিয়ে মাঠে চাষ করছিলাম আমরা তখন, আর আমাদের গাধাগুলো চরে বেড়াচ্ছিল এ ধার ও ধার। এমন সময় দক্ষিণ গাঁ থেকে হুড়মুড় করে এসে ঢুকে পড়ল যণ্ডামার্কা সব লোকেদের দলবল। আমাদের পরে হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব নিয়ে চলে গেল কেড়েকুড়ে। কী বলব আমি, সে কান্নায় ভেঙে পড়ল এই কথা বলতে বলতে। কোনোরকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে এইটুকু কেবল বলতে পারল। তোমার দাসদাসীদের সবাইকে মেরে ফেলেছে। শুধু আমিই বেঁচে গেছি কোনোমতে। বোধ হয় কেবল খবরটা দেবার জন্যে। নইলে তোমাকে খবর দেবারও কেউ ছিল না।

ভগ্নদূতের কথা শেষ হতে না হতে হাঁপাতে হাঁপাতে এল আর একজন। সে বলল কাঁদতে কাঁদতে : গেল সব গেল। বজ্রপাতে গেল তোমার সব মেষ আর মেষপালক। আমিই কোনোমতে পার পেয়েছি। বোধহয় তোমাকে শুধু খবরটা দেবার জন্য।

দ্বিতীয় জনের কথা শেষ হতে না হতে এল এক তৃতীয় ভগ্নদূত। তারও বার্তা হল : উত্তর গাঁ থেকে তিনদল দস্যু এসে আক্রমণ করে নিয়ে গেছে তোমার সব উটের দল। আর হত্যা করেছে তোমার সব দাসদাসীদের। একমাত্র আমিই রয়েছি টিকে। হয়তো তোমাকে খবরটা দিতে হবে বলে।

এরও কথা শেষ হতে না হতে এল আরো একজন। সে জানিয়ে দিল : তোমার বড়ো ছেলের বাড়িতে আজ সবার ছিল খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। সবাই যখন ফূর্তি করছে কবে তখন এল এক প্রবল ঝড়ের দাপট। মরুঝড় এসে মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে গেল সবকিছু। বাড়ি ভেঙে তছনছ। মারা গেছে সবাই। শুধু রয়ে গেছি আমি, তোমাকে খবরটা দেবার জন্য।

সে তখন উঠে দাঁড়াল সোজা। শোকে অপে ছিঁড়ে ফেলল গায়ের সব জামা কাপড়।

মাথা কামিয়ে ফেলল। সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে উপুড় হয়ে। "প্রভু, কিছুই আমি নিয়ে আসিনি সঙ্গে করে। সঙ্গে নিয়েও যাব না কিছুই। তুমিই দিয়েছিলে সব, আবার ফিরিয়ে নিয়েছ তুমিই। তোমারই নামে ধন্য যেন হই।"

সর্বনাশের এই ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়েও সে দোষ দিল না কাউকে।

আবার এল সেই দিন। সমাগত সবাই চারপাশে। সময়ও ঠিক হাজির তার মধ্যে। প্রভু তাকে জিজ্ঞেস করলেন : ছিলে কোথায়? সময় জবাব দিল : ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এ ধার ও ধার। দেখে নিচ্ছিলাম দুনিয়ার হালচাল। প্রভু জানতে চাইলেন : তুমি কি দেখা পেয়েছিলে তার, যে আমার সেবক? এই দুনিয়ায় কেউ নেই তার মতো ভালো আর নির্ভরযোগ্য অমন। সে আমার সেবাকর্ম নিয়মিত করে আর অকল্যাণ ভাবনা তার মনে আসে না কখনো। তুমি তো আমার অনুমতি নিয়ে তাকে বিচার করে দেখেছ এতদিন। বিনা দোষে বজ্রাঘাত করেছ মাথায়। সর্বস্ব কেড়েছ তার। তবু সে আজও আছে স্থির অবিচল।

সময় প্রত্যুত্তরে বলে : সর্বস্ব ত্যাগেও মানুষ কুণ্ঠিত নয়, শুধু টিকে যাবে বলে। নিজের প্রাণের মায়া—তার বাড়া কিছু নেই। শরীরে আঘাত হানো, দেখবে সে ফুঁসে ওঠে কিনা।

প্রভু তাকে উত্তরে বলেন : ঠিক আছে। সে রইল তোমার জিম্মায়। তুমি তাকে হত্যা কোরো নাকো।

সময়ের দুর্বিপাক চতুর্দিকে ঘিরে ধরে তাকে। দেখতে দেখতে মারীগুটিকায় ভরে যায় তার অঙ্গ। জঞ্জালের স্তূপের ধারে গিয়ে আশ্রয় নেয় সে। সেখান থেকে কুড়িয়ে তোলে চীনামাটির বাসনের ভাঙা টুকরো। অগত্যা, তাই দিয়ে অবিরাম চুলকোয় সারা গা। তার এই দুরবস্থা দেখে বউ তাকে কথা শোনায়। এই তো হাল তোমার। তাও এত অবিচল আস্থা আসে কোথা থেকে। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে অভিসম্পাতে জর্জরিত করে দিত তাকে। তুমি আছ দিব্যি নির্বিকার। এর চেয়ে মৃত্যুও তোমার ভালো ছিল নাকি? শোনে কি শোনে না তাও বোঝা যায় না পরিষ্কার। সে কেবলই চুলকোতে থাকে তার সারা গা।

'একি কথা, গিন্নি তোমার?' এক ফাঁকে মুখ তুলে কথার জবাব সে দেয়। 'ভালোটা যখন ভাগ্যে জোটে তখন নেব দু-হাত ভরে। আর মন্দ পেলে কথা শোনাব, এ কেমন কথা গিন্নি তোমার?' যত কষ্টই হোক না তার, সে রইল একই রকম নির্বিকার।

এবার এল তার বন্ধুর দল। দস্যুরা এসেছিল দক্ষিণ গাঁ আর উত্তর গাঁ থেকে। বন্ধুরা এল পুব গাঁ, পশ্চিম গাঁ আর আরো সব কাঁহা কাঁহা মুল্লুক থেকে। বন্ধুরা স্বচক্ষে তার কষ্টভোগ দেখে দুঃখ পেল। এখানে এসে পৌঁছোবার আগেই তারা বন্ধুর কষ্টের কথা শুনেছিল। দূর থেকে আসতে আসতে প্রথম যখন চোখ পড়ল তার দিকে তখন যেন চিনতেই পারল না বন্ধুকে। এ কী চেহারা হয়েছে তার। চুলকে চুলকে সারা গায়ে যেন

দাগড়া ঘা। ভাঙা বাসনের টুকরোয় কেটে কেটে রক্ত বেরোবার জোগাড়। কাছে এসে তার দুর্দশা দেখে বন্ধুদের চোখের জল আর বাধা মানল না। তারাও তার দুঃখের ভাগীদার হল। চিৎকার করল, ছটফট করল, নিজেদের পোশাক আশাক ছিঁড়ে ফেলল টেনে টেনে, মাটিতে মাথা ঠুকল, দু-হাতে ধুলো ওড়াল এদিকে ওদিক। তারপর বন্ধুরা চুপ করে গেল। নীরবে তার সঙ্গে বসে রইল ঠায় সাত দিন সাত রাত্তির। বন্ধুর যন্ত্রণা আর দুঃখ আর কষ্টের সাক্ষী রইল বন্ধুরা।

হঠাৎ সে মুখ তুলে তাকাল। মুখ খুলল এবার। নিজের জন্মের দিনকেই অভিশাপ দিল সে। জলপ্রপাত ভেঙে পড়ল অবিরল ধারায়।

হে ঈশ্বর, অভিশাপ বর্ষণ করো আমার জন্মের দিনে;
অভিশাপ বর্ষণ করো যে-রাতে আমার মাতা
প্রথম ধারণ করেছিলেন আমাকে।
অন্ধকারে ঢেকে দাও সেই দিন, হে ঈশ্বর।
স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ো সেই দিন;
বিন্দুমাত্র আলো যেন আর না জ্বলে তার পরে।
বিষণ্ণ ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাক ওই দিন;
মেঘে আচ্ছন্ন করে দাও, মুছে দিয়ো সূর্যকেও।
বছরের হিসেব থেকে তুমি মুছে দিয়ো দিনটাকে,
কোনোদিন যেন আর গুনতিতে কেউ না ধরে ওই দিন;
বন্ধ্যা দিন, রাত্রি আনন্দহীন।
ওঝাদের ডেকে বলো,
অভিশাপে ভরে দিক দিনটাকে;
অতিকায় দানোদের বাগে আনা তুকতাক
জানা আছে তাদের।
ভোরের তারার আলো কেড়ে নিয়ো তুমি
অন্ধকার রাত্রি যেন কখনো না পোহায়।
আমার এ দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশার তিমির রাত্রিকে
তুমি অভিসম্পাত করো।

মায়ের গর্ভেই যদি মৃত্যু হত আমার
কিংবা জন্মের মুহূর্তে—
মা, কেন তুমি কোলে তুলে নিয়েছিলে আমাকে?
তোমার বুকের দুধ কেন দিয়েছিলে খেতে?
তখনই যদি মৃত্যু হত তাহলে

কী নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ছিল পরিণতি আমার
এতদিনে আমি তবে রাজা ও সম্রাট
ঘুমন্ত প্রাচীন প্রাসাদে।
সুখী এক রাজপুত্র নিশ্চিন্তে নিদ্রায় আশ্রিত
ঘরদোর ভরন্ত সোনায় রুপোয়,
অথবা ঘুমে-ঢলা এ মৃতজাতক।
গুণ্ডা ও বদমাশ—তাদেরও কুকর্মের ক্ষান্তি হয়
মাটির কবরে
এবং সেখানে শান্তি পায় অবশেষে
ক্লান্ত শ্রমিক।
ওইখানে পৌঁছে গিয়ে জেলে-পচা বন্দীও
খুঁজে পায় মনের আরাম—
ধমক, চিৎকার কিংবা ফরমাশ
এসব এখানে নেই।
এখন এখানে তুমি চাইলে সবাইকে
খুঁজে পেয়ে যাবে
বিখ্যাত যে ছিল অথবা সম্পূর্ণ অপরিচিত
ক্রীতদাস, শেষ পর্যন্ত সেও মুক্ত এখানে।

মানুষকে এ দুঃখ ও দুর্ভোগে
কেন টেনে আনো?
দুঃখেও দেখার চোখ কেন দাও তাকে?
মৃত্যুর নিঃশব্দ অপেক্ষা শুধু
তবু তার দেখা মেলা ভার;
মাটির এ কবরস্থান, এর চেয়ে বড়ো ধন নেই।
সুখ একমাত্র এখানেই, এই বিশ্রামে;
ভবিষ্যৎ অজানা ছিল
যত্নে মোড়া লুকানো কৌটোয়।

আমি খেতে পারি না, হা হুতাশ করি। অবিরল কাতরাই। সবেতেই আমার ভয়, ভয়ই একমাত্র সত্য আমার। শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, অনিঃশেষ আমার দহন।

হে মহাজীবন, আর এ তত্ত্ব নয়

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

টেরি ইগলটন (জন্ম ১৯৪৩) বহুদিনের চেনা লেখক। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস থেকে আস্তে আস্তে তিনি পৌঁছেছিলেন মার্কসবাদে। আর সেখানেই তিনি অনড় হয়ে আছেন। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এককালের আগুনখেকোরা অনেকেই এখন সংশয়ী উদারপন্থী বা পাকা রক্ষণশীল। কিন্তু ইগলটন আজও উঁচু গলায় নিজের মত ঘোষণা করে চলেছেন : "ন্যাটো থেকে বেরিয়ে এসো। পুঁজিবাদ ছাড়ো। ব্যক্তিগত মালিকানা মুর্দাবাদ।" তাঁর বক্তব্য খুবই চাঁচাছোলা। "জীবনে নিশ্চয়ই টাকা ছাড়াও অনেক বড় বড় জিনিস আছে," তাঁর স্মৃতিকথায় (*দ্বাররক্ষী*, ২০০১) তিনি লিখেছেন। তার সঙ্গে অবশ্য এও যোগ করেছেন, তবে কিনা "টাকাই সেগুলোর বেশির ভাগকে আমাদের নাগালে আনে।" অর্থাৎ অর্থনীতির ভিতটাকে কিছুতেই এড়ানো যায় না।

অনেক বছর ধরেই ইগলটন একাধিক যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। পোস্টমর্ডানিজ্‌মকে তিনি ছাপ মেরেছেন "রুগ্‌ণ রসিকতা" বলে। অন্যদিকে রিচার্ড ডকিন্‌স্‌-এর বিরুদ্ধেও তাঁর জেহাদ। স্বভাবসিদ্ধ কড়া ভাষায় তিনি বলেছেন : "ঈশ্বর নিয়ে ডকিন্‌স্‌-এর বইটিকে আমি আক্রমণ করেছিলাম কারণ আমি মনে করি ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে তিনি নিরক্ষর।"

এসব খবর সকলের কাছে পৌঁছয় না। কলকাতার বাজারে চাহিদা অনুযায়ী জোগান হয় নানা উল্‌টো-পাল্‌টা বই-এর। আকাদেমিআ-ও এখন পোস্টমর্ডানিজ্‌ম্‌-এর নতুন অবতার, ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশ-উত্তর চর্চা-র আগ্রহ দেখাচ্ছে। মার্কসবাদ এই মুহূর্তে আর তেমন ফ্যাশনেব্‌ল্‌ নয়। তাই ইগলটন বা ফ্রেডরিক জেমসন-এর মতো মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচকের নতুন বইপত্র সহজে মেলে না। অথচ ইগলটন-এর *তত্ত্বের পরে (আফটার থিওরি)* বইটি সব জিজ্ঞাসুরই পড়া উচিত। তাঁর *সাহিত্যতত্ত্ব : একটি ভূমিকা* (১৯৮৩, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৯৬) পড়ে বছরের পর বছর ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা-বৈতরণী পার হয়েছেন। কিন্তু তার পরেও যে তাঁর কিছু বলার ছিল ও আছে সে-খবর অনেকেই রাখেন না।

তত্ত্বের পরে (২০০৩)-ই ইগলটন-এর শেষ বই নয়। গত পাঁচ বছরে তাঁর আরও পাঁচটি বই বেরিয়েছে। তার একটি সাহিত্য-বিষয়ক : *কী করে কবিতা পড়তে হয় (হাও টু রিড আ পোএম*, ২০০৬), অন্যটি দর্শন নিয়ে : *জীবনের অর্থ (মিনিং অফ লাইফ*, ২০০৭)। তবে সংস্কৃতির ব্যাপারে *তত্ত্বের পরে*-ই তাঁর শেষ বই। এখানে সেটি নিয়ে কিছু বলব। যাঁদের পক্ষে বইটি জোগাড় করা সহজ নয় (আমাকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বিদেশ থেকে আনাতে হয়েছে) বা ইন্টারনেট খুলে ইগলটন সম্পর্কে খবরাখবর জানার সুযোগ নেই, তাঁদের কথা ভেবেই আগে অত কথা লিখলুম। মূলত তাঁদের জন্যেই নিচের কথাগুলো বলছি।

মাত্র ২২৭ পাতার বই; আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'কিস্মৃতির রাজনীতি'। "রাজনীতি" শব্দটি এখন ব্যাপক চলছে : অনুবাদের রাজনীতি, রাস্তার খাবারের রাজনীতি—সবকিছুরই রাজনীতি আবিষ্কার হয়েছে। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে প্রায় সব পি এইচ. ডি গবেষণায় এককালে 'বেদান্ত' থাকত : কালিদাসে বেদান্ত, ভারবিতে বেদান্ত, মাঘে বেদান্ত, ইত্যাদি। ঠাট্টা করে কেউ কেউ বলতেন : শুধু দুটো গবেষণা বাকি আছে, পাঁজিতে বেদান্ত আর রেলপথের টাইম টেবিলে বেদান্ত। রাজনীতিরও এখন সেই দশা। নানা অর্থে কারণে-অকারণে শব্দটি ব্যবহার করার ফলে তার তাৎপর্যই হারিয়ে যাচ্ছে।

ইগলটন অবশ্য সে-পথের পথিক নন। তিনি বরং আমাদের মনে করিয়ে দেন : তত্ত্বর স্বর্ণযুগ শেষ। তার আদি প্রবক্তারা যা লিখেছিলেন, তাঁদের অনুগামীরা তেমন মৌলিক কিছু হাজির করতে পারেন নি। তবে সংস্কৃতিতত্ত্বর বাজার এখনও ভালো। ইওরোপ-আমেরিকার ছাত্রছাত্রীরা জনপ্রিয় সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। যে-সব বুড়ো বিদ্বান্ আজও মনে করেন জেফ্রি আর্চার-এর চেয়ে জেন অস্টেন বড় কথাসাহিত্যিক, বাঁ-বাকঝকে ছোকরারা তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখে। পুরনো আমলে রবার্ট হেরিক-এর কবিতায় একটি মেটোনিম লক্ষ্য না করলে সেই ছাত্রকে তার বন্ধুরাই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিত। আর এখন কেউ যদি মেটোনিম বা হেরিক-এর নাম শুনে থাকে, তাকেই বরং নিচু নজরে দেখা হয়। যৌনতাই আজকাল গবেষণার একমাত্র উপযুক্ত সামগ্রী। টিভি সেট-এর সামনে থেকে এক ন্যানোমিটার না-নড়েও পি এইচ. ডি থিসিস লেখা যায়।

তার ফল হয়েছে এই যে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভবের আগের সমবেত ও সফল রাজনৈতিক সংগ্রামের স্মৃতি হারিয়ে গেছে। মানুষকে এই ভাবেই ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে অর্থনীতির মূল প্রশ্নগুলি। ইগলটন বলেছেন, উপনিবেশ-উত্তর-চর্চায় আরও ভাবালু ধারাগুলোয় যা ধরে নেওয়া হয়, বেশির ভাগ মার্কসবাদীই তেমন ধরে নেন নি। তাঁরা ভাবতেন না : 'তৃতীয় বিশ্ব' মানেই ভালো আর 'প্রথম বিশ্ব' খারাপ। তাঁরা বরং জোর দিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক আর উপনিবেশ-উত্তর রাজনীতির শ্রেণী বিশ্লেষণে।

তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে জাতীয় বিপ্লবের আংশিক ব্যর্থতার দরুন উপনিবেশ-উত্তর তত্ত্ববিদ্‌রা জাতীয়তার ব্যাপারে কিছু বলতে চান না। উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামে জাতীয়তাবাদ যে একদা আশ্চর্যরকমের সুফলা শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছিল, এটাই তাঁরা বোঝেন না। জাতীয়তাবাদের মধ্যে তাঁরা দেখতে পান শুধুই উগ্র স্বাজাত্যবোধ বা জনগোষ্ঠীগত আধিপত্যবাদ। শ্রেণী ও জাতির জায়গায় এখন এসেছে এথ্‌নিসিটি, ছোটোবড় প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এর ফলেই উপনিবেশ-উত্তর জগতের প্রশ্ন কার্যত রাজনীতিবিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এথ্‌নিসিটি তো অনেকটাই সংস্কৃতির বিষয়, তাই ফোকাসটাও সরে গেছে রাজনীতি থেকে সংস্কৃতিতে। আর্থিক বৈষম্য, শ্রমিকদের সংগ্রাম এগুলো আর কোনো সমস্যা নয়। অথচ তথাকথিত ভুবনায়নের যুগেও বড়লোকরাই গ্লোবাল, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে; গরিবরাই লোকাল, নিজের দেশ ছেড়ে নড়ার সুযোগ নেই।

এরপরে ইগলটন আলোচনা করেছেন 'তত্ত্বর উত্থান ও পতন' নিয়ে। একদা পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পাশাপাশি আধুনিকোত্তর তত্ত্বগুলির উদ্ভব হয়েছিল। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে জঙ্গি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। নাটকীয়ভাবেই সেটির গতি কমে গেল। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পায়ে বেড়ি পরানো হলো, ইচ্ছে করে তৈরি করা হলো বেকারি। তখনই বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে গেল তত্ত্ব। দেখা দিল তেলের সংকট, উগ্র দক্ষিণপন্থার জয় ও বিপ্লবী আশার ভাঁটার টান। তার পরেই, প্রায় ১৯৮০ পর্যন্ত ছিল সংস্কৃতিতত্ত্বর রমরমা। প্রথাগত বামপন্থায় বিস্তর খুঁত ধরা হলো : শিল্প, সুখ, লিঙ্গ (জেন্ডার), ক্ষমতা, যৌনতা, ভাষা, পাগলামি, বাসনা, আধ্যাত্মিকতা, পরিবার, শরীর, বাস্তুতন্ত্র, অচেতন, এথ্‌নিসিটি, জীবনচর্যা, আধিপত্য (হেজিমনি)—এগুলোর সবকিছু নাকি প্রথাগত বামপন্থা অগ্রাহ্য করেছে। ইগলটন বলেছেন : খুব ক্ষীণদৃষ্টি না হলে যে কারুরই নজরে পড়বে এ হলো মানুষের শারীরবৃত্তর এক বিবরণ যাতে ফুসফুস ও পেট বাদ রাখা হয়েছে। অথবা এ হলো সেই মধ্যযুগের আইরিশ সন্ন্যাসীর মতো, যিনি একটি অভিধান সঙ্কলন করেছিলেন, কেন কে জানে, 'এস' হরফটি বাদ দিয়ে।

প্রথাগত বাম রাজনীতি—সে-যুগে যার মানেই ছিল মার্কসবাদ—কি সত্যিই অমন তালকানা ছিল? ইগলটন মনে করেন : ঘটনা তা নয়। গেওর্গ লুকাচ, ভালটের বেনিয়ামিন, আন্তোনিও গ্রামশি থেকে টেওডোর আডোর্নো, এর্নস্ট ব্লশ, লুসিয়াঁ গোল্ডমান, জাঁ-পল সার্ত্র, ফ্রেডরিক জেমসন—এঁরা যৌনতা ও প্রতীকিতা, শিল্প ও অবচেতন, জীবন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা ও চেতনার রূপান্তরকে অবহেলা করেন নি। বিশ শতকে ঐ ধরণের চিন্তার চেয়ে সমৃদ্ধতর কোনো উত্তরাধিকার নেই। হাল আমলের সংস্কৃতি চর্চা (কালচারাল স্টাডিজ) এই উত্তরাধিকারের খেই ধরেই এগিয়েছে, যদিও তার অনেকটাই পূর্বসূরিদের বিবর্ণ ছায়া।

'পশ্চিমী' মার্কসবাদের উৎপত্তি হয়েছিল খানিকটা রাজনৈতিক অক্ষমতা ও মোহভঙ্গ থেকে। এককালের জঙ্গি বিপ্লবী ধারাকে এতে ভদ্রস্থ করে তোলা হলো। রাজনৈতিক দিক থেকে এটি কিন্তু একেবারেই ফোক্‌লা। রবার্ট জে. সি. ইয়ং থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইগলটন দেখিয়েছেন : কমিউনিজমই ছিল প্রথম ও একমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচি যাতে নানা ধরণের প্রভুত্ব ও শোষণ (শ্রেণী, লিঙ্গ ও উপনিবেশবাদ)-এর পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছিল; এগুলির অবলোপ না করতে পারলে কোনোটির থেকেই মুক্তি সম্ভব নয়—এও জানা ছিল। লুই আলতুসের, রলাঁ বার্ত, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, জাক দেরিদা—এঁরা সবাই ছিলেন বামপন্থী শিবিরের লোক; মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ-বর্জন মেলানো একটা সম্পর্ক ছিল। পরে সকলেই অল্পবিস্তর ঘুরে গেলেন। জুলিয়া ক্রিস্তেভা ও *তেল কেল* পত্রিকাগোষ্ঠী তো আশ্রয় নিলেন ধর্মীয় মরমিয়াবাদে। ইংল্যান্ড-এ ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকের সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞরা এখন যোগ দিয়েছেন অ-মার্কসবাদী শিবিরে। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে তাঁদের রূপ দাঁড়াল রাজনীতিবিচ্যুত (ডিপলিটিসাইজ্‌ড্‌)।

এইভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে ইগলটন লাভ-ক্ষতি হিসেব করেছেন। ইচ্ছে করে দুর্বোধ্য লেখার তিনি বিরোধী। পরাপ্রশ্ন (মেটা-কোয়েশ্চেন) দিয়ে যে সরাসরি বিচারমূলক প্রশ্নকে হঠানো যায় না—এই তাঁর মত। কোনো সমালোচনামূলক প্রকল্পকেই তিনি অভেদ্য বলে মনে করেন নি; সবগুলোই সংশোধনের যোগ্য। তাঁর মনে হয়, সংস্কৃতিতত্ত্ব কথা দিয়েছিল : কয়েকটি মৌলিক সমস্যাকে ধরা হবে, কিন্তু মোটের ওপর সে-কাজে ওটি ব্যর্থ হয়েছে।

শেষ চারটি অধ্যায়ের মূল সুরটি দার্শনিক ও রাজনৈতিক। পুঁজিবাদী নীতিবোধ (এথিক) অনুযায়ী জীবনে সফল হওয়াই শেষ কথা। তার বিরুদ্ধে ইগলটন তুলে ধরেন সমাজবাদী নীতিবোধকে। বিষয়মুখিতা (অবজেক্টিভিটি)-কে তিনি সম্মান করেন; মানুষের স্বভাব—এই ধারণাটিকে তিনি ছাড়তে রাজি নন। মার্কসকে তিনি চিহ্নিত করেছেন ধ্রুপদী নীতিবাদী (মরালিস্ট) বলে। মনে হয় মার্কস নিজেও সে-বিষয়ে সজাগ ছিলেন না, "যেমন দান্তে সজাগ ছিলেন না তিনি মধ্যযুগে বাস করছেন।" মানুষকে রাজনৈতিক জীব না-ভেবে সাংস্কৃতিক জীব ভাবায় ইগলটন-এর আপত্তি আছে। তিনি মনে করিয়ে দেন, আমরা ঐতিহাসিক জীব বলেই সর্বদা এক পরিবর্তনের প্রবাহে থাকি।

এফ. আর. লীভিস তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বলতেন : যা ইচ্ছে তা-ই পড়ো। ইগলটন তাঁর মাস্টারমশাই-এর কথামতো চলেন। বাইবেল-এর পুরনো নিয়ম ও নতুন নিয়ম সংক্রান্ত গবেষণা থেকে শুরু করে আমাদের বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন-এর মতামত—সবেরই খবর তাঁর জানা। নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নে শেক্স্‌পিয়র-এর নাটক, *ম্যাকবেথ* ও *রাজা লিয়র*, থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইগলটন তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

বইটির শেষে, উত্তরকথন-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-র হালচাল নিয়ে তাঁর তীব্র আপত্তি প্রকাশ পেয়েছে। ইওরোপ যেভাবে তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসছে তাতেও তিনি বিরক্ত। তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জর্জ বুশ-ই আমেরিকা নয়, এক সত্যিকারের আমেরিকা আছে। সেই রাজনৈতিক বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে তিনি বইটি উৎসর্গ করেন (গোড়ায় অবশ্য বইটি উৎসর্গ করা আছে ইগলটন-এর মা-র স্মৃতিতে)।

Terry Eagleton. *After Theory*. New York: Basic Books, 2003.

সমাজতন্ত্রের ভাবনা ও নির্মাণ : কয়েকটি অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির পর প্রায় দু'টি দশক অতিক্রান্ত হতে চলল। বিগত ২০০৭ সালটি ছিল নভেম্বর বিপ্লবের ৯০তম বর্ষপূর্তির এবং আনতোনিও গ্রামশির ৭০তম মৃত্যুবার্ষিকীর বছর। আগামী ২০০৯ সালটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে রোজা লুকসেমবুর্গের মৃত্যুর এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার ৯০তম বর্ষ হিসেবে। এই প্রতিটি ঘটনাই আজ ইতিহাস এবং সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যাঁদের এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার ও অন্যকে ভাবানোর কথা, সেই বামপন্থীদের এক বড় অংশই বর্তমানে নির্লিপ্ত, উদাসীন। এর সম্ভাব্য দু'টি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। এক : এমন অনেকে আছেন যাঁরা এখনও এই স্বপ্ন দেখেন যে অচিরেই সমাজতন্ত্রের পুনরুত্থান হবে রাশিয়া-সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে, যদিও বাস্তবের সঙ্গে এই ভাবনার কোনও মিল খুঁজে না পেয়ে স্বপ্ন দেখার মধ্যেই তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখেন। দুই : সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও ভাবনা সম্পর্কেই অনেকে সন্দিহান এবং এমনটাই অনেকে আজ ভাবাটা শ্রেয় মনে করছেন যে এক অলীক ও অবাস্তব আদর্শের পিছনে ছোটার খেসারত দিতে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সহযোগী দেশগুলিকে।

আপাতদৃষ্টিতে এই দুই বক্তব্যকে ভিন্ন মনে হলেও এঁদের চিন্তার সূত্রটি অভিন্ন। এঁদের ভাবনার নেপথ্যে কাজ করেছে সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিষয়টি। এক পক্ষ মনে করেন যে সমাজতন্ত্র নির্মাণের মূল কলাকৌশল কিছু কিছু ভুলত্রুটি সত্ত্বেও মোটের ওপর ঠিকই ছিল। শুধু মধ্যপর্বে ক্রুশ্চেভ ও অন্তিমপর্বে গর্বাচভের মত খলনায়কের আবির্ভাব সব কিছুকে বানচাল করে দেয়। কিন্তু তাঁরা এখনও আশা করেন যে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর হবে না এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই সমাজতন্ত্রের পুনর্গঠনপ্রক্রিয়া আবারও একবার অনুষ্ঠিত হবে। অপর পক্ষ মনে করেন যে সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্ট্র্যাটেজির মধ্যেই যে অতিকেন্দ্রিকতার উপাদান নিহিত আছে, গলদটা সেখানেই। আর তারই পরিণতিতে ঘটে গেছে সমাজতন্ত্রের এই মহাবিপর্যয়। কোনও একটি পক্ষের বক্তব্যকে নির্দিষ্টভাবে সমর্থন না করেও এ কথা অনস্বীকার্য যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের অন্যতম কারণ অবশ্যই ছিল অর্থনীতির ভিত্তিটিকে সংহত করতে পারার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। অতিকেন্দ্রিকতা যে বদ্ধাবস্থার জন্ম দিয়েছিল, তা থেকে মুক্তি পেতে যখন আবার উদার অর্থনীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াকে যুক্ত করা হল, তা থেকে জন্ম নিল যে প্রবল নৈরাজ্য, তার জেরে এবং সমার্থ কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসাফল্য,—এই দুই ঘটনার সম্মিলিত চাপ সোভিয়েত ব্যবস্থার পক্ষে সামলানো সম্ভব ছিল না। এই কথাগুলো আজ আর নতুন কিছু নয়। গত প্রায় দুটি দশক জুড়ে এই

কথাগুলো বলার জন্য বিস্তর লেখালেখি, আলাপ-আলোচনা হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের ভাবনার মধ্যেই যে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি, ফাঁকফোকর ছিল, সে কথা এখন সর্বজনবিদিত।

॥ ২॥

এই কথাগুলো ভুল নয়, মিথ্যাও নয়। কিন্তু দু'টি প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। প্রথম প্রশ্ন : ছোট বড় অনেক ভুলত্রুটি, দুর্বলতা সত্ত্বেও সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নভেম্বর বিপ্লবের জন্মমুহূর্ত থেকে যে লক্ষ্য, যে উদ্দেশ্যগুলি সোচ্চারে ঘোষণা করেছিল, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের যে ভাবাদর্শকে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমাবধি পুঁজিতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে গভীর প্রত্যয় ও দৃঢ়তার সঙ্গে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল তার ঐতিহাসিক মূল্য কি সমাজতন্ত্রের মহাপতনের ঘটনা নিরপেক্ষ নয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন : বাস্তবে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র যদি সত্যিই একেবারে সঠিক পথে নির্মিত হত, যদি সেই অধরা সমাজতন্ত্র হত সব রকমের ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতামুক্ত, তার কি সমাজতন্ত্রের মূল ভাবাদর্শ ও নৈতিক ভিত্তিকে স্পর্শ করার, পরিবর্তন করার কোনও প্রয়োজন দেখা দিত? বিষয়টির জটিলতা এখানেই। সমাজতন্ত্র নির্মাণের ব্যর্থতার নিরিখে যদি সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শকে বিচার করা হয়, অর্থাৎ, ভাবাদর্শের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যকে যদি নির্মাণনিরপেক্ষভাবে দেখা না হয়, তাহলে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাটাই ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়। বামপন্থী মহলের এক বড় অংশের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আজ যে সংশয় ও অনীহার প্রকাশ দেখা যায়, তার একটি প্রধান কারণ সম্ভবত এটিই।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়া একেবারে সূচনাপর্ব থেকেই কয়েকটি নীতিগত ও আদর্শগত লক্ষ্যকে চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, যা প্রতিষ্ঠা করেছিল সমাজতন্ত্রের সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তি। যৌথশ্রম, বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া, দেশের সম্পদকে কোনওভাবে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত হবার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বাতিল করা, সহমর্মিতার ভাবনাকে উৎসাহ দেওয়া, সামাজিক ন্যায়ের ভাবনাকে চরিতার্থ করার তাগিদে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলিকে বাস্তবায়িত করা (অর্থাৎ শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, চাকুরি, সামাজিক নিরাপত্তা), পুঁজিবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন করা। পরবর্তীকালে এই লক্ষ্যগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে আদর্শগত স্খলন, ত্রুটিবিচ্যুতি নিশ্চয়ই ঘটেছিল, কিন্তু সমাজতন্ত্রের এই নীতিগত ভিত্তিকে কখনও পরিত্যাজ্য ঘোষণা করা হয়নি। এই নৈতিকতার শক্তিই সমাজতন্ত্রকে দিয়েছিল স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা, পুঁজিবাদী দুনিয়ার কাছে যা ছিল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ। ঝাঁ চকচকে বিজ্ঞাপনের বহর নয়, ব্যক্তিগত গাড়ির তুলনায় রাষ্ট্রীয় পরিবহনব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া, শিশুদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান, বর্ণবৈষম্যের ভাবনার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, সর্বোপরি ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিকের মত দেশগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সাধ্যাতীত সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করা,—এ সবই ছিল সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শের অনুসারী।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ট্র্যাজেডি সম্ভবত এটাই যে এই ভাবাদর্শকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেই কিন্তু সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছিল অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক একপথ, যার ব্যাপ্তি ছিল প্রায় গোটা কালপর্ব জুড়ে। জারতন্ত্রের রাহুগ্রাস থেকে শ্রমজীবী মানুষকে মুক্ত করে একদিকে যেমন তাঁদেরকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার, যা অবশ্যই লজ্জা দিয়েছিল পুঁজিতন্ত্রের প্রবল বৈভবকে, একদিকে যেমন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে সমস্ত রকমের সাহায্য ও সমর্থন জুগিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ঘুম কেড়ে নেওয়া গিয়েছিল, অপরদিকে এরই পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছিল মস্কো মামলা, গুলাগের মত ঘটনা, স্থায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এক প্রবল পার্টি-রাষ্ট্রের ধারণাকে, বৈধতা দেওয়া হয়েছিল একরৈখিকতার এমন এক ভাবনাকে যা মান্যতা দেয় না কোনও ধরনের ভিন্নতাকে, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার নামে সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রতিবেশী একাধিক দেশে খতম করে দেওয়া হয়েছিল জায়মান ভিন্নধর্মী সমাজতন্ত্রের চিন্তাকে।

কিন্তু এই আশ্চর্য বৈপরীত্য এবং সমাজতন্ত্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রে প্রবল বিকৃতি সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের তুলনায় সোভিয়েত ব্যবস্থার গুণগত ভিন্নতাকে কিন্তু খুব সহজে অস্বীকার করা যায়নি। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরি এবং ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়াতে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেও তাই সার্ত্র বলেছিলেন যে গোটা শরীরে রক্ত মেখেও এই দানব কিন্তু সমাজতন্ত্রই। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে যখন হিটলার ও স্তালিন, ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্র সমার্থক এমন বক্তব্য নয়া-দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রবল উদ্যমে প্রচারিত হতে শুরু করল, যখন ফ্রান্সের কমিউনিস্টবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হল The Black Book of Communism, তখন এ সবের বিরুদ্ধে যাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন, যাঁরা তীব্র নিন্দা করেছিলেন স্তালিন ও হিটলার একই মানদণ্ডে বিচার্য এই ভাবনার, তাঁরা নিজেরা অনেকেই সমাজতন্ত্রের নির্মাণকাণ্ডের বলি হয়েছিলেন, শিকার হয়েছিলেন স্তালিনতন্ত্রের। কিন্তু সমাজতন্ত্রের নির্মাণপ্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সমস্ত রকমের অপকর্ম ও কুকীর্তিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল সমাজতন্ত্রের নৈতিক ভাবাদর্শ, যার প্রবল আকর্ষণে গেওর্গ লুকাচের মত ব্যক্তিত্ব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিচল ছিলেন সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি, পশ্চিমী দুনিয়ার শত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে আঁকড়ে ছিলেন সমাজতন্ত্রকে, কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে এসে রেয়াত করেননি স্তালিনতন্ত্রকেও।

॥ ৩ ॥

সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ ও নির্মাণের এই দ্বন্দ্ব আমাদেরকে একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, যেগুলি হয়ত অমীমাংসিতই থেকে যাবে। যে প্রবল একরৈখিকতার ভাবনা সমাজতন্ত্রের নির্মাণকাণ্ডকে নির্দেশিত করেছিল, যার পরিণতিতে সমাজতন্ত্রের পরিচালন প্রক্রিয়াটি স্খলিত হল তার ভাবাদর্শ থেকে, সমাজতন্ত্রের রাজনীতি যেখানে তার ঘোষিত নৈতিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে গেল, তার কি কোনও উপযুক্ত ব্যাখ্যা সম্ভব? এক

P32105

ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে রুশ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়া এবং এই ব্যতিক্রমকেই ভবিষ্যতে সর্বজনীনতার ভাবনায় চিহ্নিত করার মধ্যেই কি নিহিত ছিল আরও গভীর কোনও প্রশ্ন? বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখাই যেখানে লেনিনের কাছে এক এক সময় প্রায় এক অসম্ভব দায় বলে মনে হয়েছিল, যে প্রবল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে লেনিনকে গোর্কির কাছে আক্ষেপের সুরে বলতে হয় সে রুশ বিপ্লবের স্থায়িত্বের বিষয়টি নিয়ে তিনি আর ভরসা পাচ্ছেন না এবং এই হতাশা কাটাতে গোর্কিকে অনুরোধ করেন পিয়ানোতে বেটোফেনের 'আপ্পাসিওনাটা'-র তেজোদীপ্ত সুরগুলি শোনাতে, তার পরে সেই দেশে সমাজতন্ত্রের নির্মাণপ্রক্রিয়া যে সহজসাধ্য হবে না, তা সহজেই অনুমেয় ছিল। যে ব্যতিক্রমী ও জটিল পরিস্থিতি নভেম্বর বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল, অতিকেন্দ্রিকতা, একেবারে গোড়ার দিকে তো বটেই, হয়ত অবশ্যম্ভাবী ছিল। এমন একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা যদি সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে, তার পরিণতি স্বস্তিদায়ক হতে পারে না। যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা লেনিনকে আক্রান্ত করেছিল, তার প্রতিধ্বনি লেনিনোত্তর সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং ধ্বনিত হয় দাপট ও ক্ষমতার আস্ফালন আর তারই জেরে সমাজতন্ত্র নির্মাণের সোভিয়েত মডেলটি সর্বোত্তম আখ্যায়িত হয়, যা বাতিল করে দেয় সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে ভিন্নধর্মী কোনও ভাবনাকে। এর জন্য যদি দায়ী করা হয় স্তালিনতন্ত্রের উত্থানকে, তার নেপথ্যেও কিন্তু থেকে যায় আরও বড় এক প্রশ্ন : স্তালিনতন্ত্রকে কি বৈধতা দেয়নি রাশিয়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত এমন কিছু উপাদান, যা ভিন্নতা ও বহুমাত্রিকতার স্বরগুলিকে অস্বীকার করে। তাহলে কি বলতে হয়, স্তালিনতন্ত্রই ছিল রুশ বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি? এর উত্তর একদিকে যেমন না, অপরদিকে আবার এও বোধ হয় বলতে হয় যে স্তালিনের বদলে অন্য কেউ যদি সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দখল নিতেন, তিনিও বোধ হয় খুব বড় রকমের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারতেন না। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভ ও ১৯৮৫ সালে গরবাচেভ এই ব্যতিক্রম ঘটাতে গিয়েই নিজেদের পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিলেন। অনুমান এইটুকুই করা যায় যে রুশ বিপ্লবের কালশ্রুতিতে যদি বিপ্লব সংঘটিত হত ইউরোপের উন্নত প্রথম সারির এক-আধটি দেশে, তাহলে হয়ত পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে যেতে পারত, যা হয়ত 'একটি দেশে সমাজতন্ত্র' নির্মাণের স্তালিনীয় ভাবনাকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে একটি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত, হাজির করতে পারত সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিকল্প কোনও ভাবনা।

শেষ বিচারে এই প্রশ্নটিই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। অক্টোবর বিপ্লবের উত্তরসূরি জুটল না ইউরোপের উন্নত কোনও দেশে, বরং বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিবর্তে কায়েম হল প্রতিবিপ্লবী ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস আর তার ধাক্কায় দিশেহারা আত্মগোপনকারী, নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টিগুলির আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াল সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুনিশ্চিত করল তাঁদের মস্কো-নির্ভরতা। এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সোভিয়েত লালফৌজ রুখে দিল নাৎসি জার্মানির অগ্রগতিকে, যা চমৎকৃত করল গোটা বিশ্বের মানুষকে, বৈধতা জোগাল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের নির্মাণকাণ্ডকে। এই ঘটনাগুলির অভিঘাতে নিশ্চুপ থাকতে

হয়েছিল এমন অনেককেই কিংবা স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এমন অনেকের কণ্ঠস্বরকেই, যাঁদের ভাবনা ছিল ভিন্নমুখী। তাই তোগলিয়াত্তি বা দিমিত্রভকে সায় দিতে হয়েছিল সব কিছুতেই, লুকাচকে বলতে হয়েছিল যে মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ছিল ভাববাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন এবং তার জন্য তিনি অনুতপ্ত, বুখারিনকে তাঁর ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মুখোমুখি হতে হল গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ডের, রোজা লুক্সেমবুর্গকে বিপ্লববিরোধী আখ্যা দিয়ে তাঁর নাম মুছে দেওয়া হল কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস থেকে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া (ফ্রান্স, ইতালি, চিন, ভিয়েতনাম) কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ক্রমেই হারাতে বসল তাঁদের গণভিত্তি, একান্তভাবেই তাঁদের ভবিষ্যৎ হয়ে দাঁড়াল সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণের গতিপ্রকৃতি নির্ভর।

॥ ৪ ॥

যদি এইসব কিছুকেই ইতিহাসের এক অমোঘ বাধ্যবাধকতার নিরিখে ব্যাখ্যা করতে হয়, তার পরেও দু'টি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথম প্রশ্ন : পুঁজিতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে মার্কস ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজে এক পূর্ণ মানুষের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার যে তত্ত্বায়ন করেছিলেন, নীতিগতভাবে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সেই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা করতে গিয়ে একরৈখিকতার ভাবনা যে ব্যভিচার ঘটাল, তার সঙ্গে মার্কসের চিন্তার কি কোনও মিল পাওয়া যায়? মার্কস পড়লে সম্ভবত যে উত্তরটা পাওয়া যাবে, তা এরকম : তাঁর ভাবনায় ভবিষ্যতের এই গোটা, পূর্ণাঙ্গ মানুষ অবশ্যই কোনও বিমূর্ত সত্তা নয়, কারণ তাঁর চরিত্র হবে সাম্যবাদী ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক নির্ভর, অর্থাৎ, আপেক্ষিক। কিন্তু তার অর্থ আবার এমনও নয় যে মার্কস এই পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলতে ছাঁচে ঢালা, নির্দিষ্ট কোনও আদলের কথা বলেছিলেন। সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে এমনটাই ঘটেছিল। সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষ গঠনের ব্রত নিয়ে যে পদ্ধতি অনুসৃত হল, সেটি ছিল যে একরৈখিকতায় দুষ্ট তা বিধ্বস্ত করে দিল মার্কসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে। লেনিনের সেই ঐতিহাসিক উক্তিটি মনে পড়ে : সংকটের সময় প্রায়ই তিনি পরামর্শ করেন মার্কসের সঙ্গে। লেনিন-পরবর্তী সোভিয়েত নেতৃত্ব এমন ভাবনায় নিজেদেরকে ঋদ্ধ করেছিলেন বলে জানা নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : সমস্ত ধরনের নেতিবাচকতাকে স্বীকার করে নিয়েও এ কথা মানতেই হবে যে সমাজতন্ত্রের কর্মসূচি রূপায়িত করতে গিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে যে দায়ভার নিতে হয়েছিল, তার চরিত্রটি কিন্তু ছিল প্রবলভাবে নৈতিকতার ভাবনায় জারিত যার মূল কথাটি ছিল ব্যক্তিস্বার্থের তুলনায় সামাজিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কিন্তু নৈতিক দায়ের ভাবনা কেন প্রভাবিত করতে পারল না দেশের সাধারণ মানুষকে, কেন উদ্দীপিত করতে ব্যর্থ হল বৃহত্তর জনসমাজকে? অতি সক্রিয় সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা সব কিছুর দায়ভার গ্রহণ করতে গিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল গণউদ্যোগের ভাবনাকে, যার পরিণতিতে নৈতিক দায়বোধের কোনও ভাবনা সঞ্চারিত হতে ব্যর্থ হল সমাজের বিভিন্ন

স্তরে। নৈতিকতার যে সমৃদ্ধি থেকে উৎসাহিত হয় সামাজিক দায়ের ভাবনা, যা কান্টের 'ক্যাটেগোরিক্যাল ইমপেরেটিভে'র মত সঞ্চালকের কাজ করে, তার ব্যাপ্তি ও প্রসারের বিষয়টি নিয়ে পরাক্রমশালী সোভিয়েত রাষ্ট্র কখনও মাথা ঘামায়নি। এখানেও সক্রিয় ছিল অতিকেন্দ্রিকতার ও একরৈখিকতার ভাবনা, যার জেরে সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পরে দেখা গেল না সমাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার কোনও নৈতিক দায়। প্রবল উৎসাহে রাশিয়ার মানুষ গ্রহণ করল বাজার অর্থনীতিকে, সমাজতন্ত্র লালিত করেছিল যে নৈতিকতাকে, তাকে নির্বাসন দিতে কুণ্ঠাবোধ করল না পতনোত্তর রাশিয়া।

একরৈখিকতার দর্শন আত্মতুষ্টিকে সুনিশ্চিত করে, নিশ্চয়তা দেয় ক্ষমতা প্রদর্শকের রাজনীতিকে, কিন্তু সমাজতন্ত্রকে প্রতি মুহূর্তে গতিশীল ও তার প্রবল সৃজনশক্তির নিরন্তর উৎসারণের জন্য প্রয়োজন যে নিরবচ্ছিন্ন সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা, একরৈখিকতার ভাবনা তাকে কোনও আমল দেয় না। সমাজতন্ত্রের সৃজনশীলতার স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল ক্রিটিক-এর, যা মান্যতা দিতে পারত বহুমাত্রিকতার ভাবনাকে, ভিন্ন স্বরের উপস্থিতিকে, যা দিয়ে চেনা যেত শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত চাহিদা ও দাবিদাওয়াকে। প্রায় তিন দশক আগে ১৯৮০ সালে জর্জিয়ার থবিলিসি শহরের একটি হোটেলে মুখোমুখি অনেক কথা বলার ও শোনার সুযোগ হয়েছিল প্রয়াত বিশিষ্ট সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ্ আলেকজান্দার চিচেরভের কাছে, যিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে। সেই গল্পটা দিয়েই শেষ করি। গভীর আক্ষেপ ও হতাশার সুরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বন্ধাবস্থার, তার প্রবল যান্ত্রিকতার ও বর্ণহীনতার কারণ কী জানেন? আমাদের দেশে জন্মালেন না কোনও সার্ত্র, কামু বা বার্নার্ড শ, যাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলিকে নির্মমভাবে প্রকাশ করেছিলেন। আমরা আটকে রইলাম একদিকে গোগল, তলস্তয়, অপরদিকে শলোকভে। এই ক্রিটিকের অভাবই আমাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে এক কঠিন, বিপন্ন সময়ের দিকে।"

পুরনো গাড়ির নতুন গল্প

রুশতী সেন

যে-সব ভোগ্যপণ্য বহুদিন ধরে অবিরত ব্যবহারের যোগ্য, তাদের কেনা-বেচার একটা প্রক্রিয়া সম্প্রতিকালে ভয়ঙ্কররকম চালু। টি. ভি. কি ফ্রিজ, মিউজিক সিস্টেম কিংবা মোটরগাড়ি — ভোক্তার ব্যবহারে এদের শরীর থেকে আনকোরা নতুনের জৌলুশটা উঠতে-না-উঠতেই পুরনো বদল দিয়ে নতুন কেনার একটা হুজুগ পড়ে যায়। 'আপনার গাড়ির দু-বছর হয়ে গেল না? যদি বদলে ফেলতে চান, নতুন অমুক গাড়ি তমুক দামে পাবেন। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ ক্রেডিট তো বটেই, উপরন্তু অমুক মাস পর্যন্ত আপনার লোন ইনটেরেস্ট ফ্রি , পরের মাস থেকেও রেট অভ্ ইনটেরেস্ট যৎসামান্য—মাত্র তমুক।' পুরনো বদলে নতুনের এই এক্সচেঞ্জ খেলায় যারা খেলুড়ে, তাদের কোনো ব্যবহার্যেরই তেমন বয়স বাড়তে পারে না জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রই সদাসর্বদা একেবারে ঝকঝকে-তকতকে, মালিন্য নেই এতটুকু আসলে পণ্য তো পণ্যই রে বাবা, তার উপর আবার মায়া পড়া কী? ওইসব ফালতু বোকামি অথবা আবেগ আজকের ভোক্তা-ক্রেতাদের শরীর-মন থেকে হু হু করে উড়ে চলে যাচ্ছে বহু দূরে, যেমন করে বেজায় চড়া রোদে ভিজে কাপড় মেললে চোখের পলকে উড়ে যায় জলীয় বাষ্প! শুকনো খটখটে মন নিয়ে হালকা ফুরফুরে ভোক্তা ভাবে—গাড়ি তে গাড়িই! যত আধুনিক হবে তার মডেল, তত হালকা সে, তত বেশি তার গতি; ততই কম পেট্রোল কনসাম্পশান এক্সপেক্টেড। কোন গাড়িতে চাপিয়ে আমার কোন পূর্বপুরুষ অথব পূর্বমাতৃকাকে শেষবারের মতো নিয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে, কোন গাড়িতে বসে আমার আজকের দজ্জাল গিন্নিটি নতমুখী সলজ্জ নতুন বউ হয়ে প্রথম এসেছিলেন আমার সংসারে কোন গাড়ির সিট ভিজিয়ে আমার প্রথম সন্তান পোলিও ভ্যাক্সিন খেতে গিয়েছিল—এমন সব স্মৃতি আবার বস্তুরকে নিয়ে লালন করে নাকি কেউ? আমার সেই কাঁথা-ভেজানো ছেলে তো আজ অটোমোবাইল ম্যানিয়াক— মোটরগাড়ির নিত্যনতুন মডেলের লিস্টি আমার চেয়ে ঢের বেশি সড়গড় তার।

তবে আজও কেন ঋত্বিক ঘটকের *অযান্ত্রিক* চলচ্চিত্র আমাদের জন্য সংবেদন তৈরি করে? সে কি সারাজীবনের দায় একসন্ধ্যার নন্দন-ভ্রমণে অথবা বাড়ি বসে সি. ডি দর্শনে সারতে-সারতে একটা শর্টকাট পাওয়া যায় বলে? পথশিশুর হাতের চাপে বেজে উঠেছে জগদ্দলের ফালতু হয়ে যাওয়া হর্ন, শুনতে শুনতে বিমলের মুখে হাসি, চোখে জল। আর কোনোদিন ট্রিপ দেবে না জগদ্দল, তবু যেন অবোধ শিশুর সানন্দস্পর্শে সে একাকার হয়ে গেল আগামীদিনের জীবনপ্রবাহে। ফিল্মের রিলে বা মঞ্চের উপরে এমনটা হলে ভোক্তার জীবনযাপনে কোনো মালিন্য লাগে না, অথচ যান্ত্রিক-অযান্ত্রিকের বোঝাপড়ায় শরিক হওয়া যায়। নতুন ইনোভা কি ইন্ডিকায় চেপে দেখে আসা যায় *অযান্ত্রিক*, বাহবা বাহবা বলতে বলতে! সত্যিই কী ছবি, কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো এসব বোঝে না। অমুকের বাবার গাড়ির মডেল একেবারে লেটেস্ট, তমুকের টি. ভি. তে তিন

পঁচাত্তরটা চ্যানেল আসে, আমাদেরটায় মাত্র পৌনে তিনশো, এইসব নানান বায়নাক্কা। ফলে নাকি অসহায় মা-বাপ পুরনোর বদলে আরো নতুন কিনতে বাধ্য। তার ওপর সস্তায় মোটরগাড়ি তৈরির কিস্‌সা; চাষির জমি নেওয়া সমীচীন কিনা, ক্ষতিপূরণে জমির মালিকের থেকে কত পিছিয়ে আছে ভাগচাষি, আর ভাগচাষির নাম যদি নথিতে না-থাকে তবে তো কোনো পূরণই নেই। তবে কি হাওয়া হয়ে গেল জমি তার লাঙল যার? এখন দলিলই সব? রোলবার কি কর্নেটো আইসক্রিমের ফাঁকফোকর দিয়ে কৃষি-শিল্পের কাজিয়া যেন কটি কানে না ঢোকে। ভালোয়-ভালোয় দশ ক্লাস পাশ করে ঢুকে যাক সায়েন্স নিয়ে বারো ক্লাসে, জয়েন্ট-এর জন্য কোচিং দিয়ে দেব আগরওয়াল না হোক বুনবুনওয়ালা। তারপর যদি মাত্র লাখ টাকায় কিনতে পারি একখানা মোটর, তো সেটা শুধুই হবে বাবাইসোনার বা সোনামণির—চালিয়ে যাবে কলেজে।

গাড়ি-বাড়ি-টি. ভি.-ডি.ভি.ডি প্লেয়ার,. কোনোকিছুতেই আর ভাগ করে নেওয়ার কালিমা সয় না। মডেল লেটেস্ট হলে খোকাখুকুদের সম্মানহানির ভয় নেই। এই দুনিয়ার বায়নাদারি সোনামণিদের জন্য ভাঙা বাড়ি, ভাঙা গাড়ির গল্প। বিজলী গাড়ি বা পারিজাত বাড়ির কী-ই বা চাহিদা এ-জমানায়? মামু কিংবা বাবা অথবা পিকলুর ছোটকার মতো খ্যাপাটে বেওকুফ যে অচল আজকের পৃথিবীতে। তাই শীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যের সঙ্গে তেমন পরিচয় হলো না আমাদের ছেলেপুলেগুলোর। ১৯৯৪ সালে দে'জ পাবলিশিং-এর মতো নামী প্রকাশক ছেপেছিলেন শীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কিশোর রচনাসম্ভার* ১, পরের বছরই দ্বিতীয় খণ্ড। কী তার কাটতি? কটাই বা কপি বিকিয়েছে এই দেড় দশকে? ইতিমধ্যে ২০০৪ সালে ঘটে গেছে সেই ঘটনা, যার পরে লেখকদের বই কাটে বেশি। কিন্তু শীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুও বোধহয় *হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া* (*কিশোর রচনা সম্ভার* ২, পৃ ১-৬৯), *হনুমানুষ* (ঐ ১, পৃ ৭৫-৩০) কিংবা *পিক্‌লুর সেই ছোট্‌কাকে* (ঐ, পৃ ১৩১-১৭৫) তেমন কাছে আনতে পারেনি পাঠকের। এই *হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া* যে সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত ছোটগল্প 'অযান্ত্রিক'-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে বাংলার বাল্য-কৈশোরকে চিনিয়ে দিতে পারে রূপকথার উল্টোবাঁক, সে কথা জানি ক-জন? এ-উপন্যাস প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৬৮-তে, অর্থাৎ শীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় কম অপরিচিত উপন্যাস *ববির বন্ধু*-র (*কিশোর রচনাসম্ভার* ১, পৃ ১-৭৩) আট বছর পরে।

ববির বন্ধু-র ঘটনাকাল শেষ হয় রেঙ্গুনে বোমা পড়বার সমকালে। অর্থাৎ গত শতকের চারের দশক। বর্মার প্রবাসী বাঙালি তার বাড়িতে ঐকান্তিক আদর-যত্নে পেলে তোলা সব জন্তু-জানোয়ারকে বনে ছেড়ে দিয়ে চলে আসছেন নিজের আজীবনের আবাস ছেড়ে। বালিকা মিনির জবানিতে দেখি :

> সে যে কী মর্মান্তিক চিৎকার শুরু হল...ওরা সবাই কাঁদছে। এমন কি খরগোশগুলো পর্যন্ত। সবাই পেছিয়ে রয়েছে। খাঁচা থেকে কেউ বেরুতে চায় না। তুতুল্‌টা পর্যন্ত রয়েছে। শাদা দুধে ধোয়া এতটুকু তুতুল্‌। তাকেও ছেড়ে যেতে হবে। তাকেও বনে যেতে হবে। মানুষ কী নিষ্ঠুর! যুদ্ধ কী সাংঘাতিক! (*কিশোর রচনাসম্ভার* ১, পৃ ৭০)।

জীব-জন্তু, পশুপাখিকে আপন করে, মায়া বাড়িয়ে কষ্ট পাওয়ার কথা গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী *এক ডুব দুই ডুব* (অভিজাত প্রকাশনী, ১৯৯৮, ৩৫.০০) জুড়ে ফিরে ফিরে আসে :

> আমাদের সিঙ্গাপুরের বাড়িতে ছিল ন'টা বেড়াল। সব কুড়িয়ে পাওয়া। তারা আবার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এক চামচ করে রেডিও-মল্ট খেত স্বাস্থ্য ভাল হবার জন্য। আর ছিল কিছু মুরগি...বৃহস্পতিবার বাজার থেকে ভুলে...যদি মুরগি কিনে বসত তাহলে সে মুরগি পোষা হত। লক্ষ্মীবারে মা'র জীব হত্যার বিরুদ্ধে জেহাদ ছিল। যুদ্ধ এসে আমাদের সব কিছু ওলোট-পালট করে দিয়ে গেল। মা চলে গেলেন ৩৪ বছর বয়সে। বাবা রইলেন মালাকায়। তারপর সেখানেই তিনি একা একা এক হাসপাতালে মারা গেলেন। বর্মায় দিদির কাছে মান্দালয় শহরে রইলাম। জাপানিরা এগিয়ে আসতে আমার পোষা ভালুক ববি আর দিদিদের চিড়িয়াখানার সব জন্তু-জানোয়ার ফেলে আমরা এক কার্গো-জাহাজে চড়ে দেশে ফিরলাম। ...যুদ্ধে আমরা বাঁচলাম বটে, কিন্তু আমাদের আত্মীয় জীবজন্তুদের একজনকেও বাঁচাতে পারলাম না। (*এক ডুব দুই ডুব*, পৃ ৪৯-৫০)

নিদারুণ কষ্টের এই স্মৃতি জীবনে একান্ত প্রখর ছিল বলেই কি গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *ববির বন্ধু*-র পরিণামে একটা শেষ না-হওয়ার রেশ রেখে গিয়েছিলেন? মিনির সঙ্গে ববির আবার কোনোদিন দেখা হওয়ার সম্ভবনাটা সুদূর হলেও একেবারে অসম্ভব নয় যেন। আবদুল তার এতদিনের মনিব আর নোকরি ছেড়ে গেল ববির পিছু পিছু; ববি ধরা দিল কিনা, আবদুল পারল কিনা তাকে ধরতে, সে-কথা বুঝবার আগেই মিনির চোখের সামনে বন ওদের ঢেকে দিয়েছিল *ববির বন্ধু*-র শেষে। পাঠকের কোনো অনুসন্ধান প্রত্যাশা কি তবে বাকি থেকে গেল? কোনো আগামীদিনে কি কোনো সভ্য শহরের রাজপথে মিনির সঙ্গে দেখা হতে পারে আবদুল আর ববির? বুড়ো আবদুল কি তখনও ববির সঙ্গে নেচে গেয়ে পথে পথে ভালুকখেলা দেখায়? নাকি যুদ্ধবাজ মানুষের সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করল মিনির বন্ধু ববি? বনের মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে তার নিজবাস? এমন কোনো নিরুত্তর জিজ্ঞাসা নেই *হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া*-র পরিণামে। *ববির বন্ধু*-র আবহের মতো যুদ্ধ সেখানে প্রত্যক্ষ নয়, বরং একেবারে নিত্যনৈমিত্তিকদিনযাপনের গল্পেই সে-উপন্যাসের অবলম্বন। আছে মিতুল টুটু বাপ্পার মতো কৈশোর-বাল্য, আছেন তাদের মামুর মতো অসামান্য মামা, তাদের বাবার মতো অদ্বিতীয় বাবা। যুদ্ধদীর্ণ এই সভ্যমানুষের আবর্তে মামু কিংবা বাবার মতো মানুষজন নাবালকদের সাহচর্যে আপাত স্বাভাবিক পরিপার্শ্বের অন্তর থেকে উন্মুক্ত করতে পারেন বেজায় নির্মম আবার দারুণ ভালোবাসার এক আখ্যান। অথচ *হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া*-র তেমন কোনো সূত্র পাবেন না পাঠক গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায়। অনেক খুঁজে পেতে মিলবে একটিমাত্র বাক্য—'একবার বাবা মামলা করতে যাবেন মালাকায়, আমরা সপরিবারে সঙ্গে যাব গাড়িতে।...আমাদের ঢাউশ ফিয়াট ফাটো ফাটো করে রওনা দেওয়া গেল।' (ঐ, পৃ ৪৮)।

ববির বন্ধু-র মিনির বদলে *হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া*-য় মিতুল। আবার এক কিশোরী বয়ানেই দেখি মামুর গাড়ি অথবা ছেলে বিজলীর (ডাকনাম বিজু) হালচাল :

> বিজলী কিন্তু তাই বলে মেয়ে নয়...বিজু কেবল পুরুষ নয়—পরমপুরুষ...দারুণ আদরে মামু বিজুকে তকাই বলে ডাকেন। তকাই পরিবারের আদত জন্মস্থান, মামুর হিসেবমত, ইতালিতে। অথচ গাড়ির নাকের ডগায় পরিষ্কার লেখা আছে দেখেছি—'ফিয়াট'। (*কিশোর রচনাসম্ভার* ২, পৃ ৩)

আর এ-হেন বিজু যখন রাস্তায় চলে, পথচারীরা বলে, 'দ্যাখ দ্যাখ, ইতিহাসের একটা পাতা উড়ে যাচ্ছে!' কেউ বা মামুকে বলে, 'রথটি আপনার খাসা। জনি ওয়াকারের টাইমের মনে হয়। সেভেনটিন সেভেনটি নাকি?' কেউ বা গান ধরে, 'হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া' (ঐ, পৃ ১২, ১৫-১৬)। মিতুলেরই মুখে শুনি বিজুর পথচলার বর্ণনা :

> ...ঝাঁকুনিতে শক্ত হাড়ও অনেক সময় দুখানা হয়। ব্রেকটাও তেমন দড় নয়। তার ওপর সামনের সিটের বাঁ দরজাটা ভাঙা। ঢোকার পর দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়...বিজু অনেকটা 'গঙ্গারামে'র মতো সুপাত্র হলেও, ও চালু। ফাঁকা রাস্তায় দারুণ স্পীডে চলে থাকে। ইঞ্জিনে আজেবাজে ঘিসির্ ঘিসির্ শব্দ নেই। একটু হেলে দুলে চলে। কিন্তু তাতে নেহাৎ খুব খারাপ দেখায় না। সেখানে থামার কথা সেখানে না থামলেও অনেকসময় কাছাকছির মধ্যে থামতে পারে। চড়লে মনে হয়, গাড়িটা কানে কিছুটা খাটো। আর, কিছুক্ষণ চলার পর মনে হতে থাকে ওর পেটের পেট্রোল ঝাঁকুনির ঠেলায় ভুটভুটিয়ে গিয়ে মদ হয়ে যাচ্ছে! স্টার্ট্ করাবার জন্য আজ পর্যন্ত এই শহরের কম ক'টি লোককে কাঁধ দিতে হয়নি। এখন এমনকি মামুর অনেক বন্ধুবান্ধব বিজুকে দূরে দেখলে আশেপাশে বাড়ির আড়ালে বা গলিঘুঁজির মধ্যে পা ঢাকা দেয়। (*কিশোর রচনাসম্ভার* ২, পৃ. ১০-১১)

অথচ এই বিজুই মিতুল-টুটু-বাপ্পার মামার বাড়ি, দাদু-দিদা, মা, মামী—সবই। বিজু কাছে থাকলেই ওরা মামার বাড়ি মামার বাড়ি খেলে। এই বিজুই মিতুলকে ম্যাট্রিকের অঙ্ক পরীক্ষার হলে পৌঁছয়। এই বিজুর সাহচর্যেই ওরা ওদের বাবার পছন্দ করা ঐতিহাসিক বাড়ির দিকে যাত্রা করে।

সেই যাত্রার মাঝপথে কলকাতার রাস্তায় মামুর মতো ওস্তাদ ড্রাইভার ট্রাফিক সিগন্যাল সত্ত্বেও বিজুকে থামাতে পারলেন না, কারণ বিজু তখন চলার মুডে। সে-দৃশ্য প্রসঙ্গে মিতুল লিখছে, 'সব গাড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে গেছে। কেবল বিজুবাবু ট্রাফিক-পুলিশের চারধারে ঠিক সার্কাসের ঘুরন্ত মোটর সাইকেলের মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। আর পুলিশ ঠায় ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' (ঐ, পৃ. ১৪)। এ তো যে সে যাত্রা নয়। যাওয়া হচ্ছে মিতুল-টুটু-বাপ্পার বাবার, অর্থাৎ ছুটি পেতে দেরি হচ্ছে বলে হাতে দু-মাসের মাইনের সংস্থান নিয়ে নিশ্চিন্তে চাকরি ছেড়ে দিতে পারা বাবার নির্বাচিত বাড়িতে। সে-বাড়িতে পৌঁছনোর মুহূর্তটা ছিল এ রকম :

> ...মামু হুই-ই করে প্রচণ্ড জোর দিয়ে সাঁ করে একটা মোড় ঘুরলেন। আর

> সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ছিঁড়ে আমি সজোরে ছিটকে এবড়ো খেবড়ো একটা ঢিপির ওপর চিৎপাত। মামু আর বিজু কিন্তু কিছুর তোয়াক্কা না করে তখন একটা গেটওয়ালা পুরনো বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। (ঐ, পৃ ১৮)

কিন্তু বাড়িটার নিরাপত্তাব্যবস্থা এমনই যে এ-হেন বিজুকে রাত্তিরে খোলা জায়গায় একা রাখতে মন চায় না বিজুর অভিভাবকের। আবার বিজু তো মামুর তেমন ছেলে নয় যে রাতভর পোড়ো আস্তাবলে বন্ধ থাকতে পারে। মামু বলেন, '...আস্তাবলে...রাখার চেয়ে আমাদের...কাছাকাছি রাখা ঢের ভাল...কী যাচ্ছেতাই নোংরা ওঠা। ভয়েই মরবে বেচারি...তোরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিস না। কোনো কোনো যন্ত্র বিশেষ বিশেষ মানুষের চাইতে বেশি সেন্‌সেটিভ হয়...' (ঐ, পৃ ৩৬)। মিতুলের সঙ্গে এত কথা বলবার আগেই কিন্তু মামু মোমবাতি জ্বালিয়ে বিজুর শরীরে কীসব টাইট করতে করতে ফিস্‌ফিস্ করে গোপন কথা বলেছে ছেলের সঙ্গে, 'তকাই, তুই যেন কোনোদিন সত্যিকারের যন্ত্র বনে গিয়ে ছেলেপুলে চাপা দিয়ে বসিসনে।' (ঐ)। তকাইয়ের কঁ্যাচ-কঁ্যাচ উত্তর মিতুল বোঝেনি, সম্ভবত মামু ছাড়া কেউই বোঝেন না।

প্রথম রাতেই সেই নতুন বাড়িতে, যেখানে ইলেকট্রিকের মিটার এতটাই গোলমেলে যে কেরোসিনে ফিরে যাওয়াই স্বস্তির, ফাটা চাল দিয়ে ভয়ানক প্রলয় ঢুকে এল ঘরে, খাটে শুয়ে ছেলেমেয়েরা ভিজে কাদা। বাপ্পা-টুটু-মিতুলের সদ্য পোষা কালো বেড়াল কিটুল বাঘের মাসির ভঙ্গিতে মোকাবিলা করল সম্ভবত এই ঐতিহাসিক বাড়ির এক প্রাচীন বাসিন্দা কেউটের। চট চাপা থেকেও ভিজে গোবর বিজু, সিটের খানিকটা ছোবড়া ছাড়া কিছুই শুকনো নেই, এমনি বিপরীত ঝড়বৃষ্টি। সেই শুকনো ছোবড়ার একটু আর বাড়িতে পাওয়া কিছু কাগজের সাহায্যে মৃত কেউটের শেষকৃত্য। আসলে এতসব যে ঘটে গেল, তার ব্যাখ্যান তো পাঠক পাচ্ছেন মিতুলের কাছে। গাড়িকে সত্যিকারের যন্ত্র হতে বারণ করা মামার ভাগ্নি সে; ইঞ্জিনিয়ান কটনের শার্টে গিঁট বেঁধে বাজারের থলি বানানো বাবার মেয়ে। এমন মামুকে নিয়ে, এমন বাবাকে ঘিরে গর্বের অন্ত নেই মিতুলের :

> কে না চায় রেওয়াজ মতন বাড়ির ছেলেমেয়ারা উঁচু উঁচু পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়। কেননা বড়রা তো কেউ কখনও ছোটবেলায় ফাস্ট-সেকেণ্ড ছাড়া হয়েছেন বলে শোনা যায় না...বন্ধুবান্ধবদের বাবা, মা, কাকা, জ্যাঠা সকলেরই ঐ 'বরাবর ফার্স্ট' হওয়ার ইতিহাস...চেনাশুনোর মধ্যে এক আমার বাবা আর মামু ছাড়া যখন সকলেই কক্ষনো-থার্ড-না হওয়ার দলে, তখন আমার আর বিজ্ঞান পড়ে বিদ্যের জাহাজ হবার ইচ্ছেটা রাখা যায় না...কেবল পাছে বাবা কষ্ট পান, তাই পাশটা করতেই হবে। নয়তো লোকে বলবে মা-মরা ছেলেমেয়েগুলোকে বাপ দেখেনি। (ঐ, পৃ ৪)

এমন চিন্তাশক্তি আর বিবেচনাবোধ যে মিতুলের, তার দেখা আর বলা তো তেমনিই বাহারি হবে। সত্যি-মিথ্যের, সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত মাপজোখ-মাপের ভেদরেখা লোপাট করে দিয়ে হাওয়াগাড়ির সওয়ারি মিতুল বলে :

> ভিড়ের রাস্তা বটে, কিন্তু মামুর হাতে বিজুর চলা দেখলে তা বোঝাই যায়

না। দুদিকের বাড়ি, ঘর, দোকান, রাস্তা, সব হু হু করে কান ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। আর কী মজা, যাবার সময় সব কিছু পিছলিয়ে পেছিয়ে পড়ছে। কেবল যখনই সামনের দিকে তাকাচ্ছি, মনে হচ্ছে সামনেটা অনেক দূরে। অথচ দূরটা যেই কাছে আসছে তখন সেটা একদম অন্য জিনিস মনে হচ্ছে। একমাত্র বিজুই কিন্তু এইসব দেখাতে পারে। (ঐ, পৃ ১৮)।

অর্থাৎ মিতুল যতই বলছে তাদের গল্পহীন গল্প, ততই তো সাবালক পাঠক ভাবছেন, সব্বনাশের মাথায় বাড়ি। এমন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীকে কোনখানে লুকোন তাঁরা, যাতে বাড়ির নাবালক-নাবালিকাগুলোর চোখে না পড়ে! তবে দর্শনে আর গ্রন্থনায় এতবড় ওস্তাদ মিতুলও কিন্তু পাঠককে জানিয়েছে, 'বাবার ঐতিহাসিক বাড়ির ছিরি দেখে আমিও খুব খানিকটা চেঁচিয়ে হাসব ভাবছিলাম। ছোটখাটো মরা বাগানে ঘেরা পোড়োমত, বুড়োমত খিল্ জানলা ভাঙা একতলা একটা বাড়ি...বিজুর ঠাকুরমারও ঠাকুমা হবে। টিউবওয়েলে জল তুলতে হয়। এসব কারণে ভাড়া কম। ধড়ধড়ে, হাত-কান ভাঙা পরী বসানো গেটের একধারে নোংরা মারবেল পাথরে লেখা আছে, অনেক কষ্টে পড়া যায়—"পারিজাত"। (ঐ, পৃ ১৯)।

অসাধারণ আর্টিস্টিক রান্না করে ছেলেমেয়েদের প্রশংসা পেয়ে, শার্ট দিয়ে থলি বানিয়ে বাজার করে, মাছ ধরার পুকুর আর চড়িভাতির স্পট খুঁজতে বিজুর উপরে নির্ভর করে বাবা আর মামু যতই স্বতঃস্ফূর্ত যাপন চান জীবনটার, শেষপর্যন্ত বেসামাল গরুর গাড়ির খড় চাপা পড়ে রুদ্ধ হয় বিজুর গতি। অনাথদাদুর অকৃপণ প্রশস্তিও বিজুকে তক্ষুনি আর নড়াতে পারে না। তাছাড়া যত আনন্দই দিক বিজু মামু, ভাগ্নেভাগ্নি, তাদের বাবা, তাদের নতুন পাড়াপড়শি বা প্রথম দেখা অনাথদাদুকে, বিজু যে এখন এক গ্যালন পেট্রোলে মাত্র মাইল চারেক যাচ্ছে (ঐ, পৃ ৬৫)। তাও আবার অনেক চিকিৎসাপত্র, মুখ-ফেরানো, রং-মাখানোর পরে! তাই দু-মাসের মাইনের সমান সঞ্চয় আর মামুর কর্পোরেশনের চাকরির জোরে বাবার পক্ষে বেশিদিন বেকার থাকা চলে না। ঐতিহাসিক বাড়ি পারিজাত আর অমর গাড়ি বিজলীর এই গল্পে ফিরে-ফিরেই ওঠে সময়কে জয় করার প্রসঙ্গ, আসে মহাকাশযাত্রার লুব্ধকে পৌঁছনোর স্বপ্ন। মামু যতই বলেন, সেরকম যাত্রার এক-একটিতে, একটি করে নতুন মানুষের পরমায়ু আটবট্টি বছর বাড়াবেন, বাবাকে বলতেই হয়, '...এ পৃথিবীর বেগ সেকেন্ডে উনিশ মাইলের বেশি উঠবে না। পৃথিবীর টাইমটা সৌরজগৎ বেঁধে দিয়েছে। তোমার তর্কাই গাড়িরও মরণকাল উপস্থিত। আমরাও এলো এলো।' এসব ব্যাকওয়ার্ড থিওরি মামুর পোবায় না। থ্রিডাইমেনশানের হিসেব নয়, ফোর্থ ডাইমেনশান হলো সময়—'এই সময়ের হিসেবটা আর বছরের হিসেবে হচ্ছে না—গতির হিসেবেও হচ্ছে...কিছুদিন পরে এই একই পৃথিবীতে কতরকমের মানুষ বেড়াবে...কালো, ধলো, ময়লা, পিলা—এসব রঙ দিয়ে মানুষ বাছার দিন শেষ হবে। মানুষ হবে কালজয়ী।' (ঐ, পৃ ৬১-৬২)। বিজুর এই বৈজ্ঞানিক আখ্যানেই পাঠক দেখেছেন, কালো কুচকুচে বিড়াল পোষা নিয়ে ঠাকুমা-দিদিমাদের আপত্তি (যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই 'কালো আলো' (ঐ, পৃ ৩১৬-২১) নামের ছোট্ট গল্পটির স্মৃতি), দেখেছেন, আত্মীয়-পরিজন থেকে সদ্যপরিচিত অনাত্মীয় গৃহস্থালিতেও মা-মরা ছেলেমেয়েদের

নিয়ে খানিকটা আবেগ, কিছুটা দীর্ঘশ্বাস, শুনেছেন ঘটি-বাঙালের নটখটি। কিন্তু কালজয়ের স্বপ্নে বিভোর মামু যেই না উত্তেজিত চড় মেরে আদর করেছেন বিজুকে, ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল তার উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচ। তকাইকে ফ্রিজ করে, হাইবারনেট করিয়ে আড়াইশো বছরকে বাগে আনার তত্ত্ব প্রয়োগ করার অনেক আগেই যেন তকাই পেয়ে উঠছে, 'সকল পথের ঘোচে চিহ্ন সকল বাঁধন যবে ছিন্ন/মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—/তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।' মামু বলে ওঠেন, '...আবার কাঁচের খরচ। আমি ব্রোক। ওকে একটা পর্যায় না আনলে ওর বয়েস ফ্রীজ করে লাভ কী? ইলেকট্রনিকে জ্ঞান ফিরে এলেই তো সেইটা ঝুরঝুর্ করে খসে পড়বে।' (ঐ, পৃ ৬৩)।

তাই ঐতিহাসিক বাড়ি আর অমর গাড়ির এই আখ্যানের অভ্যন্তরে আপাদমস্তক সাংসারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রসভঙ্গ এসে পড়ল : (১) বাবার আর বেকার থাকা চলে না। তিনি কাজ পেয়েছেন প্যারিসে। (২) মা-মরা ছেলেমেয়ে তিনটে এবার বাবার সঙ্গে যাবে। আর স্কুলবোর্ডিং নয়, আত্মীয়-স্বজনদের দায়িত্ব বাড়ানোও নয়। (৩) মামু যাচ্ছেন সঙ্গে, লন্ডনে স্পেশাল ফিচার লেখার কাজে; মহাকাশ গবেষণার সব খবর পাঠাবেন দেশে। (৪) বাবার যোগাযোগ আর মামুর সম্মতিক্রমে মি. রাও নামক এক বড় অফিসার বিজুকে কিনবেন; দর দিয়েছেন তিন হাজার টাকা; ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে, বোঁ করে, ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে বুঝতে তিনি বাধ্য হলেন যে বিজু ভালো গাড়ি। মামু অবাক—'কই এতকালের মধ্যে কোনোদিনও তো তকাই এমন নিখুঁত ব্যবহার করেনি।' (ঐ, পৃ ৬৮)

তকাইকে বেচে ফেলার প্রস্তাবটা প্রথম দেওয়ার মুহূর্তে বাবাকে কেমন মরিয়া দেখিয়েছিল টুটু আর বিশেষত মামুর সামনে—'গাড়িটা-গাড়িটা বাঁচবে না।' টুটু তেমন ছাড়নেওয়ালা নয়—বাঁচবে না তো হাইবারনেট করিয়ে আড়াইশো বছর আয়ু বাড়াবার প্রশ্ন উঠেছিল কেন। বাবা বলেন, আগামীকালের কল্পনা নিয়ে বর্তমান চলে না, আগে তো প্রমাণ চাই তত্ত্বের। (ঐ,পৃ ৬৫)। মামুর কাছ থেকে তকাইয়ের চলে যাওয়ার আগের মুহূর্তগুলো মিতুল আমাদের যতই দেখায়, ততই যেন বুঝি আমরা, যে, ছেলেপুলেদের হুজুগের দোহাই দিয়ে নিজেদের পণ্যরতি লালন করতে-করতে *হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া*-র মতো সাহিত্যের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলাটা কেন আমাদের পক্ষে এত জরুরি। হয়তো জীবনের সাহিত্য আর সাহিত্যের জীবনের কোনো এক স্তরে এ-কথাও কিছুটা স্পষ্ট হয় যে, কেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনের শেষ প্রকাশিত নাবালকদের জন্য বইটির (*বাঁপুই, দোয়েল*, ২০০৩) উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন, 'সুভাষ মুকুজ্জে মশায়ের ৫০ বছরের সংসারের ছেলেপুলে, পশুপাখি আর গাছপালাদের।' মিতুল দেখেছিল :

> ...মামু তকাইয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে মনে মনে অনেক কথা বলছেন। ওঁর সামনে বসে গম্ভীর মুখে বিটুল...মানুষ আর গাড়ির মধ্যের এই আলোচনাটা মন দিয়ে শুনছে। মামু বলেছেন যন্ত্রের মরার কোন কারণ নেই। ঠিকমত বানাতে পারলে যন্ত্র মরবে কেন? মানুষও একরকমের যন্ত্র। সেই বা মরবে কেন? বিজ্ঞানীরা বলেছেন মানুষ, যন্ত্র—সব অমর হতে পারে। তকাই কী এসব কিছু বুঝছে? মামুর মুখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে হচ্ছিল—একটা যা হোক—লাগ্ লাগ্ মন্তর—লাগিয়ে তকাইকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে দেওয়া যাক। তাহলে ও আমাদের সঙ্গে প্যারিস,

লণ্ডন চলে যেতে পারে। কতটুকুই বা এ পৃথিবী। কিছুদিন পরেই যখন আমরা লুব্ধকে যাচ্ছি—তখন কতটুকুই বা এই পৃথিবীটা? (ঐ, পৃ ৬৬)।

কালো বিড়াল পোষা নিয়ে যার যত আপত্তিই থাক, মা-মরা মিতুলের ঠোঁট-ফোলানোর সামনে কিটুলের দায়িত্ব আগু বাড়িয়ে নিয়ে নেবেন, এমন মাসি-পিসি কাকি-জেঠি বাংলার অন্দরে-অন্দরে তখনও (এখনও কি?) পাওয়া সম্ভব বলেই না মিতুল এত স্বতঃস্ফূর্ত বলে যেতে পারে *হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া*-র কাণ্ডকারখানা। তবে কি মনিপি'মার কাছে কিটুলকে আর মি. রাওয়ের কাছে বিজুকে রেখে নিশ্চিন্তে বিয়োগব্যথা বুকে নিয়ে পশ্চিমের উড়োজাহাজে চেপে বসল পারিজাত-ত্যাগী বাবা, তার তিন ছেলেমেয়ে আর তাদের লুব্ধক-পিয়াসী মামু? মিতুলের বয়ানে বিজুর শেষ বর্ণনায় ছিল, 'পরিশ্রমে হুস্ করে তকাই নিঃশ্বাস ফেলল। এবার বাবার পালা। হেডলাইট জ্বালা হল। দেখলাম ওর চশমা জোড়া ঝাপ্‌সা। মামু মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।' (ঐ, পৃ ৬৮)। কিন্তু স্মৃতিমেদুরতার এই প্রশান্তিটুকুও সইল না। মামু তখন মালপত্তর নিয়ে চলে গেছেন এয়ারপোর্ট, তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা দিচ্ছেন বাবা, হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে পড়লেন মি রাও :

> কার্‌টা দারুণ ভাল চলছিল। মেকানিকরা বলে ভাল কনডিশান। তাই আজ ভোরে গঙ্গার ধারে খুব স্পিডে চালাচ্ছিলাম—হঠাৎ ইঞ্জিন বার্স্ট করে গাড়ির বনেট শুদ্ধু উড়ে গেল। আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু গাড়িটা জার হয়ে গেছে। খসে খসে পড়ে গেছে...গাড়ির ওনার...ভদ্রলোককে বলবেন। (ঐ, পৃ ৬৮)।

প্লেনে উঠে মামু জানলেন বিজুর খবর, অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'দারুণ সেন্স অফ্ হিউমার ছিল...শেষ পর্যন্ত আত্মসম্মান বাজায় রাখতে ওকেও কম মেহনত করতে হয়নি। মৃত্যুটা আসলে আত্মহত্যা, না...?' (ঐ, পৃ ৬৯)। প্লেন যখন আরো উপরে ওঠে, মিতুল দেখে, মামুর চোখ নিচের দিকে; যেখানে কলকাতা, যেখানে 'রেড রোডের ওপর তকাই পড়ে আছে। টিন-কুড়ুনো ছেলেগুলো বোধহয় এতক্ষণে ওর গা থেকে টিন খুলে নিয়ে তা বেচে খাবার খাচ্ছে।' (ঐ)।

এমন অনুমান অর্থনীতির সত্যি দিয়ে গাঁথা, হয়তো মানবতারও। আবার লুব্ধকের স্বপ্ন বাদ দিলে মামুর ভবিষ্যৎ-জীবিকার অনিশ্চয় বাড়বে। আরও নিরালম্ব হবে টুটুর 'আগামীকাল' হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। মামু আর তার ভাগ্নে-ভাগ্নিরা আবার ফিরে আসতে পারে কলকাতায়, কিন্তু বিজুর সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না তাদের। আবদুল আর ববিকে ঘিরে সুদূরতম যে প্রত্যাশা মিনি লালন করতে পারত তার কৈশোর থেকে যৌবনে, যৌবনে থেকে মধ্যবয়সে, তেমন কোনো কল্পনার অবকাশ ফুরিয়ে গেছে *হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া*-র লিখিত পরিসরেই। বিজু-তকাই-বিস্কুটকে ঘিরে কালজয়ের স্বপ্ন লোপাট। ফুরিয়ে গেছে অযান্ত্রিক বিজুর সঙ্গে মিতুলের, কিটুলের, টুটুর, মামুর সব দেওয়া-নেওয়ার পর্ব। এই বোধহয় রূপকথার উল্টোবাঁক। টুটু-বাপ্পা-মিতুলের একমাত্র মামাবাড়ি বিজু, অনাথদাদুর মতো খড়কুটো মানুষের চোখে বহুদিন পরে আনন্দাশ্রু আনা বিজু ছিন্নভিন্ন হয়ে পথশিশুদের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় বনে যায়। হারিয়ে যায় তার হাওয়াগাড়ি সুলভ অবয়ব।

কিন্তু চাঁটি মারলে যার উইন্ডস্ক্রীন উড়ে যায়, সে ভেঙে-ভুঙে শেষ হতে চাইলে এমন কী আপশোষ থাকতে পারে এই পুরনো বদলে নতুন কেনার দৌড়-মাঠে?

গত শতকের ছয়ের দশকে কি বিজলীর পরিণাম আজকের চেয়ে বেশি বেদনাবহ ছিল? তখন কি পুরনোকে নিয়ে ভোক্তাক্রেতার আবেগ ছিল আজকের তুলনায় বেশ খানিকটা ভারি? দিন যত এগোচ্ছে, ফুরফুরে আবেগবর্জিত স্বচ্ছ মন নিয়ে, কম থেকে আরো কম তেলে চলা, হালকা থেকে আরো হালকা গাড়ির সওয়ারি আমরা রূপকথার ওই অমসৃণ উল্টোবাঁকটাকেই ভাবছি বুঝি আসলে রূপকথা। এমন মামু, এমন বাবা, এমন মিতুল-টুটু, এমনকী এমন মি.রাও মিলবে কি আজকের দুনিয়ায়? পারিজাত-এর মতো বাড়িদের দখল নিয়ে কতশত বহুতল উঠে যাচ্ছে বছরে-বছরে। *হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া-র* লেখিকা কি আগামীদিনের রূপকথাই লিখেছিলেন চারদশক আগে? নাকি নাবালকের সামনে উন্মোচন করেছিলেন প্রথম সাবালক পদক্ষেপের বেদনা? আমরা, যারা চারদশক আগেকার বাল্য থেকে আজ মধ্যবয়স পেরতে চলেছি, তারা এ-জিজ্ঞাসার জবাব পাই না। বছর-বছর পুরনো বদলে নতুন পণ্য কিনবার সাধ্য অথবা সাধ কিংবা সাধ-সাধ্য দুটোই মনের মধ্যে লালন করতে করতে, সেই লালনের সূত্রে চতুষ্পার্শ্ব ভরাতে-ভরাতে কেবল ভাবি, কী করে ওই বে-আক্কেলে মামু কিংবা বাবার হাত থেকে রক্ষা পাবে আমাদের আগামীকালেরা। যখন সফল সাবালক জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে দেখিয়ে, প্রায় জন্ম থেকেই মানুষের বাচ্চাগুলোকে শেখাচ্ছি সত্যিকারের যন্ত্র হতে, যাকে খুশি চাপা দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে, ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে, তখন সেন্স অফ্ হিউমার-এ ভর্তি, অভিমান জেদ ক্লান্তিতে ভারি ওই হাওয়াগাড়িটার মনুষ্যত্ব বড় বেয়াড়ারকমের বালাই। আবার আক্কেল দেখ, বিজ্ঞানের গল্প ফেঁদে, আকাশকে পারিজাতের ভাঙা চালে ডেকে এনে, কথায় কথায় আজ গঙ্গারাম, কাল অমুক, পরশু তকাই-বিস্কুট, যতসব *হ-য-ব-র-ল* বা *আবোল-তাবোল* হিড়িকদারিতে পড়ুয়ার মনে গাড়ির অযান্ত্রিকতা বিছাতে চাওয়া।

তবে বৈদ্যুতিক আর বৈদ্যুতিনের দাম প্রতিবছরই নিম্নমুখী। আমরাও ঘরে-বাইরে ম্যাজিক দেখিয়ে উল্টো গল্প বানাতে পারি, হ্যাঁ! আর পুরনো বদলে নতুন পাওয়ার এই সটান অর্থনীতিতে, মাত্র লাখ টাকায় মোটর গাড়ি পাওয়ার ইমারত প্রতিষ্ঠার অভিযানে, আজও কিন্তু বদলায়নি সেইসব দেশবাসীর অবস্থান, যারা জাঙ্ক গাড়ির টিনের টুকরো বেচে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার খিদে মেটায়। কী ভাগ্যিস, তাদের সাক্ষরতাই এখনও অনেকখানি অনিশ্চিত। *হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া-র* নতুন পাঠকগোষ্ঠি গজিয়ে উঠবে, এমন কল্পনা উন্মাদকেই মানায়। ঘরে ঘরে, নবজাতকের দাঁড়াতে শেখা পর্যন্তও সময় অপচয় না করে সময়ের শিক্ষা সময়ে দিচ্ছি আমরা। কখনো কোনো অযাচিত ফাঁকফোকর দিয়ে কুসঙ্গের ছোঁয়া লাগবে পরের প্রজন্মের মনে, সে সম্ভাবনাও প্রায় শূন্য। আমরা, অভিভাবকরাও, তাই নিশ্চিন্ত।

৩১ মে ২০০৮ তারিখে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত বিশেষ বক্তৃতামালায় পঠিত।

শিল্প—ও কী এল, ও কী এল না...

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

এই লেখা যতদিনে ছাপাখানা থেকে বেরোবে ততদিনে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির আরও অনেক পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা বলাই বাহুল্য। শিল্পায়ন নিয়ে আজ আমরা সমস্ত পৃথিবীর পরিহাসের পাত্র এবং এ নাটকের অন্তিম পরিণতি ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন, আমাদের, অর্থাৎ বাঙালি জাতির, চরম অক্ষমতার কাহিনি ইতিহাসের পাতায় চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকবে।

সত্যি কথা বলতে এখন যা ঘটছে তার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। তাই অর্থনীতিবিদদের পক্ষে এ বিষয়ে মতামত দিতে যাওয়াটা বাতুলতার বেশি কিছু নয়। অর্থনীতির সমস্ত নীতিকেই ধ্বংস করে যে জিনিসটি তৈরি হয়েছে তাতে আর যাই থাকুক না কেন, অর্থ বোধহয় নেই। তাই লিখতে বসে স্বস্তির চেয়ে অস্বস্তিই বেশি হচ্ছে। রাজনীতি ব্যাপারটা এই লেখকের কাছে চিরকালই রহস্যময় এক বস্তু। কাজেই সে ব্যাপারে তার মন্তব্য করার অধিকার নেই। আর যেটুকু বোঝা যায় অর্থনীতি নিয়ে এই মুহূর্তে কারোরই কোনোও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় নিস্তার দেবেন না। তাই লেখকের অক্ষমতার প্রমাণটুকু ছাপার অক্ষরে পেশ করা ছাড়া গতি নেই।

শিল্পায়ন যে জরুরি সে কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিরিশ বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে কৃষির অনেক উন্নতি হল ঠিকই, কিন্তু জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে আট কোটি অতিক্রম করে গেল। এই বিপুল জনতার কর্মসংস্থান যে কৃষিক্ষেত্রে আর হওয়া সম্ভব না এই সরল সত্যটুকু শেষ অবধি কৃষিপ্রেমী সরকারও অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন। কৃষকের পরিবারের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু জমির আয়তন কমে গেছে আর এই প্রক্রিয়ায় জমি বন্টনের সঙ্গে সঙ্গে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তোলার রাস্তাও সঙ্কীর্ণ হতে হতে আজ অদৃশ্যপ্রায়। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের বাম সরকার শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করতে পেরেছেন আর সেই জন্যই আজ সিঙ্গুর সমস্যা।

সমস্যাটার শুরু কোথায়? আমাদের যে ভাবে হোক শিল্পকে ডেকে আনতেই হবে। কাজটা বড় সহজ নয়, কারণ শিল্পকে তাড়ানোর জন্য এমন কুকাজ নেই যা আমরা গত তিরিশ বছরে করিনি। তাই শিল্পকে প্রলোভিত করে ফিরিয়ে আনার জন্য এখন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোনও পন্থা নেই। আর এ ব্যাপারটা টাটার সঙ্গে আমাদের যে পারস্পরিক বোঝাপড়া হয়েছিল তা থেকেই প্রতীয়মান। কিন্তু সেইসব খুঁটিনাটির মধ্যে যাওয়ার আগে আরও একটি কথা বুঝে নেওয়া দরকার। এক লক্ষ টাকার গাড়ি তৈরি করাটা কি সত্যিই প্রযুক্তিগত কোনও অলৌকিক ঘটনা?

কেন নয় তা বুঝতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ঠিক একশ বছর, অর্থাৎ ১৮০৮ সালে। এই বছর আমেরিকাতে হেনরি ফোর্ড ৮২৫ ডলারে গাড়ি তৈরি করে ওই দেশে গাড়ি শিল্পের মানচিত্রটি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনা সত্যিই প্রযুক্তির আমূল পরিবর্তনের সাহায্যে সম্ভব হয়েছিল। অথাৎ নানা কৌশলে গাড়ির তৈরির খরচাকে কমিয়ে, লাভ রেখেও গাড়ির দামকে ওই ৮২৫ ডলারে বেঁধে রাখা গিয়েছিল। আর একশ বছর

পরে টাটা সেই আশ্চর্য কাহিনির পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। আজ আর ৮২৫ ডলারে গাড়ি বেচা যাবে না, কিন্তু আনুমানিক ২,৫০০ ডলারে গাড়ি বেচে আজকের আন্তর্জাতিক বাজারে সবচাইতে সস্তার গাড়ি তৈরি করার খেতাবটা তিনি পাবেন এটাই নিশ্চয়ই তাঁর বাসনা। অর্থাৎ টাটা গোষ্ঠীকে সকলে একবিংশ শতাব্দীর হেনরি ফোর্ড বলে চিনবে।.

কিন্তু প্রযুক্তির দিক থেকে দেখলে কোনও বিস্ময়কর ঘটনা কি তাঁরা ঘটাচ্ছেন? অর্থাৎ অল্প খরচায় গাড়ি তৈরির জন্য কী প্রযুক্তি তাঁরা অবলম্বন করছেন? বলাই বাহুল্য গাড়ি কারখানা এবং অনুসারী শিল্পকে কাছাকাছি রেখে কিছুটা খরচা তারা নিশ্চয়ই কমানোর কথা ভেবেছেন। কিন্তু এইসব ভাবনা চিন্তার মধ্যে কয়েকটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হল গাড়ির কারখানা তৈরির জন্য জমির খরচা একটা বড় অংশ। এই খরচা টাটাদের প্রায় বহন করতেই হল না। কেন হল না?

ইতিপূর্বেই উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশ থেকে টাটারা গাড়ি কারখানা তৈরির আহ্বান পেয়েছিলেন। আর সেখানে যাওয়ার একটা বড় আকর্ষণ ছিল ১০০ শতাংশ অন্তঃশুল্ক ছাড় এবং প্রথম পাঁচ বছর ১০০ শতাংশ তার পরবর্তী পাঁচ বছর ৩০ শতাংশ আয়করের ছাড়। এর ফলে এই সমস্ত রাজ্যে টাটাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। হয়তো প্রযুক্তিগত কিছু কিছু অভিনব চিন্তাও এর সঙ্গে জুড়ে ছিল, কিন্তু সেসব কথা সঙ্গত কারণেই টাটারা সংবাদ মাধ্যমের কাছে খুলে ধরবেন না। এবারে পশ্চিমবঙ্গের কথায় ফিরে আসা যাক। শিল্প বুভুক্ষু এই রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়াবার আর কোনও রাস্তাই নেই। যেভাবে হোক এমন কোনও শিল্পগোষ্ঠীকে ধরে আনতে হবে যারা শুধুমাত্র তাদের ব্যবসা চালিয়েই ক্ষান্ত থাকবে না। যারা হয়তো বা টাটানগরের মতো এমন শিল্পনগরী গড়ে তুলবে যা আরও অনেক শিল্পকে আকর্ষণ করে আনবে। এবং সেই সঙ্গে নগরায়ণের জন্য পরিকাঠামো তৈরি করতেও তৎপর হবে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিল্প মরুভূমির চেহারাটা দেখে টাটা কেন এখানে আসতে চাইবেন? বিশেষ করে যেখানে অন্য রাজ্যরা বহু সুবিধা দিতে প্রস্তুত? তাই আমাদের রাজ্যও নানা সুবিধার কথা চিন্তা করল যা টাটাদের আকৃষ্ট করে আনতে পারে। প্রথম, টাটাদের পছন্দমতো জমি জোগাড় করে দেওয়া। দ্বিতীয়, অতি স্বল্প মূল্যে তাদের সেই জমির ইজারা দেওয়া। তৃতীয়, প্রথম পাঁচ বছরের জন্য মূল্য যুক্ত কর থেকে ছাড়। চতুর্থ, অতি স্বল্প সুদে ২০ বছরের জন্য ২০০ কোটির টাকা ঋণ দেওয়া। এরকম আরও কিছু কিছু সুবিধা হয়তো তাঁরা পাবেন যার সম্পূর্ণ চেহারাটা আমরা জানি না। কিন্তু যেটা আমরা বুঝতে পারি তা হল গাড়ির দামকে ১ লক্ষ টাকায় ধরে রাখার জন্য এই সমস্ত সুবিধাগুলোর প্রয়োজন ছিল। যদিও এর সঙ্গে টাটাদের প্রযুক্তিগত কিছু অবদানও থাকা অসম্ভব না।

আর এই সুবিধা দিতে গিয়েই শুরু হল জমি অধিগ্রহণের বিপত্তি। ১৮৯৪ সালের আইন ব্যবহার করে যখন জমি অধিগ্রহণ করা হল, তখন কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল আর সে ক্ষতিপূরণ তৎকালীন বাজারদরের তুলনায় অধিক নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু কারখানার কাজ শুরু হওয়ার পর সে দাম বেড়েছে বহুগুণ। আর এমনটা যে হতে পারে তা বিরোধীরা

প্রথম থেকেই আশঙ্কা করেছিল। তাই একেবারে গোড়া থেকেই তারা আন্দোলন শুরু করে, যে আন্দোলনকে সরকার পক্ষ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জমি অধিগ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় নন্দীগ্রামে শুরু হল তুমুল কাণ্ড, যাকে বাগে আনতে সরকারকে রীতিমতন হিমশিম খেতে হল। আর এ ব্যাপারে বিরোধীদের একটা বড় রকমের জয় যে হল তার প্রমাণ পাওয়া গেল কিছুদিনের মধ্যেই পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফলে। এমন কী সিঙ্গুর অঞ্চলের পঞ্চায়েতও তাদের দখলে এসে গেল।

এই জয়ের সুযোগ নিয়ে তাঁরা আমাদের সকলের পরিচিত ধর্না শুরু করলেন। এবং সেই ধর্না, রাস্তা অবরোধ, কারখানার কাজ বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি শাসানির সাহায্যে তাঁরা রাজ্যপালের তত্ত্বাবধানে এক আলোচনা সভায় যোগদান করলেন। সেই আলোচনার ফল যে কী হল তা কারও কাছেই পরিষ্কার নয়। শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে যে অধিকাংশ জমিই অনুসারী শিল্পের জন্য চিহ্নিত অংশ থেকে চাষিদের ফেরত দিতে হবে। এর ফল কী হতে পারে? ওই জমি চাষের উপযুক্ত নেই। চাষিরা সেই জমি নিয়ে পুনর্বার বিক্রি করে দেবে আজকের দামে, অর্থাৎ একর প্রতি ৪৫ লক্ষ কী তারও বেশি টাকায়। অর্থনীতি বলে এভাবে বিক্রি করলে তাঁদের চাষ করে যা আয় হত তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হবে। বিরোধীরা যাই বলুক, এর বিকল্প কোনও পথে চাষিরা হাঁটবেন না।

কেবল প্রশ্ন হল, এই টাকা দিয়ে কে জমি কিনবে? বলাই বাহুল্য টাটা সেই ব্যক্তি নন। বর্তমান দামে জমি কিনতে হলে আর যাই হোক, ১ লক্ষ টাকায় গাড়ি বিক্রি করা যাবে না। তাই সন্দেহ হয় যে ক্রেতা যদি কেউ থাকে তবে তিনি অনুসারী শিল্পে বিনিয়োগকারী হবেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যে ফরমুলাতে টাটা গাড়ির দাম স্থির করা হয়েছে, সেই ফরমুলা কাজ করবে না। কাজেই আবারও গাড়ির দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অতএব অনুসারী শিল্প অন্যত্র সরানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা থাকছে না। এবং তাহলেও মূল কারখানা থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় আবারও গাড়ির দাম বেড়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

সমস্ত সমস্যাগুলো বিচার করে দেখলে মনে হয় বিরোধীদের আসল উদ্দেশ্য টাটা গোষ্ঠীকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত করা। কেউ কেউ মনে করেন যে এই সুযোগে অন্য কোনও গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে এসে ব্যবসা ফেঁদে বসবেন। কেউ মনে করেন এটা শুধুই রাজনৈতিক চাল। বিরোধীরা প্রমাণ করে দেখাতে চান যে সরকার পক্ষ অপদার্থ। এর মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটি বিশ্বাসযোগ্য না। টাটা চলে গেলে যে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেবে তাতে নিশ্চিন্তে ব্যবসা করার সম্ভব না। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটিও সফল হওয়ার সম্ভাবনা অল্পই। কারণ টাটা চলে গেলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির যে ক্ষতি হবে তাতে সাধারণ মানুষ মূলত বিরোধীদেরই দায়ী করবেন। আর সে ক্ষেত্রে তাঁদের অপরিসীম রাজনৈতিক লোকসান হবে। এঁরা আর কোনওদিনও এই রাজ্যে তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় : আন্দোলন ও ভালোবাসার লেখক

শুভময় মণ্ডল

৭০ সালের একটি দিন নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসের বর্তমানে ওই একটিই দিন। হয়তো কয়েকটি ঘণ্টাই মাত্র আর একটি লহমা।

পার্টিভাগের হননপ্রহরে খুন-হওয়া দুই ছেলের একজনের মৃতদেহের সামনে পার্টিনেতা এক পিতা, অপেক্ষা করছেন শোকমিছিলের শুরুয়াতের জন্যে এবং শোকমিছিল শুরু হয় একটি বক্তৃতায়। শোকমিছিল চলছে, সেই পিতা ঘরে ফিরে এখন তাঁর রাজনৈতিক সহযোদ্ধা স্ত্রীর মুখোমুখি, যিনি মা হিসাবে তাঁর অপর সন্তানকে আনতে এখনই যাবেন মর্গে, একা যাবেন। একাই যেতে হবে তাঁকে। একাই, কারণ ওই মৃত সন্তানের অবস্থান সদ্য ভেঙে বেরিয়ে- যাওয়া পার্টির অপর খণ্ডে, যুযুধান অবস্থান বাবা এবং দাদার বিরুদ্ধে। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সক্রিয় এবং যুযুধান অবস্থান।

তখন শোকমিছিল চলছে।

সেই মুহূর্ত-কেন্দ্রিকতায় চেতন ছুঁইয়ে প্রথম পার্টিভাগের সংকটলহরেও পৌঁছে যাওয়া।

এ-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৩-এ। ভাঙন-বিভাজন সঞ্জাত নানান সংকট যখন রজ্জুরই মতো চেপে বসছে ঘাড়ে এবং পাদগ্রন্থিতে। ক্রমশ জড়িয়ে ধরছে, মুখ তুলে তাকালে বিমুক্তির কোনও দিকচক্রবালই চোখে পড়ে না কোথাও। সংকটের নানা রজ্জুরই যেন হিল্লোল, সন্ত্রাসের মালিকপক্ষেরই সোল্লাস মসৃণ অগ্রগতি।

দ্বিতীয়বার পার্টি ভাগ, সন্ত্রাসের মালিকপক্ষের পাকে-পরতে আদি কমিউনিস্ট পার্টির জড়িয়ে-যাওয়া এবং জরুরি অবস্থা—এসব নিয়ে আর একটি উপন্যাস লিখেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৭-এ। সন্ত্রাসের মসৃণতা থেকে সবে মুক্তি পেয়েছে সময়। অথচ আদি কমিউনিস্ট পার্টির সংকট তখনই বোধহয় সবথেকে খর।

আর দীপেন্দ্রনাথ যখন স্বনামেই উপন্যাসের চরিত্র হয়ে উঠলেন, তখনই ঠিক এই সময়পর্বই উপন্যাস হয়ে উঠল জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের কলমে। জ্যোতিপ্রকাশ অবশ্য তাঁর অগ্রজপ্রতিম দীপেন্দ্রনাথের মতো একটি দিন হেন অতি স্বল্প সময় পরিসরকে বর্তমান হিসাবে রাখেননি। ৭০ থেকে ৭৫ বিগত শতকের এই পাঁচ-পাঁচটা বছর জিৎভূমি-র বর্তমান। জিৎভূমি-র এই বর্তমান সময়ভূমিতে দাঁড়িয়ে মূলত চার যুবক—অসীম-শ্যামল-জহর-জয়ন্ত কখনও কখনও একটু পিছনপানে চেয়েছে, প্রথম পার্টিভাগের তুমুল দিন কালে।

পারনাসাস পাহাড় থেকে দেখা ট্রোজান প্রাকার আর সমুদ্রের মধ্যবর্তী রণভূমি নয়, দীপেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিপ্রকাশ এই সংকট-সংঘাত-সন্ত্রাসের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

সংকট-সংঘাতগ্রস্ত বিষণ্ণ সময়ের ভার বহন করেছেন; সন্ত্রাস থেকে যারা প্রাণরক্ষা করে বাঁচতে চাইছিল, বাঁচাতে চাইছিল সাথীদের, তারই মধ্যে রক্ষা করে যাচ্ছিল সংগঠন, তাঁদেরকে বুঝেছেন, অনুভব করেছেন, অতঃপর লিখতে বসেছেন সেইসব সময়ের মহাগদ্য।

দ্বিতীয়বার পার্টিভাগের পর দীপেন্দ্রনাথ যখন সেই হননপ্রহরের গদ্য লিখছেন, তখন তো ইতিহাস তার তর্জনী তোলেনি, সংকট-সংঘাত-সন্ত্রাসের পর কোন্দিকে যাবে সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রগাঢ় প্রবাহ। এবং সংঘাত-সন্ত্রাস সবে পার-হওয়া সময় যখন সবে শ্বাস ফেলছে বিজয়ীর মতো, তখনই তো আদি কমিউনিস্ট পার্টির (হয়তো) সব থেকে অসহায় সময়, তখনও ইতিহাস আরও একবার উজ্জ্বল তর্জনী তুলে দেখায়নি আবার কোনও বামপন্থী ঐক্য গড়ে তুলে সেই স্রোত ধরে সমুখপানে হাঁটতে পারবে কিনা সাম্যবাদী আন্দোলনের আদি রাজনৈতিক সংগঠন। সেই দিশাহীন যাতনা ও বিষণ্ণতা, সেই অসহায়তা ধারণ করছিল দীপেন্দ্রনাথের দুই-আখ্যানের প্রতিটি শব্দ। পারনাসাস পাহাড় থেকে দেখা ট্রয়ের রণভূমির বর্ণনায় কী গাঢ়তায় সহসা বেঁচে উঠছিল, রণভূমির রক্ত-কাদা-ধুলায় বয়ে যাওয়া হেক্টরের সোনালি চুলের গন্ধ (যদি বলো ক্লেদ-পরিমল!); হেক্টরের রণসাজ দেখে সহসা ভয় পেয়ে তার শিশুসন্তান ফিরে যায় তার মায়ের বুকের, অ্যান্ড্রোম্যাকির সেই সুরভিত ও দুগ্ধময় বুকের গন্ধে। আর লড়াইয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ানো দীপেন্দ্রনাথের উপন্যাসে সহসা ঝাঁ ঝাঁ পোড়া ডালের গন্ধ।

১৯৬৩-৭৫—এই একযুগের গদ্য লিখছেন জ্যোতিপ্রকাশ ২০০৪-০৫ সালে। ইতিহাস ততদিনে তর্জনী তুলেছে অমোঘ। সংশোধন ও সংকীর্ণতাবাদ—এমন সাংগঠনিক ও তাত্ত্বিক দলিলের পরিভাষা যদি যোজনা নাই করি, তবু বলে তো দিতেই হয়, দু-বার ভাগ হওয়া কমিউনিস্ট পার্টির তিনখণ্ডের কোন্ খণ্ডের দখলে যাবে গণভিত্তি ও সময়ের গভীর ও প্রগতিবান সিংহ পরিসর, ততদিনে নির্ণয় করে দিয়েছে ইতিহাস। সুতরাং যে ইতিহাসকে বর্তমানের মতোই দেখতে পেয়েছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ তাঁর সৃষ্টিশীল, তাঁর সংগঠন-দায়বদ্ধ বেঁচে-থাকায়, সেই ইতিহাসকে নিয়ে উপন্যাস লেখার অপেক্ষাকৃত সহজ সুযোগ তিনি পেয়েছেন।

এবং এই সহজতার মধ্যেই জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের এই উপন্যাস গড়ে তোলায় সব থেকে প্রগাঢ় কৃতিত্বের হদিশ মিলে যায়। যে বর্তমানে তিনি বেঁচেছিলেন, সক্রিয় ছিলেন, তাকে যখন তিনি ৩০ বছর পার-হওয়া ইতিহাস হিসাবে দেখছেন, দেখা ও লেখার সেই কারিগরির মধ্যে বর্তমানের প্রাণটাই একমাত্র জিয়ন্ত থাকছে। তিন কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ ৭০ পার হয়ে কেমন হবে, তা যখন স্থিরই করে দিল ইতিহাস, ইতিহাসের সেই সর্বজনীন তথ্য ও জ্ঞান কখনোই অতীতকে বর্তমান হিসাবে বর্ণনা করার প্রয়োজনীয় ঔপন্যাসিক ভানকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এমন ভান অর্জন করা সাদামাটা শিল্পীর কাজ নয়।

আবার অর্জিত এই শৈল্পিক ভানের সাফল্যের জমিনেই কি উড়তে থাকে কমিউনিস্ট হিসাবে তাঁর সততার নিশান!

পাগল যে তুই কণ্ঠভরে তরে জানিয়ে দে ওরে পাগল

জ্যোতিদার সঙ্গে দেখা হলে গদ্যের সঙ্গে গণসংগঠন ও সংগঠনের কথাও উঠত, অনিবার্যতই। তাঁদের ছাত্র-আন্দোলনের স্পন্দিত দিনগুলির কথা, ছাত্র-আন্দোলন থেকে গণ আন্দোলনে আসার নানান সড়ক-সংলাপ-সন্দর্ভের কথা।

তাঁর জীবৎকালে জিৎভূমি পড়া হয়নি। অথচ বেশ মনে আছে, এক সাথীর বাড়ি থেকে সামাজিক নিমন্ত্রণ সেরে রাত করে ফেরার সময়ে এ উপন্যাস নিয়ে তিনি খানিক কথা বলেছিলেন। তাঁর এই উপন্যাসে দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে জিজ্ঞাসা আর বিস্ময়ের মধ্যবর্তীভূমিতে দাঁড়ানো একটি বাক্য আছে : "নাকি উনি ওঁর নিজের কথাই লেখেন যেগুলো আমাদের কথা হয়ে যায়!" তাঁর জীবৎকালে জিৎভূমি পড়ে ফেলার উদ্যম যদি সংহত করে ফেলতে পারতাম, তাঁকে ওই একই প্রশ্ন, অথবা প্রশ্ন ও বিস্ময়, দুয়েরই বাতাসমাখা একখানা বাক্য হানার রোমাঞ্চ পাওয়া যেত—নিজেরই কথাই, নিজেদের কথাই কি লিখে দিলেন জ্যোতিদা, যা আমাদের কথা, আমার পার্টির কথা হয়ে উঠল!

কোনও উপন্যাসের আগে, 'রাজনৈতিক' হেন অভিধা পুঁতে দিতে আমার যে আপত্তিই আছে, সে কথা বোধহয় উপন্যাস-আস্বাদনে আমার আরও কয়েকটি লেখায় ইতিমধ্যেই বলে ফেলেছি সাদামাটা স্বরেই। আর সে স্বর সাদামাটা ছিল বলেই, এ প্রসঙ্গে এখানেও অধিকন্তু কথা নেহাত জীর্ণ ও মলিন শোনাবে। সে ঝুঁকি নিয়েও বলা যায়, এমন অভিধা গেঁথে দেওয়ার ফলে ওই উপন্যাসের পরবর্তী পাঠপ্রকল্পগুলি আক্রান্ত হয় পূর্বউৎপাদিত ধারণার চাপে। মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, আঞ্চলিক—এমন যে কোনও অভিধা কোনও উপন্যাসের পূর্বভাগে গেঁথে দিলেই এমন বিপাকের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এবং 'রাজনৈতিক' হেন অভিধা চাপালে আবার উপন্যাসের পাঠকসংখ্যাকে শুরুতেই খানিক ছেঁটে ফেলার কুকর্মও করে ফেলা হয়। তবু উপন্যাসের বিষয়ে যদি রাজনীতির কথা ওঠেই—একক্ষেত্রে আমি নেহাত বুদ্ধিহীন, অতি-সাদামাটা আরও দুটি বিভাজনের দিকে যেতে প্ররোচিত করব। কিন্তু উপন্যাসের বিষয় ও বারতায় এমন আভাস থেকে যায়, যাকে আমরা রাজনৈতিক প্রগতির কাজে ব্যবহার করতে পারি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শহরতলি অমর মিত্রের ধ্রুবপুত্র এমনই সাহিত্যকর্ম। আবার যে সাহিত্যকর্মের অবলম্বন হয়ে ওঠেন রাজনৈতিক মানুষজন, তাঁদের সংগঠন ও মনস্তত্ত্ব, তেমন উপন্যাস তিনিই সার্থকভাবে রচনা করতে পারেন সাংগঠনিক রাজনীতির সঙ্গে যিনি সংযুক্ত ছিলেন। জাগরী, দর্পণ, ত্রিদিবা, শোকমিছিল কিংবা জিৎভূমি রাজনৈতিক সংগঠনভুক্ত মানুষেরই উৎপাদন। এবং উপন্যাসের আগে 'রাজনৈতিক' হেন কোনও অভিধা লেগে গেলে তার পাঠপ্রকল্প যে বিঘ্নিত হতে পারে, তার পাঠকবর্গ যে সংকুচিত হতে পারে, এমন শঙ্কা হয়তো জ্যোতিপ্রকাশও পোষণ করতেন, নইলে কেন এই উপন্যাসগ্রন্থের ব্লার্ব-এর প্রথম ও শেষ বাক্যে 'প্রেম' ও 'ভালোবাসার' অমন মোহর মেরে দেওয়া হবে।

এ উপন্যাস শুরু হচ্ছে একজন রাজনৈতিক এবং একজন রাজনীতি-সংলগ্ন মানুষের ব্যক্তিক সংকট থেকেই। এবং সেই সংকটের অভিঘাতে রাগ সহসা সমবেত হচ্ছে তারা

রাজনৈতিক মানুষটির রাজনীতি-বলয়েরই সুহৃদজন এবং রাজনীতি-সংলগ্ন মানুষটির পরিবারভুক্ত সদস্যরা। এবং অরাজনৈতিক মানুষ বলে যেহেতু কিছু হয়ই না, তাই দেখা যায় জয়ন্তীর বাবার রাজনৈতিক সংগঠন না থাকলেও, রাজনৈতিক ভাবনা ও পক্ষ অবশ্যই থাকে। সেই ভাবনা কমিউনিজম-বিদ্বেষে তেজস্ক্রিয় এবং সময় ও সুযোগ পেলেই সেই তেজস্ক্রিয়তা হেনে দিতেও তিনি কসুর করেন না। এবং এমন মানুষদের ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটে, দক্ষিণপন্থার কুৎসিত স্বভাবজ সক্রিয়তায় তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত হলেও দক্ষিণপন্থার প্রতি তাঁদের আনুগত্য কিছুমাত্র মচকায় না। তাঁরই মালিকানাধীন বাড়ি বিক্রি করতে গিয়ে জয়ন্তীর বাবা রুদ্রনারায়ণ যাঁদের কাছে অপমানিত হয়েছিলেন, তাদের রকম দেখে মনে হয়, তারা তৎকালে এলাকার প্রতাপান্বিত মালিক হয়ে-ওঠা যুব কংগ্রেসিজন। অথচ এ-ঘটনার পরও কংগ্রেসের কোনও পক্ষের প্রতিই রুদ্রনারায়ণের মমতা ন্যূনতম কমে না।

অসীমের প্রেমাস্পদ জয়ন্তীর অসুস্থতা, সার্জিকাল অপারেশনে তাঁর মাতৃত্বের সম্ভাবনা বিনষ্ট হওয়া—এই অরাজনৈতিক সংকট ঘিরে যাঁরা জড়ো হন, যেমতো আমরা বলতে চেয়েছি তাদের প্রত্যেকরই হয় রাজনৈতিক সংগঠন আছে, না হয় রাজনৈতিক ভাবনা। এবং রাজনীতি সংলগ্নতাই সংকটকে আরও তীব্র করে, যে তীব্রতা নাটক বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নান্দনিক উপভোগকে ক্রমশ নিবিড় করে। কমিউনিস্ট রাজনৈতিক সংগঠনভুক্ত (এক্ষেত্রে সি পি আই (এম)) হওয়ার কারণেই অসীম তাদের প্রেমের পরিণতি যাত্রার দিকে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন রুদ্রনারায়ণের সমর্থন পাচ্ছে না।

আবার অরাজনৈতিক বিপর্যয়ও এই সংকটের তীব্রতাকে খর করে। সার্জিকাল অপারেশনের পর জয়ন্তীর মাতৃত্বের সম্ভাবনা বিনষ্ট হওয়ায় সে অবসাদগ্রস্ত হয় এবং অসীমের সঙ্গে গড়ে তোলা সম্পর্ক থেকেও বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এইভাবে ব্যক্তিক সংকট ও রাজনৈতিক সংকটের বেণীগ্রন্থিত গতি এই উপন্যাসের অন্যতম সম্পদ হয়ে ওঠে। ফলে রাজনীতি থেকে তিলমাত্র অবসৃত না হয়েও এ আখ্যান অনুক্ষণ মানুষের মধ্যে নিহিত মানবতাকে খুঁজে ফেরে। আর তখনই জ্যোতিদা-দের বর্তমানকে কেমন ঈর্ষা হয়। তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক বুনো ঘোড়ার মতো কেশর ঝাঁকাচ্ছে বন্ধুদের মধ্যে। কিন্তু বিতর্কই, রাজনৈতিক পক্ষ বিভাজন বিতর্কের সেতুকে বিনষ্ট করছে না। যেমন আমাদের সময়ে করে। বিতর্কের কোনও ভাঙা সেতুও আর অবশিষ্ট থাকে না। রাজনৈতিক পক্ষান্তর সহসাই দেওয়াল তুলে দেয় এক-এক পক্ষের মাঝখানে।

রাজনৈতিক সম্পর্কের বিভাজন ব্যক্তিক সম্পর্ককে কতখানি প্রভাবিত করে, কতখানি প্রভাবিত করা উচিত, এ নিয়ে বিতর্ক ছিল, আছে, থাকবেও। থাকা উচিতও বটে। এ উপন্যাস অবশ্য দীপায়নের মধ্য দিয়ে একটা মতকে উপস্থাপন করে। সেই মতটাকে সমর্থনই করে এমন নয়। দীপায়নের মত :

> রাজনীতিটা খুব জরুরি জিনিস, বিশেষ করে কোনও বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজনীতি। কিন্তু রাজনীতি তো বদলে বদলে যায়, পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু মানুষ খুব জরুরি। মানুষে মানুষে সম্পর্কও খুব

> জরুরি। বন্ধুত্ব তো সব সম্পর্কের সেরা সম্পর্ক। কাজেই রাজনীতির জন্যে বন্ধুত্ব কেন নষ্ট করব? এমনও তো হতে পারে যে-রাজনীতির জন্যে বন্ধুকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি, এমনকি শত্রু বলে ভাবছি, আজকাল তো তা হামেশাই হচ্ছে, সেই রাজনীতিটা বদলে গেল। সেই বন্ধুর সঙ্গে মতভেদটা মুছে গেল, বা হয়তো কমে গেল। আবার একসঙ্গে কাজ করার মতো সিচুয়েশান তৈরি হল। তখন? তখন আবার দু'জন একসঙ্গে। এক মিছিলে। কিন্তু বন্ধুত্বটা ততদিনে গোল্লায় গেছে! এতে তো তোমারই ক্ষতি। এ ক্ষতি মানব কেন? এক মতাদর্শ, এক রাজনীতির বন্ধুরা রাজনৈতিক কারণে আলাদা হয়ে গেছি বলে বন্ধুত্বটা কেন ত্যাগ করব?

এ অবশ্য সাম্যবাদী পক্ষের অন্তর্বর্তী বিভাজন প্রসঙ্গে মতামত। এবং এই মতকে এ উপন্যাস নিঃশেষে মেনে নিয়েছে, এমন নয়। সেও উপন্যাসেরই গুণ! এবং এরই পাশাপাশি এ উপন্যাস যা করেছে তা হল, সাংগঠনিক রাজনীতির বলয়ে আসা মানুষের মধ্যে নিহিত আর এক মানুষকে খোঁজা। সেই নিহিতজনকে খানিকটা প্রশ্রয় দেবার অবস্থানও যেন গ্রহণ করে এই আখ্যানগদ্য। সাংগঠনিক মানুষ আর ব্যক্তিমানুষের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বে বিক্ষত হয় সাম্যবাদী রাজনীতির মানুষই। দক্ষিণপন্থার এমন কোনও সংকট নেই। একজন মানুষের মধ্যে যাই থাক, দক্ষিণপন্থা শুধু চায় তার সেই প্রবণতা যা পুঁজি ও বাজারের অগ্রগতির সহায়ক হবে, যা সভ্যতাকে পিছনে টানবে। আর সাম্যবাদী মানুষ ও সাম্যবাদী সংগঠনের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সক্রিয় থাকে বলেই, জহর সি.পি.আই (এম) সংগঠনের কাছ থেকে কঠিন একটা দায়িত্ব পেলে অসীমের মনে, অমন যে সংগঠন-দায়বদ্ধ অসীমের মনে সংক্ষোভ জাগে। হয়তো সে পুরোপুরি সংক্ষোভ নয়, খর সংশয়ই :

> ভয়ংকর ভুল! ভয়ংকর! শুধু ভুল নয়, অন্যায়। ওইসব কাজের বিপদের কথা ছেড়ে দিলেও, ওই কাজ করতে করতে মানুষটাই যে বদলে যাবে। একদিন টেক-এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু তখন এই মানুষটাকে আর ফেরত পাওয়া যাবে না।

এই মানুষ-খোঁজার ব্রতযাপনে আগ্রহী বলেই এই গদ্য শ্যামলের মতো অতি-আবেগপ্রবণ, উদ্ধতও বটে, বামপন্থী হঠকারিতার স্রোতে যাওয়া কর্মীর মধ্যে এক গান-পাগলকে বারংবার ফিরে পাওয়ার আয়োজন গড়তে চায়। নির্মলাদি তার মধ্যে নিহিত পাগলকে জাগিয়ে দিতেই প্রাণপণে গেয়ে ওঠেন : পাগল যে তুই কণ্ঠভরে জানিয়ে দে ওরে পাগল।

আর এমন ধারা পাগল মানুষের মধ্যে আসলে বেঁচে থাকে বলেই শ্যামলের যে ঘোষণা শেষ হয় 'পথের কাঁটা' 'সরিয়ে দেবার' হাড়-হিম করা হঠকারিতায়, সেই ঘোষণারও শুরুয়াতে থাকে লেনিন-স্তালিন-মাও-য়ের কথা, যাঁরা দিন-দুনিয়ার বদলের জন্যেই পাগল ছিলেন।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এই গদ্য আসলে মানুষের মধ্যে সেই আপনভোলা পাগলকে খুঁজে পাগল।

এই উপন্যাসের সংগঠনভুক্ত সকল রাজনৈতিক মানুষের স্বরেই তাই বহুস্বরের অনন্ত স্রোতস্বিনী বয়ে যায়। অসীমের সকল সাংগঠনিক যুক্তি উচ্চারণ, অথবা সংগঠন-বিপ্রতীপ সংশয়, শ্যামলের সেই দীর্ঘ চিঠি, জয়ন্তর আত্মপক্ষ সমর্থন—কোনওটাই একরোখা স্বরের গোল্লাছুট নয়। সবই বহুস্বরিক (Heteroglot) স্রোতভাষা, যেখানে সাংগঠনিক তত্ত্ব ও ভালোবাসার পরাণকথা জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা কয়। সে স্রোতোভাষায় ভারতবর্ষের হাজার বছরের সম্মিলনের সংস্কৃতির, ভালোবাসার সংস্কৃতি সমন্বয়ে কথা কয়ে ওঠে এবং সেই বহুস্বরিক স্রোতোভাষা কখন যেন উপন্যাসের সমগ্র বয়ান (text)-কে নিয়ন্ত্রণ করা তাগৎ সংগ্রহ করে ফেলে। সেই তাগতের কারণেই হয়তো শেষ পর্যন্ত রাজনীতিই, রাজনৈতিক ঘটনার ঝাপট এ উপন্যাসের মূল ব্যক্তিক সংকটকে সহসা মোচন করতে পারে।

মাতৃত্বের সক্ষমতা থেকে রিক্ত হয়ে যাওয়া জয়ন্তী কোনও পরিস্থিতিতেই, কিছুতেই তো অসীমের কাছে ফিরে আসতে চায়নি। চাইল তখনই, যখনই সে হঠাৎ অনুভব করে সিদ্ধার্থশঙ্করের লেলিয়ে দেওয়া নবকংগ্রেসি মানুষজন্তুদের হাতে অসীমের প্রাণ বিপন্ন।

যদি জ্যোতিদা নিজেই লিখে গিয়ে থাকেন ওই ব্লার্ব, (জানি না) ওই ব্লার্ব-এর শেষ পঙ্‌ক্তি, 'জিৎভূমি বস্তুত এক ভালবাসার উপন্যাস', তাহলে বলতে চাইব, এই উপন্যাস ভালোবাসার উপন্যাস সেই প্রসারিত অর্থেই কারণ রাজনীতির স্বরের পাশে এখানে অতন্দ্র জেগে ভালোবাসার স্বর, যা কিনা বামপন্থী রাজনীতিরই পলিফোনিয়া, বহুস্বর, অন্তত তেমনটাই তো হওয়া উচিত, এবং তখনই দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়ানো মানুষ, তাকে প্রতিরোধ করা মানুষ তার ত্রাণ হিসাবে তার কবচকুণ্ডল হিসাবে পেয়ে যায় ভালোবাসা। পেয়ে যাবেই।

শোকমিছিল-এ রাজনীতি একটি পরিবারকে ভেঙেছিল। তবু বামপন্থী রাজনীতি একটি পরিবারের মৌলিক জোড়কে অটুট রেখেছিল অন্তিমে। শ্মশানে। সুধীর মায়ের হাত থেকে পাওয়া রক্তপতাকা আর লেলিনের ছবি আঁকা মেডেলিয়ন।

৩৩ বছর পর দীপেন্দ্রনাথ-অনুরক্ত জ্যোতিপ্রকাশ একটি পথ পেলেনই, যেখানে বামপন্থী রাজনীতিই একটি ভাঙনমুখী সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে পারে।

হঠাৎ মনে পড়ল, নির্মলাদি শ্যামলকে যে গান শুনিয়েছিলেন, 'পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে', সে-গানের শেষ চরণটি ছিল তো এমনই : 'বলবে বাতাস 'ভালোবাসি', বাঁধবে আকাশ অলখ ডোরে।'

ইতিহাসের তর্জনী

এই উপন্যাসের বহুস্বরে ভালোবাসার পাশে যদি ভাঙনেরই বিষণ্ণ স্বর বয়ে তবে দেখব ভাঙনে সব থেকে অসহায়, সব থেকে আক্রান্ত হবেন তিনিই যাঁর কাছে ভালোবাসাই প্রধানতম আশ্রয় ও প্রবণতা।

ভাঙনের বিষণ্ণতায় এ উপন্যাস অচিরেই আক্রান্ত হবেই কারণ জিৎভূমি শোকমিছিল-এর মতো, বিবাহবার্ষিকী-র মতো ৬০ থেকে ৭০-এর মধ্যবর্তী পর্বের দিনকাল নিয়ে

উপন্যাস। ফলে অরাজনৈতিক সংকট দিয়ে এ উপন্যাস শুরু হলেও, অচিরেই অরাজনৈতিক সংকটের ব্যক্তিক বিষণ্ণতায় চারিয়ে যায় ভাঙনের বিষণ্ণতা, যা রাজনৈতিক বিষণ্ণতারই শিকড়বাকড়। যাবেই। রাজনীতিক বলয়ের অন্তর্বর্তী মানুষ বলেই জ্যোতিপ্রকাশ রাজনৈতিক মানুষের মানস গড়নের এই মৌলিক প্রবণতা ধরতে পেরেছিলেন—রাজনীতিক মানুষের ব্যক্তিক বিষণ্ণতা সহসা রাজনৈতিক বিষণ্ণতার হাত আঁকড়ে ধরে অথবা বিপরীতটাই ঘটে অনিবার্যত। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত সন্তান প্রসবে তাঁর স্ত্রীর 'অসুখী' না-হওয়ার সমীকরণ খুঁজে পান 'পরদেশভোজী রাক্ষস সাম্রাজ্যবাদী'দের আগ্রাসী সক্ষমতায়, যেমন তাঁর স্ত্রীর গর্ভপাতজনিত রক্তপাত দেখে মনে পড়ে রাজপথে গুলি খেয়ে রক্তক্ষরণ করা প্রতিভা-লতিকার মৃতদেহের কথা, তেমনই জয়িতার জন্যে হাসপাতালে রাতজাগা অসীমের শেষ রাতে মনে হয় :

> অসীম যেন দেখতে পায়, লাল পতাকাটা তিন টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে ব্লাড ব্যাংকের সিঁড়িতে। কোনও টুকরো বড়, কোনওটা ছোট। কিন্তু তিনটেই লাল।
>
> টুকরো তিনটের দিকে তাকিয়ে জয়িতার মতো, দীপুদা আর নির্মলাদির মতো, অসীমেরও কেমন মনে হয়, এর কি কোনও দরকার ছিল? এভাবে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়ার?

প্রথমবার পার্টিতে ভাঙনের পর ভেঙে আসা অংশের প্রতি 'চিনপন্থী' চিহ্ন দেগে দেওয়া, চিনপন্থীদের চিহ্নিত করে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া, পার্টি ভাঙতে চিনের উস্কানির ধারণা; দ্বিতীয়বার পার্টির ভাঙার সময় পার্টির একটি অংশের বিরুদ্ধে ভোটসর্বস্ব হয়ে যাওয়ার, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠন করার এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতে পেয়ে কৃষক রমণীর উপর গুলি চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ—এ সকল প্রসঙ্গ ৬৩ থেকে ৭৫ এই অভিশপ্ত একযুগের আখ্যানে আসবেই। আসবে নিজের সরকারের বিরুদ্ধে অজয় মুখার্জির অনশনের কিংবা হেমন্ত বসু, কাশীপুর গণহত্যার প্রসঙ্গ। এমনকি সি. পি. আই-এ থেকে যাওয়া জয়ন্তর সেই অভিশাপ-আঘ্রাণগ্রস্ত বাক্য :

> আজ তোরা পার্টি ভাঙছিস। ভাবছিস তোদের পার্টি বিপ্লব করবে? দেখে নিস কী করে। মনে রাখিস যে-পার্টি ভাঙন দিয়ে শুরু হয় সে পার্টিও আস্ত থাকতে পারে না। আবার ভাঙবে দেখে নিস। ভাঙন শুধু ভাঙতেই পারে, গড়তে পারে না।

এও হয়তো নেহাত উপন্যাস-কল্প নয়, এ বাক্যেরও সমকালীন সমাজবাস্তবতা ছিল। এ বাক্যের গড়নকে একজন সাম্যবাদী রাজনৈতিক কর্মী রোমকূপে গেঁথে দেওয়া গরম সুচের যাতনার মতো চেনে, হাড় হিম-করা দীর্ঘশ্বাসের মতো চেনে। এবং যে কথা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে কতকবার, আরও একবার প্রগলভের মতো বলতে সাধ হয়, একজন সংগঠনবদ্ধ শিল্পীই সংকটের এই স্বর চেনেন, এই স্বরের হদিশ জানেন, ফলত লিখতেও জানেন। এবং নানা খণ্ডের স্বর, সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বর জ্যোতিপ্রকাশ

চট্টোপাধ্যায় কী গভীরভাবে জানতেন তা ভেবে শিহরিত হই যখন তাঁর লেখা অসীমের সেই সংলাপগুলি পড়ি, যে সংলাপে অসীম সংকীর্ণতার দিকে ঝুঁকে যাওয়া তার সাথীকে বোঝায় তাদের কমিউনিস্ট পার্টি একা, না চিন, না সোভিয়েত রাশিয়া কারও কাছে হাত পেতে দাঁড়ায়নি তাদের কমিউনিস্ট পার্টি, পৃথিবীর কোনও কমিউনিস্ট পার্টি কোনওদিন এমন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়ায়নি ; সুতরাং অসীমের আকণ্ঠ আবেদন, এই চ্যালেঞ্জের মুখে পার্টি ছেড়ে শ্যামল যেন চলে না যায়।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের, বাংলা দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজিত সবকটি অংশের স্বর এমন করে ক-জন চিনতেন।

বিভাজিত অংশগুলির বৈপ্লবিক চরিত্র নির্ণয়ে আর এক প্রবক হয়ে উঠেছিল কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিচার। উপন্যাসের একেবারে প্রথম অধ্যায়েই যখন চরিত্রগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছিল তাদের পার্টি-অবস্থান নিরিখে, তখনই জয়ন্ত-র সি.পি. আই-গত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, অন্য বন্ধুদের সংলাপ উচ্চারণ করা হয়েছিল : "বিপ্লব করবে ওরা? কংগ্রেসের দালালি করার পর সময় পেলে তো করবে।" উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে এই জয়ন্ত প্রসঙ্গেই অসীম বলে ওঠে : "ইন্দিরা গান্ধীর কোনও চামচার, এমার্জেন্সির কোনও সাপোর্টারের ছায়াও আমি সহ্য করব না। বেরিয়ে যা। গেট আউট অফ দিস হাউস।" আবার উপন্যাসের মধ্যপর্বে, অধ্যায় ৭-এ রথীন উচ্চারণ করেছে : "জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা নিয়ে পার্টি কোনও দিনই একমত হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এই তর্ক বা প্রায় একই রকম তর্কই চল্লিশের শেষে, পঞ্চাশের গোড়াতে হয়েছিল।" কথা হল এই—এই তর্কটা আজও মরেনি। তবে সেদিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রসঙ্গ উঠেছিল, সাম্রাজ্যবাদের সাময়িক শক্তিহীনতার প্রসঙ্গ উঠেছিল। আর আজকের রাজনৈতিক গদ্য লিখতে হলে সাম্রাজ্যবাদের দোর্দণ্ডপনার কথা মেনে নিয়েই গদ্য শুরু করতে হবে। এই সেদিন চলে যাওয়া জ্যোতিদা, আর কটা দিন বাঁচলেই দেখতে পেতেন সাম্রাজ্যবাদ এতখানিই প্রতাপধর হয়ে উঠেছে যে জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যেও সে অতি-অনুগত আজ্ঞাবহ পেয়ে যায় ফলত দুই কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যকে দৃঢ়তর করতে হয় শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ শক্তিমত্তার মুখে তাল ঠুকে দাঁড়াতে। ইতিহাসের তর্জনীর তেমনই নির্দেশ।

এ উপন্যাসের সকল সংকটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অসীম, সি. পি. এম-এর অসীম। উপন্যাস শুরু হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিক এবং রাজনৈতিক সংকট দিয়ে। উপন্যাস শেষ হচ্ছে তার রাজনৈতিক সংকটের যাতনা বর্ণনা করে। যেমন শোকমিছিল শুরু ও শেষ হয়েছিল একটি সি. পি. এম পরিবারের দুর্বহ সংকট ও যাতনার অক্ষরে।

ইতিহাসের তর্জনীর দিকে এমন নির্মোহ ও টানটান দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন দীপেন্দ্রনাথ ও দীপেন্দ্রনাথ অনুরক্ত জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়।

জন্মভূমি-র ভূমিকায় জ্যোতিপ্রকাশ লিখেছিলেন, "যে সময় নিয়ে, যে মানুষদের নিয়ে

এ উপন্যাস, তাদের নিয়ে এক মহাভারত লেখার কথা। তা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।" দ্বিতীয় বাক্যটিকে প্রত্যাখ্যান করে প্রথমটির প্রতি সহমত জ্ঞাপন করি। এ উপন্যাসে এমন অজস্র মুহূর্ত আছে, যাদের এক-একটিকে নিয়েই পূর্ণায়ত একটি আখ্যান নির্মিত হতে পারত। সুকনার ফরেস্ট বাংলোয় সভায় বসেছেন বিশ্বনাথ মুখার্জি ও হরেকৃষ্ণ কোঙার। কলকাতা থেকে ছুটে গিয়ে তাঁরা সভায় বসেছেন কানু সান্যালের সঙ্গে। কোনও ফল হয়নি। শেষরাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিলেন কানু সান্যাল। কলকাতাতেই ফিরে এলেন শূন্য হাতে বিশ্বনাথ মুখার্জি ও হরেকৃষ্ণ কোঙার। এমন একটি মুহূর্ত যা জ্যোতিপ্রকাশ তৈরি করলেন দশম অধ্যায়ের উপান্তে তার সামনে কতক্ষণ বুঁদ হয়ে বসেছিলাম। আস্ত একটি আখ্যান যেন ডি. টি. পি তিন পঙ্‌ক্তির মধ্যে কথা করে উঠছে।

এমন অগণন আখ্যান বীজময় সময়কে পরিমিত গদ্যপরিসরে ধারণ করেছেন বলেই যখন তিনি কোনও কোনও অধ্যায়ের অন্তর্বর্তী পরিসরে এই সময়ের কোনও অংশকে ফেলে রেখে যান তখনই অতৃপ্তি এসে গলায় বেঁধে। ১৪.১৫. এবং ১৬ অধ্যায়ের ফাঁকে যখন দেখি হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডকে ব্যবহার করে কখন নির্বাচনও জিতে ফেলে কংগ্রেস, এবং সেই নির্বাচন গদ্য পেল না এই পরিসরে, ১৯ অধ্যায়ের মধ্যেই যখন দেখি ৭২ থেকে গদ্য কখন ঝাঁপ দিয়ে ৭৫-এ চলে এসেছে তখন এ উপন্যাসের মহাভারত-সম্ভবা বিষয় এবং প্রচলিত মাপের পরিসরের মধ্যবর্তী ফাঁক নিয়ে অভিযোগই জানাতে ইচ্ছে করে। কারণ এইসব ইতিহাস ভুলে এখনকার জীবনযাপন, এইসব ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখনকার সময়চর্চা, এইসব ইতিহাসের যন্ত্রণার স্বাদ না নিয়ে ইদানীন্তনের রাজনীতি ও গদ্য প্রয়াস হয়তো অপরাধই।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের এ উপন্যাস একই সঙ্গে আমাদের দায় এবং অপরাধকে নির্ণয় করে রাখে। তাই এ উপন্যাস নিয়ে যে অতৃপ্তির কথা তিনি জানিয়েছিলেন ভূমিকাতেই সেই অতৃপ্তি আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে নিরাময়হীন হয়ে ওঠে—এমন গদ্যপর্বে এত সত্বর তিনি শেষরেখা টেনে চলে গেলেন।

সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা

দিলীপ সাহা

১.

'তারপর, এল সেই ক্রৌঞ্চ-মিথুন, এবং ব্যাধ। আর তখনই আমাদের আদিতম কবির হৃদয়-বেদনায় আমরা পেয়ে গেলুম আমাদের সেই আদিতম শ্লোক।

কবিতার জন্ম এমন আততি থেকেই। সেই আততিরই নিরাকরণে, নেতির নেতিতে। হয়তো দ্বান্দ্বিকতায়, পরিবর্জন-পরিগ্রহণ থেকে এক নতুন সত্তায়' ('কেন লিখি, কবিতার কাজ', কেন লিখি? সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)।

এ হেন ভাষ্যে প্রতিভাসিত তাঁর কবিতা ভাবনার মৌল স্বরূপ। সংবেদ্য অনুভাবের এই সূত্র ধরেই তিনি পৌঁছুতে চেয়েছেন ইতির বোধিতে, আত্মমোচনের হাত ধরে আত্মচেতনার দীপ্র পথে। তাঁর কাছে জীবনে পাওয়া, পেয়ে-হারানো বা হারিয়ে-পাওয়া—এ সবই 'লেখনের শিল্প'। আর তাই ব্যক্তি-পরিচয় অপেক্ষা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'মন'। কারণ 'মন-ই লেখে। না লিখে পারে না।' তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন :

'কিন্তু কী লিখি, কেন লিখি? কেননা, মিত কথনের আভাসের থেকে বেশি আর কীভাবে একটি রচিত কবিতাকে কাব্য-মনস্কের কল্পনার স্বরাজ্যে ছেড়ে দিতে পারি। এই সংযোগেই তো তার স্বাভাবিক সার্থকতা' (তদেব)।

কবিতা-চর্চাই মুখ্য পরিচয় হলেও সাংবাদিকতা ছিল তাঁর পেশা। পঞ্চাশের দশকে সাংবাদিক হিসেবেই তিনি যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক 'স্বাধীনতা'-য়। পরে সোভিয়েত সংবাদ সংস্থায়। শুধু 'পরিচয়' নয়, 'অরণি', 'নতুন সাহিত্য', 'বিংশ শতাব্দী', 'কবিতা সীমান্ত', 'কালান্তর' এবং 'গণশক্তি'-র সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অনুবাদক হিসেবেও ছিলেন সাবলীল। বিশেষত রুশ কবি মায়াকোভস্কির 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন' ও 'মায়াকোভস্কি-র শ্রেষ্ঠ কবিতা'—অনূদিত বই দুটি বিরল স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। প্রায় ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে জীবনের ব্রতযাত্রায় যিনি ছিলেন সর্বতোভাবে সৃজনশীল, মার্কসবাদী জীবনাদর্শে যাঁর প্রত্যয় ছিল অমোঘ, চল্লিশের প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের সেই সাম্যবাদী, দায়বদ্ধ কবিসাংবাদিক সিদ্ধেশ্বর সেন দীর্ঘ অসুস্থতার পর চলে গেলেন গত ২১ এপ্রিল ২০০৮, নিঃশব্দে, ৮২ বছর বয়সে।

২.

কবি রাম বসুর অনুজ এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যর সমবয়সী সিদ্ধেশ্বর সেনের জন্ম হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়, ১৯২৬ সালের ২৬ মার্চ। অতি শৈশবেই বাবাকে হারান তিনি। বাবার সরকারি চাকরিসূত্রে তাঁরা সপরিবারে তখন উত্তর-ভারত প্রবাসী। কাজেই বাল্যকালের প্রথম দিকটা তাঁর কাটে বাংলার বাইরে, বাবার মৃত্যুর পর কলকাতায়। ১৯৪৫ সালের

এপ্রিল-এ ছাত্রাবস্থাতেই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'প্রস্তুতি'। ওই একই বছরে, অক্টোবর-এ কবি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় বেরোয় 'অনুরণন' নামিত তাঁর একটি লিরিকও। তাঁদের বাড়ি তখন জোড়াসাঁকোয়, গিরিশ পার্কের সামনে। আর গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটের দত্তবাড়িতে থাকতেন অগ্নিযুগের অন্যতম বিপ্লবী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ছোট দাদু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী কেশবচন্দ্র গুপ্ত এবং 'ভারতী' যুগের শিশু সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়কে ভূপেন্দ্রনাথ পারিবারিক সম্পর্কে যেমন চিনতেন, তেমনই নিয়মিত যাতায়াতের ফলে সম্যক অবহিত ছিলেন সিদ্ধেশ্বরের লেখালিখির ব্যাপারেও। সাহিত্য মন দেখে ড. দত্তই তাঁকে পড়তে দিয়েছিলেন 'সাহিত্যে প্রগতি' :

> 'সে-ই—'প্রগতি' কথাটির সঙ্গে আমার মস্ত যোগ হয়ে গেল। বাংলা সাহিত্য বিচার মার্ক্সীয় নিরিখ ড. দত্তই প্রথম আনেন' (তদেব)।

এদিক থেকে তিনিই তাঁর মার্ক্সীয় শিক্ষাগুরু। ওই সময় একদিন, বিকেলের দিকে, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ড. দত্ত তাঁকে নিয়ে আসেন সেই বিখ্যাত ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়িতে। আসলে দিনটি ছিল ড. দত্তের ৬৪-তম জন্মদিন। সোভিয়েত সুহৃদ-সমিতির তখন সভাপতি তিনি। সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। লোকারণ্য সেই চারতলায় বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, জ্যোতি বসু, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য প্রমুখ। ভূপেন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হিসেবেই এঁদের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। এবং বিশেষভাবে পরিচিত হন চিন্মোহন সেহানবীশে সঙ্গেও।

এই পর্বেই সিদ্ধেশ্বর সেনের লেখালিখিতে আর এক পালাবদলের সূচনা :

> 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সেই যুগ—ভবানী দত্ত লেনের ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে আমাদের নিয়মিত দেখাশোনা ও আদর্শবাদী কাজকর্মের সেই শুরু। তখনও ব্রিটিশরা আমাদের দেশ ছেড়ে যায়নি। ছাত্রদেরও লড়তে হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। আমাদের লেখালিখি ও আন্দোলন একই সঙ্গে আমরা করেছি কমিউনিস্ট আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে' ('সেই আরম্ভের গান', কবিতা সীমান্ত, শারদীয়া ১৪১২)।

বলা বাহুল্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে চল্লিশের সেই দশক ছিল রীতিমতো টালমাটাল :

> 'দেশের স্বাধীনতা ও ফ্যাসিবিরোধী তুমুল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে সমকালের দিকবদলের সঙ্গে আত্যন্তিক যোগে। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের উদ্বুদ্ধ চেতনায়, শ্রেণীহীন সমসমাজে মানুষ যেখানে একদিন নিজসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হবে, এঙ্গেলস যাকে বলেন, প্রাক্-ইতিহাস থেকে ইতিহাসে' ('কেন লিখি', কবিতার কাজ)।

১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের নাৎসি বাহিনি আক্রমণ করে সমাজতন্ত্র ও প্রগতির দুর্গ সোভিয়েত রাশিয়া। কমিউনিস্টরা এই যুদ্ধকে ভূষিত করে 'জনযুদ্ধ' আখ্যায়। ৭ আগস্ট রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী আগুনে পুড়ছে গোটা

দুনিয়া, অন্যদিকে ইউরোপ জুড়ে 'ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদারুণতা'। তবু, মানবতার সেই চরম সংকট মুহূর্তেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। স্বভাবতই তাঁর 'মাভৈঃ' মন্ত্র, শেষ পর্বে লেখা 'সত্য যে কঠিন,/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,/ সে কখনো করে না বঞ্চনা' ('শেষ লেখা', ১১নং কবিতা)—এই তীক্ষ্ণবীক্ষণ, সর্বোপরি 'সভ্যতার সংকট'-এ সেই বিবেক উচ্চারণ 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি' ('সভ্যতার সংকট', কালান্তর)—সিদ্ধেশ্বর সেনকে প্রাণিত করার পাশাপাশি তাঁর কাব্য-অন্বেষার সঙ্গে অঙ্গীকৃত হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্র-ঐতিহ্যও :

কালের
মন্দিরার ছন্দ
ডাইনে-বাঁয়ে
দুই হাতে (ঘুঙুর)

চল্লিশের সেই উত্তাল দশকের স্মৃতি সিদ্ধেশ্বর সেনের কাছে যথারীতি ছিল মুখর। তাঁরই কথায় :

'সেই চল্লিশের একটি উত্তাল দশকে উপপ্লব ঘটতে দেখেছি। এক-দশকের আধারেই বিশ্বযুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-ক্ষমতা হস্তান্তর-স্বাধীনতা ও দেশ-বিভাগ। হাওয়ায় বারুদের গন্ধ যেমন, তেমনি বিক্ষোভ, বিদ্রোহের—'ভারত ছাড়ো', জনযুদ্ধ, আই-এন-এ, নৌ-বিদ্রোহে ; সংক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক আলোড়ন ও আন্দোলন, ধর্মতলায় মিছিলে গুলি। ছাত্র ফেডারেশন-সংক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজের...মিছিলে গুলি। ছিন্নমূল মানুষের স্রোত, গডসের গুলিতে গান্ধিজির হত্যা, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ, আবার পার্টি-পরিচালিত গণ-সংগ্রাম, আন্দোলনের শরিক হয়ে গিয়েছি, ধরা পড়েছি' ('কেন লিখি')।

সেই 'ব্যাপ্ত, প্রবল উন্মথিত সমকাল' ছায়া ফেলেছে তাঁর কবিতায়ও :

বুলেটে বুলেটে শহরের রাস্তা ফুঁড়ে ভীষণ শিলাবৃষ্টির পরে,
সাঁজোয়া ঝকঝকিকে গ্রাহ্যে না এনে,
টহলদারি শান্ত্রীটার কদর্য চাউনিরও ওপারে,
একে একে ভেসে উঠল সেই অদম্য কিশোরের মুখ
ফের সেই কৃষ্ণচূড়ার আরক্তিম স্পর্ধা
ফের সেই হৃদপিণ্ড ধমকানো শৌর্যের আগুন,
আর সমস্ত নিপুণতা মৃত্যুর স্তব্ধতা এক নিমেষে চুরমার ক'রে
ঝড়ের মাতনে ফিরতে থাকল সেই আকাশ পাতাল গান।
(যদি একবার এ ফেরারি হাওয়াটার)

অথবা

হৃদপিণ্ড-নিঙড়ানো যন্ত্রণা-কাতর
হে লাঞ্ছিত, মূর্ছিত শহর।

তোমার বুকের হাড়-পাঁজরগুলোকে নিঃশেষ গুঁড়োতে চায়
উদ্ধত ট্যাঙ্কের নিরঙ্কুশ পরিক্রমণ;
আর তোমার নিদারুণ দুর্ভাগ্যের ওপর
নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো কেন জাগে
কার্ফিউ-এর ক্লেদাক্ত রাত।
(কার্ফিউ-এর রাত)

সংক্ষুব্ধ সে-সময়ের ক্রান্তিলগ্নে ৪৬নং-কে ঘিরে, প্রগতি-সংস্কৃতির কেন্দ্রে, শিল্প-সাহিত্যের উজ্জীবিত প্রতিবেশে তাঁরও ছিল নিবিড় সহযোগ। ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের চারতলার একই চত্বরে তখন ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, শান্তি সংসদ-এর মতো প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহাবস্থান। এমনকী গোপাল হালদার-নীরেন্দ্রনাথ রায় পর্বকালীন 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তরও। সে এক সময়। সিদ্ধেশ্বর তখন পেয়ে গেছেন আগে-পরে তাঁর সমবয়সী কবি-সাহিত্যিক বন্ধুদের : সুকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু, জগন্নাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণাচল বসু, নরেশ গুহ, অসীম রায়। এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অশোক সেন, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির আচার্য, আশিস বর্মনকেও :

> 'মনে আছে, তখন 'অগ্রণী'-তে লিখছি, স্বর্ণদা, সম্পাদক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের হাতে দিয়ে এসেছি রাম বসুর কবিতা, প্রথম সেখানেই বেরিয়েছে। আর পেলুম এখানেই বন্ধু মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, সমরেশ বসু, সলিল চৌধুরী, উৎপল দত্ত, তাপস সেন, ডেভিড কোহেন...দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানও এখানেই। আছেনই তো অরুণ মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, ননী ভৌমিক, গোলাম কুদ্দুস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়...প্রগতি লেখক আন্দোলনে তরুণ পূর্ণেন্দুকে আমিই নিয়ে আসি।...পরবর্তীতে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ সান্যাল, প্রসূন বসু, অমলেন্দু চক্রবর্তী ও অনেকেই' (তদেব)।

বিশেষত লেখক সংঘের 'বুধবারের বৈঠক'-এর সাহিত্য সভাগুলির স্মৃতিও সিদ্ধেশ্বরের অনুভবে সমান উজ্জ্বল। সেইসব আসরে তিনি পেয়েছিলেন তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, পারভেজ শাহিদী, দিনেশ দাশ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজ দত্ত, সুধী প্রধান-সহ এ-সময়ের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের। প্রতিবেশী লেখক-কবিরাও আসতেন সে-সংঘে। তবে এই সংঘের আন্তর্জাতিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে :

> 'সেখানে বিজ্ঞানী জে. ডি. বার্নাল, জোলিও কুরী, জে. বি. এস হলডেনের আণবিক বোমা বিরোধী ভাষণে, লুই ম্যাকনিসের কবিতা পাঠে, সোভিয়েত চলচ্চিত্রের নায়ক-পরিচালক পুডোভকিন-চেরকাসভের আলোচনায় যখন তাঁরা

প্রথম বাংলা রিয়ালিস্ট ফিল্ম হিসেবে নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল'-এর প্রিন্ট দেখেন ও সোভিয়েতে নিতে চান' (তদেব)।

সে-ছবির বিশেষ একটি চরিত্রের মুখে স্থান পায় তাঁর কবিতাও :

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ছায়ায়
মরীচিকা মায়ায়
দৈনিক জুড়োতে যাই হৃদয়ের ক্ষত—
তারপর তন্দ্রালসা গোধূলিতে
রাস্তার ফুটপাতে
কোনো এক বিড়ির দোকান
রেডিওতে রামধুন গানে ভজনা নিয়ত। (বেকার, ১৯৪৮)

কবিতাটি তখন প্রকাশিত হয়েছে বিনয় ঘোষ সম্পাদিত 'সংবাদ'-এর বিশেষ সংখ্যায়। ইতিপূর্বেই অবশ্য প্রগতিরই দৌলতে এসে গেছে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (১ম সংস্করণ) সংকলন বা সে-সময়ের তরুণ কবিদের কাছে হয়ে উঠেছিল প্রকৃতই দিশারি।

চল্লিশের মাঝামাঝি থেকে নানান পত্র-পত্রিকায় সিদ্ধেশ্বরের নিয়মিত কবিতা বেরোলেও ১৯৫০ সালের গোড়ায় জনমানসে বিশেষ আলোড়ন জাগায় তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'আমার মা-কে'। ১৯৫০ সালে অনিলকুমার সিংহ সম্পাদিত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও 'আমার মা-কে কবিতাটির রচনা শুরু হয় ১৯৪৯-এর শেষ দিকে একদিন, আটকাধীনের একাকীত্বে। কবিতাটির বিভিন্ন পর্বের শুরুর উদ্ধৃতি পাবলো নেরুদা থেকে। সে-ইতিহাস তাঁরই বয়ানে :

'আসলে, ঐ সময়ে, একদিন প্রগতি লেখক সংঘের ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রিটের (এখন লেনিন সরণি) দপ্তর থেকে আমরা কয়েকজন হঠাৎ গ্রেপ্তার হই। আমাকে ও গণনাট্য সংঘের সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন সেনকে লকআপে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেদিনই বাড়িতে দেখে এসেছি, ছোটো বোনটি খুবই অসুস্থ এবং মা অসম্ভব ভেঙে পড়েছেন। গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে তাই মা ও বোনের এই দুঃসহ অবস্থা, ছোটো ভাইটিও তখন বেশই ছোটো, এবং সে সময়ে আমি যে তাঁদের পাশে থাকতে পারছি না—এমন এক অসহায়তা আমাকে গ্রাস করছিল। শেষে, রাত্তিরের দিকে, হঠাৎই এক তীব্র টানে, ভাঙা একটা চায়ের ভাঁড়ের টুকরো নিয়ে, আমি লকআপের মেঝেতেই এই কয়েকটি লাইন লিখে ফেলি :

'মা, তোমার কান্নার মাঝরাতে
আমি সান্ত্বনা
মা, তোমার আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
আমি জল
মা আমার...'

এর কিছুদিন পরে, জামিন পেয়ে বাড়িতে এসে দেখি, আমার একমাত্র বোনটি শেষ শয্যায়। মায়ের অবস্থা চোখে দেখা যায় না। এর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই বোন চলে যায়। মা-র সে দিনগুলির বর্ণনাতীত যন্ত্রণাকে সহ্য করার ক্ষমতা আমার ছিল না, 'আমার মা-কে'—এই পুরো কবিতাটি লিখে না ফেলা ছাড়া' (তদেব)।

সেই কারণে কবিতাটি সম্পর্কে তাঁর একটা বিশেষ দুর্বলতা হয়েছে। তাছাড়া আরও একটা দিক আছে। ইংরেজি ও রুশ ছাড়াও কবিতাটি অনূদিত হয় নানান দেশি-বিদেশি ভাষায়। বিভিন্ন সাহিত্য সমালোচক কবিতাটি নিয়ে যেমন লিখেছেন, জেল ও কমিউনিস্ট পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ড থেকেও তেমনি পেয়েছেন শুভেচ্ছা-বার্তাও। চার পর্বের এই দীর্ঘ কবিতাটিতে 'ব্যক্তিগত ট্রাজেডি' ও 'সমকালের এক বিরাট সামাজিক অভ্যুত্থান' মিলে-মিশে গেছে বলে 'এর বিন্যাসে অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র এলিয়টীয় পদ্ধতির উল্লেখ করেন। অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার আগ্রহী হন এর বহুস্বর-বৈশিষ্ট্যে। হিরণকুমার সান্যাল (হাবুলদা) পঙ্‌ক্তি ও স্তবক-মধ্যবর্তী স্পেসগুলিকেও যতিপাতের মূল্য দেন। বন্ধু মৃণাল সেন তো তখন আইজেনস্টাইনের 'ফিল্ম সেন্স' থেকে কবিতার হ্রস্ব-দীর্ঘ লাইনের শট-বিভাজন কেমন দেখান (ভিসুয়ালিটি)' (তদেব)। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ওই কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করেন সুনীল জানা। কবি সমর সেন দেখে দেবার পর তা বেরোয় পি. সি. যোশী সম্পাদিত 'ইন্ডিয়া টু ডে' পত্রিকায়।

এর পরের পর্ব সাংবাদিকতার। ডেকার্স লেনে, কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকার অফিসেই সিদ্ধেশ্বর সেনের পরিচয় ঘটে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, মূলত সুকান্ত ভট্টাচার্যর সৌজন্যেই। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে, নবপর্যায়ের 'স্বাধীনতা'-য় যোগ দেন তিনিও, সাংবাদিক হিসেবে। তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। এই পত্রিকাতেই তিনি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ইলিয়া এরেনবুর্গের। 'স্বাধীনতা' বন্ধ হয়ে গেলে তিনি কাজ নেন সোভিয়েত-সংস্থায়। অনুবাদ করেন মায়াকোভস্কি-র 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন'। রিভিয়্যু করেন সোভিয়েত লেখক ইউনিয়নের মুখপত্র 'লিতেরাতুরনাইয়া গাজেতা'-য় বিশেষত লেনিন জন্মশতবর্ষে লেখা তাঁর এই কবিতাটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য :

সত্যের মতোই
সরল
বলেছিলেন যেমন গর্কি

তাইতো চলেছেন তিনি অবিরল
মানুষের প্রতিনিধি

চলেছে ডিঙিয়ে শতক

যেন-বা বাঙলার বৈশাখী

পৃথিবী বিপুলা আর কাল নিরবধি
জ্বালিয়ে ইলিচ দীপাবলি
যেমন চলেছে সমাজতন্ত্র
প্রকৃতি নক্ষত্র
কাকলি
যেমন সত্য, অভ্রান্ত

তেমনি তো জনপদ, নগর,
গ্রাম ও সংগ্রামের মিছিল
পঁচিশে বৈশাখের দেশে আনে
বাইশে এপ্রিল। (বাইশে এপ্রিল, পঁচিশে বৈশাখের দেশে)

সোভিয়েত সংবাদ-সংস্থা থেকেই তিনি অবসর নেন ১৯৯০ সালে।

কবিতা লেখার শুরু সেই ১৯৪৫-এ, অথচ দীর্ঘকাল নিরলস চর্চা করেও সিদ্ধেশ্বর সেনের প্রথম কবিতার বই 'ঘন ছন্দ মুক্তির নিবিড়' বেরোয় ১৯৮০ সালে। ১৯৮১-তে 'সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা'-র প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়'-এর উদ্যোগে, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৩-তে মনীষার সৌজন্যে। ১৯৮৩-তেই 'তোমরা শুধু মানুষ', 'দীর্ঘায়ু অমর তৃষায়', 'আয়না-আঁটা সপ্ততলা'। ১৯৮৯-এ 'পুরাণকল্পে পুনর্বার'। আর ২০০১-এ 'সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা' সংকলন প্রতিক্ষণ-এর আনুকূল্যে। এর সঙ্গে মায়াকোভস্কির কবিতার অনুবাদ তো ছিলই। কাজেই যে-যাত্রার সূচনা চল্লিশের দশকে, একুশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছেও তা শুধু অব্যাহতই থাকেনি, বরং বাংলা কবিতার প্রবহমানতার সঙ্গেও একান্তভাবে সংলগ্ন ছিল তাঁর 'নিরন্তর যোগের সূত্রটি'। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'কেন লিখি-র বুঝি শেষ হয় না, তার শেষ নেই বলে।' তাই পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ কবিদের উদ্দেশে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, স্বচ্ছন্দ বিশ্বাসে, বহু আগেই তিনি লিখে রেখেছিলেন :

আমার চুপিসাড় কথাকে আমি
নামিয়ে দিই
খিনষ্টির তাপ থেকে আগলে রেখে
নামিয়ে দিই
ততদূর, যেখানে মাটির আচুল গর্ভাধানে
বীজমন্ত্র স্তব হচ্ছে

আমার কথারা যদি খনিজ হতো
তাহলে জমির পরতে পরতে

গাঁইতি-শাবল নিয়ে একদিন
তাদের টেনে তোলা যেত

কিন্তু, তারা আপনিই ফুটে বেরুবার তাগিদে
একটা সফল বিস্ময়ের কাল
খুঁজে নেবে
লতাপাতার বন্ধনী কাটিয়ে একটা শাখা
বাড়িয়ে দিতে পারবে
আকাশকে অতিথি হবার ডাক দিয়ে অন্তত একটিও শাখা

আমার বলা সাঙ্গ হলে তুমিও বলবে॥

(অবিচ্ছিন্নতায়)

৩.

প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনাদ দ্য স্যোশ্যর-এর মতে, ভাষার দুটি রূপ : একটি সামাজিক, অন্যটি ব্যক্তিগত। প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষ পারিপার্শ্বিককে মেনে থাকেন সমাজের শরিক হিসেবেই। আর সেই কারণে ভাষা সমসমাজী মানুষের পারস্পরিক ভাবনা-প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগের সেতু রূপে ভাষার এই কার্যকরী ভূমিকার দিকটি ধরা পড়েছে কাব্য-সমালোচক এলিজাবেথ ড্রুর-চোখেও ('Language is our means of communication with our fellows'.)। অপরদিকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রত্যেকেই আবার বাচনিক দিক থেকে স্বতন্ত্রস্বত্ব। ভাষার সামাজিক রূপ আর ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়েই তো গড়ে ওঠে কাব্যভাষার প্রাণপ্রতিমা। সমকালীন সমাজচেতনায় শাণিত চল্লিশের কবিরা সচেতনভাবে রবীন্দ্রসৃষ্ট ঐতিহ্য থেকে মুক্ত হয়ে অর্জন করেছিলেন নিজস্ব বাক্‌সিদ্ধি। সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় সেই বাক্‌সিদ্ধির কিছু নিদর্শন যা তাঁর অনন্য কবি প্রতিভারই পরিচায়ক :

ক. হে সমুদ্র মেখলা পৃথিবী!
হে আদিমতা বসুন্ধরা
তুমি কি এমন মানুষ দেখেছ
মানুষের এমন সমাজ
যেখানে তোমার আহ্নিকগতির সঙ্গে
প্রগতির সূত্র বাঁধা (আমার মা-কে)

খ. আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্বে বাঁধা
আমার শিকড় তোমার মাটিকে খোঁজে
আমার দিন চায় তোমার রাত্রির সাড়া

বলো, কোন ভাষায় কথা বলবে?

(কোন ভাষায় কথা বলবে)

গ. তার নামের আড়ালে পর্বত, সমুদ্র, তুষার
তার নামের আড়ালে পল্লব, বিহঙ্গ, ঐকতান
তার নামের আড়ালে মানুষের সম, মানুষীর ভালোবাসা,
শিশুর জাগরণ, বিস্ময়
তার নামের আড়ালে শস্যের মঞ্জরি,
শস্যের আড়ালে বীজ,
বীজের আড়ালে তুমিও, চিরদিন স্বাধীন।

(অনাদি প্রেমিক)

ঘ. বন্ধুজনের সভায়, এক কোণে
বসে থাকি
আর ভাবি, সকলেই বাজারচলিত
সুখ আর স্বস্তি নিয়ে দিনকাল কেমন চালায়

আর আমি, হায়, তার মধ্যে বুঝিবা খানিক
বেমানান, এবং একাকী॥ (এক বান্ধব সভায় গিয়ে)

ঙ. আমাদের চোখে মুখে, বৃষ্টি
হাজার তীরের ফলা নামে
অথবা ডেকেছি কেন দৃষ্টি
পুনর্বার দক্ষিণে ও বামে
আমাদের আড়ালে ওকে, থামে
ধাবন্ত, ধাবন্ত

পদশব্দ ভাঙে স্থানকাল॥ (হাওয়া, পদশব্দ ভাঙে)

আসলে প্রকরণের প্রশ্নে সিদ্ধেশ্বর সেন তাঁর কবিতার ভাষা, বাক্স্পন্দ, ধ্বনি ও উচ্চারণকে এমনভাবে চারিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যাতে সংবেদনশীল পাঠকের মনে তা গভীর হয়ে যাজে। কবিতা তাঁর কাছে জীবনের মতোই এক মানস-প্রক্রিয়া যা তাঁকে চলার হদিশ যোগায়, বাঁচতে শেখায়, সর্বোপরি পৌঁছে দেয় বস্তুসত্য থেকে মননের উদ্ভাসিত বোধিতে।

ফরাসি লেখক লুই আরাগঁ-র মতো সিদ্ধেশ্বর সেনও বিশ্বাস করতেন, 'শিল্পের ইতিহাস আঙ্গিকের ইতিহাস'। তবে রুশ কমিউনিস্ট কবি মায়াকোভ্স্কি-র দ্বারা প্রভাবিত বলে তাঁর আঙ্গিকের ভঙ্গি কিছুটা আলাদা। ভাব ও ভাষার যে সহজ সারল্য চল্লিশের কবিদের বড়ো

গুণ, সিদ্ধেশ্বরের কবিতায় অবশ্য ততোটা সুলভ নয়। তাঁর পঙ্‌ক্তি সাজানোর পদ্ধতি প্রচল রীতির বিরোধী। শব্দ-সচেতন তিনিও। তবে স্বাতন্ত্র্য বাক্‌ধর্মে :

শব্দ
শব্দের যোজনা শব্দ
শব্দেই আরম্ভ, নাদ, নভোনিখিলের
গর্ভে বাজে (একটি ছিন্ন সংলাপ, অংশ)

তাঁর এই শব্দচয়ন এককথায় অসাধারণ। রূপকের অভিজ্ঞানে যখন তিনি বলেন :

সময়ের কোন ডানা গরুড়ের চেয়ে বৃদ্ধ, পরিণামহীন, শ্রান্ত
অনুতাপকামী
আমিই দাহ্য আর আমিই সে একক দাহক।।

(আগুন আমার ভাই)

অথবা, পৌরাণিক অনুষঙ্গে ঝলসে ওঠে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা :

সময়ের হাতে আমি হবি,—মাত্র তাই?

আমি চাই উন্মোচন, উন্মোচন স্ফুলিঙ্গ ও ভস্ম
রেখে নগ্ন-পাথসাটে

প্রাচীন পাখির চঞ্চু পুনর্বার আকাশ কামড়াই।।

(প্রাচীন পাখির চঞ্চু)

তখন কবির দেশ কাল সমাজভাবনাও দীপ্ত হয় বাঙ্‌ময় রূপ-ভঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-কে রূপকাশ্রয়ে নিয়ে তাকে পুনর্নির্মাণ করে 'ঘুঙুর' নামে যে দীর্ঘ কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন তাতে উজ্জ্বল উত্তাল চল্লিশের সেই অগ্নিগর্ভ সময় :

চারিদিকে বিদ্রোহের দিনপঞ্জি লেখার গৌরবে
কবি-কিশোরের

পদাতিকে-মিছিলে-জাঠায় হরতাল, আকালেও
নবান্ন-উৎসবে, আবেদিন-স্কেচে, সন্দ্বীপের চরের
মৃত্যুহীন

নবজীবনের মতোই জাগ্রতের গানে, চিহ্ন চিনে চিনে, মন্বন্তরেও
তিন পুরুষের আত্মশ্লেষ মেনে
—এমন কি, সে কালীন কবিতাভবনেরও কবিতার
নিরিখের তর্কে—

কসাকের ডাকে—

ফ্যাসিস্ত-বিরোধে কবি-শিল্পীর সততায়, ভারতীয়
সাম্যবাদীর প্রাথমিক
স্বপ্নের নিষ্ঠায়

প্রতিবাদে-প্রতিরোধে মূল্যবোধ চিনে-জেনে
অপূর্ণের হয়তো এক সংস্কৃতিরই বিপ্লবে... (ঘুঙুর)

মিথ পুরাণের ব্যবহারে তিরিশের দশকের কবি জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র সিদ্ধি প্রশ্নাতীত। সিদ্ধেশ্বর সেনও পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য আত্মস্থ করে মিথ-পুরাণের এমন সুষম প্রয়োগ করেছেন যা তাঁর জীবনবীক্ষা-সঞ্জাত। মেনকা, পার্বতী-পরমেশ্বর, উমা-মহেশ্বর, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, উষা, বক, রাহু, গন্ধর্ব, কাশ্যপ, জাতক, দধিচী, অন্ধমুনি, জটায়ু, সঞ্জয়, অহল্যা, দ্রৌপদী—এইসব চরিত্র নিছক মিথকেন্দ্রিকতার দৃষ্টান্ত মাত্র নয়। এইসব চরিত্রের নবায়নও তাঁর কবিতার নির্মিতিকে দিয়েছে ভিন্ন তাৎপর্য, শিল্পিত মহিমা। মিথ একাধারে বস্তুগত ও ভাবগত বলেই তার মাধ্যমে অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করাও কবির একটা দায়। আর তাই মিথ, অতিকথা, উপকথা বা পুরাকল্পের ব্যবহারে ধ্বনিত হয়েছে জটিল জীবনের বহুমাত্রিক কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা। যেমন :

ক. আমারই দৃষ্টির সীমা ছেড়ে যায়, রাজ্য-সীমা
ছেড়ে অনুগত, আত্মজ আমার—
প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সে-ই নয়নাভিরাম

আমি প'ড়ে একা, দগ্ধকাম, অন্তিমের
সঙ্গী শুধু দাহ,
আমাকে পোড়ায়,
অন্ধমুনির শাপগ্রস্ত,
—মোহান্ধ, স্নেহাতুর, অথচ অসহায়—
(ফিরিয়ে নাও তোমার সসাগরা)

খ. গাজনের ঝোঁক যেন চড়কের-ই মেলা, ঘিরেছে
অন্দারে—

কথাবীজ-ও ওড়ে, লোক-দেশাচার নিয়ে, স্মৃতি
অনুক্রমে

পুঁথি পাঠোদ্ধার হলে তেমন ঐতিহ্যজ্ঞানে, ফেরা,
ফের প্রত্যহের কাছে
(দিনশেষে, কথাবীজ এসে)

গ. তবে কী তুমিই আপন রক্তে বৈরী
হরিণা যেমন শরীরে—
আমার দু'হাতে তুলে দে ধনুর্বাণ

আমি তো রয়েছি, ব্যাধের দিকেই, লক্ষ্য
ফেরাতে, তৈরি—

হরিণ, তোমার খুর অপম্রিয়মান।। (বজ্রনৌকা (অংশ) ১০)

বাক্‌প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রেও সিদ্ধেশ্বর সেনের সৃজনাকৃতি সপ্রমাণ।
কয়েকটি নিদর্শন :

ক. কৃষ্ণচূড়ারও ডালে ধরে থোকা যৌবন নির্ভর। (যৌবন)
খ. বুকে দুর্মর প্রতিজ্ঞা বাঁধে বাসা। (জয়)
গ. বেকার মজুরটি হঠাৎ ঝোড়ো আবেগে বাঙ্ময়।
শীতের কুয়াশা চাপা আক্রোশে ধুঁইয়ে ওঠে। (আগুনের পাশে)
ঘ. মেঘে মেঘে বিদ্যুতের/ব্যূহে এ আকাশ বজ্রগর্ভ। (পাথরে চোখ)
ঙ. কালবৈশাখের ডানায় ঝাপটায়/হৃদয় (আমার মা-কে)
চ. শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তর ভেঙে ধায় (জল পড়ে পাতা নড়ে)
ছ. কুঁড়ির মতো টকটকে রক্ত (তুমি কোনো যুদ্ধ শুরু করনি)
জ. বীভৎস গ্রীবার থেকে ঝোলে/ঘোটকীর মতো মুখ।। (সেন্টর)
ঝ. রাহু খায় ত্রিযুগী খণ্ড-চাঁদ।। ('কালাধার' থেকে)

৪.

'শেষ পর্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকতায় পৌঁছতে চায় আধুনিকের কবিতা। তদগত বিজ্ঞান দৃষ্টিতে, সমকালের ভাবনায়' (তদেব)।

কবিতার ধারা প্রবাহের এ হেন চলিষ্ণুতার সংরাগে ওতপ্রোত সিদ্ধেশ্বর সেনও। আত্মসচেতনতা ও ব্যাপ্তির অন্বেষায় স্থিত থেকে মানবিক বিবেকে যেভাবে তিনি নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, সমাজচেতনা থেকে উপনীত হয়েছেন শুদ্ধির প্রত্যয়ে তার অন্তরালে রয়েছে তাঁর চারিত্রিক নিষ্ঠা। এ তাঁর নিজস্ব অর্জন। তাঁর মতে :

'কবি তাঁর দেশকালের একটি চাপ বহন করেনই, যদি তিনি আত্মসচেতন হন। তার সঙ্গে সেই অনিবার্য শর্ত—তাঁর অনুভবের সংবেদ্য শিল্পরূপ সৃষ্টির দায়' (তদেব)।

এই দায়বোধেই আন্তর্জাতিক সংকটময় পরিস্থিতিতে, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির থেকে যেমন তিনি ঘোষণা করেছিলেন :

আমার হৃদয়ে তোলে দুর্নিবার তরঙ্গ উত্তাল,

আমরা সংহত হই, একসূত্রে দাঁড়িয়েছি এসে।

এ মুঠোয় শক্ত ক'রে ধরে থাকি জীবনের হাল,
আমরা প্রস্তুতি মানি, সে আশার দিগন্ত বিশাল।
(প্রস্তুতি)

তেমনি আবার দেশব্যাপী আন্দোলন, দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষকেও উপস্থাপিত করেছেন চল্লিশের মেজাজেই :

ক. বাতাস কাটছে দুঃসাহসের পাখা,—
প্রখর দিনের কঠিন সূর্য জ্বলে
দশ বছরের কায়েমি আসন টলে,
যে লক্ষ্য মনে সেই সম্মুখে রাখা। (জয়)

খ. অগুন্তি হাতের মুঠোয় লুকোনো বজ্র
অনন্যবিক্রমে ঠিকরে পড়বে।
দধিচী, তোমার আগেই আমার অস্থি দিলাম। (অদ্বিতীয়)

গ. ভারি বুটের আড়ালে আর্তস্বর।
দগ্ধ দগ্ধ ক্ষেত, ভ্রষ্টস্বর গর্ভিনী নারীর
অশ্রু-শেষ রাত ;
আহত প্রান্তর। (পাথরের চোখ)

ঘ. পঞ্চাশের বাংলা জোড়া ভয়ঙ্কর
—মন্বন্তর—
মুমূর্ষুর তেতাল্লিশে ধুঁকে ধুঁকে মরা দেশে, সারা দেশে
লঙ্গরখানায়

চালের কণায় খুদের ফ্যানেও নেই ভিক্ষা

দলে দলে গ্রাম ছেড়ে মাঠের চাষির মুখ-থুবড়ে শান-বাঁধানো শহরেও
নেই ভিক্ষা (ঘুঙুর)

ভাব ও ভাষা দুই-ই এখানে সংহত। শব্দ-ব্যবহারেও স্বাতন্ত্র্য। উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নেই অথচ আত্মসচেতনতার দৃঢ়তা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'আমার মা-কে' কবিতাটির ফর্মের বিষয়টিও। কখনো হাহাকার, কখনো বাক্রুদ্ধ বেদনা, কখনো নাটকীয় ওঠা-পড়ায়, কখনো বা ক্রুদ্ধ উচ্চারণে ব্যক্তিগত শোকানুভূতি থেকে সিদ্ধেশ্বর উন্নীত হয়েছেন সামাজিক ট্র্যাজেডির শীর্ষদেশে। স্বর বদলের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটে পঙ্ক্তি বিন্যাস, বাক্ছন্দেরও। চরণ সজ্জার সূত্র ধরেই দায়বদ্ধ কবির মতো সরাসরি তিনি ঘোষণা করেছেন :

জাগো
প্রতিজ্ঞা জাগো
নির্মম জাগো
সৃষ্টি কি প্রলয়ে জাগো
ধরণীর গভীর থেকে উথলে-ওঠা ঘূর্ণিঝঞ্ঝা
হৃদয়
কালবৈশাখের ডানায় ঝাপটায়
হৃদয়
সমুদ্র-মন্থন-বেগে
নক্ষত্র খসিয়ে জাগো

কবিতাটির অনধিগম্যতা ভঙ্গির এই ঐকান্তিকতায়। মা-র জন্য কবির বিলাপে একদিকে যেমন যন্ত্রণা, অন্যদিকে এই মা-ই আবার তাঁর কবি-কর্মের 'মৌল-প্রতিমা'।

আসলে সমাজচেতনার দায় ও শিল্পের বিশুদ্ধতাকে সিদ্ধেশ্বর সেন অসামান্য দক্ষতায় গেঁথেছিলেন সমন্বয়ের সূত্রে। এ ছাড়াও মানবজীবনের শুষ্কতা ও প্রাণের সরসতা—এই দুটি বস্তুসত্যকেও তিনি রূপায়িত করেছিলেন অনায়াস নৈপুণ্যে :

আশ্বিনের মেঘ এই স্বচ্ছ এই এক পশলার
ধুম
যেবার বর্ষণ হল ক্ষেতমাঠ টইটই নিঘুম, কোনো
কোনোবার

বলা-কওয়া নেই এল খরার আগুন
সেই শুরু থেকে শ্রাবণ-ভাদ্রেও, পোড়ে ঘাস

এই শুকনো ও ভিজা, আতুর ও পূর্ণতর
বারোমাস
ঋতুর যাপনে (এটুকু পথও যেন হয় দীর্ঘতর)

এইভাবে প্রকরণের নিরলস চর্চা ও পরিশীলনের মাধ্যমে কবিতার অবয়বকে শানিত ও শুদ্ধ করে সিদ্ধেশ্বর সেন চেনাতে চেয়েছেন তাঁর নিজস্ব আইডেনটিটি। রূপাবয়বের এ হেন একাগ্রতায় তাঁর সৃজনকৃতির অনন্যতা এবং সিদ্ধি।

সাক্ষাৎকার : সিদ্ধেশ্বর সেন

প্রস্তাবটা হঠাৎ-ই দিয়েছিলাম। বিষ্ণু দে-র সংগ্রহ-পাণ্ডুলিপি-ছবি প্রভৃতির যে প্রদর্শনীটি হয়েছিলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ, তার শেষ দিনে। স্বভাবত কোলাহলের পরিচিত বৃত্তের বাইরে থাকা একজন কবি প্রথমে বলেছিলেন : কী হবে আমার সাক্ষাৎকার নিয়ে? ওঁর বাড়িতে অতীতেও গিয়েছি, একাধিকবার, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে। সম্পর্কের সূত্রপাত অবশ্য সাহিত্য দিয়ে নয়, ব্যক্তিগত-পারিবারিক কারণে। এমনকী দু'তিনটি সন্ধে, ঘন্টা দু'এক কেটে গেছে কবিতা পাঠে। প্রথমে প্রশ্রয়মাফিক আমাকে পড়তে হ'তো কয়েকটি কবিতা। তারপর, আস্তে আস্তে এলোমেলো চুল, তখন দাড়ি ছিলোনা, পাঞ্জাবি আর ঘরোয়া পরিচ্ছদের অবিন্যস্ত ধূসর অন্ধকার কেটে শোনা যেতো উজ্জ্বল কিছু কবিতা—অথবা কবিতার খসড়া। এভাবেই ক্রমে অনুরোধের জোরটা বাড়াতে থাকি। শেষ পর্যন্ত একটা 'ভদ্রলোকের চুক্তি' হয়, অবশ্যই মৌখিক, কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের সঙ্গে। কবি অথবা কবিতা নয়, জানতে চাইলে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কয়েকটুকরো স্মৃতি ছবি হিশেবে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু স্বভাবত যিনি কবি, কৃপণতার নিন্দে তাঁর নামে যতোই চলতি থাকুক, যিনি সত্যিই এক আত্মভোলা মানুষ—তিনি কথা বললে কবিতাই বা থমকে থাকে কেন। অতএব দিন তিনেকের প্রারম্ভিক আলাপ অথবা মুখড়ার পরে সাক্ষাৎকার নেওয়া চললো। 2007-এর ফেব্রুআরি, মার্চ আর আগস্ট মাসের কয়েকটি সন্ধের পর থেকেই আবার কেমন যেন গুটিয়ে যেতে শুরু করলেন। পরে জানা গেলো, শারীরিক অসুস্থতার চেয়েও ওই সময়টা থেকে মানসিক উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছিলো। পারিবারিক অসহায়তা ও সংকট তার অন্যতম কারণ, সেটাও জানা গেছে। তারপর নভেম্বর থেকে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় ভর্তি হলেন একবালপুর নার্সিংহোমে। ছাড়া পেলেন, 16 ডিসেম্বর বাড়ি ফিরলেন। চিকিৎসা-সংকট কিঞ্চিৎ ঘটেছিলো, এটা ঘটনা। ফলে সুস্থ বলতে যা বোঝায়, সেটা আর হলেন না। 16 তারিখেই সন্ধেবেলা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, নিজেই বললেন সাক্ষাৎকারটির কথা। জানতে চাইলেন, ওটা কি কোথাও ছাপাবে? কে ছাপবে? একটু চুপ ক'রে থেকে, আবার বলতে শুরু করলেন, কথা—নিজের পরিবারের। আবারও পার্টির (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, আমৃত্যু যে রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন কবি সিদ্ধেশ্বর সেন) কথা উঠলো। 16 তারিখ আর 23 তারিখ, দু'টো সন্ধের আলাপচারিতায় আগে নেওয়া সাক্ষাৎকারটিকে একটু গুছিয়ে নেওয়া গেলো। সুতরাং সে হিসেবে, সাক্ষাৎকারটি পূর্ণাঙ্গরূপ পেয়েছিলো 16 ও 23 ডিসেম্বর 2007।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে কবি সিদ্ধেশ্বর সেনকে ভর্তি করা হয় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে, স্নায়ুরোগ বিভাগের একটি কেবিনে। সেখানেও মাঝেমধ্যে চেতনার তারতম্য ঘটছিলো। যদিও তারমধ্যে একাধিক কবিতার পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করেছেন। এমনই একটি কবিতা অনুলিখন করেছিলেন কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য। একটি কবিতা (? কয়েকটি লাইন) অনুলিখন করেছিলুম আমি-ও। তবে শেষ বয়সে সিদ্ধেশ্বর সেনের

কবিতায় যে অকাম্য পৌনঃপুনিকতা দেখা যাচ্ছিলো, আমার অনুলিখিত কবিতাটিও তেমনই—পুরোনো কোনো কবিতার স্মৃতি থেকে উঠে আসা কয়েকটি লাইন, হয়ত স্মৃতিকেই অনুসরণ করছিলো অবচেতনা। তবে এরই মধ্যে, একদিন যখন কিছুটা সুস্থ, হাসপাতালে, সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত কবিতা সংকলনের একটি কপি (সম্ভবত 'লেখক কপি') মাথার কাছে রাখা—আমাকে বললেন ওঁর কবিতাটি খুঁজে বের করে দিতে। তারপর জানতে চাইলেন, 'পরিচয়'-এর কথা, যদিও সে-অর্থে আমি 'পরিচয়'-এর তেমন কেউ নই, অনিয়মিত লেখকমাত্র। কবি শঙ্খ ঘোষ এসেছিলেন, অনেকক্ষণ গল্প করেছেন—বললেন সে কথা, আমি আর কবি অনীক রুদ্র সে বিকেলের শ্রোতা। এমনই একদিন বললেন, ভূপেনবাবু-র (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত) লেখা বইপত্তর 'মদনমোহন লাইব্রেরি'-তে এখনও আছে কিনা। এবং বললেন, সাক্ষাৎকারের সময় ভূপেনবাবু আর মুজফ্ফর সাহেবের ব্যাপারটা যা বলেছি—সেটা আর রেখে কী লাভ? [আসলে আমার প্রশ্ন ছিলো, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এতজনকে মার্কসবাদী করেছেন, কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হ'তে উৎসাহিত করেছেন—অথচ নিজে কখনও পার্টির সভ্য হননি কেন? জবাবে সিদ্ধেশ্বর সেন জানিয়েছিলেন যে তৎকালীন অনেক পার্টি নেতারই আবার ভূপেন দত্ত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অসূয়া ছিলো। হয়ত রাজনীতির মতভেদ ততটা নয়, বিশেষত কাকাবাবু-ও চাইতেন না যে পার্টিতে, মানে এরাজ্যে, ওঁর যে প্রভাব সেটা কখনও যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। অতএব...] তবে সিদ্ধেশ্বর সেন কুণ্ঠিত হ'লেও ডাঃ রণেন সেনের লেখাতেও এর ইঙ্গিত পরিষ্কার। আর মুজফ্ফর আহমেদের একাধিক লেখাতেও ভূপেন দত্ত সম্পর্কে আক্রমণাত্মক মন্তব্য চোখে পড়ে। এভাবেই, একদিন চ'লে গেলেন সিদ্ধেশ্বর সেন। একরাশ অভিমান আর উপেক্ষার দহন সহ্য ক'রে, তথাকথিত উচ্চকিত কবিতা-কোলাহলের বাইরে থেকে। তবে ওঁর প্রয়াণের পর একাধিক ব্যক্তি/ প্রকাশক অপ্রত্যাশিত উৎসাহ দেখিয়েছেন এই সাক্ষাৎকার প্রকাশের। কিন্তু, সবকিছুর পরেও, একজন কবি যখন মস্তিষ্কসচেতন, যাঁর নির্মাণের প্রতিটি শব্দের মতো যতিচিহ্নগুলিও সচেতন কারুকাজ—তাঁর সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হবে কোথায়, আমার এই সংশয়কে এককথায় সরিয়ে দিয়ে যিনি 'পরিচয়'-এর জন্য সাক্ষাৎকারটি গুছিয়ে তুলতে বললেন, তিনি 'পরিচয়' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য—যাঁর কথা অমান্য করার ধৃষ্টতা আমার নেই। কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের জীবদ্দশায় সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ পেলে হয়ত আরেকটু ভালো হ'ত।

সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করার বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে ঋণী করেছেন অরুণ ঘোষ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরি, কবি শুভ বসু। যেহেতু ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রটা মুখ্যত পারিবারিক, সেজন্য সাক্ষাৎকার প্রকাশের সময় একেবারে ব্যক্তিগত কিছু প্রসঙ্গ কথা বাদ দিয়েছি। প্রয়োজনে অসম্পূর্ণ শব্দ যোজনার জন্য তৃতীয় বন্ধনীর [ ] ভেতর অনুমানকৃত শব্দটি বসিয়ে দেওয়ার স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি। কোনো বক্তব্যের বিশদ প্রকাশ করা হয়েছে বন্ধনীর (প্রথম/তৃতীয়) সাহায্যে। সিদ্ধেশ্বর সেনের পাঠকদের কাছে সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন তথ্যই পরিচিত লাগবে, কারণ স্মৃতিকথনের ঢঙে কিছু কথা অতীতে তিনি লিখেছিলেন। তবুও, সেই উজ্জ্বল অতীতের অন্যতম পথিকটির সাক্ষাৎকারটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ'লে

আমাদের অপরাধবোধ কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

প্রশ্ন/তমোনাশ ভট্টাচার্য : কোথা থেকে শুরু করা যায়, তুমিই বলো।

সিদ্ধেশ্বর সেন : দ্যাখো, সন-তারিখে যদি কোনো গণ্ডগোল হয়... আসলে পুরোনো সব কথা তো—তুমি একটু 'চেক্' করে নিও।

ত. ভ. : তোমার জন্ম তো কলকাতার বাইরে?

সি. সে. : হ্যাঁ, 1926, 26 জানুআরি। চুঁচুড়ায় মামার বাড়িতে। বাবা সত্যেন্দ্রনাথ সেন। মা নির্মলাবালা দেবী। তবে শৈশবেই এখানে (কলকাতায়) চ'লে আসি।

ত. ভ. : তোমার বাবা তো কলকাতার লোক?

সি. সে. : হ্যাঁ, বাবার বাড়ি বলতে গেলে গিরিশ পার্ক—জোড়াসাঁকো।

ত. ভ. : সেটা তো তোমার ইদানিংকার কবিতায় উল্লেখও রয়েছে...

সি. সে. : রবীন্দ্রনাথ নিয়ে লেখার সময় ওটা মনের ভেতর কাজ করে, মনে প'ড়ে যায়।

ত. ভ. : 'কলিকাতা' সিরিজের কবিতাতেও আছে না?

সি. সে. : কলকাতার (কলিকাতা) এই নাম পাল্টানো, তুমি তো জানো, আমি এর একদম বিপক্ষে। এটা একটা 'হিস্টরিক্যাল ইগনোর্যান্স্' থেকে হয়েছে। আমি অন্নদাশঙ্কর রায় মশায়কেও ব্যাপারটা বলেছিলাম। এ নিয়ে লিখেওছি। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে লিখতে গেলেও কলকাতার কথা এসে যায়। জোড়াসাঁকোর কথা। ছোটোবেলায় দেখতুম। তারপর বিভিন্ন সময়ে...মানে তখন আমি বড়ো, ঘুরতে ঘুরতে জোড়াসাঁকো চ'লে যেতাম। কাছ থেকে বাড়িটাকেই দেখতুম। বারান্দাগুলো...কীরকম আলো এসে পড়ছে। অন্য সময়ে যাবে (অর্থাৎ অনুষ্ঠানের দিনগুলি ছাড়া)—ফাঁকা থাকলে দেখবে... .

ত. ভ. : ছোটোবেলার তেমন কোনো ঘটনা মনে আছে?

সি. সে. : বাবা মারা গেলেন 1930। তখন তো আমরা ইউ. পি. তে (উত্তরপ্রদেশ / ? হিমাচল-কেননা বাবার কর্মসূত্রে সিমলাতে থাকতেন ওঁরা)। তারপর একটু অন্য সমস্যা হয়েছিলো। আসলে, তখন তো সেভাবে বুঝিনি...অথচ মাথার ওপরে বাবা নেই। সেজন্যই হয়ত মার ওপর আমার 'ডিপেনডেন্স্'টা এত। আরেকটা কথা বলি। আমার এটা অবিশ্যি শোনা [কথা]। আমার ওপরের দুই দিদি মারা গেছিলেন। দিদিমা আর মাইমা তাই মা-কে নিয়ে সরস্বতী নদী পেরিয়ে সিদ্ধেশ্বরীতলায় যান। ওটা হুগলিতে। নদীর ওপারে। সিদ্ধেশ্বরীতলা, কোড়লা। তা, মা এখানে মানত করলেন। তাই নাম হ'লো সিদ্ধেশ্বর। ওই যে বিষ্ণুবাবু লিখেছিলেন। 'রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে'-তে সিদ্ধেশ্বরীকে দিলাম'। (কবি বিষ্ণু দে-র কবিতা সংকলন 'রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশ' ১৩৮০ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ঢাকা-র মাওলা ব্রাদার্স। এই সংকলনের দু'টি কবিতা, 'ভোর' এবং 'প্রেম ও বর্বর' বাদে বাকি ৬৪ টি কবিতা 'ঈশাবাস্য দিবানিশা'-তে অন্তর্ভুক্ত হয়—বৈশাখ ১৩৮১ বঙ্গাব্দে। কিন্তু কবি সি. সে. এখানে 'সিদ্ধেশ্বরীকে দিলাম' বলতে কী বুঝিয়েছিলেন, তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কোনো পাঠক যদি ও ব্যাপারে সাহায্য করেন, বাঙলা সাহিত্যের সকল অনুরাগী কৃতজ্ঞ থাকবেন।) সেটা সেই সিদ্ধেশ্বরী তলা।

ত. ভ. : কলকাতার কথা কিছু? শুনেছিলাম যে তুমি-ও কিছুকাল বাগবাজারে থাকতে

সি. সে. : আপার চিৎপুর রোডে। তুমি কি চিনবে জায়গাটা? হেমেন্দ্রকুমার রায় কোন্‌খানে থাকতেন, জানো? আমরা থাকতুম ওঁর বাড়ির পাশে। হেমেন্দ্রকুমার আমাদের একরকম আত্মীয় ছিলেন, সেজন্যই ওখানে আসা।

ত. ভ. : সেটা কোন্ সাল?

সি. সে. : 1945। তার এদিক-ওদিকেও কিছু সময়। ওই 'পিরিঅড়'টা থেকেই কলকাতা—মানে যেটা সুতানুটি অঞ্চল, পুরোনো কলকতা—তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ার শুরু। আর পাশে গঙ্গার প্রবাহ। সেখানে খড়ের নৌকো, জেলেরা মাঝিরা—ঠিক যেন 'ওরা কাজ করে'-র দৃশ্যরূপ।

তারপর 'প্রি-ইন্‌ডিপেনডেন্‌স্ পিরিঅড়'-এ চ'লে আসি রামধন মিত্র লেনে। 1947। রাখাল ভট্টাচার্যর (কবি সুকান্ত কাকা) বাড়ির পাশে। সেটাও সরু গলি, পরপর বাড়ি। পুরোনো কলকাতা।

ত. ভ. : তখন তো কৈশোর পেরোচ্ছে, কবিতা লেখা?

সি. সে. : 1945-তে লেখা ছাপা শুরু। লিখছি তো তার আগে থেকেই। 1945-এ 'অরণি'তে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাাদিত পত্রিকা, যার সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন কবি অরুণ মিত্র। কবিতা প্রকাশিত হ'লো। অরুণ মিত্র তিনজনকে 'অরণি'-র মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করান—সুকান্ত, আমি ও কিছু পরে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সমালোচনা লেখান সরোজ আচার্য (?)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৫-এর অক্টোবরে কবি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় সি. সে.-এর একটি লিরিক 'অনুরণন' প্রকাশিত হয়।

ত. ভ. : রাজনীতি?

সি. সে. : দাঁড়াও, আসছি সে প্রসঙ্গে। 1945-1946 থেকেই 46 নং ধর্মতলা স্ট্রিটে 'প্রগতি' (প্রগতি লেখক সংঘ)-র দপ্তরে যাতায়াত ও মেলামেশার শুরু। তখন অবশ্য আমরা, মানে আমি আরকি, একেবারেই বালখিল্য। আসলে আমার লেখা আর রাজনীতি দু'টোই কেমন যেন হাত ধরাধরি করে এসেছে। 1945-এ বেলুড়ে ছাত্র ফেডারেশনের (বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন) ক্যাম্পে গেলুম। ওখানে অলকা চট্টোপাধ্যায় আর প্রদ্যোৎ গুহ হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন। তাতে 6 এপ্রিল (1945) আমার প্রথম কবিতা বেরোলো, 'প্রস্তুতি'। আমার তখনকার বোধবুদ্ধি অনুসারে ফ্যাসিবিরোধী কবিতা। ওখানে আবার একটা ঘটনা ঘটলো। মাকে দেখার জন্য পরের দিনই ক্যাম্প থেকে [বাড়ি] ফিরে আসি। একদিন থেকে আবার মা-র নির্দেশেই ক্যাম্পে ফিরি। দেখো, ওই সময়ে আমার মা কতোটা অন্যরকম ছিলেন। ক্যাম্পের বন্ধুদের মধ্যে একসঙ্গে থাকতুম হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায় আর...। 'বি পি এস্ এফ্' (বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন/AISF-এর রাজ্য শাখা) নেতা দিলীপ রায়চৌধুরি আমাকে 'বি পি এস্ এফ্'-এর সদস্য করেন। তখন থেকেই আমি কিন্তু ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় সদস্য। আর, সেই সময়ের ছাত্র ফেডারেশন তো—বুঝতেই পারছো, বিশ্বনাথ দা (বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়)

, রমেন ব্যানার্জি, প্রভাত দা (প্রভাত দাশগুপ্ত), গৌতম দা (গৌতম চট্টোপাধ্যায়), অবনী লাহিড়ী, গীতা দি (গীতা রায়চৌধুরি, পরে গীতা মুখোপাধ্যায়)—এঁরা সব ছাত্র নেতা। এঁদের ব্যবহার-ব্যক্তিত্ব এমন ছিলো যে সহজেই এঁদেরকে 'লিডার' ব'লে মনে ধরতো। আর রাজনীতিটাও তখন বামপন্থী, মানে কমিউনিস্টদের এমন ছিলো যে ওই সময়ে 'কাল্‌চারাল্‌ আস্‌পেক্ট'টাও খেয়াল করা হ'তো। ছাত্র ফেডারেশনের বন্ধুদের পরামর্শেই ক্যাম্পে লেখা কবিতাটা 'অরণি'তে পাঠাই। কারণ 'অরণি' প্রগতিশীল কাগজ। অরুণদা (অরুণ মিত্র) লোক পাঠিয়ে ডেকে পাঠান।

1945-এই আরো কয়েকটা ঘটনা [ঘটে]। লাহিড়ীর (সোমনাথ লাহিড়ী) সঙ্গে যোগাযোগ। এমন 'ইন্টেলেক্চুয়াল' অথচ পার্টির (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি) 'রেগুলার' কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত [মানুষ]। আর পরেও দেখেছি, কাগজটাও বুঝতেন। লাহিড়ী সম্পর্কে আমার ভালো লাগার আরেকটা মস্তবড়ো কারণ হ'লো, উনিও ভূপেন দত্তর কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন। আর আমিও কিশোর বয়স থেকেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর গুণমুগ্ধ, ভাবশিষ্য। ওঁর কাছে যেতুম। উনিও আসতে বলতেন। ভূপেন দত্তর বাড়িতেই যেতাম। 'অরণি'তে লেখা বেরোলে উনি বললেন, তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবো। 60তম জন্মদিনে [64তম], (ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর জন্মদিন) ট্রামে ক'রে নিয়ে গেলেন 46নং ধর্মতলা স্ট্রিটে। সোমনাথ লাহিড়ী, স্নেহাংশু আচার্য, জ্যোতি বসু, ভবানী সেন—সকলের সঙ্গেই পরিচয়, সম্পর্ক। বলা যায়, পার্টিগত ভাবেই কিছুটা আমাকে ওখানেই 'পুট্' (put) করা হলো। আমিও যেন ঠিকঠাক একটা জায়গা পেলুম। মনে আছে, ভবানী সেন বললেন, ড. দত্ত দুই যুগের সেতু—বঙ্গ ভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী সেতু।

বাবার কাছ থেকে সম্পত্তি বলতে পেয়েছিলাম দু'বাক্স বই আর ম্যাগাজিন। এরপর ছাত্র বন্ধুদের সংস্পর্শে কবিতার প্রতি ভালোবাসাটা গাঢ় হ'লো। আর 46-এ (46 ধর্মতলা স্ট্রিট) এসে সেই ভালোবাসার সঙ্গে জুড়ে গেলো নিষ্ঠা। একদিকে অরুণবাবুর একটা ব্যাপার ছিলো। এখন 46-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অমন দীপ্ত উপস্থিতি। আগে সুকান্ত, পরে আমি—সুভাষের কবিতা পড়েই আমরা কমিউনিস্ট হ'লাম বলা যায়। আমরা দু'জন ছাড়াও, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অরুণাচল বসু, এমনকী নরেশ গুহ-ও তখন আসতেন, এঁরাও সুভাষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শুনতুম, পরে দেখেওছি, লাহিড়ীর খুব প্রিয় ছিলেন সুভাষ। তোমরা তো প'ড়েওছো নিশ্চয়ই, সুভাষের গদ্য লেখা লাহিড়ীর জন্যেই। 46-এ না এলে এটা কেউ বুঝতোই না যে কবিতাটা শুধু হৃদয় দিয়ে লেখা হয়না, তার জন্য. চেতনার অনুশীলনও লাগে। সুভাষের কবিতা, বটুকদা'র গান গেয়ে বেড়াতো পার্টির 'কাল্‌চারাল ফ্রন্ট'-এর কমরেডরা, চিনু দা' (চিন্মোহন সেহানবিশ) 'লিড্' করতেন। মানিকবাবুর সঙ্গেও ওখানেই...[পরিচয়/ঘনিষ্ঠতা]। জানো তো, মানিকবাবুও কবিতা লিখতেন? সুকান্তকে নিয়ে একটা...দেখার চোখ ছিলো তো, সুকান্তকেও বুঝেছিলেন। তোমার সঙ্গে এইসব কথা বলছি, একটু একটু ক'রে...পুরোনো সব কথা, যোশীর (পূরণ চাঁদ যোশী) কথা, সোভিয়েটের জয়ের খবর পৌঁছোলো (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে)...আমরাও ভাবছি, স্বাধীনতা শুধু নয়—ভারতবর্ষও অমন

একটা দেশ হবে...। [*একটু চুপ্ ক'রে থেকে*] আসলে কী জানো, তোমরা ঠিক বুঝবে না—মানে, সেটা তোমাদের দোষ না, আমিও তোমাকে ঠিক ব'লে বোঝাতে পারবোনা, আমরা কিন্তু সত্যিই অমন ভাবতুম। সুভাষের কবিতার লাইনগুলো শ্লোগান নয়, ওগুলোই আমাদের বিশ্বাস, স্বপ্ন, সবকিছু। ভূপেন দত্ত আমার সামনে চৈতন্যের যে কী দিক খুলে দিলেন। আর সেই 46-এর দরজায় (46 ধর্মতলা স্ট্রিট), 'প্রগতি'র অফিসে এসে্ছি, গ্রেফ্তার হলুম, সঙ্গে নিরঞ্জন সেন। নিয়ে গেলো লালবাজার 'লক্-আপ্'।

ত. ভ. : কত সাল?

সি. সে. : 1949। সেখানেই 'লক্-আপ্'-এ চায়ের ভাঁড়ের অবশিষ্ট চা দিয়ে মেঝেতে লিখি 'আমার মা-কে'। ওই সময়েই বোন মারা যায়। বোনের মৃত্যুতে যে কী যন্ত্রণা কী কষ্ট পেয়েছিলু...[*একটু চুপ্ থেকে*] 'মা, তোমার কান্নার মাঝরাতে আমি সান্ত্বনা/মা, তোমার আকণ্ঠ তৃষ্ণায় আমি জল...'। একেকটা অংশ শুরু হয়েছিলো নেরুদার চারটে লাইন দিয়ে। বইতে অনুবাদ ক'রে দিয়েছিলুম। বোধহয় এরকম ছিলো লাইনগুলো, *Throw aside your mourning mantles/Banners of wrath unfurled our tears newly dried/Now the noble day is being born*...কল্পনাতে বোনকে ফিরে পাচ্ছি, সে আমাকে রুমাল দিলো—দু'টি কুঁড়ি একটি পাতা আঁকা...*Now men have no death but to go on fighting wherevers he falls*। 1980-র দশকে বইতে প্রকাশ পেলো সেই দীর্ঘ কবিতা ('আমার মাকে')। যদিও কবিতাটি দীর্ঘসময় ধ'রে লেখা—1949-1950 তে। (1950-এ 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বৈশাখে 'আমার মা-কে প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎকারের আগে কথাপ্রসঙ্গে সি. সে. বলেছিলেন যে, গ্রেফতার হওয়ার পরে লালবাজারে কবিতাটির সূত্রপাত—জামিনে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখলেন একমাত্র বোন মৃত্যুশয্যায়—এবং তার কিছুক্ষণ পরেই বোন মারা যায়।) তবে সত্যি বলতে, এই কবিতাটা যাঁরা পড়েছিলেন সকলেই কেন জানিনা ভালো বলেছিলেন। আসলে কী জানো, তখন তো 'মার্কসিস্ট' (মার্কসবাদী) হয়ে পড়েছি, তবু কবিতাটা একটা মানসিক যন্ত্রণাবোধ থেকে লিখেছি। সমরেশ বসু প'ড়ে বললেন, কবিতাটায় আপনাকে পাওয়া যাচ্ছে—মানিকবাবু আর দেবীপ্রসাদ (দেবী- প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) বললেন, সঙ্গে নেরুদার 'ইনটারপ্রিটেশন্' কবিতাটাকে আবেগ থেকে মাথায় (মস্তিষ্কে) পৌঁছে দিয়েছে। বেশি লোক তো পড়েননি কবিতাটা...অবশ্য আমার কবিতা আর ক'জনই বা পড়েন, তবু অনেক পুরোনো লোক, একদিন যেমন গোলাম কুদ্দুসও বলেছিলেন। সবচাইতে 'অ্যাপ্রিশিএট' করেছিলেন বিষ্ণু দে। পরে সুনীল জানা অনুবাদ করেছিলেন—যোশীর 'ইন্ডিআ টুডে'তে বেরিয়েছিলো। (দেবীপ্রসাদের বাড়িতে প্রগতি লেখক সংঘ'র সভায় পূরণচাঁদ যোশীর উপস্থিতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'আমার মা-কে' ইংরাজিতে অনুবাদের সিদ্ধান্ত হয়। সুনীল জানা এবং সমর সেন অনুবাদ করেন। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত পি. সি. যোশী সম্পাদিত 'ইন্ডিআ টু ডে'-তে ছাপা হয়।) এইখানেই একটা কথা বলি তোমাকে। পার্টির (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি) অনেক নেতাই তো ছিলেন যান্ত্রিক—মানে সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারে। বিশেষত রোমান্টিক কবিতা নিয়ে অনেকেরই অস্বস্তি ছিলো।

কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন লাহিড়ী। এমনকী গোপাল দা (গোপাল হালদার) একবার বললেন, লেখালেখি নিয়ে পার্টির কোনো নেতার সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কিছু বলবেন না 'আদার দ্যান লাহিড়ী' (সোমনাথ লাহিড়ী ছাড়া)। লাহিড়ীকে ভয়ে ভয়ে দু'একবার কবিতা নিয়ে [কথা] বলেছি। তবে লাহিড়ীর তো সবচাইতে প্রিয় সুভাষ, এমনকী সুকান্তর চেয়েও বেশি প্রিয়। লাহিড়ী কিন্তু 'মেকানিক্যাল' লেখালেখির পক্ষে ছিলেন না, আমি যা বুঝেছি। ধরো, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে পার্টির যা 'স্ট্যান্ড' ভবানীবাবুরা—ওই রণদিভে (বি.টি. রণদিভে) লাইনের ঝোঁক থেকেই এসব এস্‌ছিলো—লাহিড়ী কিন্তু সম্পূর্ণ তার বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি যে 'পজিটিভ্' হ'লো পরে, সেজন্য গোপাল দা, চিন্মোহন সেহানবিশ এঁরা যেমন ছিলেন তেমনই লাহিড়ীও খুব [ভালো] 'রোল প্লে' করেছিলেন। প্রমোদবাবুরা (প্রমোদ দাশগুপ্ত) ওই কারণেই লাহিড়ীকে পছন্দ করতেন না। আর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে [ওই] ধারণার জন্যই, ভূপেনবাবু ছাড়া লাহিড়ী আমার, 'অ্যাজ্ পলিটিক্যাল লিডার'এত প্রিয়।

[এই সময়েই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র প্রসঙ্গটি আসবে। ড. দত্তর পার্টিসদস্য না হওয়ার কারণটাও এসময়েই আলোচিত হয়েছিলো।]

ত. ভ. : তুমি পার্টি সদস্য কোন্ সালে?

সি. সে. : 1949। পার্টি তখন নিষিদ্ধ। 'হোল্ টাইমার' 90 টাকা ভাতা পেতুম। ওই সময়টাতে যে কী ভুল করেছিলুম আমরা সব। ভূপেনবাবু যেমন সবসময়ই বলতেন যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে স'রে থাকাটা আমাদের ভালো হয়নি। আর এই '49 (1949)-এ চূড়ান্ত হঠকারী লাইন। আমরা বললে কী হবে, সাধারণ লোক তো মনে করেনি যে, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'। এই কয়েকবছর আগে একজন একটি গানের লাইন বললো, '...সাতচল্লিশ নয় স্বাধীনতা' (কবীর সুমনের একটি গান)—দ্যাখো, এটা আমার মত হ'তে পারে, স্বাধীনতা সম্পর্কে 'ক্রিটিক্যাল' হ'তে পারো, কিন্তু স্বাধীনতার যে ঘটনা সেটাকে অস্বীকার করবে কীভাবে? মা-র কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে 14 আগস্ট 1947 স্বাধীনতার আগের মুহূর্তে হেঁটে হেঁটে কলকাতা দেখেছি আমি...নাখোদা মসজিদে পৌঁছেছি...কী উত্তেজনা...

ত. ভ. : সেটা তো কবিতাতেও আছে...

সি. সে. : হ্যাঁ, 'মসজিদে ইমামের আতরজলের শারি সারা গায়ে মেখে/স্বাধীন-স্বাধীন চিত্তে পথে পথে ঘোরার/সারারাত পথে পথে নিদ্রাহীন ফেরার/সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে নয় আর...'

ত. ভ. : 'ঘুঙুর' কবিতা...

সি. সে. : মনে আছে তোমার?

ওইটাই তো মানুষের মনের কথা। দাঙ্গা-হানাহানি পেরিয়ে এসে একটা অন্য স্বপ্ন অনেকের চোখে। ঐটাকে বোম্বেতে (মুম্বই)' ব'সে একেবারে অস্বীকার করাটা চূড়ান্ত হঠকারী—।

ত. ভ. : পার্টিতে কী কী কাজ করতে হ'তো?

সি. সে. : আমার তো কাজ 'স্বাধীনতা'য়। তবে 'আন্ডার গ্রাউন্ড' অবস্থায় ছোটোখাটো ঘরোয়া মিটিং-এ যেতুম। ব্যাপারটায় (রণদিভে-লাইন) অনেকের মনেই সায় ছিলোনা। কিন্তু পার্টিশৃঙ্খলা! ভবানীবাবুকে একবার মুখ ফস্‌কে কথাটা ব'লেই ফেলেছিলাম। আরও দু'একজনকে বলেছিলুম। যাঁরা [পার্টিতে] একটু ওপরের দিকে। আমি তো সামান্য একজন সদস্য। তারপর...আসলে ওই 'পিরিয়ড'টায় আমার পক্ষে বলার মতো তেমনি কিছু ঘটেনি।

তারপর তো একসময় 'ব্যান্' উঠ্‌লো। আবার নতুন ক'রে লেগে পড়া। পার্টি সিদ্ধান্ত নিলো যে 'ইলেক্‌শন্'-এ (সাধারণ নির্বাচন) অংশ নেবে। পার্টিতে যাঁরা গণ-আন্দোলনের কথা বলতেন, গণমুখী চরিত্রের গুরুত্ব বুঝতেন তাঁদের মধ্যে জ্যোতিবাবু (জ্যোতি বসু) ছিলেন। নির্বাচনী প্রচার চলছে। মা তখন হাসপাতালে। জ্যোতিবাবু বললেন, আপনাকে আজ অফিস ('স্বাধীনতা' দপ্তর) যেতে হবেনা, কাল এসে কপি করবেন। আমি কি স্নেহাংশুকে বলবো (মা-র অসুস্থতার ব্যাপারে)? তা, আমার এক কাকা ডাঃ সনৎ গুপ্ত—টি.বি. হাসপাতালের 'অনারারি সেক্রেটারি'—তিনি ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিলেন। আর বিধানবাবুও দলের ওপর তেমন নির্ভর করতেন না। যাই হোক, তখন কিন্তু এরকম ছিলো। এখন বোধহয় তোমরা ভাবতেই পারবেনা। রাজনীতিটা রাজনীতির মতো ছিলো। এখনকার মতো হয়ে যায়নি।

ইলেক্‌শনের প্রচারে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে গিয়েছি। 'স্বাধীনতা'র সুবাদে ওঁর সঙ্গে ভালোই পরিচয় ছিলো। 'সিনিঅর' লোক, কিন্তু ডাকতেন 'কবি' ব'লে। তমলুক, সেখান তেকে বাঁকুড়া আর পুরুলিয়া গেছি। মেদিনীপুরের একটা বাড়িতে দুপুরে উঠেছি। জ্যোতিবাবুকে মাছ দিতে উনি ব'লে উঠলেন, আগে ওকে (সিদ্ধেশ্বর সেনকে) দিন। ও ফিরে গিয়ে আপনাদের কথা লিখবে, আমি তো বক্তৃতা দিয়ে চ'লে যাবো—আসল কথা কিন্তু ওকেই লিখতে হবে। জ্যোতিবাবু কিন্তু খুব 'কেয়ারিং,' ছিলেন, আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা, মা-র জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে কিনা—এসব জিজ্ঞেস করতেন। আরেকটা 'ইন্টারেস্টিং' ব্যাপার ছিলো, উনি আমাকে রাতে জিজ্ঞেস করতেন, কী দেখলেন বলুন তো অঞ্চলটা—আমার কোনো কিছু বাদ যাচ্ছে কিনা একবার বুঝে নিই। বিশেষত গরিব লোকেরা কীভাবে 'রিঅ্যাক্ট' করছে, তাদের মন্তব্য কী এসব আমার কাছ থেকে 'ডিটেল্'-এ জানতেন। জ্যোতিবাবু খুব 'মেথডিক্যাল পলিটিশিআন'। ওই সময়টা থেকেই কিন্তু জ্যোতিবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক। পার্টি ভাগের পরও যখনই দেখা হয়েছে, [উনি] কথা বলেছেন। লাহিড়ী বা ভূপেশবাবুর (ভূপেশ গুপ্ত) মতো 'ওরেটর' ছিলেন না, কিন্তু বলার একটা ঢঙ ছিলো। সেটা লোকেও নিতো ব'লেই মনে হয়। তুমি তো বঙ্কিমবাবু (বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়), ভূপেশবাবু, লাহিড়ী এঁদের বক্তৃতা শোনোনি...

ত. ভ. : না, লাহিড়ীর [বক্তৃতা] শুনেছি...

সি. সে. : সে তো ওঁর শেষ দিকের, যখন আর কিছু বলতেনেই না। হীরেনবাবুও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন—একটু 'ক্ল্যাসিকাল টাচ্'। কিন্তু 'পেনিট্রেটিং স্পিচ্' ছিলো ওঁদের [সোমনাথ লাহিড়ী, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ভূপেশ গুপ্ত প্রমুখ]। তবুও, জ্যোতিবাবুর বক্তৃতাও

লোকে কিন্তু শুনতো। 'অ্যাজ্ মাস্ লিডার' জ্যোতিবাবুর কিন্তু একটা স্থান আছে। জ্যোতিবাবু পরে মন্ত্রী হয়ে সব কাজ যে ঠিক করেছিলেন, এমন তো নয়। বিশেষত মরিচঝাঁপি... এসব ঘটনা তো ওঁকে [মানায় না]—সেটা একবার রাইটার্স-এ দেখা হ'তে ওঁকে বললুমও—জবাবটা এড়িয়ে গেলেন। তবে চিন সম্পর্কে পার্টি ভাগের আগে ওঁর যা 'রিডিং' তা কিন্তু সি পি এম্-এর (ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি) 'অফিসিয়াল' মতের সঙ্গে নয়, এবং পরেও একবার রুশ দূতাবাসের একটা অনুষ্ঠানে কথা হ'লো—পাল্টায়নি। আমার মনে হয়, জ্যোতিবাবুও পার্টিভাগের পক্ষে ছিলেননা, সেদিক থেকে দেখলে গোপাল আচার্যদের সঙ্গেই থাকার কথা ওঁর—তবে 'পলিটিক্যাল' লাভ-ক্ষতি তো আছেই।

ত. ভ. : আমি নরহরি কবিরাজের একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছি—তাতে এই ব্যাপারটা আছে।

সি. সে. : কই, আমাকে তো একবারও পড়ালে না...ছাপা হয়েছে?

ত. ভ. : 'মননের বন্ধন ও মুক্তি' ব'লে একটা বইতে বেরিয়েছে, তোমাকে পরে দিয়ে যাবো [আমি লজ্জিত যে বইটি বা লেখাটি কবি সিদ্ধেশ্বর সেনকে পড়ানো/দেওয়া হয়নি, দোষটা আমার।]

সি. সে. : পরের দিকের কথা আর জানতে চেওনা। তুমি তো দেখছো, চারদিকে কী সব ঘটছে। জ্যোতিবাবু তো পুরোনো লোক, মনে হয়না এসব নন্দীগ্রাম-জাতীয় ঘটনা উনি ঘটতে দিতেন। তারপর ওঁর প্রধানমন্ত্রী না হওয়া—এই ঐতিহাসিক ভুল তো আর কেউ করেনি, করেছে তো ওঁর নিজের পার্টি (ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি)—ভাগের (পার্টি বিভাজন) পর ওঁর সি পি এম্-এ আসায় ওঁর বা সি পি এম্ দু'পক্ষেরই লাভ হয়েছে, কিন্তু এই একটা চূড়ান্ত জায়গায়...।

ইদানিং তো আর কাগজের বাইরে কিছু দেখা হয় না। যাওয়া হয়না। পার্টির প্রোগ্রাম এও যাওয়া হয়না—রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তাও তেমন বলা হয়না। সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এর-ওর সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছে। অজয় (অজয় গুপ্ত) বা অরণ্য (অরণ্য) সেন) ফোন করলে কথা হয়। মহাশ্বেতাদির সঙ্গে (মহাশ্বেতা দেবী) রাজনীতি নিয়েও কথা হয় নিয়মিত।

ত. ভ. : এখন একটু 'পরিচয়'-এর সাথে তোমার সম্পর্কের কথা শুনি।

সি. সে. : 'পরিচয়'-এ প্রথম গদ্য লিখি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে। বুদ্ধদেব বসু 'পদাতিক' নিয়ে লেখার পর 'অগ্নিকোণ' (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) নিয়ে আমি লিখি। তাতে লিখেছিলুম, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এ যুগের (সে যুগের) প্রধান কবি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পড়ে যুগপৎ খুশি ও লজ্জিত হন। এরপর থেকে 'পরিচয়'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। তখন ধর্মতলা স্ট্রিটে সুলেখা সান্যাল-চিত্ত বিশ্বাসদের ওখান থেকে বেরোতো। গোপাল হালদার আর ননী ভৌমিকের সময় (সম্পাদনাকাল) থেকে 'পরিচয়' হ্যারিসন রোড্-এ (৪৯ মহাত্মা গান্ধি রোড) উঠে আসে। ওই সময় 'মৃত্যুর দিকে' নামে একটা কবিতা (লিখেছিলাম)—সেই সংখ্যাতেই সম্ভবত একটা ব্যাপার ঘটেছিলো। সরোজবাবু (সরোজ

আচার্য) লিখলেন 'সেই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে' আর ওই সংখ্যায় কৃষ্ণ ধর, তখন উঠ্‌তি কবি, লিখলেন—স্তালিনকে নিবেদন করে। ('পরিচয়' ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় এই লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিলো। কৃষ্ণ ধরের লেখা কবিতা 'কালের রাখাল'-এর শিরোনামের তলায় লেখা ছিলো 'পিকাসোর আঁকা স্তালিনের ছবি দেখে'।) সেই কবিতায় লিখেছিলুম, 'পৃথিবী, রক্তবহা নাড়ী/প্রাচীন শোণিত/মাতা বসুধা...'। যেহেতু ওই সংখ্যাটা অনেকের কাছে পৌঁছেছিলো, অনেকেই প'ড়ে জানিয়েছিলেন। পরে রবীনবাবু (রবীন্দ্র মজুমদার), প্রদ্যোৎবাবুদের (প্রদ্যোৎ গুহ) সঙ্গে কাজ করার সময় (সোভিয়েত তথ্য দপ্তর) ওঁরাও এই কবিতাটার কথা বলতেন। আর পূর্ণেন্দু (পূর্ণেন্দু পত্রী) তো আমার খুব বন্ধু ছিলো। আমার কবিতা খুব খুঁটিয়ে পড়তো। ওর-ও ভালো লেগেছিলো। পূর্ণেন্দুর [সম্পর্কে] একটা কথা বলি। ওকে 46-এ আমিই এনেছিলুম। আমার কবিতার বই বেরোবে। পূর্ণেন্দুকে কবিতাগুলো পড়ে শোনালুম। ও-ই প্রচ্ছদ আঁকবে। শেষ অবধি বইয়ের নামকরণ-ও ওর করা, 'ঘন ছন্দ মুক্তির নিবিড়'—প্রচ্ছদও। পূর্ণেন্দু অন্যত্রও লিখেছে, অন্য জায়গায় কাজ করেছে। কিন্তু ওকেও আমি 'পরিচয়'-এর একজন মনে করতুম।

গোপালদা'র 'গাইডেন্স্' পাওয়া, সে একটা বিশাল ব্যাপার। সত্যিই কী যে গুণী ছিলেন। অথচ কোনোরকম অহংকার ছিলোনা। শীতে খালি কষ্ট পেতেন। কাছেই তো থাকতেন (ক্রিস্টোফার রোড্-এ গোপাল হালদারের বাসস্থান এবং বেচুলাল সরকারি আবাসনে সিদ্ধেশ্বর সেন থাকতেন।) —বহুবার গেছি। ওঁদের মতো (গোপাল হালদার ও অরুণা হালদার) মানুষ হয়না। কত সমস্যায় সাহায্য পেয়েছি। পরে রুশ দূতাবাসে (সোভিয়েত তথ্য দপ্তর) কাজ করার সময় নানা প্রশ্ন মনে এলে, সোজা গোপাল দা। এছাড়া ননী ভৌমিক কিংবা হাবুলদা'র (হিরণকুমার সান্যাল) সঙ্গে কাজ করাও একটা অভিজ্ঞতা। আর পরে দীপেন (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) 'পরিচয়' অন্তপ্রাণ।

[এর পর ওঁর অফিস/কার্যক্ষেত্র সম্পর্কে কিছু কথা আছে। সেগুলো একান্ত ব্যক্তিগত।]

ত. ভ. : 'দেশ'-এ লেখা? 'আনন্দবাজার'-এ ধর্মঘটের সময় সমর্থন করার পর অনেকদিন তো তোমায় কবিতা বেরোয়নি ওখানে?

সি. সে. : দ্যাখো, ওই 'স্ট্রাইক্'-এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য একটু আলাদাই ছিলো। যাঁরা সই সংগ্রহ করেছিলেন...চিনু দা তো পরে বললেনই সে কথা। আর কাগজের অফিসে ইউনিয়ন করার কথা যদি বলো, [দু'একটি ব্যক্তিগত কথা] প্রভাসদা'রা যা করেছিলেন (প্রভাস ভট্টাচার্য, 'আনন্দবাজার' ও 'যুগান্তর'-এ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক)—চাকরিই চ'লে গেছিলো, পরে কোনো প্রলোভনে মাথা নিচু করেননি—কী 'ক্রাইসিস্' ওঁর তখন কোনো কাজ নেই—তবু কমিউনিস্ট পার্টি করবেন ব'লে সুরেশবাবুর (সুরেশ মজুমদার) 'অফার' রিফিউজ্' (প্রত্যাখ্যান) করলেন। এসব তো আমি জানি। পরে ওঁর সঙ্গে একসাথে কাজ করতে করতে (সোভিয়েত তথ্য দপ্তরে) শুনেছি। পরে 'আনন্দবাজার'-এর ধর্মঘটটা(র) ঠিক সেই 'ক্যারেক্টার' ছিলো না শুনেছিলুম। পরে আবার যখন [কবিতা] চাইতে সুরু করলো ['দেশ'] তখন দিয়েছি। আগে সুভাষদা'ও ফোনে বলেছিলেন। তবে তার মানে এই নয়

যে ওই শিবিরের (আনন্দবাজার গোষ্ঠী, 'দেশ' ইত্যাদি) অবস্থানটা আমি বুঝিনা। ওরা কমিউনিস্টদের পক্ষে নয়। শিল্প-সাহিত্য বিষয়েও ওদের মত-নীতি আমাদের সম্পূর্ণ আলাদা। তবে পাঠক আছে, এটা সন্দেহাতীত।

দেবেশ (দেবেশ রায়), অমিতাভ (অমিতাভ দাশগুপ্ত)-র সময়েও ('পরিচয়' সম্পাদনাকালে) আমার লেখা কখনও বাদ দেয়নি ওরা [এটা 'পরিচয়' বিষয়ে]। আমি তো 'পরিচয়'-এরই একজন। সেটা ওঁরা-ও মনে করেন। আর 'পরিচয়' যদি তুমি কালানুক্রমে পড়ো, দেখবে যে বাঙালি মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী চিন্তাচর্চাকারীদের ধারণা-চেতনা-অনুশীলনের যেসব পরিবর্তন, বাঁক—তার 'রিফ্লেকশন্' ('পরিচয়'-এ পাবে। গোপালদা'র মাপের বুদ্ধিজীবীর লেখাও তো 'পরিচয়'-তেই বেরিয়েছে, শেষদিন অবধি। এটা কিন্তু আমারও মনে হয় যে ভালো লেখা কিছু লিখলে, সেটা 'পরিচয়' যদি চায়, তাহ'লে 'পরিচয়'তেই [দেবো]। 'কবিতা সীমান্ত'-র ওরাও তো আমার অত্যন্ত কাছের জন। (গোবিন্দ ভট্টাচার্য) দীপেন (দীপেন রায়) এরাও...।

ত. ভ. : লেখার আদর্শ, মানে লেখালেখি করার পিছনে যে তাগিদ সেখানে মার্কসবাদী চেতনার ভূমিকা কতখানি?

সি, সে. : যান্ত্রিক মার্কসবাদে আমার আপত্তি আছে। ওই যান্ত্রিকতার একটা প্রকাশ দেখেছিলাম আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে। 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক'-তে (ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত) তার আঁচ পাওয়া যায়। দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা উপলব্ধি করা একটা 'প্রাইমারি' (প্রাথমিক) ব্যাপার। মাঝে 'সোশালিস্ট নিওরিএলিজম্' (সমাজতন্ত্রী নয়াবাস্তববাদ) নিয়ে বড্ড [?] হয়েছিলো। সোভিয়েত মডেলের অন্ধ অনুকরণ করাটা মোটেই ঠিক হয়নি। তবে এটা সে সময় বোঝার বয়স ছিলো না। তবে সোভিয়েত-এর সমালোচনার নামে 'প্রগতি'র [সম্ভবত 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন' বোঝাতে চেয়েছেন] বিরোধিতা করবো, সি. আই. এ. (মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ)-র গা-ঘেঁষাঘেঁষি করবো—এটা মেনে নেওয়া যায়না। আর এটা করলেন কারা? যাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী। আমি যখন ইলিয়া এরেনবুর্গের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলুম 'স্বাধীনতায়, উনিও এই বিপদের কথা বলেছিলেন। আবার উল্টোদিকে দেখো, সমরেশের (সমরেশ বসু) সঙ্গে আমরাই বা কী করেছি? যদিও পরেও সমরেশ 'পরিচয়'তে লিখেছে। এমনকী সুভাষদা—সুভাষদা সম্পর্কে কিছু নেতার মন্তব্য শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। 'ভূতের বেগার' বইটা লেখার পর পার্টি যা করেছিলো—ওই সব 'সো কল্‌ড্ লেফ্‌টিজম্'। পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কোনো বই পার্টি আর ছাপিয়েছিলো কি? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বই বেরোলে সেটা তো পার্টির 'অ্যাসেট্' হ'তো। ফলে এমনটা বারবার ঘটেছে, আমাদের 'ফোল্ড্'-এর লোক অথচ ব্যবহার করেছে যারা 'আইডিওলজিক্যালি' সম্পূর্ণ 'অপোসিট্ ক্যাম্প'-এর বরং আমার মনে হ'তো, গোপাল দা'দের সঙ্গে কথা ব'লেও মনে হ'তো যে 'পরিচয়' পার্টির কাছে থেকেও তার সঙ্কীর্ণতামুক্ত অবস্থান [আছে]। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও আমার বারবার একই কথা মনে হয়েছে। আসলে যত দিন যাচ্ছে, আমার অবলম্বন হয়ে উঠছেন রবীন্দ্রনাথ। এটা কিন্তু কোনো ভাবালুতা থেকে [আমি] বলছি না। আমাদের (কমিউনিস্টদের) রবীন্দ্রনাথকে ভালো ক'রে বোঝা

দরকার। একজন সাহিত্যকর্মী হিশেবে এটা আমার মনে হয়। পণ্ডিতরা কী বলেন, তা জানিনা।

ত. ভ. : নিজের লেখা সম্বন্ধে কিছু বলবে?

সি. সে. : তোমার 'টেপ্'-টা (টেপ্ রেকর্ডার) বন্ধ করো। [একটু থেমে] অনেক কিছুই তো এতক্ষণ বললুম। আর কিছু বলবো না। [এরপর কিছু ব্যক্তিগত কথা। কীভাবে ওঁর পরিচিত কেউ কেউ ফোন্ ক'রে জানাতেন যে, সেইবার উনি কোনো পুরস্কার পাচ্ছেন—কিন্তু দেখা যেতো যে প্রাপকের তালিকায় ওঁর নাম নেই। এই ব্যাপারে যুক্ত একজনকে অজয় গুপ্ত প্রশ্ন করলে সেই ব্যক্তিটি জানান যে সিদ্ধেশ্বর সেনের প্রকাশিত বই তেমন নেই।]

ত. ভ. : অনুবাদ কবিতা সম্পর্কে?

সি. সে. : মায়াকভ্স্কি অনুবাদ করেছি, সেটা অনেকেই জানে। এছাড়া অফিসে (সোভিয়েত তথ্য দপ্তর) কাজ করার সময় 'সোভিয়েত দেশ' (অধুনালুপ্ত) পত্রিকায় গদ্য-কবিতা অন্য 'আর্টিকল্'ও অনুবাদ করতে হয়েছে। অনুবাদের ব্যাপারে আমি চেষ্টা করতুম, বিশেষত মায়াকভস্কি-র কবিতার ক্ষেত্রে, যাতে বিষয়ের সঙ্গে 'ফর্ম'টাও বজায় রাখা যায়। 'লেনিন' অনুবাদ ক'রে খুব আনন্দ হয়েছিলো। অমন একজন কবি, তাঁর পরিণতিটাও...। ভূপেনবাবুর কাছেও শুনেছিলুম... [এই বিষয়টি সাক্ষাৎকারে পরিষ্কার করা হয়নি]। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মুকুল গুহর সঙ্গে মিলেও অনুবাদ করেছিলুম। আর পিট সিগারের 'উই শ্যাল্ ওভারকাম্'-টাও আমি অনুবাদ করেছিলুম। এটা হেমাঙ্গ দা (হেমাঙ্গ বিশ্বাস) বলেননি। আমাকেও বিষয়টা মনে করিয়ে দিলো সন্দীপ দত্ত পুরোনো কপি ('পরিচয়'-এর) থেকে ফটোকপি ক'রে দিয়েছিলো। 1963 ডিসেম্বর সংখ্যা 'পরিচয়'-এ পিট সিগারের গলায় নিগ্রো সমাধিকারীর গান' শিরোনামে অনুবাদটি প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে 3.3.97 'আজকাল'-এ প্রকাশিত প্রসঙ্গ অনুবাদ : 'আমরা করব জয়' দ্রষ্টব্য।

[এরপর সম্পূর্ণত ব্যক্তিগত কিছু আলাপচারিতা/পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা। সাক্ষাৎকারটি এভাবেই শেষ হয়ে যায়। পরে হাসপাতালে যে দু'একটি কথা আলোচিত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।]

সি. সে. : আরক্ত পৃথিবীক্ষণ, হে পৃথিবী, জয়ধ্বনি করো/রক্তাক্ত পৃথিবীক্ষণ, হে পৃথিবী, জয়ধ্বনি করো।/অনেক তপস্যাক্ষীণ দীর্ঘরাত কাঁপে থরোথরো/প্রত্যাসন্ন যে আশায় আলোকের অবাধ উচ্ছ্বাসে হবে তা-ও হবে পূর্ণ/রক্তাক্ত প্রসূতিক্ষণ, হে পৃথিবী, জয়ধ্বনি করো।/অগ্রগামী সূর্যের আশ্বাসে রক্তিম দিগন্তে লীন/এ মাটির বুকে রক্তের দাগ ভুলোনা/এ মাটির লালে লাল হয়ে যাক সারা দেশ/ মিছে মনে বিভেদের বিষ তুলোনা/এ মাটির লালে লাল হয়ে যাক সারা দেশ/লাখো মানুষের ঐক্যের জোরে হানো শেষ/আঘাতের পর আঘাতের ধারা অনিবার...

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সম্পাদনা—তমোনাশ ভট্টাচার্য

একগুঁয়ে ছেলেটা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ওরে ও বালক, ওরে একগুঁয়ে ছেলেটা,
এই সময়ে দৌড়ে কোথা যাস?
কোনখানে পড়েছে ডাক এই ভরদুপুরে?
কে তোকে ডেকেছে বল দেখি।

ঘুমোচ্ছে নদীর জল, ঘুমোচ্ছে গাছের পাতা, মাঠে
কাউকেই দেখছি না, রাস্তাঘাটে
একগলা রোদ্দুর। ওরে বাছা,
ভেজিয়ে খিড়কির দরজা এই সময়ে কোথায় চললি রে?

প্রশ্ন করি, কিন্তু কোনো উত্তর মেলে না।
মিলবে বা কী করে? কে না জানে,
ওর কানে একটাও পিছুডাক
আজ আর কিছুতে পৌঁছবে না।

একগুঁয়ে ছেলেটা ঠাঠা রৌদ্রের প্রভায়
মিশে যাচ্ছে, তাকাচ্ছে না ফিরে।
এইরকমই হয়ে থাকে, এইরকমই হয়,
যে যায়, সে এমনি করে যায়।

ভুসুকু জানে না

কৃষ্ণ ধর

চোখ ঝলসানো পোশাকে চলছে ফ্যাশন প্যারেড
মানুষ দেখছে তাকে চাক্ষুষ বা বৈদ্যুতিনে
শরীরী ভাষার টানে ভাঙচুর হয় আলোছায়া।
একই নিয়মে শুনি মুখের ভাষাও
পোশাক বদল করে হাঁটতে যাচ্ছে র‍্যাম্পে।
সেল ফোনে অবিরাম পথ চলতে চলতে
কখনো বা এস এম এসে ঠারেঠুরে
টক্সা-ঠুংরির চালে, হরবোলা এক এসে
নিত্যনতুন ভাষার পোশাক শুধু ইশারায়
ফুরাতে চায় সব লেনদেন
ভাষার পাঁজর ভাঙে, হৃদকমল থেকে পাপড়ি
খসে পড়ে, ধুলোতে গড়াগড়ি যায়।

ভুসুকুর গায়ে লাগে, মনে লাগে
হাজার বছর ধরে তাঁরও তো হাঁটা পথে
সঙ্গী ছিল ভাষা মুখের কথনে
হাতের অক্ষরমালায় পুঁথিতে পুঁথিতে
প্রবাদে ও প্রবচনে লোককথার আসরে
সত্তার গভীরে মিশে আছে।

ফ্যাশন প্যারেডে ভুবন বাজারে কেনা
পোশাক বদল করে কোন হাটে
নিজেকে বিকোতে চায় ভাষা?

ভুসুক জানে না।

জল শুধু জল

তরুণ সান্যাল

এই তো অবগাহনের জলে নতুন পোশাক পরলাম,
ইদং তোয়ং কয়েক ছিটা, তা হোক তা পানীয় বটে তো
স্নাত্বা পীত্বা সুখী হওয়া তো? তা নয় হওয়া গেল
নদী কিন্তু স্নানে এক ধাপ পোশাক রেখে দিয়েছে পরো

কত রকম যে নদী রেখেছো নারায়ণ, সেও জলস্রোতে কল্লোলিনী
তা হলে তো পুরুষের লজ্জাবস্ত্র হয়ে অর্ধাঙ্গিনী কোনো নারী
অনন্ত শয়নে আছো, জলই জলদাভাস ধূম জ্যোতি সলিলে কৃষ্ণাভ
ঘুড়িটি উড়াল বটে মেঘপুঞ্জে বুঝি হারায় তবু বন্দি লাটাইয়ে
এই-যে আহা মুক্তিস্নান অগ্নিস্নান সারা হয়েছে বলে
অমৃত সাগরে নাকি নদীতে ভাসন্ত যে পুরুষ
তার দু-পা লিঙ্গ শিশ্ন মূলাধার মণিপুর ধুয়েছ
চমৎকার ভাঁজ ধুতিটি হীরা এসে ছলকায় সে ঢেউয়ে
ওখানে তো চাঁদ সূর্য উর্বশীর উদ্ভিন্ন চুচুক
কোমরের কষি জলস্তরে হয়েছে মহিমা ছলাৎ
ভালোবেসে জল পোশাক পরে নিও ওটাই তো দস্তুর
সেই যে ক' কোটি বার পৃথিবী ও সূর্যকে ঘুরেছে
তুমি তখন ছিলে জলদ মেঘ ছিলে জলশয়ান সে কবে
প্রলয় পয়োধি যখন ভাসাচ্ছিল বেদ তুমি জলপোশাকে ছিলে
তুমি অগ্নি জল সইতে সীতা সইতে সরযূ পরে ছিলে
ওরা বলতেন অন্তর্জলি আত্মাকে পরাতো নাকি জলই
আপোহিষ্টা ময়োভূবস্তা নউর্জ্জে দধাতন কি এক মন্ত্র বলে
ভাবতে থাকো ও-ও-তো কবিতা ওই বেদমাতা শিখিয়েছে নিজে।
সেই যখন আলো ছিল না অন্ধকারও নেই বায়ু নেই ছিলেন কে তিনি
সেই অনস্তিত্বে এক মারাংবুরু জল থেকে মাটি তুলে গড়লেন হড়ম
বললেন পোশাক পরো পরলাম সে গাছের বাকল জল জল
জল সরাচ্ছে জল ঝরাচ্ছে আয় তা হলে জলে ফিরে যাই
অন্তত তা জল সইয়ে সৃষ্টি বীজে দু-ফোঁটা বাখর।

কথা ছিল

বিতোষ আচার্য

"ময়ূরপঙ্খী ভাঙা জোড়া দেয় মাঝি সারা দিনরাত/হাতুড়ি ও বাটালির শব্দে মুখর এ নদীপ্রান্তর"।
—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

কথা ছিল, "ঝড়ে ভাঙা ঘর কত বলিষ্ঠ বাহু ওঠাবে"
উঠিয়েও ছিল, তাদের নির্জীব বংশধরেরা ফণা গুটিয়ে
কে যে কোথায় দিন গুজরান করছে।
দশক চল্লিশে বলেছিলে, "মাথা পিছু নেব এক এক শিয়াল"
কোথায় কি...কেউ কথা রাখেনি বটুকদা
যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা আর স্বাধীনতা—বয়েস তো কম হল না
আর কতকাল নাবালক অপবাদের ঝুড়ি-মাথায়
চৈতন্যের ফেরি করে বেড়ানো!
কন্ত মনে পড়ছে : নবজীবনের গানের কলিগুলো
'মধুবংশীর গলি'র সেইসব অ-সাধারণ মানুষজনের
স্বরের উল্লাস, যা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো দিগন্ত থেকে দিগন্তে

এখন অট্টালিকার মাথায় পত্‌পত্‌ উড়ছে লালপতাকা
অথচ, "রক্তপতাকা দেখলেই হৃদ্‌পিণ্ডে হাতুড়ির ঘা পড়তো
অজান্তে উষ্ণ প্রস্রবণের ঢেউ উছলে উজলে তীব্র বেগে
সব একাকার করে বন্যা বইতো..." লিখেছিলুম দশক সত্তরে,
"এখন বহুধাবিস্তৃত স্মৃতির অনুষঙ্গে ভারাক্রান্ত নদী
লাল-হলুদ-সবুজের আবিল ধারায় মন্থরিত চালে
কোথায় বে যায়"

আর, আজ এই কালবেলায়, কী অদ্ভুত, মনে হচ্ছে
কথা রাখেনি কেউ, তিনটে দশক মসৃণ পায়ে চলার পথ ধরে
এ আমরা কোথায় পৌঁছলাম : ইতস্তত বিক্ষিপ্ত
ট্রাক্টরের ভাঙা দাঁতা, মাটি কামড়ে বুলডোজারের মরচেপড়া শেয়াল
আর মোবাইল টাওয়ারের পাঁজর থেকে বেরিয়ে থাকা
পাখির ফসিল।

ক্লিক

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

এক এক জন বাতিল মানুষের
ফটো তুলতে ক্যামেরায় ক্লিক...
সভাস্থলে বাতিল মানুষের
সংখ্যাও কম নয়;

মাথাটা অত উঁচু নয়
উঁহু অত বাঁদিক কেন
মুখোশটা খুলে রাখুন
মুখের বিকল্প তো মুখই;

কান্নার কথাগুলো সিন্দুকে
রেখে দিন, কাঁদলেই ছবি ভেসে যাবে
বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার;

বুক ফাটিয়ে হাসার সময় নয়
হাসুন। একটু ব্যালান্স করে
স্মাইল প্লিজ। স্মাইল প্লিজ।
সোজা থাকুন সোজা থাকুন;

ক্যামেরা হো হো হেসে উঠল।

মৃত্যুকে হারিয়ে দিতে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের জগৎ যদি গড়ে তুলি, তবে তাই হবে
মৃত্যুর সবল প্রতিরোধ;
যতদিন বেঁচে থাকবো সে আমাকে আগলে রেখে দেবে
মানুষের সৃষ্টি এই সভ্যতার প্রতি ভালোবাসা
শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। আমি
মৃত্যু নিয়ে এলোমেলো পাখির ডানাই ছেঁটে দেবো।
দেখবো, দেখে যাবো এই মানুষের সৃষ্টি, কারুকাজ।

অযত্না মাটির বুকে সাজাহান স্বপ্ন দিয়ে গড়েছেন তাজ;
মাথা উঁচু করে তাও বেঁচে আছে পরম বিস্ময়ে,
বেঁচে থাকবে, কীর্তি ও স্বপ্নের যুগপৎ
মিলন, সহস্র যুগ ধরে।

অবিরল সৃষ্টি আর ধ্বংসের আশ্চর্য লীলা চলে অভ্যন্তরে,
বাইরে, চলেছে; আমাদের
সব অসাফল্য যুক্ত হয়ে, একদিন
ছুঁয়ে যাবে সাফল্যের চূড়ো, পৃথিবীর
ইতিহাস তাই।

অশোকের শিলালিপি, আজকের আকাশচুম্বী মল
কিছু, কোনোখানে থেমে নেই;
জীবন সুসহ আর সুন্দর করেছে প্রতিদিন
স্বপ্ন সন্ধানী বিজ্ঞানের
অভাবিত সৃষ্টি, স্থিতি; তার
লয় নেই, স্বাভাবিক গতি আছে অজানার দিকে।

মৃত্যুকে হারিয়ে দিতে মানুষের চিরন্তন সংগ্রাম,
চিনিয়ে দেয় আমার 'আমিকে'।

কবি থামলে

রাণা চট্টোপাধ্যায়

কবি যেখানে থামেন, কবিতা শুরু হয় সেখান থেকে।
কবি নিজেও বুঝতে পারেন না কে তাকে থামিয়ে দিয়েছে
কে তার মস্তিষ্কের ভেতর অবশ ইনজেকশন দিলো।

এই দিনকাল, হেঁড়াখোঁড়া মানুষ, নতুন মুখের মিছিলে
সামিল হ'য়েছে যখন
কবি টের পান দিনের প্রথম ভুরু স্পন্দনের পর
একটু পরই লবণাক্ত কথাগুলি বিবর্ণিপড়ে হয়ে উঠবে
মধু মাখানো স্নিগ্ধ সময় চলে যাবে
বাতাস বইবে নিচু ভূমি পার করে ছায়াচ্ছন্ন
প্রান্তরের দিকে
নিজেকে খুঁড়ে দেখবেন কবি
পড়ে নেবেন বিবর্ণ শোকগাথাগুলি।

গত বছরের সঙ্গে এ বছরের পার্থক্য
এ বছরের সঙ্গে পরের বছরের সম্পর্কগুলি
ছোট ছোট শিশুর খেলার মতো থাকবে,
রক্ত পরীক্ষার পর বোঝা যাবে কোলস্ট্রলের মাত্রা।
কবি যখন থামবেন কবিতার অক্ষরগুলি
খেলা শুরু করে।

কবি জীবনের ভালবাসা ও ঘৃণাগুলি
তুচ্ছ রাজনীতির বাইরে রেখে হেঁটে যান একাকী
বাদাম গাছের নিচ দিয়ে নবীন কিশলয়দের নিয়ে
অফুরান বসন্তের দেশে।

কবিকে থামতে হয়, দু'দশ বছর পরও
কবিতার সাহায্যকারী হাত
মানুষের দিকে বাড়ানো থাকে।
কবি থামলে কবিতার কাজ শুরু হয়।

লক্ষ্যভ্রষ্ট একা নই আমি

সত্য গুহ

রদ্দুর রদ্দুর
খাঁ খাঁ করা রদ্দুর উথাল পাথাল ক'রে থ্রিম
কী খেলায় মেতেছে যে? সঙ্গে সমান বয়সী উদ্দাম শিশুর
দল, দেখে ভালো লাগছে, কিন্তু রক্ত হচ্ছে হিম
মাথার ভেতরে এনে পরিবেশ বিশারদ জ্ঞানীদের ভাবা
মৃত্তিকার কাছে নাকি ব্যর্থ করা জলের প্রত্যাশা

সময় করবে নাকি জল লাগি অরণ্যেরোদন
অরণ্য কোথায়, সে তো মানুষের প্রতি অভিমানে
বীতশ্রদ্ধায়—ভয়ে সমুদ্দুরে ঝাঁপ দিয়েছে, মৈনাক তেমন
আবার সমুদ্র নাকি পরিকল্পনায় রাখছে (মগ্ন থেকে নোঅার সন্ধানে)
গিলে খাবে সভ্যতার সমস্ত শিখর
ভাবছি আর মনে বাড়ছে দুরারোগ্য জ্বর

জ্বরে লোকে ভুলভাল বকে
দুঃখ ও স্মৃতির ভারে মন-মেধা অবসন্ন, ঘুরে ঘুরে আসে
বিপদের চতুর্দিক, পুড়ে যাই বিশ্বে লাগা আগুনের ধ্বকে
যে আগুনে বরফ যে বরফ সেও পুড়ে ধুয়ে খাক, সর্বনাশে
অর্ধেক পণ্ডিতে ছাড়ে, পণ্ডিত-মূর্খ কী ছাড়ে
শতাব্দীর জ্ঞান অপকর্মে খাটিয়ে শুদ্ধ অঙ্কুরের শ্বাসবায়ু কাড়ে

তরাশে আতঙ্কে কাছে ডেকে এনে শিশু পৌত্রে রাখি হাতখান
নরম ঘর্মাক্ত চুলে ঢেলে দুর্বাধান আর বিড়বিড় করি :
লক্ষ্যভ্রষ্ট একা নই আমি, লোভ অতি বলবান
নিত্য জিহ্বার শুধু অসারকি, শূন্যতা মুঠোয় শুধু ভরি......
শিশু ছটফট করে নিরঙ্কুশ মুক্তি চেয়ে হাতে আমচারা
এঁটো [illegible]ঠি ফেড়ে আসা জৈষ্ঠ্যে তাচ্ছিল্যে দেখে বাস্তব সাহারা।

ভয় শুধু ভালোবাসা নিয়ে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

আমার দুঃখের সঙ্গে কারো কোনো সদ্ভাব থাকবে না, জীবন কি এতটাই নিরালম্ব। একটা অস্তিত্বের কাছে আর এক অস্তিত্ব যায় জলভরা মেঘ সঙ্গে নিয়ে। হাতের উপরে হাত, হৃদয়ে ডুবানো হৃদয়—সেই মুহূর্তগুলির কোনো জলদর্চি কোথাও নথিবদ্ধ থাকে না। আগুনঝরানো আকাশ অস্বীকার করবে, সে জলের জন্য প্রতিশ্রুত ছিল।

একে একে যখন সাজিয়ে রাখছি শেষযাত্রার খই হরিধ্বনি, ঈশানকোণ ছুঁয়ে এক টুকরো মেঘ উঠছে। লুঠেরার তর সইছে না কখন আলো নিভবে। ওরা যা অর্জন করেনি, তার জন্য লোভে।

আমি তো সর্বস্ব ছড়িয়ে রেখে চলে যাব, শুধু ভয়; টেবিলের কাগজ কলম, একটি অবাক ছবি, সজ্জন প্রতিবেশী, বারান্দার নীচে পুষ্পিত চাঁপা গাছ—তারা বলবে এমন সজ্জিত বাগানে এতো বহুকীট কোথায় লুকিয়ে ছিল।

আমারও দেশ

দীপেন রায়

এই দেশ তো আমারও দেশ
ভেবে ভেবে সারা রাতের শিথিল,
পাথর-আড়ষ্টতা
মোমের মতন ক্লান্ত হয়ে গড়িয়ে পড়ে—এই দেশ
তো আমারও দেশ, ভাবতে ভাবতে
গঙ্গা নদী নেমে এসেছে ঢালের দিকে—বিষণ্ণতা,
তোমার কিছু করার তো নেই—ভাগটুকু,
বালিয়ে নিয়ে ডুবে যাবো তোমার সঙ্গে
জলের অতল গভীর দিকে।
হয়তো তোমার ক্ষতি হবে—এই দেশ তো
আমারও দেশ
চেনা মানুষ অনেক আছে, অচেনাটা অদেখা তো—
নাম ডাকলে বেরিয়ে আসে গুহার মুখ আলো করে,
পাথরগুলো গড়িয়ে দিয়ে
জলের কানায় দাঁড়িয়ে ডাকে,
মানুষ বড় আপনজনের কাছাকাছি
ভালবাসে বসে থাকতে
এটা জানলে তোমার কিছু ক্ষতি হবে—
এই দেশ তো তাহারও দেশ,
ভাবতে ভাবতে জড়িয়ে যাবো দশ হাত পুরো শাড়ির মতন।
আমার লাভ—তোমার ক্ষতির জরিপ মাপ।
পশ্চিমে মেঘ-পাহাড় তুলে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিক হিংস্র চোখ—
নাস্তির গড়ন সমগ্র নয়,
ঊনিশ-বিশ বয়স তো নয় পাথর খেয়ে জমিয়ে দেব।
দেশটা আমার জানতে জানতে এগিয়ে আসছে
দু-কোটি চোখ—
তোমার ক্ষতি—
বয়ঃসন্ধির মানুষ খুবই উদার এবং বর্ণময়।

নতুন প্রজন্ম

জিয়াদ আলী

আমার দক্ষিণবাহু অস্ত্রহীন
বামও ঢালহীন
ভিতরে বাহিরে তাই ভয়ানক দীন।

চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে মাঠ ফালাফালা
রোয়া ধান জ্বলে যায়
উড়ে যায় লাউমাচা
খড়ের দোচালা।

চতুর্দিকে ভীষণ বিভ্রম
মসজিদে আযান আর মন্দিরে মন্দিরে জ্বালে হোম।
অশ্বমেধ বাড়ায় লোভ
ভোগের বাসনা দীর্ঘ হয়.
ভিতরে ভিতরে জমে ভয়ানক ক্ষোভ।

অসম্ভব নীল রৌদ্রে কারা তবু দুন্দুভি বাজায়
আলোর পাখিরা ফিরে আসে
নতুন প্রজন্ম দেবে প্রেমময় পাতার বাসায়।

বিপন্ন সময়ে

(উৎসর্গ : বাসব সরকার)

অনন্ত দাশ

আজকের এই আলোড়িত রুদ্ধশ্বাস ছবি
চিরন্তন নয়
প্রতিদিন পাল্টে যায়
অনুরাগ, অভিমান, ক্রোধ
বেদনাকুসুম
সময়ের এই অবয়ব
নিরবয়বের কারসাজি
মাঝখানে পড়ে থাকে
আবহমণ্ডলের ঝড়
পরোপকারিতার নামে
মানুষের অশুদ্ধ ক্ষমতা

এই নিঃসীম তমসা
হিংসার বিস্তার
দিশাহীন হাহাকার
মৃত্যুর আবহ
আর কতকাল আমাদের ভয় দেখিয়ে যাবে

এই বিপন্ন সময়ে
আলো যেন বহুবর্ণ স্তরের বিন্যাসে প্রভাহীন

মানুষের অনুপম সত্তা
খুঁজে কি পাব না কোনও দিন

জীবন খুঁজতে গিয়ে
মৃত্যুর প্রতীকে দেখি
আজকের মানুষের আত্মপরিচয়

বিধ্বংসী বাতাস এলে

রমেন আচার্য

গন্তব্য ঠিক করে বের হলেও, পথে নেমে
ঠোক্কর খেতে খেতে বদলে যায় পথ,
ভোঁ কাট্টা ঘুড়ির সুতোয় জড়িয়ে যায় লক্ষ্যপথ।

মত্ত ষাঁড়ের সামনে নিরস্ত্র মানুষের অসম যুদ্ধে
অকারণ রক্তপাতে তৃপ্তি পেতে দেখেছি মানুষকে।
সেইসব মানুষের জিঘাংসু রক্তপ্রবাহই কি
আমাদের শরীরেও বহমান?

সতর্ক থাকি তাই। অন্যমনস্ক পদক্ষেপে যেন গলে না যায়
গর্ভবতী কেন্নো। ভাবি সাদামাটা কথায় যেন
সিঁধ কেটে ঢুকে না পড়ে ছদ্মবেশী ষড়যন্ত্র। যেন
শীতল কথার প্রলেপে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে
অকারণে বজ্র না টেনে আনি।

জীবনযাত্রায় এই সতর্কতা দিয়ে আমি গেঁথে তুলেছি
আমার স্বপ্ন। ভাবি—
বিধ্বংসী বাতাস এলেও যেন তার উস্কখুস্ক চুলে
এই ভালবাসার আবিরই আমি মাখিয়ে দিতে পারি।

একটি সনেট

বেণু দত্তরায়

আছি, বেশ আছি। অর্ধেক বাংলায় জেগে আছি,
ভাঙা-মসনদে। প্রতিদিন শোকাহত দেশে
মৃত্যু হানা দ্যায়। মৃত্যুই একান্ত কাছাকাছি
আমাদের, ভাঙে ঘর সে যে নিমেষে-নিমেষে।

যেন এক শ্মশান-স্বদেশে যে দিকেই চাই
শাঁখাভাঙা নারী বসে থাকে, চাপা-ক্রন্দনের
হাহাকার। চারদিকে কী নিঃশব্দে ওড়ে ছাই।
রক্তে হোলি-খেলা, শিরা ছেঁড়ে সব বন্ধনের।

আমাদের প্রত্যেক নদীতে যেন বিসর্জন,
রোজ রাত্রে বন্যা-জলে ভাসে সন্তানের লাশ,
ঘোলাস্রোতে তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ মৃত্যুর গর্জন,
আছি, বেশ আছি! সর্বনাশ, শুধু সর্বনাশ।

আছি বিধ্বস্ত স্বদেশে, তবু নেই লুকোছাপা—
ধ্বংসস্তূপে জাগো, বাংলা, হয়ে ভুঁইচাঁপা।

বিষ্ণু দে

গণেশ বসু

তিনি কি রূপক? চলমান মিথ, বাতাস আগুন জল।
আবেগে মননে লোকশিল্পের গতি।
আবিশ্ব তিনি প্রতিভা-প্রতীক মানবীয় মনীষায়,
আমরাও তাঁর চেতনার সন্ততি।

ঘোষের মাথায় রিখিয়ার মেঘ পাহাড়ের চূড়ো ছোঁয়
একইভাবে লোকজীবনের রচনায়
অবিরাম খুঁজে পেয়েছেন তিনি নিজেকেই নিশ্চিত
আত্মখননে, মার্কসীয় বীক্ষায়।

অসহ্য অলসতায় কিংবা চালিয়াতি মজ্জায়
অনেকে এখন সুন্দর চোরাবালি
নির্বিকল্প নির্মননের এই পরিণতি দেখে
অমাবস্যাও মারে নির্মম তালি।

চেতনা বিদায়। মগজে নেমেছে অপঠিত বটঝুরি
আমরা কি তাঁর ঠিক উত্তরসূরি?

পুবের দিকে

পার্থ রাহা

বহুদিন হয়ে গেল এখনো নিজেকে আমার
চিনে নেওয়া হলো না
পশ্চিম কোণে কোন ঝড়ের দেখা নেই
তবু আমার হাত পুবের দিকে দূর দেশান্তরে
তিরিশ বছর ধরে সাপ আর সিঁড়ির খেলায়
ওঠানামা নেমে ওঠা, নামাওঠা
এখনো পশ্চিমের সূর্যের আলোয়
আমি যখন নরম সবুজ ঘাসে আমার শরীর
মাথার উপরের পেঁজা তুলোর আকাশ ছোঁয়
চারিদিকে ঘুরের যন্ত্রণা
তখন, ঠিক তখন
আমার বাবার দুধেভাতে খাওয়া মুখ
নিঃশ্বাসের বাতাস
আমায়
পুবের বাতাসের দিকে
নিয়ে যায়
আমার পশ্চিমের হেলে যাওয়া হাত
আবার পুবের দিকে ছুটে আসে।

নিউইয়র্ক ২০০৮

দ্যাখো, সে গ্রন্থি আমার নেই

অরুণাভ দাশগুপ্ত

দ্যাখো, আমি ফিরিয়ে নিয়েছি মুখ
এখন
ধুলোয় লুটোচ্ছে তোমার রহস্য,
    তোমার হেঁয়ালিপনার বেড়ি,
দ্যাখো, কী অবলীলায় নামিয়ে রেখেছি
    বিগত বসন্তদিনের অঙ্গুরীয়...

দ্যাখো, কোন আঘাতেই আজ তেমন বেজে উঠি না,
আর তুমি তো সেই বিবাদাশ্রিত কবিতা নও
    বধ্যভূমিতে পা রেখেও যার পিছুটান...
সে রকম ভাবমূর্তি নও, যা শিল্প করে তুলতে
    ফি বছর আমার খড়ের কাঠামো নিয়ে বসা,
না শিখলে পোড়াতে না ভাসাতে,
চাইলেই তমাল হয়ে দাঁড়াবো
দ্যাখো, সে গ্রন্থি আমার নেই।

নিরপেক্ষ একজন

কার্তিক লাহিড়ী

শেষমেশ পার্কের গেট খুলে গেল সর্বসাধারণের জন্য, যদিও পার্কের নাম শিশু ও হরিণ উদ্যান, ছোটদের খেলা-বেড়াবার এবং হরিণের চরে বেড়াবার উদ্দেশ্যে পার্কটা তৈরি হয়, ছোটরা তো

আসবেই, কিন্তু যে সব শিশুর একলা বা বাড়ি থেকে একলা আসার বয়েস হয়নি, তারা আসে গার্জেনের সঙ্গে, তাই

একদল বুড়োও চলে আসে পার্কে তাদের নাতি-নাতনির হাত ধরে, তা আন্দাজ করেই বোধহয় বসার জন্য পার্কে সিমেন্টের বেঞ্চ বানানো হয়েছে, আর

ছোটদের জন্য আছে দোলনা, স্লিপ, ঢেঁকি, প্যারালাল বার, ঝোলার জন্য রিং, ওদিকে

হরিণদের ঘোরা-ফেরা, ছুটোছুটির জন্য আছে অনেকখানি ফাঁকা তৃণভূমি ফাঁক-ফাঁক জাল দিয়ে ঘেরা, বাচ্চারা ওই ফাঁক দিয়ে নাক গলিয়ে হরিণদের ছুটোছুটি দেখে, কখনো সখনো নিজের যা খাচ্ছে তা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু হরিণরা সে-খাবার শুঁকেও দেখে না, শুধু ড্যাব-ড্যাব চোখে তাকিয়ে ওদের দিকে

বাগান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, যেদিকে তাকাও কেবল সবুজ আর সবুজ, মধ্যে মধ্যে মরসুমি ফুলের নানা রং, দূরে বাউন্ডারির বেড়া ঘেঁষে শিমুল পলাশ শিউলি ছাতিম কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি গাছ, তাদের মাথা ভরা থাকে সবুজের ঢের-এ, এবং বিশেষ বিশেষ ঋতুতে নানা রঙের, ফুল, একবার ঢুকে পড়লে বের হতে মন চায় না, তবু

এই পার্কের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে খোলাও বন্ধ হবার—

সকাল : ৬টা থেকে দশটা

বিকেল : ৪টে থেকে ৯টা

গেট সকাল ছ-টায় খুলবে, বেলা দশটায় বন্ধ হবে, বিকেলে চারটেয় খোলে রাত ন-টায় বন্ধ হয়, মধ্যবর্তী সময়ে

অর্থাৎ দশটা থেকে চারটে অব্দি পার্কের কর্মচারীরা বাগানের পরিচর্যা করে—ফুল গাছ ইত্যাদির যত্ন করে, হরিণদের খাওয়ার ইত্যাদি, এ ছাড়া চব্বিশ ঘন্টা দফায় দফায় চলে সিকিউরিটিদের পাহারা, তারা গাছ, ফুল, হরিণের উপর নজর রাখে, ঢোকার সময় দেখে-বাইরে থেকে কেউ খাবার নিয়ে ঢুকছে কিনা বা এমন কিছু নিয়ে যা থাকলে গাছের, ফুলের এবং হরিণদের ক্ষতি হতে পারে কিংবা কোনো নাশকতা

উদ্যানের একটি মাত্র গেট—ঢোকার এবং বের হবার, আর চারপাশ লোহার মোটা জাল দিয়ে বেড়া দেওয়া, সেই বেড়া ভেঙে বা কেটে ঢোকা বেশ আয়াসসাধ্য, এত কষ্ট

করে চোর বা দুষ্কৃতিকারীরা ঢুকবে কোন্ লাভের আশায়, এখানে নেবার মতো কীই বা আছে, কেবল কিছু ফুল বা ফুলের টব, এগুলো নিতে কেউ এত পরিশ্রম করবে কেন, তাই

বাগান সুরক্ষিত সুসজ্জিত থাকে সব সময়, আর

লোকের ঢল নামে, বিশেষ করে শনি, রবি এবং ছুটির দিনে

পুর-প্রধান ভেবেছিলেন, পার্কে ঢোকার জন্য কিছু প্রবেশ-মূল্য ধার্য করবেন, তাতে পুরসভার বিরাট আয় হবে, কিন্তু বেশির ভাগ ওয়ার্ডের পৌর-পিতা আপত্তি করায় প্রবেশ-মূল্য ধার্য করার বিষয়ে পিছিয়ে আসেন, তবে আশা করেন—একদিন ওরা ঠিক বুঝতে পারবে, আর তিনি সর্বসম্মতিভাবে প্ল্যানটা পূরণ করবেন, এখন তো

শুধু খরচা-ই হয় পার্ক বাবদ, আয় নেই কানাকড়ি, কেবল খরচ, তবে এই পার্ক-কে কেন্দ্র করে বাড়ছে কর্মসংস্থান, যেমন—

রাস্তার পারে একের পর এক গজিয়ে উঠছে নানা ধরনের দোকান

হকার-ও এসে পড়েছে, ক্যানাস্তারাটিনের মধ্যে স্টোভে তৈরি হচ্ছে-লেবু চা, লাল চা, কফি ইত্যাদি

এসেছে বাদাম, চানাচুরের প্যাকেট নিয়ে নানা বয়সের ছেলে

বাড়ছে রিক্শা, অটো চলাচল, সঙ্গে সঙ্গে

আশ-পাশের জমির দাম চড়ছে, এসবের ফলে

এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক মানচিত্রটাই পালটে যাচ্ছে, আগে ধু ধু করত জায়গাটা, অনুর্বর এবড়ো-খেবড়ো জমি, কোনো প্রোমোটার এগিয়ে আসেনি জমিটা কিনে ফ্ল্যাট বানাতে, সন্ধ্যা হলে অ্যান্টি-সোশ্যালদের ডেন্ হতো, ভয়ে এদিকে কেউ পা মাড়াতো না পড়ন্ত বিকেলের পর—রিক্শা, ভ্যান চলাচল করা দূরের কথা, একটা প্রাইভেট মোটর গাড়িও দেখা যায়নি কখনো, আজ

সেই জায়গা লোকে লোকে ভরসার, পার্কের শ কি দেড়শ গজ দূরে রাস্তার ওপাশে ফ্ল্যাট উঠছে, রাস্তা ড্রেন সব পাকা হয়ে গেছে, তাই হকার থেকে খুচরো ব্যবসায়ী—সব তাদের চৌহদ্দি বাড়াচ্ছে, এমনকি এক কর্পোরেট্ হাউসের কর্তা দেখে গেছেন জায়গাটা...অর্থাৎ

বেশ জম-জমাট হয়ে গেছে পার্কটা, সেই সুবাদে শহরের নাম-ও ছড়াচ্ছে আশ-পাশে, নানা জায়গা থেকে লোকজন আসছে শিশু ও হরিণ উদ্যান দেখতে, আর যারা দেখছে

তারা আশা করছে, তাদের শহরে এমন পার্ক গড়ে উঠবে, শিশুরা বেড়াবার খেলার মুক্ত জায়গা পাবে, সেখানে থাকবে হরিণ এবং ময়ূর, বুড়োরাও পাবে নির্মল বাতাস

বেশ চলছিল সব কিছু, পার্ক ঘিরে ব্যবসা বাণিজ্য রুজিরোজগার যেমন বাড়ছিল, তেমনি বাড়ছিল শিশু ও বুড়োদের আনাগোনা, আসা যাওয়া ইত্যাদি

কথায় আছে সব দিন সকলের সমান যায় না, মানুষের বেলায় এটা খাটে বেশ, কিন্তু পার্কের বেলায়, পার্কের তো কোনো সজীব সত্তা নেই, তবু তা জীবন্ত হয়ে ওঠে মানুষজনের আনাগোনায়, এখানে সেই আনাগোনার কোনো কমতি নেই, কিন্তু একদিন

দেখা গেল একটা হরিণ নির্জীব হয়ে পড়ে আছে ঘাসের উপর, প্রথমে দেখে একজন শিশু, সে চেঁচিয়ে অন্যদের দেখায়—দেখ্ দেখ্, হরিণটা কেমন ঘুমোচ্ছে..., তার চেঁচানিতে আর সব

শিশু জুটে যায় এবং তারাও চেঁচাতে থাকে, তাদের হৈ-হট্টগোলে বয়স্ক-রাও এগিয়ে আসে, তারপর

ওই খবর ছড়িয়ে পড়ে, পৌর-প্রধান সরেজমিনে দেখতে এসে বুঝতে পারেন না, হরিণটা মরলো কী ভাবে, স্থানীয় লোকজনেরও ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না, শেষে খবর পাঠানো হলো বনদপ্তরে, তারা দেখলেন, তারাও বুঝতে পারলেন না কী করে কী হলো?

এটা মানুষের কাজ নয়, কেউ বা কারা মেরে ফেললে তারা হরিণের লাশ সরিয়ে নিয়ে যেতো, ফেলে রাখতো না এভাবে, কারণ

হরিণের মাংস বেশ সুস্বাদু, তাছাড়া হরিণের চামড়ারও দাম আছে, তাহলে?

হরিণের লাশ পাঠানো হলো ময়নাতদন্তের জন্য...

পরের দিন আবার হরিণের দুটি মৃতদেহ পাওয়া গেল, তারপরের

দিন—আর একটা

মহা ধন্দে পড়ে পুরসভা, স্থানীয় লোকজন ও বনদপ্তর, কেউই বুঝতে পারে না, তন্ন তন্ন তল্লাশি চালিয়েও ক্লু পাওয়া গেল না, তার মধ্যে এসে যাচ্ছে

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, তাতে জানা যাচ্ছে—

এসব শেয়াল বা ওই রকম কোনো জন্তুর কাজ, আর অবাক কাণ্ড তারপরই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে দু-টি সুড়ঙ্গ, তখন স্পষ্ট হয়—এসব শেয়ালের কাজ, তারা অত্যন্ত কৌশলে বেড়ার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে বেশ প্ল্যান-মাফিক, কিছু দিন আগে

একটা হরিণ-শিশুর মৃত্যু হয়, তবে সেটা অসুখে, তাতে কেউ তেমন বিচলিত হয়নি, কিন্তু কষ্ট পেয়েছিল সকলে, সদরের ডিয়ার পার্ক থেকে মাত্র চারটে হরিণ আনা হয়, এই ক-বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় কুড়িতে, কিন্তু

পর পর কয়েকটা হরিণের মৃত্যুতে বনদপ্তরের টনক নড়ে এবার, তারা চাপ দিতে শুরু করে, বলে—এখানে হরিণ রাখা 'সেফ্' নয়, এদের আমরা যেখান থেকে এনেছিলাম, সেখানে ফেরত নিয়ে যাবো, হরিণরা থাকবে হয় জঙ্গলে, নয়ত পুরোপুরি ডিয়ার পার্কে, তা শুনে

পৌরপিতা-সহ স্থানীয় লোকজন হইচই শুরু করে, তাদের বক্তব্য—বনদপ্তর এখানে মাত্র ৬টি হরিণ নিয়ে আসে, এখন সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে কুড়ি-তে, তাও ওদের আনা ৬টির মধ্যে একটা মারা গেছে বেশ কিছুদিন আগে অসুখে, অতএব তারা সব কটি হরিণের মালিক নয়, সে জন্য তারা সব হরিণদের নিয়ে যেতে পারে না, এবং আমরাও তা হতে দেবো না, দরকার হলে আমরা আন্দোলন করবো...

দু-পক্ষ জেদাজেদি শুরু করে, একপক্ষ হরিণ নিয়ে যাবেই, অন্যপক্ষ নিতে দেবে না

দু-পক্ষই অনড় নিজের নিজের অবস্থানে, কেউ এক চুল-ও নড়ছে না নিজেদের অবস্থান থেকে, দু-পক্ষেরই যুক্তি আছে

বনদপ্তর বলছে—এখানে হরিণ রাখলে বাঁচানো যাবে না, একবার যখন শেয়ালদের থাবা পড়েছে, তখন ওরা বারবার আক্রমণ করবে, এবং তারা জানান দিয়ে আঘাত হানবে না, এসব সুড়ঙ্গ বন্ধ করে দিলে অন্য কোথাও সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ঢুকে পড়বে, অতএব—

পৌরপিতা ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের বক্তব্য—

পার্কে হরিণ আছে বলে এর একটা আলাদা অ্যাট্রাকশন হয়েছে, মানুষজন আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, তাতে এলাকাটা সমৃদ্ধ হচ্ছে, একদিন অন্য জায়গার সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে, তাছাড়া পার্ক দেখতে এসে সকলে খুশি, এটা কম বড় পাওনা নয়, অতএব—

পুর-প্রধান ভেবে না পেয়ে দু-পক্ষকে আলোচনায় আসতে বললেন, কিন্তু দু-পক্ষই শর্ত-আরোপ করছে, আর শর্ত আরোপ করলে তো আলোচনা হতে পারে না, অতএব—

তখন কোথা থেকে এক তৃতীয় পক্ষ এসে হাজির হচ্ছে, তারা এলাকারই মানুষ, তাদের বক্তব্য—

সমস্যার মূলে আছে শেয়াল, তাহলে শেয়াল ধরে অন্য কোথাও বা জঙ্গলে চালান দিয়ে দিলেই তো সমস্যা মেটে

উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নেই, কিন্তু বনদপ্তরের জানা নেই—শেয়াল ধরার কোনো কল আছে কিনা, কিংবা ফাঁদ পেতে শেয়াল ধরা যায় কিনা, যদি থেকেও থাকে, তবে তেমন সরঞ্জাম স্থানীয় বনদপ্তরে নেই, অতএব—

আর এক পক্ষ এসে বলে—বেড়ার নীচে আট-দশ ফুট খুঁড়ে যদি কংক্রিট করে দেওয়া যায়, তবে শেয়াল-রা সুড়ঙ্গ বানাতে পারবে না, তাতে সব সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু তাদের

কে বোঝাবে গোটা বেড়ার নীচে ওই ভাবে কংক্রিট করার টাকা জোগাবে কে, আর এত টাকা কেনই বা কোনো সংস্থা খরচ করতে যাবে, আর পুর-সভার সেই আর্থিক বলও নেই, অতএব—

মাথার ঘায়ে পাগল হবার অবস্থা পুর-পিতার, তবে তিনি শেষের দু-পক্ষের প্রস্তাব নিয়ে মোটেই চিন্তিত নন, কারণ ওই দু-পক্ষের তেমন কোনো জোর নেই, তাঁর মাথাব্যথা

প্রথম দু-পক্ষকেই নিয়ে, এক পক্ষ হরিণ নিয়ে যাবেই, অন্যপক্ষ নিয়ে যেতে দেবে না, দু-পক্ষই অনড়, এখন কী করা?

তিনি পুরো-সভার জরুরি অধিবেশন ডাকলেন...

বৈঠকে সব ওয়ার্ডের পুর-পিতা উপস্থিত, আলোচনা শুরু হলো, প্রথমে

বেশ শান্তভাবে, এক এক জন নিজের নিজের বক্তব্য পেশ করতে থাকেন, কারো কারো বক্তব্যে কেউ সামান্য বাধা দিচ্ছে, সেই বাধা-র মাত্রা বাড়তে থাকে, নানা মতের জটলায় প্রকৃত বিষয় থেকে আস্তে আস্তে আলোচনা নানাদিকে মোড় নিতে থাকে, বাদানুবাদ শুরু হয়, বাদানুবাদের মাত্রা ক্রমে বাড়তে থাকে, কেউ কারো কথা শুনতে চায় না,

প্রত্যেকেই বলতে চায় শোনাতে চায়, ফলে শুরু হয়ে যায় হৈ-চৈ হট্টগোল, শেষে হাতাহাতি হবার উপক্রম, পুর-প্রধান

কী করবেন ভেবে পান না, একবার এদিকে চাইছেন তো আরেকবার ওদিকে, কিছু শোনা যাচ্ছে না, কেবল একটা গোঁ গোঁ শব্দ, পুর-প্রধান কী করবেন এই অবস্থায়, তাঁর দৃষ্টি এধার-ওধার ঘুরতে ঘুরতে কানে তালা লাগার উপক্রম হতেই চিৎকার করে ওঠেন—

থামুন আপনারা, আর ওই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তার জট খুলে যায় তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘোষণা করেন, একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি চাই...

নিরপেক্ষ ব্যক্তি? সভা একেবারে স্তব্ধ, মানে?

হাঁ, একদম সম্পূর্ণ একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মধ্যস্থতা করার জন্য, আপনারা খুঁজতে থাকুন তেমন একজনকে, ব্যক্তিগতভাবে আমিও দেখছি...

এক মুহূর্ত নীরব থেকে সকলে বেরিয়ে পড়েন খুঁজতে, যেমনভাবে

গৌতম বুদ্ধর শর্ত অনুযায়ী বেরিয়ে পড়েন কিসা গৌতমী এক কণা শস্যবীজ জোগাড় করতে এমন বাড়ি থেকে যেখানে কখনো কোনো মৃত্যু হয়নি তার নিজের ছেলের প্রাণ বাঁচাতে, তেমনভাবে

খোঁজ শুরু হয় বাড়ি বাড়ি, সেই

খোঁজা এখনও চলছে তবু...

সীমানা শেষ হয় না

অমর মিত্র

মনোময় ফিরে এসেছিল জ্যোৎস্না অন্ধকারে। মনোময় গিয়েছিল নগর পার হয়ে অনেক দূরে সেই লাঙলপোতায়। লাঙলপোতায় যাবে বলে বেরোয়নি, কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে, জ্যোৎস্নায় ডানা মেলে দেওয়া হাঁসের মতো সে দূর বহুদূর, এই সবুজনগর পেরিয়ে লাঙলপোতায় চলে গিয়েছিল। লাঙলপোতায় যাওয়ার পথটি ছিল সেই অঙ্কুরহাটি, খালিয়া, ভগবানপুর কত গ্রাম-মৌজা পার হয়ে হয়ে। গ্রামগুলিতে গ্রামের কোনো চিহ্ন ছিল না। গৃহশূন্য, বৃক্ষশূন্য, জলাশয় শূন্য। শুধু একটি প্রাচীন শিমুল দাঁড়িয়েছিল মরুভূমি হয়ে যাওয়া শূন্য গ্রামগুলিতে। একটিই। শুধু একটি। গ্রাম খালি করা হয়েছে। সবুজ নগর এগিয়ে আসছে এদিকে। নগরের জন্য গ্রাম এই রকম হয়ে যায়।

মনোময় একা, শূন্য গ্রামগুলির মতো একা নগরে ফিরে তার আবাসনের কাছে এসে দাঁড়াতে দেখল জটলা। নিচে পিনাকি, রিয়া চ্যাটার্জি থেকে সদানন্দ গাঙ্গুলী সকলে। আর ছিল প্রহরী, নগররক্ষীরা। তাদের ইউনিফর্ম বাঘের মতো। হলুদ কালোয় ডোরা। তাদের মাথায় ড্রাগন আঁকা হেলমেট। তাদের একজনের হাতে বাঘের মতো শাঁসালো একটি কুকুর। যত্ন আত্তিতে তার শরীরখানি মাংসে ভরা। চোখ দুটিতে অহেতুক হিংস্রতা। সে অমাবস্যার অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার-কালো।

মনোময় গিয়ে দাঁড়াতেই নগররক্ষীরা সেই কুকুরের গলায় লাগানো বেল্ট যত্নে খুলে নিতেই, কুকুরটি প্রায় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ছিল মোটা জিনস, অনেকটা ঝুল-ওয়ালা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিতে দাঁত বসিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁতে চেপে তাকে টানতে লাগল।

রক্ষীরা ছুটে এল, হল্ট, ডোন্ট মুভ।

কী হয়েছে?

রিয়া চ্যাটার্জি ছুটে এল, আঙ্কেল, মি. শীল, সিটিতে প্রচুর বোমা পাওয়া গেছে, একসঙ্গে বিস্ফোরণ হওয়ার কথা ছিল, হয়নি। রিয়ার কথার ভিতরে যেন হতাশা, বলছে ছটা শপিং মলে, তিনটে থিয়েটারে, পাঁচটা সিনেমা হলে, বাজারে, গণপতি মন্দিরে, স্যাটারন, শনিঠাকুরের মন্দিরে, পাঁচটা চার্চে, রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে—মি. শীল, আপনি জানেন না?

রিয়াকে থামায় একজন রক্ষী, চুপ, ওদিকে গিয়ে দাঁড়ান।

রিয়া থামল না। রক্ষীর কথা কানেই নিল না, বলল, টিভিতে বলছে। ঠিক রাত আটটা দু-মিনিটে বিস্ফোরণ হওয়ার কথা ছিল, আমরা তখন ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছি—ইস!

মনোময়ের ঘাড়ে তখন একজন রক্ষীর হাত। অন্য এক রক্ষী তার গায়ে মেটাল ডিটেক্টর ছোঁয়াতে লাগল। ঘষে ঘষে দিতে লাগল। ওদিকে রিয়া চ্যাটার্জি বলে যাচ্ছে, তারপর থেকে সার্চ হচ্ছে, এই কুকুরটার মতো অনেক কুকুর নিয়ে পুলিশ নেমে পড়েছে, শুধু শুঁকছে....

চুপ করবি তুই! গর্জন করে উঠল এক বিশাল দেহরক্ষী, অ্যাই কেউ কোনো কথা

বোলো না, যে যার গর্তে ঢুকে পড়ো। আমরা একজনকে আইডেনটিফাই করেছি, এবার দেখি কুকুরটা কী করে।

রিয়ার হাত ধরল পিনাকি, চলো।

রিয়া বলল, আরেল!

দেখলে না লোকটার ফ্ল্যাটের দরজায় কুকুরটা কতবার আঁচড় দিল, থাবা দিল, টেররিস্ট।

আই ডোনট্ বিলিভ ইট।

অ্যাই, গো টু য়োর ব্ল্যাক হোল—লোকটাকে তোলা হোক। বিশালদেহী রক্ষী গর্জন করল। মনোময় গাড়িতে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল, আমার অপরাধ?

তুমি ভালো করে জানো, তোমার আই কার্ড? মস্ত লোকটি তাকে নিয়ে অত্যাধুনিক গাড়িটিতে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করল ধীরে ধীরে। গাড়ির সামনে ছুটছে কুকুরটি। মনোময় টের পেল তার কোমরের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রর খুব ঠান্ডা ছোঁয়া।

মনোময়ের কাছে সাড়া না পেয়ে লোকটি আবার বলল, শো য়োর আই-কার্ড।

নেই।

কেন নেই?

করা হয়ে ওঠেনি

পারমিট?

ঘরে আছে, টাকা দিয়ে এই সিটিতে ফ্ল্যাট কিনেছি।

সিটিটাকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য?

মনোময় বলল, আমি কিছু বলব না।

তোমাকে বলতে হবে, হু আর ইউ?

আই ডোন্ নো।

ইউ সোয়াইন, আমি তোমাকে কী করতে পারি জানো?

নাথিং।

লোকটা বলল, আজ যদি একসঙ্গে ব্লাস্ট হতো সব, কী যে হতো।

মনোময় চুপ করে থাকল।

লোকটা বলল, তুমি কিছু বলছ না।

অহেতুক টেররাইজ করছ কেন, ফাটত না।

ফাটেনি কি আগে?

কিন্তু তার সঙ্গে আমার যোগ কোথায়?

সেইটাই তো বার করব, কেন আমরা লাভলির অধীন, এটা একটা মেয়ে কুকুর, গ্রেট ডেন। সাংঘাতিক এফিসিয়েন্ট, ভীষণ সন্দেহপ্রবণ। ও একটা ইনভেসটিগেশনেও ভুল করেনি এখনও।

এইটা।

নো, ও যখন তোমাকে ধরেছে, তুমি কনফেস করো।

কী?

যা করেছ।

কিছুই করিনি।

লোকটা বলল, প্রমাণ হয়ে যাবে সব, লাভলি কখনও ভুল করে না, ওর মেয়ে বিউটি আমাদের মেয়রের সিকিউরিটি দ্যাখে, আর একটা মেয়ে কিউট-ই অথরিটির দ্যাখে।

মেয়র আর অথরিটি আলাদা?

আমি বলব না, তুমি জানতে চাইছ কেন?

ইচ্ছে হয় না, যে শহরে থাকি সেই শহরের মেয়র আর অথরিটির তফাত আছে কিনা না জানলে হবে?

হবে। খুব গম্ভীর হয়ে বাঘের নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা, তারপর বলল, তুমি জানতে চাইবে কেন, যা জানানো হবে তাই জানবে।

মনোময় চুপচাপ হয়ে গেল। নিস্তব্ধ রাজপথ থেকে গাড়ি আচমকা কুকুরের পিছু পিছু ঘুরে গেল। মনোময় টের পেল নগরের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে গাড়ি। কুকুরটি দাঁড়ায়। গাড়িটিও দাঁড়ায়। মনোময় ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল পরপর, সারিবদ্ধভাবে গোটা পাঁচ সাঁজোয়া গাড়ি তাদের অনুসরণ করে এসেছে।

লোকটা বলল, নামো।

মনোময় নামল।

লোকটা বলল, পালাতে গেলে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

মনোময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কুকুরটা এগোচ্ছে। মনোময়কেও হাঁটতে হয় লোকটার উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রর আগে। এই যে সেই খালিগ্রাম, শূন্য করে দেওয়া পিতৃ-ভূমি। ঘরবাড়ি পুকুর দিঘি, আগানবাগান, বুড়োশিবতলা, কালীতলা, পীর-মাজার সব মিলিয়ে গেছে বাতাসে। জমি ভরাট করেও ফেলা হয়েছে নগর আসবে বলে। শুধু রয়ে গেছে বুড়ো শিমুল। কতকালের গাছ, কতকিছু দেখেছে সে। এই পথ দিয়েই তো মনোময় ফিরেছে লাঙলপোতা থেকে। লাঙলপোতায় আশ্রয় নিয়েছে এদিকের মানুষ। যত গ্রাম উচ্ছেদ হয়, খালি হয়, মানুষ যায় লাঙলপোতায়। সেই লাঙলপোতায় চলে গিয়েছিল মনোময়। লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথা থেকে ফিরলে এত রাতে?

জানি না।

জানো না মানে?

মনোময় বলল, আমি যা জানাব না তা তুমি জানবে না।

তুমি যে অথরিটির মতো কথা বলছ।

মনোময় চুপ করে থাকল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছি?

গেলে বুঝতে পারবে।

তুমি জানো না, এত বড় সিকিউরিটি অফিসার!

লোকটা বলল, না মেয়রও জানে না, অথরিটিও জানে না।

তাহলে কে জানে?

লাভলি।

জ্যোৎস্নার ভিতরে কালো ছায়ার মতো গ্রেট ডেন কুকুরটি তার মস্ত শরীর নিয়ে ছুটে চলেছিল। স্থির দৃষ্টি। সে সামনের দিকে ছাড়া তাকাতে জানে না।

মনোময় টের পায় তাকে নিয়ে বধ্যভূমির দিকে যাচ্ছে নগররক্ষী বাহিনী। একটু বাদেই তার গুলি ঝাঁঝরা দেহ পড়ে থাকবে এই প্রান্তরে। কালো কুকুরটি যাচ্ছে বধ্যভূমির সন্ধানে। মনোময়ের মনে পড়তে লাগল এমন ঘটনা অনেক হয়েছে। বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে উধাও করে দিয়েছে সন্দেহভাজনকে। সে ঢুকে পড়েছে ওই তালিকায়। কী করে ঢুকল তা সে জানে না। তাকে এরা মৃত্যুদণ্ডই দিয়েছে ধরা যায়, কিন্তু কেন তা অজানাই থেকে গেল। যেমন অজানা থাকল মেয়র আর অথরিটির ভিতরে কোনো তফাত আছে কিনা। তাকে একদিন নগর কর্তৃপক্ষ ডেকে নিয়ে অথরিটির পরিচয়ে যিনি কথা বলেছিলেন, তিনিই কি মেয়র, না অন্য কেউ? এই নগরের মেয়র স্বপ্নপ্রবণ, কল্পনাপ্রবণ, নাগরিককে এমন করে গড়ে তুলতে চান, এমন অনুশাসনে ভরে দিতে চান যা কোথাও আর কোনোদিন হয়নি। ঘটেনি। নিজের স্বপ্নপূরণের জন্যই এত রক্ষীবাহিনীর ব্যবস্থা। এমন বাঘের মতো ডোরাকাটা ইউনিফর্মের নিষ্ঠুর রক্ষীবাহিনীই তাঁর স্বপ্ন সার্থক করে তুলবে এ বিশ্বাস তাঁর আছে। মনোময় গুনগুন করে উঠল : সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।

কী গাইছ?

গান।

কী গান?

ধনধান্য পুষ্পে ভরা...।

এটা কোন গান?

শোনোনি?

ধান্য পুষ্প মানে ধান আর ফুল?

মনোময় বলল, ইয়েস স্যার।

তার মানে গ্রাম, অঙ্কুরহাটি, খালিয়া, ভগবানপুর?

ইয়েস স্যার।

স্টপ ইয়োর সং, এসব গানই সর্বনাশ করেছে তোমার, আমরা ঠিক লোককে আইডেনটিফাই করেছি।

লাভলি করেছে।

লাভলি আমাদের বাহিনীর অংশ, ওর স্যালারি আমাদের চেয়ে বেশি, খাতিরও বেশি।

মনোময় গুনগুন করল, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

আবার! ডোরাকাটা তার কোমরে আগ্নেয়াস্ত্র চেপে ধরল,চাপা গলায় গর্জন করল, তোমার ভয় নেই?

মনোময় জবাব দেয় না। লোকটা জিজ্ঞেস করে, এরপর কী হতে পারে জানো?

কী? একটা এনকাউন্টার হবে তো।

লোকটা চাপা গলায় স্বগতোক্তি করল, ঠিক লোক, জঙ্গিরাই এভাবে কথা বলে।

মনোময় জিজ্ঞেস করে, কী ভাবে?

কথা বলো না, সামনে তাকিয়ে হাঁটো, লাভলি তোমার জন্যই আর ছুটতে পারছে

না, তফাত বেশি হয়ে গেলে তোমার গন্ধটা ওর কাছ থেকে হারিয়ে যাবে শুয়োরের বাচ্চা। শুয়োর মারা দেখেছ?

মনোময় এগোতে লাগল। তার ঘাড়ের কাছে ধাতব স্পর্শ লেগেই রয়েছে। হাড় হিম করা ঠান্ডা। মনোময়ের মনে পড়ল পিসির কথা। পিসির কাছে ছুটে ছুটে যেত বাবা মনোতোষ। মনোময়ের মনে পড়ল অলঙ্কারপুর থেকে পিসি পাঠাত আমসত্ত্ব, ছাঁচে বানানো ক্ষীরের মিষ্টি। তার কী সুগন্ধ! মা একবার সব ফেলে দিয়েছিল জানালা দিয়ে। পিসির পাঠানো পুজোর জামা মা ফালাফালা করে ছিঁড়ে দিয়েছিল। মনোময় আকাশে তাকায়। অলঙ্কারপুরে একবার জ্যোৎস্নারাতে তারা, সে পিসি আর রত্নাবলী বসেছিল ছাদে। পিসি আর রত্না—চন্দ্রাবলী আর রত্নাবলী যুগলে তাকে শুনিয়েছিল, ওহে সুন্দর মরি মরি... গুনগুন করে উঠল মনোময়। দুই পংক্তি। রত্নাবলী শুনিয়েছিল, আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে...গুনগুন করে উঠল মনোময়। চন্দ্রাবলী শোনাল, চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে...। পকেটে হাত দেবার উপায় নেই। তাহলে মোবাইল ফোনটি বের করে এনে ডাকত পিসিকে—চন্দ্রাবলীকে। চন্দ্রাবলী তাকে একবার একলা রেখে দিল। বলল, রত্না, সে তো নেই, সে গেছে তার মাসির বাড়ি। চন্দ্রাবলী পঞ্চব্যঞ্জনে খেতে বসিয়ে হাওয়া করতে করতে বলল, তোর বাবা মনোতোষদা, সে পছন্দ করত এই রকম ফুলকপি দিয়ে ভেটকি মাছ, তোকে দেখলে শুধু মনোতোষদার কথা মনে পড়ে মনো। আসবি তো সোনা, যখন ডাকব আসবি তো? শেষে তোর বাবা যে কী করল, তোর মা ঘুমের ওষুধ খেলে, আমি বললাম তুমি এখানে এসে থাকো ছেলেটাকে নিয়ে, তা না করে হরিদ্বারের সেই মেয়েছেলেটা...ও মনো পায়েসটা মুখে দে।

মনোময় হাঁটছে। অন্তহীন পথ আর শেষ হয় না। জ্যোৎস্নার তাপ যেন বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে রোদ পড়ছে গায়ের উপর। দুটি হাত আকাশমুখী, মনোময় গুনগুন করে ওঠে, ওহে সুন্দর মরি মরি/তোমায় কী দিয়ে বরণ করি...। পিসি বলছিল, মেয়েটা এমন লেগে থাকে তুই এলে, ইস্কুলে ছুটি নিয়ে নেয়। তোর সঙ্গে যে দুটো কথা বলব, মনোদা বলে ডাকব...তোকে দেখলে আমার মনোতোষের কথা মনে পড়ে রে, ওহে সুন্দর মরি মরি...তুই যেন সেই মনোতোষ...। একবার রত্না বলল, পিসি চায় না আমি আসি, আপনি এলে খবর দিল না সে বার। থাক থাক রত্নাবলী। থাকবে থাকবে তো, আমারও যে কিছু বলার থাকতে পারে তা পিসি জেনেও না জানার ভান করে, আমিও তো গাইতে পারি মনোদা, রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও, যাও গো এবার যাওয়ার আগে... ও মনোদা, মনোময় তোমার জন্য কী আনাব, এই যে কোঁচড়ভরে এনেছি কতরকম ফুল, সব ফুলের আবার নাম জানি না, বনে বনে ফুটে থাকে। মনোময় গুনগুন করল, বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি ...সে বার অলঙ্কারপুরে কী বসন্ত না এসেছিল! আগুন আগুন! বাতাসে ঘূর্ণি হচ্ছে। মেয়ের নাকের পাটা ফুলছে, ঠোঁটদুটি স্ফুরিত হচ্ছে, ডাকছে সে, এসো না মনোদা, ও মনোময় এসো দেখবে এসো...ঘূর্ণি হচ্ছে রত্নাবলীর বুকে। চাপা গলায় ডাক দিল সেই রত্নাবলী, এসো না, শুনতে পাও না তুমি, টের পাও না মনোময়?

পিসি চন্দ্রাবলী তার পাতানো পিসি, বাবা ছিল চন্দ্রাবলীর পাতানো দাদা।

হল্ট! ডোরাকাটা গর্জন করে উঠল।

মনোময় দাঁড়াল। চন্দ্রাবলী রত্নাবলী কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মনোময় দেখল তাদের সামনে সেই বুড়ো শিমুল গাছ, তার মস্ত কাণ্ড, আকাশছোঁয়া ডালপালা। জ্যোৎস্নার ভিতরে ঘুমিয়ে আছে, নাকি বার্ধক্যে ঝিমিয়ে আছে রাত্রিকালে। কালো কুকুরটি তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়াচ্ছে। যেন ক্ষিপ্ত কামুকী নারী আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে এক পুরুষকে।

ডোরাকাটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এ কী, লাভলি কী হয়েছে?

মনোময় বলল, গাছটি টেররিস্ট হতে পারে।

হোয়াট? গর্জন করে ওঠে ডোরাকাটা। গাছটি জঙ্গি, কিন্তু গাছ নড়তে পারে না।

ডোরাকাটা ছুটে গিয়ে লাভলির পিঠে হাত দিল আদরে, হোয়াট হ্যাপেনড্ ডার্লিং লাভলি?

কুকুর ঘুরে ঘুরে গাছের গায়ে থাবা মারতে লাগল, গর্জে উঠতে লাগল। মনোময় হেসে উঠল। ট্রেনড্ কুকুর কখনও ভুল করতে পারে না।

না পারে না।

মনোময় বলল, গাছটিকে নিয়ে আমি ওর সঙ্গে মরি।

ডোরাকাটা ছুটে এল উদ্যত রিভালবার হাতে। একটা কথাও বলবে না, বললে শুয়োরের মতো গরম শিক ঢুকিয়ে মারব। কুকুরটা যখন এমন করছে, কোনো একটা কারণ আছে, আচ্ছা সব গাছ কেটে সাফ করা হয়েছে, এটা পড়ে আছে কেন?

মনোময় ভাবছিল রত্নাবলী আর চন্দ্রাবলী তার বাবা মনোতোষের অনুরাগিণী, রত্নাবলী তাকে দূর থেকে ভালোবেসেই গেল। মনোময় গুনগুন করে ওঠে, ফিরে দ্যাখো রত্নাবলী... তোমায় ওগো কী যে বলি... অপরূপা চন্দ্রাবলী...চন্দ্রপুষ্পের একটি কলি...। মনোময় বুঝতে পারছিল মৃত্যুর খুব কাছে এসে পৌঁছেছে। এই যে বিপুল মরুপ্রান্তর, এ ছিল শস্যশালিনী এক গ্রাম। একের পর এক গ্রাম। গ্রাম মুছে দিয়ে নগর খেয়ে ফেলছে একে তার অজগরের নিঃশ্বাসে। প্রাচীন শিমুল গাছটি শুধু দাঁড়িয়ে আছে প্রাণের মতো। তার ডালে ডালে ফুল ফুটে আছে। পাতা ঝরছে আবার জন্ম নিচ্ছে সমস্ত দিন সমস্ত রাত ধরে। সেই গাছে যখন কুকুরি ঝাঁপিয়েছে, গাছ আর সমস্ত দিন থাকতে পারে না। মনোময় ভাবছিল এখনই করাত কুঠার এসে যাবে। আগে কটি বুলেট, তারপর টুকরো টুকরো করে লরিতে চাপিয়ে লাশ উধাও। গাছ কাটা পড়লে তারও বেঁচে থাকা তো হবে না। গাছটা যেন তার প্রাণের মতো জেগে আছে এই নিষ্করুণ প্রান্তরে। একা একা।

ডোরাকাটা এবার মুখ নামিয়ে লাভলির কানের কাছে, সুইটি হোয়াট হ্যাপেনড্, টেল মি, তোমার ওটা হয়নি তো, আজ খুব হবে, তাগড়াই একটা পুরুষ বসিয়ে রেখেছি দরজায়, ফিরেই পাবি, বল কী হয়েছে।

কুকুর একবার মনোময়, একবার গাছ, দু-দিকে আগুনভরা চোখ নিয়ে তাকাতে লাগল আর গর্জন করতে লাগল। তখন ডোরাকাটা আবার ছুটে এল তার দিকে। মনোময় দেখতে পাচ্ছিল পূর্ণিমার চাঁদের উপর দিয়ে পাতলা একরাশ মেঘ ভেসে যাচ্ছে। আলো কমে ছায়া পড়ল। ডোরাকাটা গর্জন করে উঠল, এই, হু আর ইউ?

মনোময় শীল।

হু ইজ মনোময়?

সন অফ মনোতোষ।

হু ইজ মনোতোষ?

চন্দ্রাবলী জানে।

হু ইজ সি?

রত্নাবলী জানে। বলতে বলতে মনোময় দেখছিল কুকুরি আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে বুড়ো শিমুলের দেহখানি। আর তখনই ঘটে গেল অদ্ভুত কাণ্ড। বুড়ো শিমুলের প্রাচীন দেহ আর সহ্য করতে পারল না। একটা বুড়ো আর কত পারে। কত কৌশলে এই গাঁ উজাড় করা নগরে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, আর উপায় নেই। তার কাণ্ডটি দু-ভাগ হয়ে গেল। আর যেতেই ভিতর থেকে—কে ও? স্বর্ণগোধিকা এক।

সোনার বরণ তার অপরূপ রূপ।
দশদিক হয়ে আছে অখণ্ড নিশ্চুপ॥

ডোরাকাটা হো হো করে হাসতে লাগল। লাভলি, মাই ডার্লিং, আজ আমিই তোর সঙ্গে শোব পাগলি, ঠিক খুঁজে বের করেছিস।

মনোময় চাপা গলায় বলল, একা?

ইয়া, একা, বেটিকে খোঁজা হচ্ছিল অনেক দিন, যখন এদিকের সব পুকুর বোজানো হয়, তখন বেটি গেল কোথায়? এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়াতে দেখেছি, কিন্তু মাগিটিকে ধরতে পারেনি, এতদিনে বুঝলাম, এখানে লুকিয়েছে, গাছটা সেল্টার দিয়েছে।

সোনার বরণী মেয়ে দোসর হারিয়ে দিক খুঁজে না পেয়ে শিমুল গাছের কাছে এসেছিল, শিমুল গাছ, শিমুল গাছ?

কী বলো, কী?

আমার সে গেল কোথায়?

সব চলে গেছে লাঙলপোতার দিকে, হয়তো ওদিকে।

না সে বলেছিল যাবে না, থেকে যাবে, সে বলেছিল সে আর আমি থেকে যাব, যতই শহর হয়ে যাক, নগর খেয়ে ফেলুক আমরা দুটিতে থেকে যাব, জম্মো থেকে আছি, মরণ অবধি থেকে যাব, থেকে যাব আর বলে যাব কেমন ছিল আমাদের গ্রাম, আমাদের জন্মভূমি।

গাছ বলল, তোমাকে খুঁজছে। দেখামাত্র শুট করবে, এসো মা তোমায় লুকিয়ে রাখি, যখন চাইবে আমি তোমায় বের করে দেব, অন্ধকারে মাঠে খুঁজে বেড়িও তাকে।

ডোরাকাটা বলল, কত্তদিন হয়ে ম্যায় উসকি ঢুঁড়তা, মাগির রূপ দ্যাখো, হন্ট!

স্বর্ণগোধিকার গায়ে এসে জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে যাচ্ছিল। সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। ডোরাকাটা রক্ষীবাহিনী আর উদ্যত রাইফেল দেখে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। কতদিন এদের ফাঁকি দিয়েছে।

ধর ধর ধর, ওই যে পালাচ্ছে...যাহ্...মাগিটাকে ধরতে পারলে এমন শিক্ষা দেব...।

গাছ গাছ আমার সে কই? ঘুরে শরীর বাঁকিয়ে রূপবতী ডাকল।

মনোরমা বলল, লাঙলপোতা বস্তিতে, যেখানে সব উচ্ছেদ হওয়া প্রাণী গিয়ে মাথা গুঁজেছে, চাষা চাষিনি কুমোর কামার ধোপা ধোপানি, মাদার গাছ, বট অশ্বত্থ আম জাম চালতা আমড়া থেকে পাখপাখালি, খরগোশ বেজি থেকে কৃষ্ণগোধিকা স্বর্ণগোধিকা, তোমার দোসর ওদিকে আছে, তার এখন থেকে থেকে জ্বর আসে, তোমার জন্য কাঁদে।

অ্যাই চুপ। গর্জন করে উঠল ডোরাকাটা

স্বর্ণগোধিকা তখন আর নিষেধ মানল না। ছুটতে লাগল। আর তা হতেই ডোরাকাটা চিৎকার করে উঠল, পালাচ্ছে পালাচ্ছে, মোস্ট ওয়ান্টেড, খতরনাক মাগি, ফায়ার।

মেঘ চলে গেলে চাঁদের আলো আবার নেমে এল। সেই চন্দ্রালোকিত প্রকৃতিতে সে পড়েছিল উপুড় হয়ে। তার সোনালি বরণে জ্যোৎস্না ক্ষরে যাচ্ছিল। রক্তের ধারা পিঠ থেকে গড়িয়ে শুকনো মাটিতে পড়ে শুকিয়ে এসেছিল। মনোময় বিড়বিড় করছিল, লাঙলপোতায় দোসর ছিল, সে শুধু জ্বর নিয়ে একা একা কাঁদে।

হোয়াট আর ইউ টেলিং?

নাথিং

মাগিটাকে চেনো? বলতে বলতে অপরূপ স্বর্ণগোধিকার দেহটি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে উল্টে দিল ডোরাকাটা। বলে উঠল, মেয়েছেলেটা বলছিল জমি ছাড়বে না, বহুদিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল।

মনোময় থমথমে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখছিল ঈষৎ হলুদ রঙের পেটটিতে লম্বা জড়ুলের চিহ্ন। আদরে জায়গা। সে মাথা নামিয়ে দাঁড়াল। বলল, ইনি থাকলে লক্ষ্মীশ্রী ফিরত।

হোয়াট?

ধনধান্যে পুষ্পে ভরে যেত সব। তুমি কালকেতু ব্যাধের কথা জানো না।

লোকটা তখন মৃত সোনালি নারীর দেহের সামনে দাঁড়িয়ে প্যান্টের জিপার খুলল, মৃতার গায়ে প্রস্রাব করতে করতে বলল, লাশ চলে যাবে, অপারেশন ফিনিশড্, চলুন মনোময় শীল, আপনি যে এই খতরনাক মাগিটাকে খুঁজে বের করে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, মেয়রকে আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, অথরিটি এখনই জেনে যাবে সব, চলুন, কাজ শেষ, লাভলি কাম অন ডার্লিং।

অনেকক্ষণ বাদে গাড়ি চলছিল। ডোরাকাটা হাসছিল আর গান গাইছিল, আজ জ্যোৎস্না রাতে সব্বাই গেছে বনে, সব্বাই গেছে বনে...। গাইতে গাইতে নেমে মনোময়ের দিকে চেয়ে হাসল, এটি মেয়রের প্রিয় গান, বুইলেন, আপনি যেভাবে আমাদের আজ সাহায্য করেছেন মনোময় শীল...এবার টেররিস্টরা একটু থমকাবে, ওই মাগিটাই ছিল ব্রেন, ওই-ই সব করাত।

মনোময়ের ঘাড় ঝুলে পড়ল। আবার সে বধ্যভূমির দিকে চলেছে যেন। বধ্যভূমির সীমানা কখনও শেষ হয় না। শেষ হয় না।

পশ্চিম গগনের বিষণ্ণতা

সাধন চট্টোপাধ্যায়

কলিংবেলটা বেজে উঠল কি কোনো ফন্দি এঁটে, নাকি কাকতালীয়?

ফ্ল্যাটের ভেতরে কিছু-সময় ধরে সরমা বিছানাতে আছেন বুকধড়পড় উপসর্গটি নিয়ে। অনেকটা অসহায় পড়ে আছেন। হাতড়াচ্ছিলেন বালিশের পাশেই ডিয়াংজিট্ ট্যাবলেটের পাতাটি সাজানো ছিল যে, এখন কোথায়? পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। শরীরে বুকধড়পড় উপসর্গটি দেখা দিলেই সরমা অসহায় বোধ করেন। চারপাশ দিয়ে কেবলই ঘরের দেয়ালগুলো কুঁচকে ছোট্ট হয়ে যাচ্ছে, ভয় লাগে এই বুঝি কেউ দরজা খট্‌খটিয়ে হুড়মুড়িয়ে 'গলা টিপে ধরবে ঢুকে পড়ে। এক ফোঁটা বাতাস মিলবে না সরমার। কী যে কষ্ট। উঃ। কী যে কষ্ট। ধড়পড়ানি চিন্তাব্যাকুলতায় উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। তখন চট্‌জলদি পাতা ছিঁড়ে ডিয়াংজিট্ ট্যাবলেট এবং আধগ্লাশ জল।

পুরো দেহটিই রোগের ডিপো। রক্তচাপ, গাঁটব্যথা, কোলোস্টরেল, হার্ট, হজম, গ্যাস—কিছুই নিঁখুত নেই। মাসোহারা মুদি, শাকসব্জিপৌঁছেদেয়া ছেলেটার মতো, পাড়ার 'দি মেডিসিন'-এর করেকম্মেখাওয়া মালিক-ছোকরাটি—ডাকু নাম—খোঁজখবর নিয়ে ফর্দমাফিক ওষুধ পৌঁছে দিয়ে যায় তিনতলাতে। প্রেসারে অ্যাম্‌লোডাক, গাঁট ব্যথায় ব্রুফেন, ঘুমের জন্য ক্যাম্পোজ, হার্টের প্রয়োজনে ল্যানসিন্, অম্বলের জিন্‌ট্যাক—আরও কত কিছু। ডাকু ঠিক ঘরের ছেলের মতো। সরমা যে অজস্র শারীরিক খুঁত নিয়েও মাঝেমধ্যে বেঁচে থাকাকে ভালোবেসে ফেলেন, দক্ষিণের জানলা খুলে হঠাৎ-হঠাৎ টুকরো নীল দেখে মুহূর্তের দীপ্তিতে জেগে ওঠেন—ট্যাবলেটের পাতাগুলোর ঠেকনোয়।

দ্বিতীয়বার বেলটাকে বাজানো হল।

অন্যান্য উপসর্গের তুলনায় সরমা টের পান বুকধড়পড়ানি অনেক, অনেক বেশি দুর্মর। ডিয়াংজিট যতক্ষণ পেটে গলে গ্রেডিয়েন্ট ঠিকঠিক রক্তে না মিশছে, ভয় বিদূরিত হতে চায় না। মনে হয়, চিন্তার কোথায় যেন তালা পড়ছে, আতঙ্ক নিয়ে গলা টিপতে অচেনা কেউ রহস্যে বাজাচ্ছে কলিংবেলটা।

সকাল-বিকেলে নয়, ঠিক কাকের ডাকবারা দুপুর বা গভীররাত—চট্‌কা ঘুমটুকু ভেঙে গেলে ট্যাবলেটের পাতাটি তাই হাতের কাছে রাখেন। শচীন চলে গেছেন দেড়বছর হল। নিঃসঙ্গ জীবনটাকে চলমান রাখতে, সরমাকে উপসর্গগুলো জোড়াতালি দিতে হয়। কোথায়? কোথায় আমার ওষুধ? হতাশ হয়ে মেয়েলি-কটুবাক্য তিনি অঞ্জলির উদ্দেশে নীরবে ঝাড়লেন।

ঘরমোছা-বাসনমাজার কাজের মেয়েটি সম্পূর্ণ পেশাদারিণী। টেবিল, বিছানা, আলমারি, তাক, জলের বোতলের র‍্যাক্—কোথাও সে উজিয়ে অতিরিক্ত হাত-ফাত দেয় না। বালতি, ফিনাইল, ভিমবার, কসকোবাইট্, বেসিন সাফাসুফো—ঠিকঠিক আপন এক্তিয়ার ছেড়ে

বাড়তি সব কিছুতেই উদাস। সরমার ঝামটি জোটে না দুর্গার। লাইনের পাশের ঝুপড়ি থেকে আসে।

সরমাকে সেবা করে যে, অ্যাটেনডেন্ট বলে কেউ কেউ, আয়াসেন্টার থেকে আনিয়েছে যাকে, বড় তরোখরো। এটা সাজানো, ওটা গোছানো, মাসিমা-মাসিমা সম্বোধনে গলিয়ে, ঘরটিকে অচেনা করে দিয়েছে সরমার চোখে। এটা পায় তো ওটা হাতড়ায়। নিত্য নতুন গোছানোর কী যে ঠ্যালা! নিজের সংসারই আজ সরমার কাছে গোলকধাঁধা। মাঝেমধ্যেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে সরমার। অঞ্জলি বোকাবোকা হাসিতে বলে, ওই তো মাসিমা! আপনার হাতের কাছেই গুছিয়ে রাখলাম।

থাক্। অনেক হয়েছে। আমারটা এখন তোর চোখ দিয়ে দেখতে হবে?

অঞ্জলি এই শিক্ষিত অভিজাত খোঁচাটি ধরতেই পারে না। সতেরো বছরের আয়াজীবনে গু-মুত ঘেঁটে মনের সব তক্‌মারি ঘষে তুলে ফেলেছে। সরমা অবিশ্যি পরক্ষণেই বোঝেন দুহাজার টাকায় যা সার্ভিস দেয়—কোথাও জুটবেনা। অভাবি সংসারের তো, বিশেষ লেখাপড়া শেখেনি, বরখ্যাদানো, গেঁয়ো টাইপের ; তাই মায়া-মমতা, মানুষের জন্য মনকাঁদা টাঁড়-জমিনের মতো খটখটে রসকসহীন নয়। সকাল আটটায় এসে যায় রাত করে। ঘড়ির দিকে তাকায় না। অঞ্জলি প্রায়ই পুরনো বিশ্বাসের মজার কথা বলে। রস পান সরমা। হয়তো কোনো বিশেষ-কথা শুনে নিঃসঙ্গ, আত্মীয়হীন সরমার কাছে একটি শৈশব ছলছল্ ধরা দিয়েই যায় মিলিয়ে।

হঠাৎ অঞ্জলি হয়তো বলে বসল, আজ কুটুম আসবে।

কেনরে? সরমা অবাক।

ওই যে কুটুমপাখি ডাকছে?

ধ্বস্ত দেহে মনে মনে হাসেন সরমা। হাল্কা বোধ করেন। সামান্য ভাঙাচোরা একটা ছোট্ট বেলা দুলতে দুলতে হাজির।

ফ্ল্যাটের তলাতেই রাস্তাজুড়ে যে—বাজার, অঞ্জলির আগবাড়িয়ে টুকটাক কিনে আনার শখ। মোচাটি, থোড়, শাক।

সরমা হয়তো মুখ ফসকে বল্লেন, কুমড়োশাক পেলে আনিস তো। ...ফালিটাক কুমড়ো সঙ্গে... মিলিয়ে মিশিয়ে ঝোল-ঝোল রান্না!...কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে।

আলটপকা অঞ্জলি, মায়ে-ছেলে এক সঙ্গে রাঁধতে নেই।

সরমা প্রথমটা হাঁ, মর্মটি ধরতে মিনিটখানেক লাগে। কুমড়োশাক হল মা, ফল—কুমড়ো, তার ছেলে। একসঙ্গে কুটে রান্না করতে নেই।

তো, অঞ্জলি ডিরাংজিটের পাতাটা কোথায় সাজালো? মানে হয় কোনো? টেবিলে উঠে এল কী করে? সামান্য খোঁজাখুজির পর পেতেই, উনি ছিঁড়ে একটি মুখে ফেলে, জলের গ্লাশটা হাতে নিলেন।

তৃতীয় বার একটু অধৈর্যের বাজনা বাজল কলিং বেলটাতে।

সরমা কাঁধের অংশ শাড়িতে ঢেকে দরজার উদ্দেশে এগোলেন। বুকের কষ্ট কমেনি। আস্থা জাগছে, ধীরে ধীরে রক্ত ডিউটি সুরু করলে পীড়ন কমতে কমতে যাবে।

নমস্কার।

তিন-তিনটে ঝকঝকে চেহারায় যুবক। নিখুঁত গাল, চশমা, টাই, হাতে সেল-ফোন ও ফাইল। ধবধবে দাঁতের পাটিতে হাসি দিল।

ভেতরে ঢুকতে পারি, ম্যাডাম? আর কে আছেন ভেতরে?

সরমার চোখে ইতস্ততভা। জবাব দিলেন না। খানিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ইঙ্গিতে জানালেন, আ-সু-ন।

ওরা ঢুকে রুমালে যার যার কপালের ঘাম মুছে, চাপাচাপি বসল একমাত্র সোফাটায়। পুরনো, সস্তাদরের ও খানিক লম্বা। খালি স্পেসটুকুকে বারান্দা কাম ড্রয়িংরুম বলা যেতে পারে। ওরা বসে পড়তেই আচমকা যেন সরমার বুকে অস্বস্তির ঘা লাগল। সংস্কারের। অসুস্থ শচীন চিরবিদায়ের কিছু দিন আগে থেকে, ওটাতে মুখগোমড়া বসে থাকত। বিশেষত বিকেলে। প্রস্ট্রেট্-এর ক্যান্সার নিয়ে লড়ালড়ির পর, ডাক্তার যখন জবাবই দিয়েছিলেন, তখন দুপুরটা হেলে পড়লেই শচীন গিয়ে ওখানে বসতেন। একটা ফ্যানের বন্দোবস্ত করেছিল সরমা যে-জন্য। পশ্চিমের জানালাটি খুলে দিতেন সরমা। মেঘ, ক্রমশ হতে-থাকা ঠিকরনো রংগুলো দেখিতে দেখিতে বিধুর বেদনায় একটি আলোহীনতার আস্তরণে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া গেলে শচীন মজুমদার ঘরে উঠিয়া আসিতেন।

কেউ ওটায় বসলে এখন সরমা স্বস্তি পান না। সরিয়েও রাখেন না ওটাকে। স্মৃতি হিসেবে পুরাতনের আস্তরণ নিয়ে সোফাটা পশ্চিমমুখো বসানো। আজ অঞ্জলি ডুব দিয়েছে। অনুপস্থিত। নইলে ঘরে ঢুকে অঞ্জলিকে দিয়ে ছেলে তিনটির ওখানে বসা বদলে দিতে পারতেন।

মাসিমা, দু-চারটে কথা ছিল আপনার সঙ্গে। ...পাঁচ মিনিটের বেশি আপনার সময় নষ্ট করব না।

কী মনে হতে, শুনেই চশমার আড়ালে ভারি চাউনিতে তাকিয়ে, ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে, ভেতরে ঢুকে এলেন। আয়নার সামনে শাড়িটা ঠিকঠাক করলেন, গলায় গালে পাউডার-পাফ্‌টা একটু বুলোলেন, ই-স্। সিঁথির চুল উঠে গিয়ে চওড়া হয়ে পড়েছে। ভালো করে চট্‌জলদি চুল আঁচড়াতে গিয়ে গোছার জটে চিরুনিটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

কেউ আসবে।

সরমার কাকতালীর আতঙ্ক, এরা কোনো বদ মতলবে নয়তো? মেরে রেখে দিয়ে উদ্দেশ্য সারার পর সরে পড়ল। ফ্ল্যাট দরজাগুলোর বিচ্ছিন্নতা একাকীত্বে ক্রাইমের আর দিন-ক্ষণ-সময়ের কী প্রয়োজন? সোফায় বসাটাই অশুভ লক্ষণ।

এইতো দিন পনেরো আগের ঘটনা, ডাকু ঢুকেছিল।

কই মাসিমা, কী কী ফুরলো, বলুন?

যাচ্ছি বাপু, দাঁড়া।

অ্যাম্‌ব্রোড্যাক আছে?

আছে।

ডাওলিন? ব্রুফেন?

দাঁড়া, দাঁড়া! ...ঘোড়ায় জিন্ লাগিয়ে এলি যেন?

সরমা ঘর ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়াতেই, ডাকু সবে পুরনো আসনটায় কোমর ঠেকাতে যাবে, দেখতে পেয়েই উঁহু! উঁহু! বলে উঠেছিলেন। 'ঘরে আয় বাপু!'

ডাকু চমকে ভেতরে ঢুকে বলেছিল, কেন? পনেরো দিনের ওষুধগুলো লিখে নিতাম কেবল। বিকেলে আমার দোকানের ছেলেটা পৌঁছে দিত।

সংস্কারে সরমা মাতৃবৎ স্নেহময়ী। ডাকুর চুলে-মাথায় হাত বুলিয়ে ম্লানমুখে 'তোর মেসোমশায় শেষ দিনগুলোয় ওখানে বসতেন কিনা!' থুতনি কাছিয়ে ডাকুর কল্যাণে আঙুলে চুমু খেলেন। ডাকুর বাবা অমরেশ ছিলেন শচীনের শেষ-জীবনের বন্ধু। শেষ সম্বলটুকু ঝুঁকি নিয়ে বেকার ছেলেটাকে দাঁড় করাতে মেডিসিনের দোকানটা দিয়েছিলেন। আজ তিনি নেই। ডাকু দাঁড়িয়েছে মোটামুটি। দোকানের দু-দুজন কর্মী। তিন তিনটে পরিবার নিশ্চিন্ত আছে এটির ওপর। এলাকার বেশ চালু দোকান।

যে-বউটা পক্ষকাল পরপর চাল দেয়, ওই বারান্দার সোফাটিতে বসে গালগল্প করতে বসলে, অঞ্জলিই পাটকে দিয়েছিল।

নিচে বসো তো বউ। মাসিমা দেখলেই ঝামটে উঠবেখন।

কেনরে দিদি? গরিবরা এট্টু গদিতে বসবেনি? এতই মন্দ কপাল?

অত বাপু জানিনে! কাউকে বসতে দেন না উনি।

বউটা নাকি আসে চাকদহের বহু ভেতরের একটা গাঁ থেকে। কালো মাড়ি, তেঁতলে বিচের বর্ণ, স্বাস্থ্যল শরীর, টিকলো নাক। চোখজোড়া মা মনসার মতো। চা দাও তাকে, রুটি দাও, পান সাজে দাও—চেয়েচিন্তে নিতে কোনো বাঁধ নেই। সরমা মাঝে-মাঝে বিরক্ত। কিন্তু বউটা ভালো গল্প বলতে জানে, চাল দিতে এলে ওঠার নাম নেই। ঘন ঘন তার স্বামী বদলানোর গল্প। প্রথম রাতের সব রকমের অভিজ্ঞতার কথা।

বিড়েল পোথম্ নাতেই মান্তে হয় মাসি!

কেমন তা?

যেটা এখন সঙ্গ করে...হাত দেয়ার আগেই বমুম মুয়ে গন্ধ পাচ্ছি যেন? তখন সেই মুখটা কাছে আনলে।

চুপ কর। সরমা বাধা দেয়।

দিনু কামড়ে...।

এ্যা-ই মেয়ে।

বে-শ, চলি গো!...খারাপ লাগলে বয়ে গেল বলতে।

সরমা তখন আমতা-আমতা গলায়, রাগ করলি? ইঙ্গিতে অঞ্জলিকে দেখিয়ে বল্লেন, আস্তে! কী ভাববে বল তো!

কৈ পান দাও গো।

তোর সেই মুসলমান বরটা...কী যেন নাম ছিল...সরমা মৃদু হাসেন।

বাব্বা:। তিনি তো আলো নিবুতে না নিবুতে...

থাক্! থাক!

তবে থাক। ...উঠছি গো...!

তোকে উঠতে বলুম? ফিসফিসিয়ে কথা বলা যায় না?

সেই বিজলীরানীকেও ও-গদিতে বসা বারণ করা হয়েছিল। মাছ, সব্জি, মুদি, মশলা—ভিন্ন ভিন্ন ছেলে-মরদরা যখন মাল নিয়ে তিনতলায় ওঠে, কাউকে ঘরে, কাউকে বা বারান্দায় বয়েআনা টুলে বসতে দেওয়া হয়। দিন রাত্তিরে কতটুকুই বা তাদের বসে কাটানোর সময়?

গত দেড় বছর ধরে শচীনের অবর্তমানে, সরমা এইসব পথ-ঘাটের আত্মীয়তা ও বন্ধনে নিঃসঙ্গতা টেনে নিয়ে চলেছেন। অঞ্জলি সংসারে এখন পড়েপাওয়া চোদ্দআনা। মাঝেমধ্যে টুকিটাকি হাতড়ে না-পাওয়ার অভ্যাসভ্রষ্টতায় সরমা বুক ধড়পড়, হন্তব্য হবার আতঙ্কে সেবিকাকে কটুবাক্য ছুঁড়লেও, বোঝেন অন্ধের লাঠি বলতে কী বোঝায়। স্বামীর মৃত্যুর পরপর, জ্ঞাতিরা আসত, কিছু পড়শি, এজেন্সির ছেলেপুলে দুচার জন—বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, সরমা তাদের কাছে টেলিফোনে খোঁজখবর নেয়ার সম্পর্কে এসে দাঁড়ালেন। তাও কালেভদ্রে।

এখন তো কাজের মেয়েটা দুর্গা, অঞ্জলি, ডাকু, বিজলীরানী, আলু-আদা দিয়ে যায় বৈদ্যনাথদের দেখভালে ভয়-আতঙ্ক-স্মৃতিও নবতর জীবনরসের টানে তিনতলায় সরমা 'শচীন'কে নিয়ে থাকেন। ট্যাবলেট-নির্ভরতায় বেঁচে থাকারপ্রতি গ্লানি জমলেও, টিকে থাকার আসক্তি সর্বজয়ী। তাইতো এত ভয়, এত আতঙ্ক। এই বুঝি নির্জন ফ্ল্যাটে লাশ হয়ে গড়িয়ে পড়ে থাকবেন! মনেই হয় না, চৌষট্টিটি বছর তো টানা বেঁচে রইলেন। কোটা তো পূরণ হল। অবিশ্যি বাঁচার কোনো কোটা হয় না।

সরমা একটা মোড়া সঙ্গে নিয়ে ফিরতেই, দলটার নেতা কথা বলে। নিশ্চয়ই এ-বয়সে ওষুধ সঙ্গী? কী কী ধরনের? আমি বলছি, মিলিয়ে নিন আপনি। ছেলেটি এবার ফাইলের একটা কাগজে টিক্ মারতে মারতে যে-যে ওষুধগুলো বলে গেল, ডাক্তুর তালিকা থেকে ভিন্ন নয়।

নিত্যপ্রয়োজনীয় আর সকল? ছেলেটির দ্বিতীয় প্রশ্ন।

সরমা এত ব্যক্তিগত কৌতূহলে ঘাবড়ে যান।

ধরুন চাল, ডাল, মুদি-মশলা, ডিটারজেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেন বাবা? সরমা সরলভাবে জানতে চাইলেন।

কিন্তু প্রতিপক্ষের হাসিতে তিনি ঢাকা পড়ে গেলেন।

ধরুন, আপনার নিত্যকার আলু-বেগুন-পটল-কুমড়ো...একটা প্রশ্ন রাখতে বাধছে যদিও অনুমতি নিয়ে বলছি...
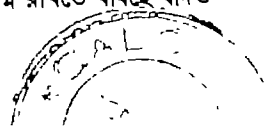
হ্যাঁ, আমি মাছ-মাংস খাই, ডাক্তারের পরামর্শে। সরমা বলে ফেললেন। খুব ভালো মাসিমা। বলেই সে পায়ে হাত রাখতে যায়। কী লাভ বলুন তো অবৈজ্ঞানিক সংস্কারের ভিক্‌টিম হয়ে? জীবন একটাই, সময়ও আপনার একটা। 'এখন' বলি যা। বাঁচব একবারই। তাহলে পুষ্টি নিয়ে বাঁচব না কেন? যদি কারও সঙ্গতি থাকে?

সরমা যেন স্বপ্ন দেখছেন। কী এদের উদ্দেশ্য? নানা বর্ণের কথায় ঘরখানা ক্রমে ছবি হয়ে উঠছে যেন। খুব বড় ধরনের প্রতারক কি? এ-ফ্ল্যাটে কিছুই নেই সরমার। সোনাদানা, অলঙ্কার, ক্যাশটাকা—সবই পাড়ার ব্যাংক এবং ভল্ট-য়ে। যা রেখে গেছেন উনি, দু-দুটো নিঃসন্তান সরমার তিন-তিনটে জীবন কেটে যাবে। ওরা কাগজ-ফাইল-ডট্ নিয়ে কী সব হিসেব-টিসেব সারল।

মাসিমা, সব যদি আমরা যোগান দেই? ...আমাদের হিসেব বলছে...

সরমার মনে হয় প্রতারক হলে এতক্ষণে যা-ঘটবার ঘটত। তিনি কিছুটা ডাকু, বৈদ্যনাথ, বিজলীরানীঘেরা স্বচ্ছ-স্বাভাবিকতা বোধ করলেন। মাসের এক দুই তারিখে যদি পৌঁছে দেই? আমাদের টেলিফোন নম্বর...

একটা কুটুমপাখি ডাকল যেন? তুই কি ডুবদেবার দিন পেলিনা অঞ্জলি। ছেলেটি বলে, আপনি মায়ের মতো, কোনো কিছু আড়াল নেই, ধরুন আমরা আপনার ফোনটি পেয়েই সব কিছু তিনতলায় পৌঁছে দেব, ফ্রেস্ আর বাজার থেকে শতকরা দশভাগ কমে?

তিনতলায় উঠবে বারে বারে? আমার ছেলেরা তো দিতে আসে?

ছেলেটি বলে, আমরাও আপনার ছেলে। কুন্তীর কি শুধুই পঞ্চপাণ্ডব ছিল?

সন্তানহীনা সরমা অকস্মাৎ বিগলিত। মহাভারতীয় একটি ঐতিহ্যিক অনুভূতি তাকে বিহ্বল করে তুলল। কুমারীগর্ভে কর্ণের জন্ম। অস্তাচলসূর্যের ম্লান আলোয় সরস্বতী-তীরে পৃথা প্রাণের টানে পঞ্চপাণ্ডবের বাইরের আত্মজটিকে আপন শিবিরে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন।

কেন? এসবের হেতু কী তোমাদের? সরমা জানতে চাইলেন।

ছেলেটি সাবলীল হেসে, নব ধর্মপ্রতিষ্ঠায়!...জীবন আরও সহজ ও সঙ্গতিময় হয়ে উঠুক।

সরমা প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন না।

দিন পনেরো পর। সন্ধ্যা লাগে লাগে। ঘনঘন কয়েকটি কলিংবেলের আওয়াজে সরমা ত্রাসে বল্লেন, দেখ তো অঞ্জলি কারা কী চায়?

বুকটা ধড়পড় হতে থাকে। ওষুধ হাতের কাছেই। ডিয়াংজিট্ আজ তো খেয়েছেন দুপুরে। দুদিন আগে ডাকু বউ নিয়ে অভিমান করে গেছে। কলিংবেলের আওয়াজ আজকাল আতঙ্ক বয়ে আনে। পক্ষকাল ধরেই খুব নির্জন বোধ করছেন। প্রয়োজনবোধই মানুষকে মানুষের খোঁজে ছোটায়। সরমা চাইলেই সব পাবে এখন, সাজানো গোছানো। তবু মহাভারতীয় একটি অজ্ঞাত দুর্দশা তাকে প্রায়ই ঘিরে ধরছে। ট্যাবলেটের গ্রেডিয়েন্টগুলো আপন রক্তে শুষে নিতে সময় নিচ্ছে অনেক বেশি।

অঞ্জলি দরজার উদ্দেশে গেল তো গেলই। ফিরে আসে না। কোনো বিপদের চিহ্ন এটা? নিজেই সরমা উঠে গেলেন দরজার দিকে। কোথায় অঞ্জলি? ডোর-পাল্লাটা হা হা খোলা। অকল্যাণময় পুরনো সোফাটায় চেপেচুপে ঘেষাঘেষি ডাকু, বৈদ্যানাথ, বিজলীরানীরা চোয়ালঝুলিয়ে ভাঙা গালে পাথরের চোখ নিয়ে পশ্চিমের জানলাটার প্রতি তাকিয়ে। তৈলহীন রুক্ষচুল, শোকের পোষাক সকলের শরীরে। যেন হুড়মুড়িয়ে একত্রে সবাই সরমার পা জড়িয়ে ধরবে। এখন যার যার কোলে পোষ্য শিশুসন্তানরা ঝিমিয়ে, ঘুমিয়েও বা।

সরমা জানতে চাইলেন, তোমরা? ওমাঃ। ওখানে গিয়ে বসলে কেন?

ইহারা উত্তর করিল না। জানালাপথে তাকাইয়া রহিল। মেঘ ও ঠিকরানো বর্ণগুলার ক্রমশ হইয়া-ওঠা দেখিতে দেখিতে বিধুর বেদনায় একটি আলোহীনতার আস্তরণে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া গেল।

অঞ্জলি মৃদু ধাক্কা দিতে দিতে বল্লে, গোঙাচ্ছেন কেন? বেদ্‌নাটা বাড়ল? ব্রুফেন খেয়েছেন তো?

দম নিয়ে উঠে বসে সরমা দুঃস্বপ্নের রেশে আঁতকে থাকেন। আস্তে আস্তে বল্লেন, কারা সব এসছিল রে?

অঞ্জলি হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

রমণী ও পাহারাদার

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

(১)

তে-মাথানি মোড়। এদিকটায় এখনও সিমেন্টে গোড়া ঘিরে লাল লেটার বক্স চালু। বক্সটার মাথায় গোলাকার ধাতব টুপি। জল গড়িয়ে যায়। চিঠি ঢোকবার ফোকরটুকু মানুষের হাতে হাতে মরচেহীন হয়ে চকচকে।

পাশ দিয়ে ফুটপাথ এখানে নিচু। পথচারীদের মধ্যে সত্তর একাত্তর বছর বয়েসি মানুষটি থমকে দাঁড়ায়। লেটার বক্সটার কাছে গাঁদার মালা জবা তুলসি আকন্দ ফুল ব্যাপারী মেয়ে বউরা বলে, কী নেবে গো দাদু?

একুশ বাইশ বছুরে মেয়েটার কানে মোবাইল। যত হাত নাড়ায়, গা দুলিয়ে উত্তর দেয়, বুকের ওড়নাটা খসে খসে সরে যায়। চুড়িদারের উপর টাইট পাঞ্জাবিতে শরীরটা কে ভরাট।

শাড়ি ব্লাউজে রোগা লম্বা মেয়েটা ফুলওয়ালিকে বলে, ও মাসি—দাদু দিদার খোঁপায় দেবার রজনীগন্ধার মালা খুঁজছে

ফুল ব্যাপারী বউটার কপাল জুড়ে বড় সিঁদুর টিপ। হাতে শাঁখা নোওয়া, দিদার কি লক্ষীপুজো? দুব্বো তুলসী আর মালা ঠোঙার বেঁধে দুবো?

দাদুর হাতে ছোট্ট বাজারি ব্যাগ। বাঁধা সবজি দোকানটায় কিনতে যাচ্ছে নিমপাতা আর উচ্ছে। পাশে মাচা খাটিয়ে ফল দোকান। দোকানি ছোকরা বলে, থাম না তোরা। দাদু এখানকার বহুদিনের লোক

ছোকরা ফল দোকানির কথায় খুশি, ঠিক বলেছ। ছোটোবেলায় কত চিঠি ফেলেছি— ডাকবাক্সটায়। দেশে একটুও জং ধরেনি, চকলা ওঠেনি। ব্রিটিশ আমলের জিনিস তো?

চুড়িদার পাঞ্জাবি পরনে মেয়েটার ফোন থেমে গেছে। দাদুকে বলে, বাব্বা সেই কথা এখন উছলে উঠছে মনে...। দিদাকে কি চিঠি লিখে ভাব নাকি গো...

—দুস্। তবে তোমাদের মতো ওই কান কামড়ানো যন্তরটা হাতে আসে নি

চুড়িদার একটু গা চলকিয়ে শোনায়, বড্ড দুঃখু না?

ফল দোকানির ছাউনি-বাতায় ঝুলোনো বাল্বের আলো পড়ায় ব্যাপারী মেয়েদের ফুলে তবুও মোমবাতি জ্বেলেছে ফল দোকানির টুলটার আড়ালে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া মোমবাতি জ্বলছে। সেই আলোয় কয়েন বাছে। নোট পরখ করে।

তিন চাকা রিকশা ভ্যান। ডাকবাক্সটার কাছে দাঁড়ায়। ছোকরা ভ্যানচালক আওয়াজ দেয় কইরে পাখিগুলো? আয়

চুড়িদার-পাঞ্জাবির সঙ্গে রোগা শাড়ি ব্লাউজও ভ্যানমুখো। সিঁদুর টিপ ফুলওয়ালিকে চুড়িদার-পাঞ্জাবি বলে, মাকে জানিয়ে দিও, আজ সারা রাত

পাঞ্জাবির খুঁট ধরে টানে, ও প্রীতি কোন হোটেল রে? যদি মেরে ফেলে টেলে রাখে

—উঁ? বাঁচতে যখন নেমেছি খদ্দের বুঝবো, দাম হাঁকবো তবে বিকোবো। বললেই হ'ল

(২)

একটু রাত বাড়তে জায়গাটা খানিক ফাঁকা। জলধর ফল দোকানির টুলটায় বসে। সোজা চোখে পড়ে, মাস মাইনের কর্মচারী মালিকের হয়ে দামি সেন্টেড ধূপ ধরায় গণেশ লক্ষ্মীর পুতুলে। দু-হাত জড়ো করে গড় জানায়। পুতুল-দেবতার সামনে প্রদীপের বদলে জিরো পাওয়ারের ফিকে সবুজ নয়তো খানিক লালচে ডুম জ্বলে। কোলাপসিবল গেটের দমকা ঝনঝন শব্দ, কাঠের পাল্লার দুড়ুম-দাড়ুম সেটিং—সব মিলিয়ে পাপড়ি গুটিয়ে নেওয়া...ঝিমিয়ে বুজে-আসা বাজারটা জলধরের চোখে দৃশ্য হয়ে ওঠে। ফল দোকানির আলো পুরোনো ডাক বাক্সটার গায়ে।

বড়বাড়ির মেয়ে গরিব যুবকের প্রেমে থই পেতে শেষতক পান সিগারেট পাউরুটি বিস্কুট চিরুনি সস্তা সেন্ট গোপনে চাইলে কন্ডোম সম্ভারে দোকান লাগিয়েছে এদিকটায়। ফরসা গোল গাল মুখ ভরেল টেরিকটনের পাতলা শাড়িতে স্বল্প বেশবাস। ঢেউ ভাসা চোখ দুটোয় কত যে বাড় ঝাপটা গেছে বছরভর। এখন দু-চোখে কূল কিনারার ভরসা। টিনের শিট সেঁটে গুমটি ঘরে দেশলাই সিগারেট থরে থরে সাজানো। সামনের দিকে ফল ফলে সবুজ পানের গায়ে লাল ভিজে ন্যাকড়ার ঢাক। জল ঝাপটায় মাঝে মাঝে বড়বাড়ির মেয়ে। এক কৌটা দু-কৌটা টপে। সামনেই কাচের পাল্লা ঘিরে সেলফোন বা মোবাইল দোকান। দোকানটার মাথায় গ্লো-সাইন আলোয় মস্ত হোর্ডিং। সে আলোয় যে পানের ডগা বেয়ে জলের কৌটা ঝলমলিয়ে কুচো মণিমুক্তো।

পাকা রাস্তার ওপারে ইলেকট্রিক পোস্টের আলো। সে আলো তে-তালা বাড়িটার দেওয়ালে। বারান্দায় গ্রিল ঘেরা। দেওয়ালে বিশাল জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। গলায় ছোট বড় রুদ্রাক্ষমালা বাম হাতে মস্ত ত্রিশূলধারী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। মাথার উপর কাচের ফ্রেমে সাঁটা মহারাজকে একটা প্রণাম জানিয়ে কাঠের চেয়ারটায় বসে জ্যাঠামশায়। বয়স্ক মানুষ। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তো জ্যাঠামশায়ের চেষ্টায় ও বুদ্ধিতে। পাকা রাস্তা ধরে ইরিগেশান জমির উপর পনেরো বিশখানা ঘর বাড়ি ভাড়ায়। সেখানে ছোট বড় দোকান। মাস গেলে তো গরমেন্টের জমি খাটিয়ে ফাঁকতা কলে বড়বাড়িতে কত টাকা! ওই জ্যাঠামশায়ের কাছে লুকিয়ে দেখা করতে গেলে দু-পাঁচ কেজি চাল, একটা ভালো শাড়ি বাচ্চার জন্যে দু-এক প্যাকেট ভালো বিস্কুট দেয়। যদি পাকা রাস্তার ধারে ভাড়া দোকানের একটা দিত আমাদের...তাহলে দোকানটা ঠিকঠাক চালিয়ে..., বড় ঘরের মেয়ে তে-তালা বাড়ির দিকে একবার তাকায়। গুমটির তক্তায় বসে খদ্দেরের জন্যে সকালের সুপুরি কুচোয় রাতে। ধারালো যাঁতির চাপে পাতলা...সরু সরু...।

বড়বাড়ির মেয়ে একটু খাতির জানাতে বলল, ও জলধরদা

—উঁ বউদি, ফল দোকানির টুল থেকে সাড়া দেয় লোকটা।

—তোমাদের দাদা কিন্তু বড্ড রাগী মানুষ

—কে? আমাদের ভোলাদা? পিস্তল দেখায়? না, চাকু মারে? বড়বাড়ির মেয়ের হাতে যাঁতি থমকে যায়। ভাবে, বড্ড তো ফুটফাট কথা...

বাল্বের আলো ডাকবাক্সের মাথা গড়িয়ে কপালের কাছে যে রোদটুপির মতো। যেন একজন খেলোয়াড়। সেই ছোটবেলায় দো-তলা নয়তো ছাদ থেকে এমন মনে হত বড়বাড়ির মেয়ে বীণার। সেই সময় থেকে দেখে আসছে বয়সে মাত্র ক'বছরের বড় জলধরকে। হঠাৎ মনে হল বীণার, জলধরদা তো একটুও সমীহ করছে না আমার কথায়। তবে কি গরিবের বউ হয়ে পান দোকানি বলে? বাপের বাড়ি...আমার বাপেদের বাড়ি কাকা জ্যাঠাদের অত বড় মুদিখানা কাপড় দোকান—সে সব ভুলে গেছে? নাকি আমার গা থেকে মুছে গেছে...। নিজের কাপড় চোপড়...হাতের কনুইয়ে ত্বকের রঙ একটু পরখ করে।

হাতের যাঁতি চালিয়ে সুপুরি শেষ। খালি হাত। চকিতে বীণা নিজেকে মর্যাদায় আনতে বলে, জলধরদা

—কী? জিজ্ঞাসায় বিরক্তি।

—বাবার দোকানের সামনে কী-একটা জটলা গোলমাল হচ্ছিল গো?

—কবে?

—আজ

—কখন বলো দিকি?

—উঁম। কে যেন বলছিল? বেলা একটা দেড়টা হবে

—কী আর। তোমার বাবা অতবড় ব্যবসা ফেঁদেছে, কতজন কর্মচারী। তাদের শুধু খাটাবে—মোটে ছুটি দিতে চায় নে

—তাতে কী? ওরা তো থাকে খায়—মাইনে নেয়

নিজের বুকে জেগে ওঠে জলধরের, উফ্ বাপের দোকানের জন্যে...নাকি বাপের জন্যে মায়া উছলে উঠেছে? অথচ সেই বাপ তো এক কাপড়ে বের করে দিয়েছে..., উচ্চারিত হয় না বরং দু-ঠোঁটে বিড়বিড়িয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ। সে আওয়াজ টুল থেকে বাতাসে আর চাপা মুখভঙ্গি আলোয় ভেসে ভেসে তা বীণার অনুভবে। তাই শুধোয়, কী বলছো গো?

—তা খেলেই বা হপ্তায় দেড় দিন তো কর্মচারী আইনে ছুটি? তাই লেবার অফিসার এসে কেস দিলে। অফিসারকে ঘিরে ভিড়

চারদিকে দোকানপাট প্রায় নিবে এসেছে। পাকা রাস্তায় কোথাও কোথাও আবছা আঁধার। আঁধার চিরে হেডলাইটের জোরালো আলো। আলোর তীব্রতায় জলধর সোজা দাঁড়ায়। লাল আলোটা জ্বলছে নিভছে। তৎক্ষণাৎ মনস্ক মানুষ। খোয়া পিচে চাকার শব্দ। চেনা শব্দে দু-পা এগিয়ে পাকা রাস্তার দিকে। জলপাই রঙের জিপটা ব্রেক কষে জলধর বরাবর। সামনের সিট থেকে মুখ বাড়িয়ে, আই সি বলেন, জলধর?

—স্যার, বলে স্যালুট জানায়।

—তোদের আর ক'জন? তারা?

—সব আছে সার, কাঁধে ঝোলানোর পাঁচ ব্যাটারি টর্চটার কাচে হাত বুলোয় জলধর।

—ব্যাটারির জোর আছে তো? জিপে বসেই জানতে চায় আইসি। তখনই আইসির

কোমর বেল্টের খাপে সেলফোনটা বেজে ওঠে। তাড়াতাড়ি কানে রাখেন তিনি। হুস করে জিপটা বেরিয়ে যেতেই রাত বেড়ে গেল। দোকানপাট সব বন্ধ। সেল ফোনটার বাজনা...আলো তখনও জলধরের কানে। চোখে...।

বড়বাড়ির মেয়ের সঙ্গে স্বামী ভোলা টিকাদার। হাতের ব্যাগে হরদম সস্তার শাক আর বেগুন। টিন শেডের গুমটিতে চাবি লাগায়। দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় দেবতার উদ্দেশে। পরে বলে, জলধরদা—দেখো গো দোকানটা, পাশে তাকিয়ে ডাক দেয়, কই বীণা পাশাপাশি হাঁটে দুই নারী পুরুষ। ক্রমশ ওরা আবছা আঁধারে মিশে যায়। দেখতে দেখতে জলধর খুব অবহেলায় বলে, ধ্যাৎ। আরও যদি মাসে মাসে কুড়িটা টাকা দিতিস? নেহাৎ বাজার কমিটি চাঁদা তোলে—সেই পয়সায় ফাঁকতা কলে পাহারা। তোরা নিজে চাঁদা দিলে তো বলতিস—, জলধরদা ব্যাগটা দিয়ে আসবি চল্। করতিস বাজারে লম্পটগিরি। ভাগিয়ে আনলি বড়বাড়ির মেয়ে। এমন বঁড়শি গাঁথলি চার ফেলে, সে আর বেরুতে পারলো নি। এমন গায়ে গতরে মেয়ে মাছ...। তাকে নিয়ে ঢলাঢলি চুপসোতে এখন তো ফুটপাথের পান দোকানি। সেই চটক পোশাক, পরের বাইক চালিয়ে বড়বাড়ির সামনে সিগারেট ফুকোনো... নেহাৎ তখন এদিকটায় তত মোবাইল তখন এমন করে আসে নি। তবু ভোলার গলায় টোন টোন দেখো না...

জলধর যেন শুরু করতে পারছে না। জায়গাটায় ধীরে ধীরে জনহীনতায়... না, আলো আঁধারি আবছায়ার জন্যে। নাকি বীণা ভোলার দোকান গুমটি...ফোনটার টানে? নাকি ওই থানার বড় দারোগা...ইন্সপেক্টারের কেঠো আলাপ কিংবা দায়িত্বের চাপে।

দোকানপাটে দরজা ঝাঁপ পড়ে গেছে। ভেতর বাইরে অনেক বাল্ব নিভোনো। শুধু মাপা দূরত্বে ইলেকট্রিক পোস্টের আলো নিচ থেকে দূরে ক্রমশ ক্ষীণ। তখন তো চোখ...চোখের পর মনটা চলে যায় ভোলা বীণাদের দোকান গুমটির দিকে। সেদিনের দোকান পাট। রাতে হ্যারিকেন জ্বলত। এখন পাশের দোকান থেকে কানেকশন নিয়ে মাসকাবারি চুক্তিতে একটা চল্লিশ পাওয়ার বাল্ব জ্বলে। সে আলোয় পর পর সাজানো দেশলাই বিড়ি বিস্কুট পাউরুটি পান। খদ্দেরের পয়সা ফেরত দিতে গেলেই সে আলোয় সিকি আধুলি কয়েন ঝকমকিয়ে ঠুন ঠান বাজে যে। সে বাজনা জলধরের বুক চিরে চিরে আরও ভেতরে ঢোকে। ভাবে, তক্তপোশে টিন সেঁটে গুমটি দোকানে কেমন ডেলি রোজগারের ব্যবস্থা। বড়ঘরের অমন মেয়েও কাঁচা পয়সা নাড়া করতে করতে সব ভুলে খাপ খেয়ে গেছে। এত রাতে ভোলার পাশাপাশি বীণা যাচ্ছে নিজেদের ভাড়া করা ডেরায় খেতে। শুতে...

(৩)

—এই জলধরদা, যেন ফিসফিস শব্দে কানে আসে কথাটা। ঘাড় ফেরায় জলধর। দেখতে পায় উত্তমকে। তার গলায় ঝোলানো সুতোয় বাঁধা পিতলের বাঁশি। বে-খেয়ালে নিজের হাতে বাঁশি ধরে নাড়া চাড়া করে।

—কী বলছিস রে?

—যাবি জলধরদা আলুপট্টির দিকে?

—কেন?

—চল না, ফিচকে হাসে উত্তম। হাতে খাটো লাঠি। বার দুয়েক লাঠিটা ঠুকে বলে, মাইরি দাদা—মাল। খলবলে মাল

এতক্ষণ গুম মেরে ছিল জলধর। খানিক খাবিয়ে বলে, এই তোর রোগ শালা—, কথাটা শেষ হওয়ার আগে ট্রেনের ভোঁ. স্নায়ু শরীর কাঁপিয়ে বাম্ বাম্ শব্দ। ইয়ার্ড থেকে চলেছে প্ল্যাটফরমে। ভোর রাতের ফার্স্ট ট্রেন হবে।

—মাইরি দা, সত্যি বলছি পেলাটফরমে সেই তাগড়াই ডাঁটো বউটা—যে উল্টোডাঙা থেকে প্রায়ই প্রাই চেরাই কাঠ বস্তা ভর্তি জ্বালুন বয়ে আনে, সেই মাল

উত্তম বাঁশিটায় হাত বুলিয়ে লাঠি ঠুকে স্বস্তি পায় না। বরং গড় গড় বলে, রঙচঙে শাড়ি, টাইট জামা, কী চকমকি সাজে আলুওলার আড়তে ঢুকেছে রে—। ধরবিনি তোরা...

জলধর একটু গায়ে গাঁটে ভিজে যায়। মৃদু হেসে বলে, দুশ শালা। বাজার কমিটির গারড তোরা। ধরবি তো চোর ছ্যাঁচড়? ওসব কি ধরতে বলেছে বাজার কমিটি?

উত্তেজনায় একটা ঘা খেল উত্তম। মনে মনে বলে, জলধরদাটা কী মানুষরে বাবা?

গলির এই দিকটায় এস টি ডি বুথ নিচে, ওপর তলায় নানা রঙ নানা ডিজাইন হরেক দামের শুধু শাড়ি আর শাড়ি। সঙ্গে শায়া ও ব্লাউজের কাটিং মেসিন নিয়ে জনা দুই অল্প বয়েসি মেয়ে দর্জি। পাশের রুমটায় তো চেয়ার টেবিল আলমারি সাজিয়ে ক্যুরিয়ার সার্ভিস।

সুতরাং গলির গমকল থেকে বেরোয় প্রসেনজিৎ। ঘাড় গলিয়ে বগলে ঝোলানো পাঁচ ব্যাটারি টর্চের সুইচ জ্বালায়। নেভায়। আবার জ্বালায়। সঙ্কেত অতদূর থেকে। জলধর উত্তম দু-জনে একই ঘাড় ফিরিয়ে নিজেদের টর্চটার সুইচ টেপে। এগিয়ে যায় দুজনেই প্রসেনজিৎদের দিকে। দু-একটা বন্ধ দোকান ঘরে ফুল স্পিডে ফ্যান চলার শব্দ। জলধর দেখে বই দোকানের সামনে ফুটপাথে চপওয়ালাদের নেভানো উনুন। রাস্তার ক্ষীণ আলোয় উনুনের গায়ে বেসন পুড়ে বুটি বুটি। রোদ্দুরের তেজ থেকে দোকানির মাথা বাঁচাতে ছাতা খাটানোর শিকটা পোতা। উনুনের কাছ ঘেঁষে যেতেই এখনো তাপ! টগবগে তেলে গরম চপ আর বেগুনির জন্যে কী ভিড় যে খদ্দেরের! চোখে চশমা আঁটা মোটাসোটা বউটাও মুড়ি মাপে। ফুটন্ত তেলে কাঠি দিয়ে চপ উলটে দেয়। কাঁচা বেসন পিঠ তেল পেয়ে কড়া হয়। লাল রঙ ধরে। জলধর থমকে দাঁড়ায় এত রাতে ফাঁকা দোকানপাটের নির্জনতায়। ভাবে, ...অমন স্বাদের চপটাও যদি ভাজতে জানতুম। পাসবই হাতে রোজ দুপুরে ব্যাঙ্কে জমা দিতে যায় বউটা...

এখন মুখোমুখি হয় তিনজন। উত্তম ঠোঁট নাড়াবার আগেই প্রসেনজিৎ বলে, আইসির প্যাট্রল জিপ গেল?

উত্তম হাইফাই করে বলে, কিছু ধরতে পারলি?

—ধরবে কী টা?

—তোর যেমন কাজ নেইরে উত্তম; আলটপকা কথাটা বলে ফেলে জলধর।

—তুমি যেমন জলধরদা..., তাচ্ছিল্যের সুর বাজে উত্তমের গলায়। বিজ্ঞ অথচ ধুরন্ধরের

মতো বলে, একটা কিছু ঘটে গেলে? তখন বাজার কমিটি যদি দোষ চাপায়,—এই তোমরা গারড দাও?

কথাটা...তার সঙ্গে জড়িয়ে আশঙ্কা ভাবায় জলধরকে, তাহলে কী করবি উত্তম?

—আলুওলার আড়তে ছন্দুতি? আর যদি বাজার কমিটির কাজে লাগায় চ্যাংড়া গারডদের বাতিল করো, না হলে গারড খরচের চাঁদা দুবোনি। তখন? আর সিনিমায় টিভিতে সেন্ট সাবানের অ্যাডভাটাইজে দেখিস নি, মেয়েদের গায়ে জামাকাপড় থাকে ব্যাটা ছেলেদের সামনে? ওই মেয়েগুলো বেশিরভাগ বাবুদের বাড়ি বড়লোকের মেয়ে। চাঁদা টাদা সকলে না দিলে মাসকাবারি মাইনে পাবি তোরা..., চরম সত্যিটা বলতে পেরেছে এই বিধায় সকলের কাছে তারিফ আশা করে প্রসেনজিৎ।

—থুং

—কী?

জলধরের প্রশ্নের উত্তর দেয় উত্তম, চাঁদা। অত বড় আড়ত দেয় তো মাস গেলে চল্লিশ টাকা। তাকে আবার ভয়?

নাড়ুর গলায় আক্রোশ ঝাঁঝিয়ে ওঠে। জলধর ড্যাবলার মতো তাকিয়ে। বরং ভাবে, উত্তমের অত কেন। যে যা পারে করুক না। কাঠওলি, গায়ে গতরে গাট্টা সাট্টা মেয়েটা তো সিঁধেল চোর নয়। যার পয়সার জোর গায়ের জোর আছে ইচ্ছে হয় ফুর্তি মারুক না...

—তাহলে—?

উত্তম যেন সন্ত্রাসবাদী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই গম্ভীর। একটু চুপচাপ ভেবে বলে, এ রাস্তায় আমি গার্ড দিচ্ছি। তোরা গোটা বাজারটা একবার রাউন্ড মার। দরকার বুঝলেই জোরে হুইশিল দিবি

—ধুস। যদি পিতলের বাঁশির সঙ্গে সকলের গলায় একটা করে মোবাইল ঝুলত রে...

(৪)

রাত ক্রমশ গভীর। দোকানপাট সব ঘুমোয়। পলিথিন শিটে দড়ি ঘিরে বাঁধা কুমড়ো পেঁপে বেগুন শাক সবজিরাও ঘুমোয়। রেল ইয়ার্ডের পোস্টের আলোর ঝলক এখানেও। গাছটার রোগা শাখা পাতা মাঝে-মাঝে হাওয়ায় নাচে। কেঁপে যায় পোস্টের আলোকরশ্মি। ছোকরা উত্তম অমন গা-গতরে কাঠওলি আর আলুওলার ঘনিষ্ঠ যাপনের কল্পনায় সারা শরীরে তাপ বাড়ে। দোল খায় নির্জন নিঃশব্দতায় দাঁড়িয়ে এ পট্টির মুখে।

পাঞ্জাব পেঁয়াজের খোসা। দোকানির ঝাঁকা বস্তা ফুঁড়ে গন্ধ বেরুচ্ছে। পানের গোছে জল মেরে মেরে এ জায়গাটায় কাদা-কাদা। দাঁড়িয়ে উত্তম। হঠাৎ মনে পড়ে, ক'মুঠো ঢেঁড়স আর পাঁচ ফালি থোড় নিয়ে বসেছিল বেওয়া আকলিমা বুড়ি। পেঁয়াজ ব্যাপারী রশিদ বলে ছিল, ও মেয়ে—উঁহু, এখেনে নয়

—বসি না রে পাখি তোর সামনে। এই তো মাত্র কটা মাল? বেচা হলে উঠে যাবো রে বাপ

—না বলতেছি তো। সামনে বসলে, আমার খদ্দের আসবে কী করে?

—বাপুরে তোর খদ্দের ঠিক আসবে। বিক্রি করে দুটো পয়সা হলে নাতির জন্যে ওষুধ কিনবো রে পাখি, মিনতি জানিয়েছিল গেঁয়ো বুড়িটা।

—হ্যাঁ। আজ ওই বলতেছ, কাল যখন এসে শোনাবে, কেন? রোজ তো এখেনে বসি—এই তাল নারকেল কটা বেচতে দাও—, বেশ পোড় খাওয়া মানুষের বাক্য রশিদের গলায়।

—রশিদদা, বুড়িটাকে একটু বসতে দে না গো

—তোরা কেন ব্যবসার মধ্যে ঢুকিস বল তো উত্তম? বিক্রিবাটার মতো সুযোগ—মার্কেট না পেলে দোকান খুলে লাভ? যেখেনে সেখেনে লোক ব্যবসা খোলে? দেখতে পাচ্ছিস নি—সবকিছু জুৎসই না হলে টাটারাও কি গাড়ি কারখানা খুলত?

—বাব্বা। কী কথায় কীসের তুলনা...।

—তবে? দোকান চলুক আর না চলুক, মাস গেলে তোদের গারড-খরচা চাঁদা তো দিতে হবে। নাকি?

চুপ মেরে তাকিয়ে বুঝেছিল উত্তম, যতই ইয়ার দোস্ত হোক, রশিদ তো এখন কেওশাদার।

স্টেশনের নতুন ইয়ার্ড থেকে ট্রেনের ভোঁ। ঝম ঝম শব্দে প্ল্যাটফরমে গাড়ি ঢোকে। একটা ঘোরে এতক্ষণ উত্তম। আবছা আঁধার চিরে গলি থেকে হেঁটে এসে কেউ চমকে ওঠে। কাছাকাছি আসতেই গলায় ঝোলানো বাঁশি বাজায়। সে বাজনা সংকেত হয়ে ঢেউ খেলে। ছুটে আসে প্রসেনজিৎ। পেছনে জলধর।

সস্তা ভয়েলের গোলাপি শাড়িতে ক্ষীণ আলোর ধাক্কা। মেয়েমানুষটা কাছে আসে, সবজির গাড়ি দাঁড়িয়েছে?

—আগে তুমি দাঁড়াও, বেশ কড়া গলা উত্তমের।

—গাড়ি ফেল হলে? তারপর—, কণ্ঠে তেজ মেয়েমানুষটার। শ্যামলা রঙে লম্বাটে ছাঁদে মুখ চোখ। সুস্বাস্থ্যে দেখনসই। গায়ে সেন্টের ছিটে।

—এতক্ষণ চোরের মতো ছিলে। খেয়াল হয় নি? গাড়ি ফেল হলেই বা—

—চোরের মতো? ওটা তো আমার রোজগার। ধকলের পয়সা...

জলধর প্রসেনজিৎ হাজির। তারা নিজেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

সস্তা ভয়েলের গোলাপি শাড়ি উত্তমের আরও কাছাকাছি হয়, তুমি বললেও গাড়ি ফেল করতে পারি। রাজি? নগদ—

উত্তম পিছু হটে। তিন পাহারাদার ছোকরা মেয়েটাকে তিন জোড়া চোখে বুলোয়। দেখে।

—আমার ব্যাগে বুলাদি আছে। কিচ্ছু...অসুবিধে নেই

অমন তুখোড় মেয়েমানুষ। উত্তম বেকায়দায়। সরে দাঁড়ায়। তখন সস্তা ভয়েলের গোলাপি শাড়ি বলে, চলি গো। সত্যি সত্যি গাড়ি ফেল হলে এক বস্তা কাঠ আনা হবে নি

—ওই তো কাঠ। কাঠের বস্তায় রোজগার হয়। তবুও..., উত্তম জানতে চায়।

—হাই দেখো! এক বস্তার রোজগারে ছেলেপুলের ভাত হল। আমার শাড়ি, হাত খরচ? দু-একখানা গন্ধসাবান মন মাতোয়া সেন্ট..., হাতের মৃদু পরশে উত্তমকে পথ ছাড়তে ইঙ্গিত

করে, যার আছে তার কাছ থেকে কিছু নিলুম। এমনি তো নয়? তোমরা ঘর সংসার করো তো। যাও—, বলতে বলতে কোন দম্ভে-যে পথে পা ফেলে মেয়েমানুষটা। একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ সুতরো সদ্য এক রমণী।

জলধরের চোখে হঠাৎ ভেসে ওঠে চুড়িদার পাঞ্জাবিতে ডাকবাক্সর পাশ ফুঁড়ে ফুলওলিদের প্রীতি। শেষ রাতে কেন যে!

তিন চাকার ভ্যান রিকশায় মাছের ঝড়া চাকন নিয়ে আরও মানুষ আসে। ভোরের প্রথম ট্রেন নগরমুখো হওয়ার ঘোষণা যাত্রীসাধারণকে জানানো যায় যে, এক নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে। দু-নম্বরে কেউ দাঁড়াবেন না, লাইনে কাজ চলছে।

নিম-দাঁতনের বাণ্ডিল। ফুল বেলপাতার পোটলা। মাছ শাকের বোঝা। জিনিসপত্তর সামলানোর হাঁকা হাঁকি।

রেলের টি-স্টল। কাঠের পাল্লা খুলে গ্যাসের ওভেনে আগুন। চায়ের কেটলিতে গরম জলের বাষ্প।

জলধর বলল, উত্তম, ডাকলি যে...?

প্রসেনজিৎ বলে, থাম না। একটু দম নিক

—শালা। আমরা আছি বলে, পুলিশগুলো এদিক মাড়ায় না..., আপশোস উত্তমের কণ্ঠে। নাকি পুলিশের কাছে চাপা অভিযোগ তুখোড় মেয়েটার কাছে চোট খেয়ে!

—বাহা রে! আমরাই তো হাফ পুলিশ। তাদের খাতায় আমাদের গুষ্ঠির নাম পরিচয়...

জোরে সিটি দিয়ে ভোরের প্রথম ট্রেন বেরিয়ে যায়। ঝম ঝম বাজনা। রেল লাইনের ঝাঁকুনি মাটি বেয়ে এখানেও। শেষ রাতের ধরিত্রী কেঁপে কেঁপে ওঠে। সে কম্পন কতদূর থেকে যে...

—ধুস্ ভালো লাগে এসব..., কী অবহেলা যে জলধরের চোখে মুখে!

কাকপাখির ডাক গাছগাছালিতে। পাখিদের ঠোঁট বেয়ে ভোর আসে ধরিত্রীতে। ভোরের হাওয়া লাল ডাকবাক্সর গা বুলিয়ে বাজারের গড়ান পথে বয়ে যায়। কলকাতাগামী ডিলাক্স বাস হাঁক দেয়, বেহালা মোমিনপুর ধর্মতলা হাওড়া স্টেশন...ধর্মতলা...

কনডাক্টরের এমন চিৎকার চললেও, দোকানপাটের খাঁজে বাঁকে শেষরাত এক আধ মুঠো লেগে। ফলত তে-মাথানি মোড়...সড়কপথে প্যাসেঞ্জার স্টপাট আসে না। কিংবা আসার উদ্যোগে। তাই কনডাক্টর একটু জিরোতে, প্রসেনজিৎরের চোখে জলধর। জলধরের চোখে উত্তম কুঁকড়ে এতটুকু। তাদের হাতে হাতে রাতপাহারার খেটে লাঠি, গলায় ঝোলানো পিতলের বাঁশি, বগলে টর্চলাইট। সব আছে...তবু কী যে একটা নেই...। কিংবা পট করে হারিয়ে গেল...।

উত্তম নতুন হাওয়া তুলতেই বলে, চল। চা খাই

পাকা গাঁথনির গায়ে খয়েরি রঙ মেরে রেলের টি-স্টল। বিস্কুট কেক বয়ামে সাজানো। গ্যাস ওভেনে চায়ের জল ফুটছে। ছোকরাটা বলে, চা দোবো তিনজনকে?

—দোবো! মানে? আমরা রাত জাগি বলে তো তোরা ঘুমোতে পারিস

কাপ ধুতে ধুতে ছেলেটা বলে, উঁ? আমাদের ভয় নেই। তোমরা জাগো তো ওই বাজার পার্টির জন্যে?

কর্মচারী ছোকরা পাশ ফিরে বলে, ঠিক বলেছিস রে মান্টা

উত্তম দাবড়ি দেয়, ল্যাজ নাড়িস নি। ওঠ—চা কর

—মাইরি দাদা, লাস্ট ট্রেন ঢুকলো। রাত একটায় শুইছি, বলে ছেলেটা।

টি-স্টলের সামনে গায়ে গায়ে জুড়ে সরু সরু ছ'খানা চেয়ার এক কাঠে সাঁটা। ছেলেটা চা ধরে দেয় তিনজনকে। জলধর পাশে উত্তম, তারপরে প্রসেনজিৎ। খাস্তা নোনতা চায়ে চুবিয়ে সকলে এক কামড় দিয়েছে। গলায় খানিক চা ঢালার পর জলধর বলে, এসব ফাজিল কর্ম ধরাধরি ভালো লাগে?

—কী ভালো লাগে তোর, উত্তমের কথার পর তিনজনেই মৌজে সুড়ুৎ সুদুৎ চা খায়।

জলধর দু-এক চুমুক বেশি খায়। জিভে ঠোঁটে চায়ের মিষ্টি রসে যায় গালময়। চকিতে মনে পড়ে,...বড়বাড়ির মেয়েটার বিস্কুট...লজেন্স...পান সিগারেটের দোকান। কত খুচরো পয়সা! কেমন বিক্রি..., হঠাৎ বলে জলধর, ...দুশ শ্লা, রাত জেগে পরের দোকান পাহারা দিই আর তারা বউকে জড়িয়ে সারা রাত ঘুমোয়। আমরা শুধু...

—তাতে তোর...তোর কী ইচ্ছে..., বলে উত্তম।

—আমার...! ...একটা ছোটোমতো দোকান করি। রোজগার হোক। বউ করি...রাতে ঘুমোতে যাই...! তোরা দোকানটা পাহারা দিবি—মাসে মাসে চাঁদা দুবো—

তড়াক করে লাফিয়ে জলধরের পাশ থেকে সরে যায় ছোকরা উত্তম! প্রসেনজিৎয়ের কাছে দাঁড়ায়, এত মাস এত রাত এক সঙ্গে পাহারা দিচ্ছি...দিলে কী হবে...ও কি আর বন্ধু...সঙ্গী...

গায়ের কাছে প্রসেনজিৎ। নিরুচ্চারে সহমত জানায়। উত্তম খুব নিম্নকণ্ঠে বলে, জলধরদা—তুইও আমাদের চাকর বাকর রাখতে চাস...

প্ল্যাটফরমের মাইকে ঘোষণা, পাঁচটা পঞ্চান্নর ট্রেন এক নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে ছাড়বে...

অন্ধকারের রাত

আফসার আমেদ

স্টেশনের ওটি রোডের মুখটাতে দাঁড়িয়ে তার স্বামী স্বপনের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল আরতি। তার স্বামী অমন তো খারাপ মানুষ নয়! সাত চড়ে রা কাড়ে না, শান্তশিষ্ট শীতল মানুষ। মদ খায় সঙ্গীসাথীদের পাল্লায় পড়ে, মদ খেয়ে সে হুল্লোড় কখনও করেনি। কাপড়িদের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কীসব চেঁচামেচি করছে, অঙ্গভঙ্গি করছে। আরতি এসেছিল কলটলে এটা ওটা পুজোর সামগ্রী কিনতে। আজ শুক্রবার, কাল শনিপুজো। আগের দিনে কিনে রাখাই ভালো। দুপুরে খানিকটা ঘুমিয়েও ছিল। স্বপন খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ে, না ঘুমোনোই তার কাল হয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে মদ খেয়েছে ঠেকে। এখন সন্ধেবেলা জনবহুল ওটি রোডে ক্যাওড়ামি করছে।

কেউ বলবে না, এমন স্বভাব স্বপনের। বাজারে তারা স্বামী-স্ত্রীতে মাছ বিক্রি করে। কত মানুষ তাদের চেনে। কত মানুষ স্বপনকে ভালো মনের মানুষ বলেই জানে। কমকথা বলে। দামাদামি সব আরতির সঙ্গেই হয় খদ্দেরদের। মানুষটার ভেতর এমন আর একটা মানুষ থাকতে পারে, বিশ্বাসই করতে পারে না আরতি। নিজেকে চিমটি কেটে দেখার কথা ভাবে, সে ঘুমের মধ্যে নেই তো?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমশ আরতির দম বন্ধ হয়ে আসে। খানিকটা তফাতে এসে দাঁড়িয়েছে সে। আর স্বপন বাঁ হাতের মুঠো কানের কাছে এনে মোবাইলে কথা বলার ভঙ্গি করছে। কিন্তু সবচেয়ে শিহরিত হল, যে-সব কথা বলছে সব শুনে। বলছে, 'হ্যালো, বড়োবাবু। কে বলছেন, বড়োবাবু, ওকে ছেড়ে দিন, ও আমাদের লোক।' পরের মুহূর্তে আবার বলছে, 'কে বলছেন, বড়োবাবু, ওকে পুরে দিন, তারপর পেটান, তারপর কেস দিয়ে চালান দিন।'

আরতির সারা শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে স্বপনের এই কথাগুলি ও ভঙ্গি শুনে দেখে। সে যেন চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে মনে হল তার। মাথা ঘুরে গেল। চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কানে শুনতে পাচ্ছে না। অজয় সেনের নকল করে দেখাচ্ছে স্বপন। তাদের চালাঘরটা অজয় সেনের বাড়ির সামনে। মাঝখানে শুধু একখানি রাস্তা। যে রাস্তায় অজয় সেনের দোতলা বাড়ির বারান্দাটা এগিয়ে এসেছে। গ্রিল দেওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে অজয় প্রায়ই রাতে মোবাইলে কথা বলে এখন।

একবার দু-বার ভঙ্গি দেখিয়েই যে স্বপন থেমে যাবে, তা নয়, বারবার অজয় সেনের নকল করছে। জনগণ খুশি হয়েছে, মজা পাচ্ছে, তাকে বারণ করছে না, প্রতিবাদও করছে না।

অজয়ের বছর চল্লিশ বয়স। বউ সুন্দরী ও শিক্ষিত, হালে চাকরিও করে দিয়েছে অজয়। শালি শালাদেরও চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে। ভাইটাকেও প্যারা টিচারের চাকরিতে ঢোকাল। নিজে একটা স্কুলের শিক্ষক। সবচেয়ে বড় পরিচয় তার সে নেতা। থানা হাতে,

বিডিও হাতে, স্থানীয় স্কুল কলেজ হাসপাতাল হাতে। অটো ইউনিয়ন, রিক্সা ইউনিয়ন, বাজার দোকান ইউনিয়ন সব হাতে। মোটর সাইকেল চড়ে, সুঠাম চেহারা। কাউকে দাবড়ে কথা বললে সে পেচ্ছাপ করে ফেলবে। তার কথায় গোটা মহল্লাটা চলে। আর স্বপন কিনা তারই নকল করছে? গোলমেলে পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেল আরতি। তার পুজোর কেনাকাটা মাথায় উঠল। কীভাবে এই জনপরিবেশ থেকে তার স্বামীকে আড়াল করবে, কিংবা বিচ্ছিন্ন করবে, ভেবে পেল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আরতি নিকট দূরত্বে থেকে অসাড় হয়ে গেল। আর বলেই চলেছে স্বপন, 'কে বলছেন, বড়োবাবু'—

কী ঘটনা ঘটিয়ে তুলছে স্বপন তা জানে না। কেননা স্বপন এখন মাতাল, মদের ঘোরে বলছে। এমন নকল সে বাস্তবে কখনো করতে পারবে না। সজ্ঞানে সে শান্তশিষ্ট, ভদ্রসভ্য। ভয়ানক গোলমাল করছে। একবার নয়, বারবার বলছে, একই কথা। একই ভঙ্গিতে বার বার যাচ্ছে। আর আনন্দিত হচ্ছে পাবলিক। জনমানসে হিল্লোল উঠছে। চমৎকারিত্বের এক সজ্জায় আছে যেন। জনমনের পছন্দ তৈরি করছে স্বপন। স্বপন এখন মাতাল, সে কী করছে, সে নিজেই জানে না। মাতালদশা ঘুচলে সে নিজেই লজ্জায় জিভ কাটবে। কিন্তু ঘটনাটা তো ঘটিয়ে তুলেছে স্বপন, ঘনিয়ে তুলেছে। আর সেই আবহে স্বপন আরো উৎসাহ পাচ্ছে, পাবলিক তাকে উৎসাহিত করে তুলছে।

আসলে কাকে নিয়ে এই নকল করছে, পাবলিকরা জানেতে পারছে। এই জানাজানির জন্যই এই আনন্দ-উপভোগ্যতা। আর তাদের কাছে এই ভঙ্গির এক বিশ্বস্ততাও আছে। কেননা স্বপন অজয় সেনের লাগোয়ো থাকে। এ ভঙ্গি কবার সাহস কারু নেই, স্বপন বলতে পেরেছে। স্বপনের এই সবার মনের বাসনাতে নাড়া দেওয়া এক অভিজ্ঞান।

আরতি কী করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। দু-পা সামনে এগোয়, তারপর আবার দু-পা পিছিয়ে যায়। আরতি সামনে গেলে যদি স্বপনকে সমর্থন করা হয়ে যায়, সেই ভয়ে যেতে পারে না কাছে। এক দ্বিধাবোধে সে থমকে দাঁড়িয়েছে। যেন বাগনান দোকান পশারি ও লোকবল সব ছবির মতো হয়ে উঠেছে, স্থির। সময় সেখানে থমকে গেছে। আর একমাত্র স্বপন সেখানে জ্যান্ত। চারপাশে হর্ষধ্বনি আর হাততালি।

স্বপনের মধ্যে এই আবরণটা কখনো কোনো এক সময়ে রচনা না হলে তার প্রকাশ ঘটতে পারে না। সজ্ঞানে তাকে কখনো বের করেনি। সে তো স্ত্রী, তাকে নিভৃতে কখনো বলেনি এই বিরোধাভাস। সম্পূর্ণ একজন অচেনা মানুষ তার সামনে। কিন্তু বিপদ, বিপদাপন্ন হচ্ছে তার পরিবার। এ রকমভাবে বিরোধিতা করা অপরাধ। তার কী যে শাস্তি পেতে হবে কে জানে! এই কথা ভেবে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে আরতির।

আর কী আশ্চর্য অজয় সেন এখানে কীভাবে এল? মোটর সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে জনহল্লা মুহূর্তে নিভে যায়। আর জনহর্ষ থেমে যাওয়া মেনে নিতে পারল না মাতাল স্বপন। সে আরো প্রবলভাবে নকল করতে লাগল অজয় সেনকে। 'কে বলছেন, বড়োবাবু'—

দু-এক মিনিট স্বপনের পেছনে মোটর সাইকেল থামিয়ে দেখল অজয়। মুখে নির্বিকার

ভঙ্গি। তারপর মোটর সাইকেল উড়িয়ে বেরিয়ে গেল অন্যদিকে। যেন এই তুচ্ছতায় সময় দেওয়ার তার সময় নেই। আর অজয় সেন স্বপনের এই আচরণ চাক্ষুষ করেছে, নিজে কানে শুনেছে নকল কথাগুলি, এ দৃশ্য দেখে আরতির শরীরের ভেতর ভয়ের হিমস্রোত কিছুতেই থামছে না। কীভাবে এখান থেকে স্বপনকে সরিয়ে নিয়ে যাবে, সেই কথা ভাবল সে। কেন অজয় আসার আগে স্বপনকে সরিয়ে নিয়ে গেল না? নিশ্চয় স্বপনের আচরণে তারও ভালোলাগা ছিল? এখন স্বপনকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়। যা হবার হয়ে গেছে, আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। কিংবা ভয় অজয়ের লোকজন এসে যদি পেটায়? স্বপন দু-একবার বলেছে, অজয় শুনেছে। এখুনি স্বপনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে খানিকটা রক্ষা করতে পারবে সে।

যা হবার তো হয়েছে, এবার স্বপনকে সরাও। গুরুতর বিপদ হতে পারে। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে আরতি নন্দর একটা খালি রিক্সার ওপর, নন্দ খালি রিকশা নিয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে ঘোরায়। আর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বপনকে তুলতে। নিজেও গিয়ে ধরে স্বপনের নড়া। নন্দ প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। পরমুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারে, বুঝতে পারে স্বপনদা মাতাল হয়েছে, তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর বেশি কিছু জানতে পারল না নন্দ। সেও আরতির মতো ক্ষিপ্রতায় স্বপনকে ধরে, আর রিকশায় তোলে। আরতি উঠে যায় রিকশায়। আর স্বপনকে ধরে বসে। স্বপন আরতির বুকে মাথা ঠেকায়। অচৈতন্য হয়ে পড়ছে। শান্ত হয়ে পড়ছে। আশ্রয় তাকে এমনটা করছে। না হলেও ক্লান্তিহীন এমন বকে যেত, নকল করে যেত, অপরাধ বাড়িয়ে তুলত। কিন্তু এই দশায় স্বপনের মনে কোনো অপরাধবোধ ছিল না। ভেবেছিল সে ঠিক করছে।

এক দু-মুহূর্তের জন্য পাবলিক থেমে গেল, আরতির এই স্বপনকে রিকশায় তোলার দৃশ্যে। তাদের হর্ষ থেমে যায়। তারা বোধহয় বুঝতে পেরেছে এখন এরা বিপদাপন্ন হতে পারে, তাই তাদের হিল্লোল থেমে যায়। আগে কেন এটা মনে হয়নি পাবলিকের? আরতির খুব অভিমান হল পাবলিকের ওপর। কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে চাইল না, নীরবে চলে যেতে চাইল। তার অশ্রু ভেতরেই রয়ে গেল।

সবচেয়ে ভালোবাসতে ইচ্ছে করল স্বপনকে। এমন একটা মানুষ এরকমটা হল কী করে? সে-ই তো বেশি বিপদাপন্ন হয়েছে। তার প্রাণহানিও ঘটতে পারে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়। আশঙ্কার কথা ভেবে তাই স্বপনকে আঁকড়ে ধরতে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে। মানুষটাকে হারিয়ে ফেলে যদি। কী ঘটতে পারে কিছুই জানে না। স্বপনকে আগলে রাখা, আশ্রয় দিয়ে রাখা, নিরাপদ রাখার মতো পরিস্থিতির মধ্যে পড়ল সে। তার এই ভঙ্গির ভেতর কিছুটা বুঝেছে পাবলিক। পাবলিকের নীরবতার ভেতর যেন সেই আশ্রয়ের দুশ্চিন্তা ছিল। যেমন দুশ্চিন্তা আরতির। সেই আবহ বদলাতে বদলাতে চলেছে সে বাড়ির দিকে, নন্দর রিকশায়, স্বপনের মাথা বুকে নিয়ে। বিপদের আশঙ্কার কথা ভেবে চোখ তার জলে টলমল করছে। কিন্তু ফেটে বেরিয়ে আসছে না। একটু টোকা দিলেই যেন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলবে সে। স্বপন কিছু জানে না, কিছুই জানে না। নন্দও জানে না। সে জানছে স্বপনদা মাতাল

হয়েছে, বৌদি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে, সে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে। আরতি যে কত ভার নিয়ে নন্দর রিকশায় বসে আছে, নন্দ তার বিন্দুমাত্র জানে না, সে শন শন করে রিকশা চালাচ্ছে।

স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে তাদের বাড়ি। মুম্বাই রোডের ধারে। তারা যে দশ বারো ঘর চালা বেঁধে আছে, সে সব সরকারি জমি। চিলতে জমি। ইটের রাস্তার গায়ে, মুম্বাই রোডের লাগোয়া। ইটের রাস্তার ওপারে ভদ্র পাড়া, সম্ভ্রান্তদের বড়ো বড়ো বাড়ি। ঠিক সোজাসুজি রাস্তার ধারেই অজয় সেনের বাড়ি। এ পারে যারা থাকে তারা গরিবগুবরো, অবাঞ্ছিতরা। কেউ রিকশা চালায়, কেউ বিড়ি বাঁধে, কেউ বাজারে বসে, কেউ অটো রিকশা চালায়। মুম্বাই রোড বাড়লে তাদের অন্যত্র চলে যেতে হবে। পাড়ার ভদ্রলোকেরা তাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কেউ মদ খেয়ে ভর রাত্তিরে বউ পেটাবে, কেউ ঝগড়া ক্যাচাল যখন তখন করবে, ভদ্র মানুষদের অশান্তি নষ্ট হয় তাতে। কিন্তু এরা বহু বছর ধরে এখানে বসবাস করে আসছে, বরং সম্ভ্রান্তরা হালে এসেছে। কেননা জমিগুলি সব নিচু ধান জমি ছিল। ওগুলো ভরাট করে বাড়ি করেছে। এই বছর কয়েক আগে অজয় সেন বাড়ি করল, দোতলা। আর বাড়িটা তাদের বাড়ির সামনে হওয়ায় কাল করল। প্রায়ই তো সন্ধ্যায় রাতে ও সকালে দেখে স্বপন অজয়কে মোবাইলে ফোন ধরতে। আর কথা বলতে শোনে। সব কথা স্পষ্ট শোনা যায়।

আর অমন ক্ষমতাবান মানুষ ফিসফিস করে বলবে কেন? সবাই শুনতে পায়। আর স্বপনদের বাড়িটা গায়ে হওয়ায় তারা বেশি ভালো শুনতে পায়। আর স্বপন শুনে শুনে হেদিয়ে গেছে। না হলে মাতালদশায় ওভাবে ঠিক ঠিক নকল করতে পারত না। তা ছাড়া মাতাল দশায় সেও বুঝি অজয় সেন হতে চেয়েছিল।

নন্দ ধরে ধরে নিয়ে যেতে সাহায্য করল। বাড়িতে ছেলে দীপু ছিল, মেয়ে শতাব্দীও। দোরে নিয়ে গিয়ে স্বপনকে বসাতেই শুয়ে পড়ল স্বপন। দীপু আর শতাব্দী কপালে চোখ তুলে চলে আসে দোরে। স্বপনকে চাটাই পেতে শুতে দেয়। শতাব্দী বালিশ আনে। স্বপন চিৎপাত শুয়ে পড়ে, আর ঘোরের মধ্যে থাকে। এত মদ কেউ খায়? স্বপনের আজ কী হয়েছিল। মাছ আড়তে মহাজনের কাছে তাদের তো দেনা আছে সামান্যই, আর কারবার চালাতে এ দেনা মামুলি।

ভেতরের ঘরে গিয়ে দীপুকে সব বলে আরতি। শতাব্দীও দোরে দাঁড়িয়ে সব শোনে। আরতি কপাল চাপড়ায়, 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল গো।'—

দীপু ভয় পেয়েছে। বলল, 'এখন তাহলে কী হবে?'

আরতি বলল, 'জল ঢাল মাথায় আমার শতাব্দী।' কথাটা বলে বেরিয়ে যায় হাঁচতলায়। প্রথমে গা গুলিয়ে ওঠে। বমি পায়। বমি করতে যায়, বমি হয় না। কিন্তু খুব কষ্ট হয়।

শতাব্দী বলল কান্না জড়ানো গলায়, 'মা তুমি এমন করছ কেন?' সে মায়ের পেছু পেছু চলে এসেছে।

দীপু ঘরের ভেতর থেকে শুনছে মায়ের বমি করতে চাওয়ার শব্দ।

আরতি বলল, 'মাথায় জল ঢাল, বমি হবে না।'

শতাব্দী বলল, 'একটু বমি করো না, দেখবে ভালো হবে। বাবা কোনো অন্যায় করেনি, শুধু শুধু ভাবছ তুমি।'

দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে আরতি, 'কত ধানে কত চাল হয়, তুমি জানবে কেমন করে? কাল থেকে বাজারে বসতে না পায়, খাবে কী?'

শতাব্দী কান্নাজড়ানো গলায় বলল, 'এখন শান্ত হও তো।'

'শান্ত হব কী করে?' আরতির গলায় হতাশা ও বেদনা।

'দাঁড়াও, তোমার মাথায় জল ঢালি, ভালো লাগবে।'

'ঢাল জল।'

সব কথাই অনুচ্চে ফিস ফিস করে হচ্ছে। হতাশা যে ঝরে পড়ছে তাও অনুচ্চ স্বরে, বেদনা প্রকাশ যে করছে অনুচ্চ স্বরে। কোনোকিছু উচ্চকিত হতে পারছে না। সবকিছু গুমরে উঠেছে তাদের মধ্যে। আর মানুষটা সে সব কিছু জানে না, সে এখন চিৎ হয়ে শুয়ে অচেতন ঘুমোচ্ছে। তাকে জড়ালেও নড়বে না, কথা বলালেও বলবে না।

মাথায় জল ঢালতে একটু আরাম পায় আরতি। কিন্তু বেদনা সরছে না, বুকের ভেতর তির তির করছে। ঘরের তক্তপোশে বসে গিয়ে পা ছড়িয়ে। দেখে মনে হবে তার কোনো ঘনিষ্টজনের মৃত্যু হয়েছে। মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার দুই ছেলেমেয়ে। মাথায় জল ঢালার পর এখন একটু নীরব হয়েছে। বেশি অস্থিরতা প্রকাশ করছে না। তার সামনে ছেলেমেয়ে আর হ্যারিকেনের আলো, তা দেখে বলল আরতি শতাব্দীকে, 'তোর বাবা অন্ধকারে পড়ে আছে, আলোটা ওখানে রাখগে গিয়ে।'

আলো নিয়ে চলে যায় শতাব্দী।

মায়ের সামনে এসে বসে দীপু। বাইরে জানালা গলে মুম্বাই রোডে গাড়ি যাতায়াতের আলো ঘরে এসে মেশে, মাঝে মাঝেই আলোকিত হয়ে ওঠে ঘর আর মা ছেলের মুখ।

আরতির বুকের ভেতর বেজে ওঠে কথাটা, 'কে বলছেন, বড়োবাবু?' বুকটা ধক করে ওঠে আরতির।

মেয়ে আলো নিয়ে বাবার কাছে বসে আছে। ওদিকে অজয় সেনের বাড়ির পেছনের ঝুলবারান্দায় কোনো আলো নেই। ভেতরে নিশ্চয় মানুষজন আছে। হয়তো অজয় সেন ফিরেছেও। কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেননা বারান্দাটাকে ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে না।

দীপু বলল, 'কী হবে মা?'

আরতি বলল, 'জানি না।'

দোর থেকে শতাব্দী বলল, 'দাদা তুই চুপ করবি।'

তারপর নীরবতা শুরু হয়ে গেল তাদের। শতাব্দী হ্যারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দিল। আরতি ভাবল, ভালোই হয়েছে আলো নিভিয়ে দিয়ে। তারা না হয় এমন দুশ্চিন্তাতাড়িত রাত অন্ধকারেই জাগবে।

সন্ধ্যালোক

অজয় চট্টোপাধ্যায়

ছুটি। নোটিশ জারি করে আগাম ঘোষণা নেই। দমকা ছুটি। ধর্মঘটের ছুটি। হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন। মজাই আলাদা, যে ভোগ করে সেই মর্ম বোঝে। প্রসূন সেই ভোগে মজে আছে। রাত পোহাতেই ফুরফুরে মেজাজের ঘোরে। কী যে করবে আর কী যে করবে না দড়ি টানাটানি। চিন্তা বিহার ছিন্ন হয় সুরেলা ধ্বনির গুঞ্জরনে, আমায় অভাবে রেখেছ। বিরাম মানে না। এরপর ফের ; আর কী ভরসা আছে তোমারি চরণ বিনে।

প্রসূনের রক্তে ঢেউ খেলে। একবার শব্দের কোলে পরক্ষণে সুরের কোলে দোল দোল দুলুনি। কপালে চিন্তার ভাঁজ। এ রকম গান সচরাচর 'পিসিমা' 'দাদু' বিধবা 'দিদি'— ঘাটের দিকে যাদের পা এবং গলগ্রহী সেইসব মহিলারাই গেয়ে থাকেন। এখানে তেমন মহিলা উদ্বাস্তু। এই গৃহকোণ নিছক তুমি আছ আমি আছি আর আছে মাইনে করা মাসির কোলে সবেধন নীলমণি মিঠুনের শ্রীবৃদ্ধি। সুখ সুখ গৃহাঙ্গন। অন্য কারো বাস নেই। অবাক প্রসূন ধ্বনির উৎসে নির্ণয়ে দৃষ্টি চঞ্চল করে। খোঁজ পেয়ে শিহরিত। কলসি নিতম্বে মুঠি উপস্থান স্তনে অবেলায় অধিক চর্বিল মনীষার সৃজন। মনীষার আটপৌরে গলা কর্কশ। এখন কী শান্ত, কী নম্র। কী মধুর। গলায় ফুটছে রিক্ততা। হাহাকারে চোবান স্বরধ্বনি। শব্দ ও ধ্বনি বোধের সঙ্গে নিবিড় ভাব হলে এমন দুঃখের পাক তৈরি হয়। মনীষার যে গহন দুঃখ গোপনে পোষ্য ছিল তার আঁচে প্রসূন সেদ্ধ হতে থাকে।

মনীষার জন্য প্রসূন দরদী হয়। দরদ উৎপন্ন করে দিব্য। প্রসূন দিব্যি করে মনীষা এবার থেকে তোমার সঙ্গে কলহে স্থগিতাদেশ। তোমার দুঃখ ভাগাভাগি করব।

ইত্যবসরে গানের ধারা স্তব্ধ। সংগীত আনুগত্য বাঁট দেয়। বেলা কেটে যাচ্ছে অলস বেলায়, অথচ পড়ে আছে বিস্তর কাজ। অফিস নেই। কলেজ নেই। সময় শাসিত তাড়া নেই। তাতে কী। নিত্যকার কাজগুলোয় তো কামাই নেই। কলেজের টিফিন বাদ। সে জায়গায় যোগ হচ্ছে সকালের জলখাবার। ছুটির সকাল। সাদামাটা চলবে না। তারপর আছে অবসরের দুপুরভোজ। শুধু ক্যালরি যোগান দিলে মুখ ভার। বাহারি পদের সম্ভার চাই। নতুবা ভোজ- সভায় কর্তা অভিমানী। কোন পদ স্বাগত আর কোন পদ খারিজ তা নিয়ে চলে চুলোচুলি। নির্বাচন অনেকটা সময় খেয়ে নেয়। যোগাড় আছে, রাধাকে সব বুঝিয়ে দিতে হবে। নিজেকেও হেঁসেলে ঢুকতে হবে। অন্যদিন ছাড় আছে। ছুটির দিন কোনো ওজর চলে না।

ব্যস্তে মনীষা ফ্রিজের কাছে আসে। ডালা খোলে। বাটি বার করে। বাটির গায়ে আঙুল লাগতে শিরশির করে শীতল স্পর্শে। শিহরণে বাটি টাল খায়। বাটিভর্তি দুধে ঢেউ ওঠে। কিছুটা চলকে পড়ে। দুধের পরিমাপ নজর করে মনীষা বলে, রাধা এঁচোড় তোলা থাক। তুই বরং দুধটা কাট। ছানার ডালনা করব। বলে ঘাড় ফেরায়। গলা ছাড়ে,—ভাত খেতে দেরি হবে। টিফিন কী করবে? টোস্ট-কলা না-কি লুচি ভাজবো।

—লুচির বিকল্প টোস্ট-কলা। ভাবা যায়! কিন্তু ম্যাডাম লুচি মানেই লুচি উইথ বেগুন ভাজা।

ঘোষণা টাটকা থাকতে প্রসুন পালটি খায়,—ঘটিদের ওই এক চয়েস, জম্পেস রসনা মানেই ময়দা ঠাসা। আরে বাবা দানাশস্য দিয়ে কত বিচিত্র রেসিপি হয়। সেসব ভাবা যায় না।

অতএব টোস্ট তো আগেই ব্রাত্য। এখন লুচিও বয়কট। দেখা যাক বাবুর মন এখন কী টানে। মনীষা প্রশ্নাতুর। প্রসূন অন্য আকুলতা প্রকাশ করে। ঘি দিয়ে মুড়ি ভাজ। নারকোল কুড়োর ওপর চিনি মিশিয়ে মাখ। মা যেমন মাখত, আঙুল চেটে খাব।

ঝক্কির জলখাবার নয়, খেতেও সুস্বাদু। কিন্তু মনীষা চটে যায় মায়ের উল্লেখে। ধাড়ি হয়েছে ঢের। মা মা বাই আগলে আছে।

কে যেন কড়া নেড়ে যাচ্ছে একঘেয়ে। লম্বা পায়ে প্রসূন এগোয়। লিভিং রুম ডিঙোতে ইতস্তত করে। ছড়ান সবজি। দু-পাশে ঠ্যাং ছড়িয়ে মাঝখানে বঁটি রেখে কুটনো কুটছে মনীষা। মুখ ফেরায়। নির্বিকার। দরজা খোলা স্থগিত রেখে প্রসূন থমকায়। বলে,—তুমি যে এত দুঃখ চেপে রেখেছ জানতেই পারিনি।

রঙ্গ করে মনীষা জবাব দেয়,—পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে।

কথায় না জড়িয়ে প্রসূন নিজের খুপরিতে ঢুকে যায়।

বিরতি আছে। বিরাম নেই। থেকে থেকে কড়া নাড়ছে কেউ। মনীষার হাত জোড়া। গরজও নেই। দুধ এসে গেছে। কাগজ দিয়ে গেছে। রাধা হাজির। নির্ঘাত কোনো সেলসম্যান। কিছুটা সময় বাজে খরচ করিয়ে দেওয়ার ফিকির। মনীষা শোনে আর উপেক্ষা করে। কুলোর ওপর ডাল ছড়িয়ে আঙুলের কিরিকেটে কেটে ময়লা বাড়তে রত। নাঃ এ যে দেখছি ঠ্যাটা, নেড়েই যাচ্ছে কড়া। ভাগানোর জো নেই। অগত্যা হাত মেঝেতে ভর রেখে শরীরে ভাঁজ ফেলে ফেলে খাড়া হয়। মন্থর পায়ে দরজা অভিমুখী। আঙুল তোলে ছিটকিনিতে। দরজা হাট হতে মুখোমুখি অদ্বৈত।

—ওমা ঠাকুরপো যে। এরই মধ্যে বার্তা রটে গেছে আজ ঘর খালি।

—আমরা হচ্ছি কোকিলের জাত। বসন্তের ইসারা পেলেই হাজির। ইথারে ভেসে এল ছেলে গেছে বনে। খালি কুঠি। চলে এসো সখা। সাড়া দেয় না কোন কালিদাস। মনীষা ক্ষোভ দেখায়, গলা চড়ে—আহা কথার কী ছিরি। গেরস্থবাড়ি হচ্ছে খালি কুঠি।

জোড় হাতে অদ্বৈত নতজানু। রগড়ে গলায় অনুতাপ করায়।—ক্ষমা করো মোরে তাত—আমি যে পাতকী ঘোর তাত?

মনীষার নাকের ডগা ফুলল। হাতে ছিল লেটি বেলার বেলুন, উঁচিয়ে তেড়ে এল।

—তবে রে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইয়ার্কি! ডেঁপো কোথাকার।

এদিকে ধৈর্যচ্যুতিতে ছটফট করছে প্রসূন। অদ্বৈত এসেছে। তার প্রকট অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এ ঘরে ঢুকছে না, বৌদিবাজিতে কাল হরণ করছে। টেপে কেউ সিডি বাজাচ্ছে। অতুলপ্রসাদ বাজছে। পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।

কবি বলে খালাস। মন কি বাঁধা যায়। অফিস, হোক ঘন্টার পর ঘন্টার ব্যস্ততা—কত আর ভরাট করতে সক্ষম। অবসর আসেই। আর অবসর মানেই একাকীত্ব। গুচ্ছ গুচ্ছ মুমূর্ষু চিন্তার থাবা। চিন্তাকে ঝাড়ু দিতে ত্রাণ হিসেবে হানা দেয় ছিপি খোলার মচ্ছব। ডাক পড়ে বাল্যবন্ধু অদ্বৈতর। বাল্যবন্ধু বল্লে কিছুটা গোপন থাকে। সুপ্রযুক্ত হয় বল্লে ন্যাংটো বেলার বন্ধু। আজন্ম সখা, সখা সন্নিহিতে হাট হওয়া যায়। অবদমন নিঃসরণ হয়। বিরাট মুক্তি।

যেন বেড়া টপকে ঘরে ঢুকছে অদ্বৈত, বসার উদ্যোগে এমন ক্লান্তি যেন অবরোহণ করছে।

সোফার আরামদায়ক আশ্রয় টেনে নিল তাকে, বসে হাঁপ ছাড়ে অদ্বৈত। ধাতস্থ হতেই তাড়া দেয়।—অধিবেশন শুরু হয়ে যাক শুরু।

—এসেছিস অনেকক্ষণ। আমড়াগাছি করে করে বেলা কাবার করলি। প্রসূন ধমকায়। প্রশস্ত সোফায় শরীর ছড়িয়ে অদ্বৈত কারণ দর্শায়।—সরি বস, বেরোতে দেরি হল, এখানেও কড়া নেড়ে নেড়ে হাতে কড়া পড়ে গেল।

—বেল টিপতে কী হয়েছিল। গাঁইয়া।

—কোথায় আছ গুরু। বিদ্যুত বিরহ চলছে জান নেই।

প্রসূনের মস্তিষ্ক কাজ করে। খেয়াল হয় পাখার ব্লেড স্থবির। তাই বড্ড গরম লাগছে। বাতাস যা আসছে তা বাইরে থেকে। প্রকৃতিসঞ্জাত, তাই টের পায়নি বিদ্যুতের আড়ি। অদ্বৈত ওসকায়।—যা ঘটার ঘটে গেছে। নো পোস্টমর্টেম। এখন আর দেরি নয়। হাতে হাতে গ্লাস ধরো।

প্রসূন দাঁড়ায়। প্রস্থানার্থী হতে হতে শুধোয়। —বল কী সেবা নিবি।

—মানে। বিকল্প আছে নাকি—! উল্লাস আসে অদ্বৈতর।

—ইয়েস। গর্বিত ঘোষণা করে প্রসূন।

—তাহলে আমার ব্রান্ড রাম। পিয়ো। পেট সাফ, নো হ্যাঙওভার। রামের হয়ে এমন সওয়াল করছে যেন টিভি পর্দায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।

—তুইও শালা রামভক্ত হলি। দেশটা দেখছি বিজেপি বনে গেল। তোর সুট করে খা। তা হ্যাঙওভার হ্যাঙওভার করছিস কেন। কী যায় আসে তোর হ্যাঙওভারে।

—যায় এবং আসেও। হ্যাঙওভার মানেই মাল কট। গিন্নির কাছে কেস খেয়ে যাব।

—বোস। লকার খুলে বের করে আনি।

—লকার। লকারে মালের বোতল? গিনেস বুকে তোর নাম উঠবে। তোর বড়িতে অ্যালকোহলিক চোর ঘোরাঘুরি করে না-কি।

—আর বলিস না। সেদিন দেখি কী ছেলেটার থুতনিতে কেশ। ঠোঁটে নবজাত গোঁফ রেখা। গালে দাড়ি। বয়োসন্ধিক্ষণ পিরিয়ডটা মারাত্মক। কখন যে কী করে বসে। মওকা পেয়ে হয়তো এক ঢোক মেরে দিল। সাবধানের মার নেই।

—ধরা পড়বে না।

—তুই শালা গাণ্ডু রয়ে গেলি। মাথা খেলা। এক ঢোক মারল। এক ঢোক জল পাইল করে দিল। মাত্রা যেমন ছিল তেমন রইল। ধরে কোন বাপ। সাবধানের মার নেইরে।

কথা ছেড়ে প্রসূন চলে যায়। ফিরে আসে ত্বরিতে। কোলে তোয়ালে জড়ান কোলের বাচ্চার মতো বোতল। তোয়ালের প্যাচ খুলে বোতলটা টেবিলে রাখে। উদাত্ত ঘোষণা করে।—আজ বিজেপি বয়কট। আন্তর্জাতিক হ।

অদ্বৈত;—আই এগ্রি। উই আর ইন দ্য সেম বোট।

—পল রোবশন।

—নো মেনশন।

অদ্বৈত বোতলটা নেয়। ঠাণ্ডা স্পর্শ, অনেকদিন শুয়ে ছল হিম ঘরে। ডাইসের অক্ষরে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে পাঠ নেয়। কোষে কোষে খুশির ঢল নামে। গালে ঠেকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়।

—গুরু তোর কাছে টুপি খুলতে বাধ্য। এবে দেখছি ফরাসি পোলা। এতদিন কোথায় ছিলি ধন। তোকে সেবা করার আগে তর্পণ করি সেই দিদিমাকে, যে দিদা মৃত্তিকা গর্ভে পুঁতে রেখেছিল আদরের নাতি বড় হলে দেবে বলে, উন্নয়নের কোপে এই ক্যাওড়া পার্টিতে ঠাই নিলি বাছা আমার। মুখ ফিরিয়ে প্রশ্নাতুর হয়—দোস্ত একী টানা মাল-না ঘুসের মাল।

বোতলটা ছিনতাই করে প্রসূন, ঘোরাতে ঘোরাতে ব্যাখ্যা করে—টানা মাল নয়, ঘুসের মাল নয়। যারা ঘুস নেয় তারা কাজ করে। বরাদ্দ কাজই আমার বকেয়া থেকে যায়। গাঁটের কড়ি খরচ করে খরিদ। বিশ্বায়নের কল্যাণে দাম সস্তা।

এমন ভাবে সস্তা শব্দ উচ্চারণ করল যেন জলের দরে গঙ্গার ইলিস বিক্রি হচ্ছে।

—বিশ্বায়ন চোখ খুলে দিয়েছেরে ভাই। হাজির করেছে ভোগের দর্শন। যা কিছু ভোগ্য পন্য তা কারো বাপের ধন নয়। এসো বিশ্ববাসী—সবাই মিলে ভোগ করি।

অদ্বৈত ফোড়ন কাটে।—দ্রৌপদী কেস হয়ে যাবে না তো। লুটপাট সে এক কেলো।

—না না, কাঁচা কাজ নয়। শাসন আছে। কেনার যোগ্যতা থাকা চাই।

অদ্বৈত বাক্য করে না। প্রসূনের লেকচার বাসি হতে কপালে হাত ঠেকায়। —জয় বাবা বিশ্বায়ন। এই শুভক্ষণে আমরা নাতি সকল পৃথিবীর সকল দিদিমার পদপ্রান্তে আজকের মজলিস অর্পণ করছি।

সোচ্চার হয় তোম্রাই। —সাচ বাত। যার স্বদেশ নেই তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আয় জনি তোকে সৎকার করি।

এই সময় মনীষা ঢোকে। ছিপি খোলার পর বাতাসময় অদ্ভুত গন্ধের বিকিরণ। না কটু না মধুর। নিজস্ব সৌরভ। আপন করতে দ্বিধা আসে। আবার বিবমিষা আসে না, এক প্রকার সহনশীল আবেদন আছে। নাক টেনে শ্বাস নেয় মনীষা। নাক সিটকোয়। ভুরুতে ভাঁজ পড়ে। বিরক্তির আঙ্গিক। প্রচ্ছন্ন আস্কারায় মান্য। রকম দেখে বলে,—মাল না টেনেই যা কাণ্ড করছো—পেটে মাল পড়লে ওভারডোজড হলে কী কাণ্ড যে বাঁধাবে—।

অদ্বৈত নাড়া খায়, উপোসে উপোসে ব্রতে ব্রতে জর্জর মনীষা যেভাবে মাল মাল

শব্দ উচ্চারণ করছে সাবলীল, অবাক লাগে। তাড়না এলেও গোপনে ঠেলে দেয় জিজ্ঞাসা; নবযুগ কি এসে গেল কমরেড বৌঠান?

প্রসূন ধৈর্যচ্যুত হয়।—থো কিচিরমিচির, এবার শুরু করি কর্ম।

অদ্বৈত গদগদ।—সকলি তোমারই ইচ্ছে গুরু।

হাতের বেড়ে মস্ত ট্রে। ট্রের ওপর ছোট বড় কয়েকটা পাত্র। আসরের চাহিদা ভোলেনি মনীষা। ভাজাভুজির সম্ভার আছে। স্যালাড আছে। নিচু হয়ে ট্রে নামায় মনীষা। আয়োজন মানে চাট সাজিয়ে রাখে। হাঁফ ছাড়ে। মুখের ঘাম মোছে আঁচল ঘসে ঘসে। —খালি বুকনি। মনীষা মুখ ঝামটায়। সঙ্গ ছাড়তে উদ্যোগি হয়। পারে না। ঠেস দিয়ে পার পেয়ে যাবে অত সোজা।

মনীষার টিপ্পনীর পিঠে প্রসূন জুড়ে দেয় টীকা।—আমরা হচ্ছি নবজাত প্রৌঢ়। আমরা বকবো না তো বকবক করবে সবে বাল গজানো পোলাপানরা কও কী। ওরা জীবনের কী জানে কী বোঝে যে বলবে।

—তোমাদের খালি লম্বা লম্বা কথা, যা করার তা কিন্তু ওরাই করে। তরুণদের পক্ষ নেয় মনীষা। উপেক্ষার হাসি ছড়ায় প্রসূন।—ওরাই তো করবে। আমরা করবো অরগানাইজ। ছক কষব। ওরা রূপায়ণ করবে। শোনোনি নেতার আহবান রক্ত দাও।

কে দেবে? তরুণরা, গলগল করে রক্ত ঢালবে। জান দেবে, শহীদ বেদী হয়ে বেঁচে থাকবে। সর খাবে দামড়ারা। মাতঙ্গিনী বলো অহল্যা বলো লতিকা বলো ক্ষুদিরাম বল কেউ কি ছিল অর্গানাইজার? অর্গানাইজাররা ঝুঁকি নেয় না। প্রকল্প করে। উদ্বুদ্ধ করে। অ্যাকশন স্কোয়াডের সদস্য হয় যুব সমাজ। আদর্শের বলি হচ্ছে ছোকরা ছুকরি।

যে খেলার যে ব্যাকরণ তা কি ফ্যালনা। সহসা সঞ্জয় গান্ধীর কথা কম কাজ বেশি— কথামৃত মনে পড়তেই থেমে যায় প্রসূন। দ্রুত হাতবদল হয়ে বোতল। যে যার কোটা পূর্ণ করতে তৎপর। বোতল এখন অদ্বৈতর স্বত্বে। বোতলটা বুকে চেপে ঘুমপাড়ানি স্বরে গুঞ্জন করে দোল দিচ্ছে। আহা বাছা আমার, এসো শিল্পায়ন এসো উন্নয়ন এসো ভোগ এসো এসো আমার ঘরে এস। মহাপ্রস্থানে যাওয়ার আগে প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হারিয়ে মোরে আরো আরো দাও প্রাণ।

প্রসূন সংগত করে।—তোবা। জবাব নেই দোস্ত। বেড়ে বলেছিস। সগ্গে যাবার আগে নরক দর্শনটা করিয়ে দে। হাঃ হাঃ আমরা এখন প্রমোদ তরণীতে ভাসব। আচমকা অদ্বৈতর নজর কাড়ে মনীষা। ঘামে নেয়ে যাচ্ছে শ্রী মুখ।

—তুমি ঘামছো বৌঠান। ধকল গেছে। একটু বোসো। রেস্ট নাও।

—না না। আমি যাই। রাধাকৃষ্ণকে জল দিতে হবে। মনীষা আসরে ভঙ্গ দিতে উদ্যত। প্রসূন আপত্তি জানায়। —রাধা ঠিক আছে তাই বলে কৃষ্ণ। মাথা যদি নত করতে হয় করো তার কাছে। যার চরিত্তির আছে। কৃষ্ণর ওসব বালাই নেই। ব্যাটা লুজ ক্যারেক্টার। তুই কী বলিস দোস্ত। প্রসূনের দৃষ্টি তারিফ প্রত্যাশা।

অদ্বৈত ফাঁপড়ে পড়ে। দোনামনায় ছটফট করে। স্বভাবে ও ভেলু। মন যুগিয়ে চলতে

অভ্যস্ত। যে-কোনো পরিস্থিতিতে স্পষ্ট মত দিতে হলেই সংকটে পড়ে। এখন সেই সংকট। এ কী গেরো। কোনদিকে যে যায়। একদিকে বৌঠানের ধর্ম বিশ্বাস। তদুপরি নারী এবং অতিথি বৎসল। অন্য দিকে দোস্ত। উৎসবের স্থপতি।

জলকেলি এবং বেণী শুকনো রাখার পলিসিতে হাবুডুবু খায় অদ্বৈত। অবশেষে আমতা আমতা করে ঝাপসা মতামত দেয়,—আমি ভাই চাপা কৃষ্ণভক্ত। ওকে আপন লাগে। মনে হয় লাইনের লোক। এলেম আছে।

প্রসূন দাবড়ায়—প্রেমের ছদ্মবেশে আসলে বণিক, শাড়ি সাপ্লায়ার, শালা বেরসিক—। বে রসিক? অমন কেলি করতে যে পাকা খেলুড়ে সে কাটখোট্টা? অবাক প্রশ্ন ছোঁড়ে অদ্বৈত।—

নিজের মত আঁকড়ে থাকে প্রসূন। সাফাই দেয়। —হ্যাঁ তাই। ভাব মহাভারতের সেই এপিসোড। ধূপধুনো জ্বালিয়ে পারিবারিক জমায়েত থরথর। রুদ্ধশ্বাসী প্রতীক্ষা। রাজার মেয়ে হা বস্ত্র প্রার্থনায় হাহা করবে। দ্রৌপদী বিবস্ত্র হবে। কাঁচি চলবে না। মহাকাব্য থেকে টুকলি। রূপা গাঙ্গুলির শাড়ি আলগা হচ্ছে। খুলে নিচ্ছে। বসন খসছে। হ্রস্ব হচ্ছে। সে কী দিশ্যি মাইরি। এইবার...এইবার...দ্রৌপদী শিশুকন্যা হবে। রূপা জড়োসড়ো, লজ্জায় অসহায় গুটিসুটি শরীর। সমাবেশ তড়িতাহত। চোখের পলক স্থির। লোম খাড়া। বাহ্যি পেচ্ছাব লক আউট। ফস করে রসের পাইপ লাইনে তালাচাবি। কোনো সারকুলার জারি নেই। আশা হয়ে যায় কুহকিনী। মধুসূদনের চামচা। কেষ্ট ব্যাটা শাড়ি যুগিয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে চোখ খোলা রেখে গুষ্টিসুদ্দ লঘু পর্ণোভোগ—মজাই আলাদা। দিলে মটি করে। টিভি দেখার উল্লাস লুট হয়ে যায়। দখলিস্বত্ব নিয়ে হচ্ছিল কুরুপাণ্ডব লড়ালড়ি। শরিকি লড়াই। এর মধ্যে তুই নাক গলাস কেন। ফড়ে কোথাকার। শিভালরি। দ্রোপদী উলঙ্গ হলে তোর সয়না, না। ইজ্জত প্রীতি। ঢং। পাবলিক কী ধুর। যমুনার ঘাটে মগডালে বসে রইলি মেয়েদের শাড়ি কুড়িয়ে কু মতলবে। গোপিনীরা নাইতে নেমেছে। জলকেলি সেরে ডাঙায় উঠে গা ঢাকবে। তুই মেয়েদের উদোম অঙ্গ দেখবি বলে ওই কাণ্ড করলি। লোচ্চারা যা করে। চেনা আছে ঢের। কুলবধূদের কৃষ্ণভজনা গোদা বাংলায় আলুবাজদের প্রতি ছোকছোকানি মনস্তত্ত্ব।

হাত কাঁপে। গ্লাস থেকে কিছুটা তরল চলকে মেজেতে গড়ায়।

মনীষা আর পারল না। ক্ষোভে ফাটল। —আহা ভাষার কী ছিরি। রকের আড্ডা। সে প্রস্থানার্থী।

মনীষাও একপ্রকার আবডাল। সরে যেতেই দুই বন্ধু নিজস্ব স্বরূপে ফুটতে থাকে। কথার তোড় এবং উত্তেজনায় উভয়ে আসনচ্যুত। দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের টাল টলমলো। মুঠির গ্লাসটা বুকে। ডুগডুগি বাজালে মাথাটা যেমন নুয়ে পড়ে—গ্লাসটা বুকসংলগ্ন। অবনত শির। মাথা নিচু দুই বাল্যসখা বাউল আদলে পাক খেতে থাকে। ঘোরে হিল্লোলিত শরীর। প্রসূনের পরনে লুঙ্গি। প্রবাহিত বাতাসের ঝাপটায় লুঙ্গি ফুলে ওঠে। ঘাঘরার মতো ছড়ায়। এক হাত গিঁট সামলাতে কটিতে। আর এক হাতের খামচিতে গ্লাস, ঘাগড়া পরা নর্তকী

ছন্দে নাচতে থাকে প্রসূন। প্রতিক্রিয়া হয় অদ্বৈতর। সেও মেতে যায়। পুলকে চরণে চরণে ঢল নামে উদ্দাম ছন্দ। নিজস্ব ঘর। বন্ধুর সঙ্গতা, ফূর্তির আসর। পরমের দিন। প্রসূনের পরনে যে লুঙ্গি তার ভেতর কোনো অন্তর্বাস ছিল না। তরল প্রভাবে টলমলে শরীর, বাতাসের বেগ—সব মিলে বাঁধন আলগা হয় হয়। যে-কোনো মুহূর্তে বিয়োগ হয়ে যেতে পারে কোমরবাস। হলে সে হবে এক কেলেঙ্কারি। আশঙ্কায় অদ্বৈত সতর্ক হয়। —ওরে তুই খাড়াইয়া ক্যান। ব, বইয়া বইয়া খা।

গ্লাসটা হৃদযন্ত্রে জাপটায় প্রসূন। মৌতাত চড়া। গ্লাস খালি, বোতল শূন্য। নেশার যোগান নেই। তাতে কী, আবেশ লেপটে আছে। আবেশে বোতল নিয়ে পড়ে।...এ্যাই জনি...জনি...ড নে মেরি জান...প্রভুর দেশ ছেড়ে প্রজার দেশে এলি...ছাড়পত্র দিল শিল্পায়নের সু পার ফার্স্ট শকট।

অদ্বৈত আপ্লুত। নেওটা বনে যায়।—সাচ বাত গুরু। যে উজবুক বিশ্বায়নের পেছনে কাঠিবাজি করে সে শালা কৃবির দালাল। সিঙ্গুর পার্টি।

প্রসূন সীড দেয়। —দালাল কো হালাল করো।

অদ্বৈত ধুয়ো দেয়।—আভি করো জলদি করো।

প্রসূন।—নো অবজেকশন। ইউনানিমাসলি পাশ।

হাত বাড়িয়ে অদ্বৈত বোতল নিজের কাছে নেয়। বোতলটার খোদিত অক্ষরে স্থির দৃষ্টি রাখে। আত্মপরিচয়ের স্মারক চিহ্ন হিসেবে খোদিত আছে ব্রান্ড-বর্ষ-তারিখ। অদ্বৈত বর্ণমালায় আপন ঠোঁট ঠেকায়। নিবিড় স্পর্শে বুলতে থাকে। কাটা কাটা উচ্চারণে ঘোষণা করে,—আয় জনি ঈশ্বরের সন্তান হয়ে বিশ্বায়নের পোঁদে চুমু খাই।

।।দুই।।

শাশুড়ি-ননদীয় নিগ্রহ নেই। ঠাসাঠাসি করে থাকার বিড়ম্বনা নেই। রুচি নিয়ে ঠোকাঠুকি নেই, পদে পদে আপস নেই। স্বাধীনতার অবরোধ নেই। যাপিত জীবনে শৃঙ্খলা আছে। কথা আছে। গলাবাজি নেই। হাসি আছে হি হি রব নেই। বিরোধ আছে। ঝগড়া নেই, বিরক্ত আছে। বরকট নেই। সবই সহনশীল। মাপা। আদুরে। ছিমছাম পরিসর। লঘু পরিশ্রম। পরিপাটি শ্রী। সুন্দর আসবাবপত্র। যন্ত্র সুখ। গোষ্ঠী পরিবারে এই সুখ টলটল করে। সুন্দর বাস্তব। কিন্তু এই বাস্তবের আর একটা পিঠ আছে। যে পিঠ প্রতিশোধের আখর, রিক্ততার বর্ণমালা।

যদি সন্তান পুত্র হয় তো ছেলে মায়ের সঙ্গে ছাড়া ছাড়া। যদি কন্যা হয় এবং হয় অন্যূন কিশোরী তো কিঞ্চিৎ উদ্ধার। নতুবা অলস দুপুর এবং মধুর বিকেল, গিন্নিরা নিঃসঙ্গ তার শিকার। ঘোর একাকী। বিষণ্ণতা থাবা বসায়। একাকীত্ব লগ্নে নারী খোঁজে যেমন তেমন দোসর। নির্বাচন হয় উদার। যাকে পায়, পেয়ে যায় কাজের মেয়েকে। তাতে কী। তার কাছেই নিজেকে হাট করে। আলাপ-বিলাপ, খোঁজখবর খাসখবর, কোঁদল লেনদেন করে। পড়শি চর্চা করে মনের ভার লাঘব করে। ইদৃশ মানসিক চাহিদার তুঙ্গক্ষণে কে আপ মার্কা সঙ্গী-কে ঠেকনা বাছবিচার বেকার। সঙ্গী সঙ্গতার দাবিতে ফুটে ওঠে। সামজিক

প্রতিষ্ঠা জাতি বিরাগ একাকার হয়ে যায়। অন্তত মনীষার ক্ষেত্রে তাই ফলছে, চুল যতই বনসাই করুক রাধার সঙ্গে তার খুব গলাগলি। সম উৎসাহে ড্রয়িংরুমকে গড়ে তোলে পাড়াগাঁর পুকুরঘাট।

ভাঙা আসর। সবে শেষ হওয়া যাত্রা আসরের মতো। একটু আগে অনেক কিছু ছিল। এখন খা-খা। দরজা খোলা। গলাবাজি না হলেও কণ্ঠস্বর উদার। সব কানে এসে বিঁধছে। প্রসূন শুনছে। ভাবের ঘরে সিঁদ না কাটলে স্বীকার্য মন্দ লাগছে না শুনতে। কথোপকথন চলছে নিম্নরূপ :

মনীষা : এ কী করলি রাধা। কোলেরটা মাই ছাড়েনি ফের পেট করলি।

রাধা : কী করবো বলো। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম।

মনীষা : নেকি। কেন বরকে নোটিশ দিতে পারিস না আগে নাশ করো। পরে ফস্টিনষ্টি।

রাধা : সে কী গো। নাসবন্দির কথা বলছো। সঞ্জয় গান্ধী ধুয়ো তুলেছিল। পুরুষরা একজোট হয়ে ঝাঁটা দিয়েছে। পুরুষ খোজা হবে ধম্মে সয়। কী যে বলো বৌদি।

মনীষা : কী এমন বললাম যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। ভোগ লুটবে জুটি। কষ্ট ভোগ করবে একজন। মানবি কেন?

শিক্ষা দেয় যে ভাবে সেই শুরুদেব রাধা বোঝায়—মেয়েরা হচ্ছে মাটি। পুরুষরা চাষ করবে আমরা ফসল ফলাবো। সৃষ্টির রীতি তুমি খণ্ডাতে চাও।

মনীষা গালে হাত রাখে। বাব্বা : কথার তো খুব বাহার। বেশ তাই কর। যে রেটে বাঁধাচ্ছিস ছানাপোনায় খোঁয়ার হয়ে যাবে। গতর ধসবে। ঘাঁটতে পারবি না। সখ আহ্লাদ চুলোয় যাবে। ভাত-কাপড়-লেখাপড়া-শোওয়ার জায়গা, কূল পাবি না কুলতে।

পচবি। পচে পচে মরবি।

রাধা : বিধির যা লিখন তাই হবে।

মনীষা বোঝে তর্ক মানে বাঁজা তর্ক। যে যার পথে চলুক।

রাধারও ঠেকে শিক্ষা বিবিদের ধাত আলাদা। ভিন্ন ধারায় সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এক। তর্কাতর্কি নিস্ফল। অতএব প্যাচাল ভঙ্গ।

বিবরী কথা পাড়ল রাধা। পেশ করল দাবি।—বৌদি এই মাইনেতে আর চলবে না। পঞ্চাশ টাকা বাড়াতে হবে। শুধু পুজোয় নয় হোলি এবং রামনবমীতেও এক সেট করে শাড়ি-শায়া-জামা দিতে হবে। সেনদিরা দেয়। তোমাকেও দিতে হবে। ফিরে এলে। ঠিকে লোক দিয়ে চার মাস চালাও।

রাগে গড়গড় করে মনীষার মুখ। পলকে সেও প্রভু বনে যায়। হাতে স্বাস্থ্য খেলিয়ে বলে, চোপা করিস না রাধা। এই সেদিন মাইনে বাড়ালুম। প্রতি মাসে কামাই আছে কিন্তু মাইনে কাটি না। খোরপোস বাদ দিয়ে যা পাস হিসেব করলে টের পাবি তা তোর পাওনার চেয়ে অনেক বেশি। সাফ বলে দিচ্ছি কুড়ি টাকা মাইনে বাড়বে। পুজো ছাড়া বৈশাখে

বাড়তি এক সেট শাড়ি-জামা-সায়া পাবি। পেট ভর্তি খাওয়া। পোষায় কর না পোষায় পথ দেখ। ওসব সেনদি বোসদি ঠানদির গল্প শোনাবি না। যে হারে জমি থেকে উৎখাত হচ্ছে পরিবার ঝির ছড়াছড়ি।

আধশোয়া হয়ে প্রসূন টের পায় শর্ত নিয়ে আকচাআকচি স্তব্ধ। কথা কাটাকাটি শ্রান্ত। শব্দযুদ্ধ অবসন্ন। অর্থাৎ ইঙ্গিত স্পষ্ট...রাধা অন্তর্হিত।

১২০ বর্গমিটার ঘর। বয়োসন্ধির ছাত্র আবাস। যেমন হয়, বই বিছানা পোশাক আলুথালু। জামা-বইয়ের ডাঁই পাশে সরিয়ে প্রসূন বিছানায় কাত হয়। তখন ওর পিঠে শক্ত মতন কী লাগে। হাতড়ে তোশকের নিচ থেকে বের করে আনে একটি বই। চটি বই। কভারে ঝাপসা গোলপি মেয়ের ছবি, কৃশ কাঠাম। বেটপ বাঁ বুক উদ্ভাসিত। এক পুরুষের থাবায় ডান বুক আচ্ছন্ন। শুধুমাত্র যোনিদেশ অংশটুকু আবৃত, নীল এক টুকরো কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা। হাওয়ার দাপটে উদভ্রান্ত চুল। কৌতূহল ওসকায়। কভার ছেড়ে প্রসূন পাতা ওলটায়। প্রত্যেক পাতার ডান কোণ ঘেঁসে ওপর এবং নিচ অংশ ছ্যাঁদা। আঁটা ছিল। কড়ি ফেল পাঠ করো নীতির ভিত্তিতে বেচাকেনার বন্দোবস্ত। আঁটা খদ্দেরকে আটকে দিতে প্রতিকার। পাতা উলটে উলটে প্রসূন আলগা পাঠ নেয়। ছবি দেখে, প্রতি ৪/৫ পাতা অন্তর ছবি। অস্বাভাবিক ভঙ্গি । সঙ্গম চিত্র। বহু আঙুলের বহুবার স্পর্শে অক্ষর ও ছবি বিবর্ণ। ইনটার নেটের যুগেও সাবেকি কোকশাস্ত্র রমরমা। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। প্রসূন অনুভব করে কাঁচা ভাবা গোলা ছবি তার শরীরে উত্তেজনা এবং কাম জাগাতে সক্ষম।

নিজেকে সামলায় প্রসূন। ছেলের জন্য উদ্বেগে শ্বাস দীর্ঘশ্বাস হয়। বইটা রেখে দেয়। অভিভাবক সত্ত্বা উথলে ওঠে। মানসিক বিহ্বলতা মনীষার সঙ্গে ভাগাভাগি করলে ত্রাণ আসতে পারে ভেবে প্রসূন আড়মোড়া ভাঙে। জং ছাড়াতে ছাড়াতে প্রত্যয়ী পদপাতে সে মনীষার শরণগত।—হাঁগো মিঠুনের ভাবসাব ইদানীং লক্ষ করেছ।

মনীষার ডাগর চোখ খর হল।—মিঠুনকে নিয়ে পড়লে কেন?

—কেমন যেন চুপচাপ থাকে। ফটপাট বেরিয়ে যায়। উড়ু উড়ু মন। কোথায় যায়, কী যে করে।

—পড়াশোনার চাপ আছে। কেরিয়ার তৈরির দুশ্চিন্তা আছে।

—সে তো ঠিকই। কিন্তু আমি অন্য কথা বলছিলাম, ওর ঘরে একটা বই পেলাম। নোংরা বই। বয়সটা তো গোলমেলে। বদসঙ্গে পড়ে উৎসন্নে যাচ্ছে না-তো।

মনীষা খেঁকি হয়।—এই। ওই বয়সে তুমি পড়োনি। কাঁচি না চালান লদকালদকি ছবি দেখতে ফিল্ম ক্লাবে ঘুরঘুর করোনি? এখন সাধু সাজছ।

বেগতিক দেখে প্রসূন প্রসঙ্গ ধামা চাপা দেয়। মনীষাও নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়। প্রসূন দেখল মনীষার মুখ ভার। মুষড়ে পড়লে যেমন হয়, থমথমে। হবেই। কাল থেকে রাধা আসবে না। চার মাস ছুটি, বলা যায় না এই যাত্রাই হয়তো অগস্ত্য যাত্রা। এদিকে একদিন কাজের মেয়ে না এলে গৃহস্থালি ভেসে যায়। মনীষা খাবি খায়। আবারও তেমন

যোগাড়ে বউ নয়। যে পাড়ায় ঢু মেরে একে ওকে পটিয়ে একটা ধরে আনবে। বাইরে বের হতে ভীষণ জড়তা, একটা কারণ বাতের ব্যথা। চলতে গেলে এই একদিক হেলে পরক্ষণে এই আর একদিক হেলে। দোলাচল টিবি। দ্বিতীয় কারণ অনভ্যাস। তৃতীয় কারণ অভিজাত পাড়ায় মেলামেশার যে আদব কায়দা তা রপ্ত করতেপারেনি। বাস্তবিক সংসারের জন্য করে করে বেচারি কেমন ক্ষয়ে যাচ্ছে। মনীষার কষ্ট দেখে প্রসূন কষ্ট পায়। ওর জন্যে কিছু করতে আকুলতা আসে।

স্ত্রীর প্রতি আনুগত্যে প্রসূন কাবু হয়। মনীষা এই সময় উসকে দেয় প্রসূনের মন বিহার।

—কুঁড়েমি করে গাঁটে গাঁটে বাত ধরিও না। বেরিয়ে পরো। এই পাড়ার লাগোয়া ঝি পাড়া আছে। চিরুনি তল্লাশ চালিয়ে একটা যোগাড় করে আনো।

উত্তম তাড়া, কৃতজ্ঞ দক্ষিণা দিতে প্রসূনের তাড়না আসে। ভাবে কাজের মেয়ে যোগাড় করে দিতে পারাই হবে ওর প্রতি বড় উপহার।

তৎপর প্রসূন গায়ে পাজামা-পাঞ্জাবি চড়ায়। পায়ে গলায় চপ্পল। বলে,

—চললাম, দাসী নিয়ে তবে ফিরবো।

—আবার সেবাদাসী নিয়ে ফিরো না। বগড় পিছু ধায়।

॥ তিন ॥

অভিজাত পল্লীর গা ঘেঁসে কাঙাল পাড়া। ভিখিরিদের বসবাস। তারই লাগোয়া আর একটা পাড়া। ঝি পাড়া। নাম এবং ঠিকানা আন্দাজ ছিল। ১০/১৫ মিনেটের হাঁটা পথ, আজ শুনশান, রাস্তার দখল নেই। রাস্তা এবং ফুটপাত পায়ে চলার দখলে। প্রসূন হাঁটতে হাঁটতে পাড়ার কাছাকাছি হয়, পাড়াটার ঠিক গায়ে পড়া একটা বাগানবাড়ি। সেখান থেকে কোলাহল এবং জমায়েতের আভাস আসছে। কৌতূহলে ইতি উতি দৃষ্টি পিছলোয়। নির্জন পথে বিমূঢ় দৃষ্টি এক পথিকের নজর কাড়ে। এমনিতে এইসব পাড়ায় কাউকে কিছু প্রশ্ন করার জো নেই। জিজ্ঞাসাবাদে গা-ছাড়া, তাছাড়া সর্বদাই কান চাপা মুঠি। অর্থাৎ আত্মবিভোরতায় বুঁদ। অন্যের ব্যাপারে নির্লিপ্ত। সে অন্য দিনের অন্য কথা। আজ অবসর। আঁটোসাটো এলিট প্রথার ছুটি। সামাজিকতার উপবীত ধারণ করতে ব্যগ্রতা আসে। এই আশে জনেক ভদ্রলোক আগ বাড়িয়ে এগিয়ে আসেন। ব্যাখ্যায় বাচাল হন। —ওটা ভিখিরি পাড়া। হট্টগোলের আখড়া। পাশে যে জটলা দেখছেন ওটা বাগান বাড়ির উৎসব। দরিদ্র পুজো। নারায়ণ সেবা। ছুটির দিন কাঙাল ভোজন হয়। দেয় শ্যামসুন্দর জালান। পুণ্যের টোপ। গিলতে আসে শয়ে শয়ে। ডিনার পার্টি ভিখিরিদের জন্য সংরক্ষিত। হলে কি হয়। পড়শি ঝি পাড়া থেকে ছিটকে আসে প্রচুর। মিশে একাকার হয়ে যায়। কে বহিরাগত কে ভুমিদাস চিহ্নিত করা বেকার। ভুখা গোত্রে একশা হয়। পঞ্চাশ জনের সীমিত গ্রাহক। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। লাইন আছে। বাদ আছে। অতএব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। পেশী

শক্তির আস্ফালন আছে। দাদাগিরি আছে। বর্জন আছে। লাইন ভাঙা ভাঙির খেলা আছে। পঞ্চাশটা টোকেন বিলি হওয়া পর্যন্ত হল্লা ধস্তাধস্তি চলবে।

সমূহ তথ্য ছিটিয়ে ভদ্রলোক ভিন্নমুখী।

কোলাহল তাক করে প্রসূন পদব্রজী। ফুটি ফুটি দুপুর নয়, দুপুর পূর্ণ বিক্রমে ফুটছে। বাতাস এবং ছায়ার অকৃপণ অনুদান আছে। ফলে রোদের তেজ ভোঁতা। প্রসূন ছায়া-বাতাস-রোদ বিচিত্র স্পর্শে মাখামাখি হয়ে হাঁটছে। লক্ষ্য আছে তাড়া নেই। ফলে লঘু পদসঞ্চার ক্রমে হৈচৈ রবের নিকটতম হয়। বিরাট জটলা, হুল্লোড়, টোকেন বন্টনের প্রাকপর্ব। প্রসূন কাছে যেতে ধাক্কা খায়, তাড়া খায়, মুখ ঝামটা খায়।—তুমি এ পাড়ার নও। কেন এসেছো অন্নভোগে। ভাগো।

চমকিত প্রসূন নিজের পানে তাকায়। বাসি দাড়ি, পাকার আধিপত্যে ভাঙা গাল। খের্বাকৃতি এবং ক্ষয়িষ্ণু মুখশ্রী—ফেকাস আদল; মেয়েটি তাকে পালটি ঘর গন্য করেছে। মস্ত ভুল। কিন্তু কারণ আছে। প্রসূন রাজ্য সিভিল সার্ভিসের পদস্থ চাকুরে। সংরক্ষণ কোটাসিস্টেমে নয়। গণ কোটায় উচ্চশিক্ষা। উঁচু চাকরি। চাকরি-নিরাপত্তা-প্রতিষ্ঠা সফলতার দ্যোতক। যে সফলতা গঠন বিনির্মাণ করে। ব্যক্তিত্বে দ্যুতি আনে। প্রসূনের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় আছে। জৌলুসের উপকরণ সকলি তার অর্জনে। অথচ সর্বাঙ্গে লেপটে আছে তপসিলি উপসর্গ। যেন ত্বক লগ্ন জন্মদাগ। আবার অন্য প্রকার সন্দেহও কারো মনে টুকি দেয়। মনে হয় অভিমান এবং এক প্রকার নিরুপায় আক্রোশে ও নিজস্ব খোল চূর্ণ করতে ইতস্তত। উলটে প্রতিপালনে শ্রদ্ধাভাজনেষু।

এই মনোভাবে প্ররোচিত প্রসূন বাধ্যতামূলক রীতিনীতির বাইরে নিজস্ব জাতি সত্তার সামাজিক ব্যাকরণ আঁকড়ে থাকে। নাগরিক প্রথাটুকলি করে না। ফলে খিচুড়ি ব্যক্তিত্ব। কারো দোষ নেই। কেউ আঁচ করে ওর নাগরিক প্রকাশ। কারো নজর কাড়ে ওর নিম্নবর্গীয় রুচি। নানান দিক থেকে বিভ্রমের শিকার। গুনাগারও দিতে হয়। এর জন্য অবশ্য প্রসূনের ক্ষোভ নেই। বরং মজা পায়। আমুদে দৃষ্টিতে ও অপমানের উৎস নারীকে খোঁজে।

এদিকে মেয়েটির বিভ্রম ছিন্ন হয়েছে। সে বোঝে এ লোক কাঙাল পংক্তির লোক নয়। ভ্রম শোধরাতে সে ধেই ধেই করে ধেয়ে আসে। গা ঘেঁসে শুধোয়, —তুমি কী চাও গো—।

প্রসূন পূর্ণ চোখে তাকায়, সহবাসের পয়দা। সৃজন নয়। বুভুক্ষার ফসল। অপুষ্টির ডাঁসা কাঠাম। গা থেকে গলা হাড়সর্বস্ব। কৃশতার অভাব থমকে গেছে মুখে। অভাব লীন, উদ্ভব হয়েছে বৈভব। ভরাট উজ্জ্বল মায়াময় মুখ। আবছা চন্দন আভা। ভর্তুকি দিয়ে দিয়ে গড়ে ওঠা ফুল্লকুসুমিত মুখশ্রী। অনবদ্য কারুশিল্প। শরীরের ব্যাপক অংশ অভাবী, ক্ষুদ্র অংশ বৈভবী। শূন্যতা এবং পূর্ণতার বৈপরীত্যে অদ্ভুত সহাবস্থান—একই অঙ্গে। দেখতে দেখতে ঘোর লাগে প্রসূনের। দৃষ্টি আশ নিরসন হয় না। কপালের আল বেয়ে বয়ে আসা চুলের রাশ। দু-হাতের আঙুলে ঝোপ কেটে রোদনভরা মুখ ঝলসে ওঠে।—কী খুঁজছো গো তুমি?

ঘোর ছিন্ন হয়। ফস করে প্রসূন প্রস্তাব পাড়ল।—তুমি কাজ করবে? ঠিকে কাজ, মাস মাইনের?

—দেবে তুমি। তোমার বাড়ি। মাইরি বলছি মন দিয়ে কাজ করব। চুরি করে পালাব না। হাতটান নেই।

পুষ্পিত অর্ঘ্যের মতো লুটিয়ে পড়ল আশ্বাসপ্রবণ আর্তনাদ।

॥ চার ॥

স্মৃতিভ্রংশ হয় না। আবার স্মৃতি উদযাপনের স্পষ্ট বাস্তবতা অবলুপ্ত। আলো-ছায়ার দ্বন্দ্বে স্মৃতি ভার বিষম কষ্টের, অগত্যা অনির্ণেয় এক বাস্তবতা, ধোঁয়াসা আচ্ছন্ন মনোবিহার প্রসূনকে বিদ্ধ করে। দগ্ধ করে। ক্লান্ত করে। না পারে বাড়তে না পারে রক্ষণ করতে। বয়স ফোড়া পালন করে তার ধর্ম। কুরে কুরে দংশায়।

তখন সে ১৪, মেয়েটি ১২, ও থাকে আন্দুল রোড থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটা পথে ভেতরে। পোদরা গ্রামে। মেয়েটি থাকে দু-স্টপ এগিয়ে অরবিন্দ পল্লিতে। একই গৃহ শিক্ষকের কাছে টিউশন পড়ে। দেখাদেখি চোখাচোখি আলাপ, ক্রমে ভালোবাসা। ওদের ভালবাসার দৈনন্দিনতা ছিল দেখবার মতো। ইলোরা আর প্রসূন যেন একই ছন্দে একটি কবিতার দুটি চরণের মতো মিলে গেছে। মনে মনে আলাপে শপথবাক্যে সাব্যস্ত হয়ে যায় ওরা প্রেম করবে, বিয়ে করবে সংসার করবে। সবই প্রথাসিদ্ধ এমনকি বাল্য প্রেমে অভিশাপ আছে শ্রুতি ও প্রথাসিদ্ধ হয়ে যায়। প্রসূন যখন কলেজের উঁচু ধাপে সহসা আবিষ্কার করে ও বয়কটে। কোনো নোটিশ জারি ছাড়া। কিছুদিন যায় অভিমানে। কিছুদিন যায় মান রাখতে। কিছুদিন যায় রাগ পুষতে। অবশেষে একসময় সব বয়ে যায়। খোঁজ খোঁজ উদ্যোগ শুরু হয়, জানা যায় ইলোরা মানুষ হচ্ছিল এক আত্মীয় বাড়িতে। বাংলাদেশ চলে গেছে বাবা-মার কাছে। এর বেশি কিছু জানা গেল না। মনে হয়েছিল যা জন্মের সম্পর্ক জন্মের মতো তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আশার জলাঞ্জলি। সবশেষে প্রসূন যৌব ধর্ম পালন করে। প্রতিজ্ঞা করে ওকে ভুলবই। শুধু একবার যদি জন্মের মতো দেখতাম।

দেখা হয়নি। ঝাপসা হয়েছে সেই সকুমার মুখচ্ছবি। সেই আরতোজ্জ্বল প্রেমাচ্ছন্ন লজ্জা লজ্জা টলটলে নয়নযুগল। সেই মৃদুহাস্য, সেই কোমল স্নেহময় মধুর কণ্ঠধ্বনি।

॥ পাঁচ ॥

সংগতি এবং অকুণ্ঠ স্বস্তি ভরন দিয়েছে মনীষাকে। কাজ আছে। অবসর আছে। অপরাপর চাহিদার যোগান আছে। মনীষার মতো করে মনীষা খুশি। সংসার সুখে আছে সুখের সংজ্ঞায়। গৃহস্থালি সাবলীল। অন্দরমহলের এই নিরাপত্ত এর মূল যে গিন্নিপনা তা কাজের মেয়েটির। দু-হাতে সে সব দিক সামলায়। সংসারে সে সুন্দর মানিয়ে গেছে। তার ধূলিধূসর চেহারা এখন প্রত্নতাত্ত্বিক—এমনই পরিবর্তন, পোশাক আহার এবং নিরাপত্তার সৌজন্যে

মেয়েটি ফুটন্ত। সবই ঘটেছে মনীষার ভরণে। এক গিন্নি উৎপন্ন করেছে আর এক গিন্নির ধারা। মেয়েটির নতুন নামকরণ করেছে মনীষা। কুড়ানি, ঠাট এমন যে সে যে সংগ্রহ ডিখিরি পাড়ার—সে তথ্য এক্ষণে পুরাতত্ত্বের।

জীবনের ধর্ম নিয়ে জবাবি মন্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণকে জ্ঞাত করেছিলেন যে তত্ত্ব—বেঁচে থাকার সেই ধরতাই আগলে জীবন ছিল টপবগে। সমস্যা-সংকট-উত্তরণ—খুশি ইত্যাদির সংকলিত সংসারে প্রসূনের মন অভিগত। প্রসূন শান্ত।

ছিল...।

যায় সুখ বেঁপে—কামনা করলেই কী সুখ বর্ষণ হয়। না। মানসিক ফলে না, অন্তত প্রসূনের জীবনে ফলেনি। ধোঁকা দিয়েছে। তার মনরাজ্য জুড়ে হাহাকার। দুঃখের দৌরাত্ম্য, সুখের নির্বাস। কৃতার্থ জীবনের সত্য তার বুকে অহরহ ঠাট্টার সুর বাজায়।

প্রসূন করতলে মুখ গোঁজে। দিশাহারা অনুসন্ধান ঝাপসা সিদ্ধান্ত রক্তের ভিতর হাহাকারে হলাৎ করে। হাহুতাশে ছিন্নভিন্ন হয় কোষ। অক্ষম আক্রোশে চৌচির হয়ে স্বগতোক্তি করে। অনেক দিয়েছ প্রভু—দিলে আবার কেড়ে নিলে। দিলেই যদি কাঙাল করলে কেন।

বুক ভরে তার শোক উথলোয়। সমৃদ্ধ বিরহে প্রসূনের কান্না আসে। ফোঁপায়। হে ঈশ্বর যার ঘরনি হয়ে থাকার কথা সে হল পাকা দাসী। বিধাতা এ কোন খেলা খেললে তুমি।

বিগ্রহ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

কতদিনে একটা ব্যবস্থা স্থবিরতা পেতে পারে? ধরা যাক দশ বছর-বিশ বছর—ত্রিশ বছরও হতে পারে। কি, এত কম সময়ে কি স্থবিরতা আসে? না, আসা উচিৎ? তবু জড়বৎ বিগ্রহ হয়ে যায় কেউ কেউ। যেমন হয়েছে আমাদের ছিদাম মুদি।

বিগ্রহ হতে চায়নি ছিদাম। যদিও বিগ্রহ হতে চাওয়া না চাওয়া কোনোটাই ছিদামের ইচ্ছার অনুবর্তী নয়। তার চেয়ার, তার চারিপাশের পরিমণ্ডল, ঘর-বায়ু-অবস্থান সবকিছু মিলিয়েই তো ছিদামের ক্রিয়া। ছিদামের প্রতিক্রিয়া এখানে বাহ্য। চারিপাশের পরিমণ্ডল-ব্যবস্থা-অভ্যাস ধীরে ধীরে ছিদামকে বিগ্রহ করে তোলে। অবশেষে একদা ছিদামকে তাই বিগ্রহ হতেই হয়।

বামপ্রান্তের একটা ঘরে ছিদামের অধিষ্ঠান। ছিদামের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার আছে। চেয়ারের চারিপাশে লোক। ঐ লোকেদের ঘিরে আরো অনেক লোক ঘরের ভিতরে। ঘরের ভিতরের লোকেদের ঘিরে আরো অসংখ্য লোক ঘরের বাইরে।

কেউ কোনোদিন চেয়ারের লোক হয়ে জন্মায় না। কাজ করতে করতে চেয়ারের হয়। কেউ কোনোদিন চেয়ারের পাশের লোক হয়ে জন্মায় না। কাজ করতে করতে পাশের হয়। এই একই নিয়মে ঘরের লোক, ঘরের লোককে ঘিরে থাকা বাইরের লোক, তাঁদের ঘিরে থাকা আরো অনেক লোক...ইত্যাদি।

ছোট ছোট ঝড়-ঝাপটা মাঝেমাঝে এসে ওলোট-পালট করে। ঘরের লোক চলে যায় বাইরে। বাইরের লোক এসে ঘর দখল করে। ছোটোখাটো দু'একটা ব্যতিক্রম ঘটে গেলেও ছিদামমুদির চেয়ারে অধিষ্ঠানের কাল মোটামুটি নির্বিঘ্নেই কেটে যাচ্ছে।

ছিদামমুদি চেয়ারের লোক। চেয়ারে বসে বসে স্থাণুবৎ। স্থাণু হতে হতে জড়বৎ। জড় হতে হতে বিগ্রহ। ছিদামমুদি এখন বিগ্রহ। ছিদামের নামে প্রতিদিন পুজো হয়। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তদল পুজোর ডালি সাজিয়ে নিয়ে আসে। ছিদাম বন্দনা হয়। ভক্তরা ভক্তিভরে ছিদামকে অঞ্জলী দেয়। ছিদামের নিকট মনোস্কামনা ব্যক্ত করে। ছিদাম ও যথাসম্ভব ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করে।

ছিদামমুদি চেয়ারের লোক। চেয়ারে বসে বসে স্থাণুবৎ-জড়বৎ-বিগ্রহ, ভক্তপরিবেষ্টিত ছিদামমুদির ভক্তসংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুজোর ডালি নিয়ে আসা ভক্তদের মধ্যে মাঝেমধ্যেই হাতাহাতি-লাঠালাঠি, কখনও বা খুনোখুনীও হয়। নিন্দুকেরা মাঝেমাঝে মুখ ফস্কে বলেও ফেলেন "—ছিদামের ছত্রছায়ায় আছে বলেই এদের এত বাড়বাড়ন্ত।" ভক্তরা কিন্তু অন্যকথা বলে, "ছিদামকে তুষ্ট করার অধিকার সকলেরই আছে। আর ভক্তদলের মনোস্কামনা পূরণের জন্য ছিদামকে স্পর্শ করতে গিয়ে যদি একটু ঠেলাঠেলি হয়, পদপৃষ্টে দু'একজন ভক্ত মারাও যায়, তবে অন্য লোকের পেছন ফাটছে কেন?

কিন্তু বাস্তবে যাদের 'পেছন ফাটে', তারা তো অন্যের মাথা ফাটাবেই। এটাই নিয়ম। এই মাথা ফাটাফাটির মধ্যেও ছিদামের কলাটা-মুলোটা প্রাপ্তির সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পেতেই থাকল। ছিদাম ভাবল, থুড়ি, ছিদাম তো এখন বিগ্রহ, একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য, ছিদামের বিগ্রহ টিকিয়ে রাখার জন্য, চেয়ারের পাশের লোক, পাশের লোককে ঘিরে ঘরের ভেতরে থাকা অসংখ্য লোক, ঘরের ভেতরে থাকা অসংখ্য লোককে ঘিরে বাইরে থাকা আরো অসংখ্য লোক প্রতিদিন ছিদামের অনুগ্রহ প্রার্থী হল এবং জোটবদ্ধ হয়ে ছিদামের মাহাত্ম্য দিকবিদিক প্রচার করতে শুরু করল।

ছিদামমুদি এখন আর একটা লোকের নাম নয়। একটা চেয়ার। শুধু একটা চেয়ারের নাম নয়। একটা প্রতিষ্ঠান, একটা বিগ্রহ। শুধু একটা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহও নয়, অগণিত ভক্তদলের আকাঙ্ক্ষা। একটা প্রাপ্তি। একটা নির্ভরতা। নির্ভরতা পেতে পেতে একটা স্বার্থান্বেষী অভ্যাস। অভ্যাস মানে হাজার হাজার জনতা। হাজার হাজার জনতার ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষাকারী বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘমেয়াদি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। যার কেন্দ্রে ছিদামমুদি নামক একটা চেয়ার। চেয়ারে বসা স্থানুবৎ-জড়বৎ একটা বিগ্রহ।

ধরা যাক বিগ্রহ সরে গেল। চেয়ার সরে গেল। ঐ বিগ্রহের উপর নির্ভরশীল জনতা, দাতা ও গ্রহিতার যে পারস্পরিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ আছে, তাদের লোভী ক্ষুধার্ত হিংস্র চোখ তো সহজে মেনে নেবে না। তখনতো বিগ্রহকে ঘিরে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

একটা পার্টিক্লাসে মৃত্যুঞ্জয়দা এরকমই এক গল্প শোনাল আমাদের। আমাদের বয়স কম। সব কিছু প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞা করার মনের জোর—মেধা, প্রবণতা আমাদের সকলের। আমরা সমস্বর প্রতিবাদ করে উঠলাম। বললাম আপনার গল্প আমরা মানি না। আমাদের অবচেতনে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার প্রতি এক ধারাবাহিক দুর্বলতা কেন তৈরী করতে চাইছেন? আপনি কি বলতে চান এই বিগ্রহকেই সারাজীবন পুজো করে যেতে হবে?

—বিগ্রহ কি পুজো চায়?

—তবে আমরা দিই কেন?

—আমাদের সুপ্ত বাসনা পূরণের জন্য।

—আমাদের যদি বাসনা না থাকে?

—আকাঙ্ক্ষা থাকবে।

—যদি বাসনা-আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করি।

—সংযত করার ক্রিয়া?

—ত্যাগ।

—ত্যাগের পর?

—শান্তির।

—শান্তির পর?

—সুখের।
—সুখের পর?
—প্রাপ্তির।
—প্রাপ্তির পর?
—পূর্ণতা।
—পূর্ণতার পর?
—আনন্দের।
—আনন্দের পর?
—অধিকতর আনন্দের জন্য অধিকতর আকাঙ্ক্ষা।
—অধিকতর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য?
—পুজো।
—পুজার জন্য?
—উপকরণ।
—উপকরণের জন্য?
—বস্তু।
—বস্তুর জন্য?
—অর্থ।
—অর্থের জন্য?
—প্রচেষ্টা।
—প্রচেষ্টা যদি সার্থকতা না পায়?
—ভজনা।
—কার?
—বিগ্রহের।

সেদিন আর আমরা বেশিদূর এগোতে পারিনি কথার খেলা নিয়ে। কিন্তু আমরা নিজেরা আগামী দিনের ভাবী ব্রিলিয়ান্ট। আমরা সহজে কথার খেলায় হার মেনে নিতে পারি না। তাই আবারও প্রশ্ন করলাম—বিগ্রহ যদি পুজো না চায়?

—তবে ফিরে এসে চেয়ারে বসতে হবে।
—যদি তাই বসে?
—তবে স্থাণু হতে হতে জড় হয়ে যাবে।
—যদি স্থাণু না হতে চাই?
—তবে ছিদামকে মুদি হয়ে যেতে হবে পুনরায়।
—ছিদাম যদি মুদি হয়ে যায়?
—তবে তাকে দোকানে ফিরে যেতে হবে।

—যদি সে দোকানেই ফিরে যায়?
—তবে চেয়ার ফাঁকা হয়ে যাবে।
—যদি চেয়ার ফাঁকা হয়ে যায়?
—তবে ঘর ফাঁকা হয়ে যাবে।
—যদি ঘর ফাঁকা হয়ে যায়?
—তবে লোক ফাঁকা হয়ে যাবে।
—যদি লোক ফাঁকা হয়ে যায়?
—তবে পার্টি থাকবে না।
—যদি পার্টি না থাকে?
—তবে এতো প্রশ্ন করবে কে? —মৃত্যুঞ্জয়দা কথার রেশ টানল।

ছিদাম মুদি কিন্তু এত ভেবে দল করেনি। করতো নিতান্ত একটা মুদির ব্যবসা। তেলচটা সাইনবোর্ডে লেখা ছিল, 'রুক্মারী ষ্টোর্স' তার তলায় বড়বড় হরফে লেখা, 'সততাই মূলধন'। তার তলায় ছোটছোট করে লেখা—প্রোঃ শ্রীদাম মণ্ডল।

সততাকে মূলধন করে ছিদাম জনপ্রিয় হল। ভোটে জিতল। ছিদামকে কেন্দ্র করে এলাকায় পার্টি গড়ে উঠল। এ সবই অতীত। বর্তমান শুধু ছিদামের বিগ্রহ। ছিদামের চেয়ারে বসা।

প্রতিদিন সকাল ৯টায় এসে চেয়ারে বসে। চেয়ারে বসেই প্রথমে স্থাণুবৎ তারপর জড়বৎ। তারপর ক্রমশঃ বিগ্রহে রূপান্তরিত হয়। চেয়ারের চারপাশের লোক। চেয়ারের চারপাশ ঘিরে ঘরের লোক। ঘরের লোকেদের ঘিরে ঘরের বাইরের লোক—চক্রাকারে ব্যূহ রচনা করে ছিদামকে ঘিরে। এরাই ছিদামের ভক্তকুল। এরাই ছিদামের মাহাত্ম্যর প্রচারক। এরাই ছিদামের আশ্রয়। চারপাশে সমাজের গর্ভে যে নিয়মিত পচন ধরে যাচ্ছে, তার গন্ধ ছিদামের কাছে পৌছনোর সুযোগ নেই এদের জন্য। ছিদাম আত্মতৃপ্তিতে মশগুল। ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণের তৃপ্তিতে মশগুল। গন্ডির বাইরে, ঘরের বাইরে, ব্যূহের বাইরে অহরহ ঘটে যাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ নেই ছিদামের। গন্ডির ভেতরে, ব্যূহের ভেতরে, মুষ্টিমেয় মানুষের তৃপ্তির জগতকে, মুষ্টিমেয় মানুষের ইচ্ছা বাসনাকে পরিপূর্ণ করে তোলাই ছিদামের ধ্যানজ্ঞান, এহেন ছিদামকেও চমকে যেতে হল এক ছোট্ট ঘটনায়।

একদা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এক ভক্ত ছিদামের দর্শনপ্রার্থী হয়েছিল সকাল ৮ টায়। তখন ছিদামের ঘরের চারপাশে মুষ্টিমেয় গুটি কয়েকের ভীড়। ছিদাম ঘরে ঢুকল সকাল ৯ টায়। বিগ্রহ হল সকাল সাড়ে ৯টায়। প্রথম দর্শনার্থীকে দর্শন দিল ৯টা ৪০ নাগাদ। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। তারপর চিত্রটা ভিন্ন। চেয়ারের চারপাশে থাকা লোকের সুপারিশ, চেয়ারের চারপাশের লোককে ঘিরে থাকা ঘরের লোকেদের সুপারিশ

এবং সবশেষে ঘরের লোকেদের ঘিরে থাকা বাইরের লোকেদের তৎপরতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ লাইনে সামিল হতে হল লোকটিকে এবং শেষ দর্শনার্থী হিসাবে তাঁর অবস্থান নির্ণিত হল। সর্বশেষ দর্শনার্থী হওয়াতেও বিশেষ কোনো অসুবিধা ছিল না, যদি সব কিছু নিয়ম মাফিক হত। বিভ্রাট ঘটল অন্যত্র। যখন সে দর্শনের সুযোগ পেল, ছিদামমুদির বিগ্রহের সময় অতিবাহিত হয়েছে। ছিদামকে ঘিরে থাকা সকলেই এখন নিজেদের প্রাপ্তি, কমপ্রাপ্তি, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এবং দেশের আসন্ন ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় মশগুল। এহেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অকস্মাৎ ব্যক্তিটির অনুপ্রবেশ ও প্রশ্ন, উপস্থিত সকলকে বিচলিত করল।

ছিদাম এখন মুদ্রিত আঁখি সম্পন্ন বিগ্রহ নয়। লোকটির চেহারা সে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করল এবং আগত ও চারিপার্শ্বস্থ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে তার চেহারাগত পার্থক্য অতি সহজেই বুঝতে পারল।

ছিদাম মুদি এখন বিগ্রহ নয়। এমন কি চেয়ারের লোকও নয়। ফলে যথাসম্ভব হৃদয়ের কাছাকাছি গিয়েই প্রশ্ন করল—

—তোমার কি চাই?

—আজ্ঞে, আমার ছেলের ওলাওঠা...

—ডাক্তার দেখাওনি কেন?

—আমাদের হাসপাতালে এখন কোনো ডাক্তার নেই।

—ডাক্তার তো থাকার কথা। নেই কেন?

—ছিল। গত সনে সেই ডাক্তারবাবু সাপের কামড়ে মারা গেলি আর কেউ এখানে আসতি চাইচে না। কলকাতা থেকি দু দুবার অর্ডার হয়েচে। কেউ আসে নি।

—আমি ওষুধের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। নিয়ে যাও।

—আমি ওষুধ নিতি আসিনি বাবু। ডাক্তার নিতে এয়েছি।

—কিন্তু ডাক্তার কবে যাবে তো ঠিক নেই। আপাততঃ ওষুধ নিয়ে গিয়ে ছেলেকে বাঁচাও।

—ছেলেকে আর কি বাঁচাবো বাবু, ছেলেতো কালই মারা গেছে।

—তাহলে আমার কাছে...? (প্রশ্নটা ছিদামমুদির কাছে কেমন এলোমেলো মনে হয়। প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতায় বুঝতে পারে না ২৫ বছর চেয়ারে, চেয়ারে বসে বসে বিগ্রহ হয়ে যাওয়া ছিদাম মুদি।)

—শুনেচি আপনি সাক্ষাৎ বিগ্রহ। আপনার কাচে পুজোর ডালি নিয়ে এলি সমস্ত ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন বলে শুনেচি। তাই ভাবলাম, আপনার কাছে যাই। আমার ছেলে তো মারাই গেছে, যদি আপনার দয়ায় বাকি ছেলেরা বাঁচে।

এই প্রথম নড়েচড়ে বসল ছিদাম মুদি। এই প্রথম এক ব্যতিক্রমী ভক্তের সাক্ষাৎ। এতোদিন ভক্তকুলের মনোস্কামনা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাওয়া-পাওয়ার গন্ডিতে। কিন্তু এ চাওয়া ভিন্ন। এই বাসনা পূরণের যাদুকাঠিতো তার হাতে নেই। কেউ বেকার? হয়ে যাও সাপ্লায়ার।

লোহা-ইট-কাঠ-বালি-সিমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন সাপ্লায়ার। যদি চাও দিতে পারি অটোর পারমিট। অতি প্রিয় হলে বাসের পারমিট। অশিক্ষক কর্মীকে করে দিতে পারি শিক্ষক। শিক্ষক হতে পারে প্রধান শিক্ষক। অধ্যাপক হতে পারে রেজিস্টার। কখনও সবাইকে টপকে অধ্যক্ষও করে দিতে পারি। কিন্তু এ চাওয়ার ধরণ ভিন্ন।

সমগ্র বিশ্বজুড়ে সম্প্রতি দেখা দিয়েছে এই এক চরম আত্মসংকট। বাসনা পূরণের কাঙ্ক্ষায় মানুষ দুর্নিবার। সমস্ত অ-জড় বস্তু জড়ে পরিণত হচ্ছে। মানবকূল পশুপাখিতে রূপান্তরিত। পশুপাখিরা নগন্য কীটে। জীবনের গতি উর্ধ্বমুখী অথচ জীবনের গান অন্তর্লীন। কাল ক্রমশ মৃতবৎ। জীবন অর্ধমৃত।

ছিদাম মুদির চৈতন্য ফেরে। বিগ্রহ থেকে চেয়ারে এসে বসে। ঘরের সকলের কণ্ঠস্বর কেমন কর্কশ হয়ে যায়। ছিদাম ভক্তবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করে

—আমি কোথায় ছিলাম?

—ধ্যানে।

—কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে আমি অর্ন্তধ্যানে।

—আমরা আপনার চারপাশে ঘিরে আছি।

—আমি কার সাথে কথা বলছি?

—আজ্ঞে এই লোকের সঙ্গে।

—কি চাও তুমি?

—প্রতিশ্রুতি,

—কিসের?

—চিকিৎসার।

—তোমার ছেলে তো মারা গেছে।

—অন্য যারা বেঁচে আছে তাদের জন্য।

—কিন্তু আমি তো শুধু তোমাকেই কিছু দিতে পারি।

—কিন্তু আপনি তো এখন বিগ্রহ নন।

—তাতে কি?

—বিগ্রহের কাছেই শুধু নিজের জন্য চাইতে হয়।

—তাহলে আমি কোথায়?

—আপনার চেয়ারে।

—আমার চেয়ারের কাছে তুমি কি চাও?

—আপনাকে ম্লান না করার প্রতিশ্রুতি।

—কিন্তু চেয়ারের কি সেই সাধ্য আছে?

—আপনি নিজের কাছেও তো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

—কিসের?

—অবশ্যম্ভাবী পতন রোধের।

—কোথায় তুমি পতন দেখতে পাচ্ছো?
—আপনার বিগ্রহের।
—কিভাবে এ পতন আমি রোধ করবো?
—প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকারে।
—কে তুমি? নিশ্চিত করে বলো?
—আমি মানুষের প্রতিনিধি।
—কোন মানুষের? তুমি তো কোনো সাধারণ মানুষ নও।
—মানুষ-ই আমার একমাত্র পরিচয়।
—তুমি কি চাও?
—ডাক্তার।
—কার জন্য?
—রোগাক্রান্ত আর্ত মানুষের জন্য।
—নিজের জন্য তুমি কিছু চাইতে শেখো নি?
—না।
—কিন্তু এই অপারগতা আমার যন্ত্রণা।
—কিসের?
—আমার প্রতিশ্রুতি পালনের।
—কিসের প্রতিশ্রুতি?
—আমার মুক্তির।
—কিন্তু যতক্ষণ না প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে, তোমার মুক্তি নেই।
—যদি আমি এ জীবন তোমাদের হাতে সঁপে দিয়ে মৃত্যুবরণ করি?
—কিন্তু বেঁচে থাকাইতো মানুষের একমাত্র অঙ্গীকার।
—কিভাবে আমি বাঁচবো?
—অন্যকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে।

মৃত্যুঞ্জয়দার গল্প শুনতে শুনতে, দুঃখে, হতাশায়, আশাভঙ্গের বেদনায় আমরা রূদ্ধবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম মনুষ্যকুলতো প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন। মেধা ও মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে অগ্রগতিতে। কিন্তু ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না কেন? গতিপথে আছে অনেক চড়াই উৎরাই। কখনও একটা ছোট্ট টিলার ধাক্কা খেয়ে এভারেস্টে ওঠার বাসনা-ই পরিত্যক্ত হয়, আবার কখনও শুশুনিয়া পাহাড় ডিঙিয়ে এভারেস্ট জয়-এর উল্লাস দেখায়।

নেই নেই করে ঘন্টা দু'এক মৃত্যুঞ্জয়দার ক্লাস শুনছি। এতদিন শুধু জয়, জয়-এর স্বপ্নে বিভোর। বাস্তবের নিরিখে দেখা যায়, এই জয় আসলে জয় নয়, মাথা গোঁজার ঠাঁই। কিন্তু অনন্ত আকাশ যেখানে লক্ষ্য, মাথা গোঁজার ঠাঁই তার কাছে নগন্য হতে বাধ্য। আবার সামান্য মাথা গোজার ঠাঁই নিয়ে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে যেখানে, তার পায়ের তলার

মাটি অকস্মাৎ যদি কেঁপে যায় প্রবল ভূমিকম্পে অথবা বিস্ফোরণে, তখন তো ভাবতেই হবে যেটুকু জায়গা পেয়েছি, তাও তো নিরাপদ নয়।

ছিদাম মুদি বিগ্রহ থেকে চেয়ারে এসে বসেছে, এটাকে যদি অগ্রসরণ ভাবি, তবে বিগ্রহে ফিরে যাওয়া যেকোন মুহূর্তে ঘটতে পারে। ছিদাম এই প্রথম ভক্তের মনোস্কামনা পূরণে ব্যর্থ হল। ঘরের ভেতরের লোক, ঘরের ভেতরের লোককে ঘিরে থাকা বাইরের লোক, সকলেই সচেষ্ট হল, এই জাতীয় অবাঞ্ছিত ভক্তদের আগমন রুখে দেবার। প্রতিরোধ যত এল, অবাঞ্ছিত ভক্তের সংখ্যা ততোই বৃদ্ধি পেল।

বিগ্রহ এখন চেয়ারে। বাইরের কোলাহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্তকোলাহল একজন থেকে অন্যজনে সংক্রামিত হচ্ছে। সকলেই এসে বলছে, —আমার ছেলে যখন মারা গেছে, অন্যের ছেলেরা যাতে বাঁচে তার ব্যবস্থা করুন। ছিদামের হাতে সেই ব্যবস্থার চাবিকাঠি নেই। চেয়ারেরও জানা নেই গোটা ব্যবস্থাকে কিভাবে বদলাতে হয়। তাই চেয়ার ক্রমশঃ হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠিত করে বিগ্রহ।

বিগ্রহের যা ক্ষমতা আছে, চেয়ারের নেই। ছিদাম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতরে লোক, ঘরের ভেতরের লোকদের ঘিরে বাইরের লোক, সকলে মিলে একটা সমাধান সূত্র খুঁজে পেল। ছিদাম ঘোষণা করল ওলাওঠাতে যাঁদের পুত্রসন্তান মারা গেছে তাদের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণে রাজী হল না কেউ-ই, সকলেই সমস্বরে বলল—ডাক্তার চাই, হাসপাতাল চাই, চিকিৎসা চাই।

মৃত্যুঞ্জয়দার গল্প থামিয়ে দিয়ে আমরা বললাম, 'বিগ্রহ বদলের হাওয়া তবে কেউ তুলছে না কেন?'

মৃত্যুঞ্জয়দা বলল—বদলের হওয়া মাঝেমাঝে ওঠে না বললে ভুল হবে। ওঠে। তবে কেউ কেউ অভ্যাসে, কেউ কেউ বিশ্বাসে বিগ্রহের পক্ষেই থেকে যায়। তাছাড়া বিগ্রহের আশীর্বাদধন্য অগণিত ভক্তবৃন্দ, তাদের মিলিত শক্তিও তো উপেক্ষা করা যায় না।

—বিগ্রহ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে ভক্তবৃন্দের আস্ফালণও অবশ্যম্ভাবী?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—বিগ্রহ আর ভক্তদল একে অপরের পরিপূরক।

—বিগ্রহ যখন ভক্তবৃন্দের ব্যক্তিগত মনোস্কামনা পূরণ করবে না?

—ভক্তদলের সংখ্যা কমবে।

—ভক্তদল, যদি ব্যক্তিগত মনেবাঞ্ছা ব্যক্ত না করে, সমষ্টির স্বার্থে করে?

—ভক্তদলের সংখ্যা কমবে।

—বিগ্রহ যদি সমগ্র মানবজাতির প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখে?

—ভক্তদলই গড়ে উঠবে না।

—যদি ভক্তদল গড়ে না ওঠে তবে?

—বিগ্রহ সৃষ্টি হবে না।

—বিগ্রহ যদি সৃষ্টি না হয়?

—ইচ্ছাপূরণের কেন্দ্র থাকবে না।

—ইচ্ছা পূরণের কেন্দ্র যদি না থাকে?

—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে না।

—আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত না হলে?

—লোভ প্রকাশ পাবে।

—লোভ মানেই তো ইচ্ছা, পাওয়ার ইচ্ছা, লিপ্সা।

—হ্যাঁ, তার মানে প্রয়োজন ইচ্ছা পূরণের কেন্দ্র।

—তার মানে তো আবার সেই বিগ্রহ।

—মৃত্যুঞ্জয়দা বলল, হ্যাঁ, এতক্ষণ সেই কথায় তো বলছিলাম, আমাদের চাহিদার পরিকাঠামোতে বিগ্রহ সৃষ্টি হবেই আর ভক্তদল তার বাইপ্রোডাক্ট।

আমরা বললাম, 'ঠিক আছে মৃত্যুঞ্জয়দা আপনি ছিদামমুদির বিগ্রহের গল্পটাই বলুন দেখি ছিদাম কি করছে।' মৃত্যুঞ্জয়দা বলল—কি আর করবে, ছিদাম বেচারার তো আর কিছু করার ছিল না, —তাই সে দরোজার দিকে পা বাড়াল। ভক্তবৃন্দ সকলে হায় হায় করে উঠল, বলল—

—একি করেন? একি করেন, আমাদের ছেড়ে কোথায় চলেন?

—মুদির দোকানে।

—কিন্তু ওখানে তো কোনো চেয়ার নেই, ঘর নেই, ঘরের ভেতরের লোক নেই, ঘরের ভেতরের লোকদের ঘিরে বাইরের লোক নেই।

—তাতে কি হয়েছে?

—চেয়ার তো কোনো দিন ফাঁকা থাকতে পারে না?

—কিন্তু চেয়ার তো জড় পদার্থ। তার থাকা না-থাকা দুই ক্রিয়াই সমান।

—কিন্তু চেয়ারের মানুষতো জড় নয়?

—তবু চেয়ারে বসলে মানুষ জড় হয়।

—সেটা মানুষের ব্যর্থতা।

—চেয়ারকে উদ্যোমী করে তোলা মানুষের কাজ।

—কিন্তু চেয়ারের অভ্যন্তরে, অন্তরালে লুকিয়ে আছে দুর্বিনীত আকাঙ্ক্ষা-লিপ্সা।

—সে আকাঙ্ক্ষা মানুষের অনিয়ন্ত্রিত।

—কিন্তু পৃথিবীব্যাপি মহা কোলাহলের মধ্যে, ধ্বনি-প্রতিধ্বনীর অনুরণন, মানুষের সাফল্য, মানুষের জয়, মানুষের বেঁচে থাকা সব অর্থহীন হয়ে যায়, যদি চেয়ার এভাবে আকর্ষণ করে মানুষের গতিকে স্তব্ধ করে দেয়।

—চেয়ারও জড় বলে হয়ত মানুষও ক্রমশ জড় হয়ে যায়।

—মানুষকে ব্যর্থতা দেওয়া ছাড়া এ চেয়ারের কি আর কোনো লক্ষ্য নেই? উদ্দেশ্য নেই? গন্তব্য নেই?

জড়বৎ চেয়ারটাকে শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিদাম মুদি হাঁটা শুরু করল। একটাই গন্তব্য মুদির দোকান। দোকান কদ্দিন ধরে বন্ধ। দোকানে কি আছে সে জানে না। অসংখ্য ইদুঁর আরশোলা টিকটিকি হয়তো। তারাই এখন ছিদামকে ঘিরে থাকবে। অসংখ্য মানুষ পরিবৃত ছিদাম মুদি ঐ কীটের সংসারে কেমন থাকবে? চুপচাপ চেয়ারে বসে থেকে জড় হয়ে কিছুতেই মরবে না সে। প্রতিটি কীটের তবু একটা গতি আছে। বেগ আছে। দংশন আছে। তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিমুহূর্তে তাকে সচল থাকতে হবে। কিছুতেই নিষ্ক্রিয় হতে পারবে না। মানুষ একখণ্ড জড়বৎ চেয়ারের ওপর স্থানুবৎ বসে থাকার জন্য নয়, বিগ্রহ হয়ে শুধু অনুদান উপঢৌকন দেওয়ার জন্য নয়, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ক্ষতিপূরণ নয়, প্রতি ঘটনার সে নিয়ন্ত্রক হতে চায়।

ক এক পা এগিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছিদাম, ঘরের চৌকাঠে পা আটকে এই দুর্ঘটনা। ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখল, ঘরের সকলে, যারা এতদিন তাকে ঘিরে, তার চেয়ারকে ঘিরে বসে থাকত, তারা যে যার মত ব্যস্ত। ফাঁকা চেয়ারের গন্ধে মাছির মত চেয়ারের চারপাশে ভনভন করছে। ছিদামমুদি যেহেতু নিজের বিগ্রহের প্রতি জেহাদ ঘোষণা করেছে, অধিক যোগ্যতর কাউকে সেই চেয়ারে বসার অধিকার করে দিতে হবে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে একবার উঠে গিয়ে কোনোক্রমে চেয়ারটাকে স্পর্শ করল ছিদাম। চেয়ারের স্পর্শে ধীরে ধীরে ব্যাথার নিরশম হল। উষ্ণ মনে হল নিজেকে। একটা সামান্য মনোস্কামনা পূরণের ব্যর্থতায়, অতি সামান্য সময়ের জন্য কেমন সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে শুধুমাত্র অন্তরাত্মার নির্দেশে আবার সে চেয়ারে গিয়ে বসল। তার এতক্ষণের উদ্যোগ-তৎপরতা আবার সব স্থানুবৎ-জড়বৎ হল। আবার সে বিগ্রহে রূপান্তরিত হল।

আমরা সমস্বর প্রতিবাদ করলাম, বললাম, এতোটা এগিয়ে এসে গল্পের শেষে ছিদামের এমন পরিবর্তন হতেই পারে না। মৃত্যুঞ্জয়দা বলল, ঠিকই ধরেছিস, এই গল্পের আর একটা ভিন্ন পাঠ আছে :

ছিদামমুদি দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। পেছনের দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য পূর্বাপর বিবেচনা না করে ছুটতে শুরু করল। কৃত্রিম উপগ্রহের যেমন মহাকর্ষের বলয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গতির তীব্রতা বহুগুন বেড়ে যায়, তেমনি ঘর থেকে বেড়িয়ে ছিদামের গতির তীব্রতা বহুগুন বৃদ্ধি পেল। ছুটতে ছুটতে দমবন্ধ হয়ে এল। শরীরের শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে তবু ছুটে চলল একদা জড়বৎ-স্থানুবৎ ছিদামমুদি। সামনে দেখতে পেল আলোর ক্ষীণ রেখা। সেই আলো তাকে সম্মোহিত করে টেনে নিয়ে এল কাছে। পতঙ্গেরা যেমন আলোর রোশনাই-এ মুগ্ধ হয়ে আলোককুন্ডে

ঝাঁপ দেয়, হিদামের মধ্যেও তেমন আসন্ন মৃত্যুর প্রস্তুতি শুরু হল। হে মৃত্যু আমাকে আলিঙ্গন করো। তোমার চিরশান্তির পথে আমাকে নিয়ে চল। আমাকে মুক্তির পথ দেখাও।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। না এটা হতে পারে না। মানুষ শুধু ধারাবাহিক পরাজয় এর বাহক হতে পারে না। সমস্ত মানুষই বাঁচতে চায়। হিদামও তার ব্যতিক্রম নয়।

—মানুষের বিজয় বার্তার রঙীন স্বপ্ন দেখানোই আমার কাজ। কিন্তু...

মাথাটা টলে গেল মৃত্যুঞ্জয়দার। ধীরে ধীরে চেয়ারে এসে বসল। চেয়ারে বসে প্রথমে স্থানুবৎ তারপর জড়বৎ হল। তারপর বিগ্রহের ভঙ্গীতে অস্ফুট উচ্চারণ করল "তথাস্তু"।

মাথাটা এলিয়ে পড়ল চেয়ারের হাতলে। মৃত্যুঞ্জয় দা-ও মৃত্যুকে জয় করতে পারল না।

আমরা সমস্বরে উচ্চারণ করলাম

"ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রানশ্চক্ষুঃ শোত্রমথো বল মিন্দ্রিয়ানি
চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং,
মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং
মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে যে উপনিষৎসু
ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ
শান্তিঃ"*

---

* অনুবাদ : আমার অঙ্গসমূহ আপ্যায়িত বা পরিতৃপ্ত হউক, এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহও আপ্যায়িত হউক অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে সামর্থ লাভ করুক। সমস্ত বেদ ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে আমি যেন কখনও পরিত্যাগ না করি, অর্থাৎ তাহাতে যেন বীতশ্রদ্ধ না হই। ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন, আমি যেন কখনও প্রত্যাখ্যাত না হই। উপনিষদ শাস্ত্রে আত্মার যে সমস্ত ধর্ম উক্ত হইয়াছে, সেই ধর্মসমূহ আমাতে বিদ্যমান থাকুক। ওম শান্তি, শান্তি, শান্তি।

একাকীত্বে নির্বাসনে

মলয় দাশগুপ্ত

ছেলে অরূপ এই 'রিমোট-বেল' কিনে দিয়ে বলেছিল, 'মা, দরকার হলেই এই এখানকার সুইচটা টিপে দেবে, আমার ঘরে বেল বাজলেই আমরা কেউ না কেউ চলে আসব। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

নতুন খেলনার মতো সুইচটা নাড়াচাড়া করতে করতে সন্ধ্যাতারা বলেছিল, 'আমার জন্যে এত্ত করতে যাস কেন, আমি তো এখনো চেঁচিয়ে ডাকতে পারি।'

'এখন ডাকতে পারো মা। একদিন তো এমনও হতে পারে—,তাছাড়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির চেয়ে একবার বেলটা টিপে দেওয়াটা কি সহজ না?'

মা আর কথা বাড়ায়নি, নতুন দিনের নতুন ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়েই না সন্ধ্যাতারার জীবনটা আজ শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনের অপেক্ষা করছে।

রিমোট-কলার ও বেলটা মায়ের হাতে ধরিয়ে দেবার ফলে ছেলে-বৌ-এর যে সুবিধা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সারাদিনে খুব একটা আসতে হয় না এখন মায়ের ঘরে। অরূপ অফিস যাওয়ার আগে একবার আসে, ভালমন্দ কথা জিজ্ঞাসা করে, জানতে চায় মায়ের কী দরকার না দরকার, তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, 'মা যাই এবার।' বলে বেরিয়ে যায়। অরূপ তার এই রুটিনমাফিক কর্তব্য কোনোদিন ভোলে না। এর বেশি সন্ধ্যাতারাও আশা করে না

বৌমা যূথিকা দুপুরে খাবার সময় আসে। ভাতের থালা-বাটি ছোট্ট টেবিলে রেখে, 'হাত দিয়ে খাবেন, না খাইয়ে দিতে হবে?' জিজ্ঞাসা করে দাঁড়িয়ে থাকে। এটুকুই যথেষ্ট, এতটাই বা কে পায়, 'না মা, আমি নিজেই খাবো।' বলে আশ্বস্ত করে পুত্রবধূকে।

সন্ধ্যাতারাকে দেখাশোনা করার জন্য আছে উর্মিলা। রাতে থাকে না, দিনে বারো ঘণ্টা ডিউটি, ন'টা থেকে ন'টা। স্নান করানো, বেড-প্যান দেওয়া, কাপড়-চোপড় কাচা, মাথা আঁচড়ানো, মায় সিঁদুর টিপটি পরিয়ে সাজগোজ করানো, সবকিছু পরিপাটি কাজ ওই উর্মির। কিন্তু ওর হাতে ভাত খেতে প্রবৃত্তি হয় না। একটু কষ্ট হলেও নিজের হাতেই ভাত খায় সন্ধ্যা, খুব দরকারে যূথিকা খাইয়ে দেয়। দেহের বাঁ দিকটার বদলে ডান দিকটা পড়ে গেলে হাত দিয়ে খেতে পারত কিনা একথা অনেকদিন ভেবেছে সে, আর সেই ভাবনার সূত্রেই ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞবোধ—অন্তত ভাত খাওয়ার জন্য হাতটা রেখেছ তুমি। সন্ধ্যাতারা ওই সচল হাতখানাই কপালে ঠেকায়, অভ্যাসে চোখ বুজে আসে, তখন চারপাশের চারটে সাদা দেয়াল সমস্ত চোখ জুড়ে থাকে, চোখ থেকে মনে ছড়ায় তা, সাদা এবং শূন্য। কতদিন, কতদিন এই শূন্যতা নিয়ে শুয়ে আছে, কতদিন আরও কতদিন এই শূন্যতা নিয়ে শুয়ে থাকতে হবে।

দিনের বেলাটা তবু উর্মি থাকে। একটা সচল জীবনের সঙ্গ পায় সে, কিন্তু রাতের নির্জনতা শূন্যতা বাড়ায়, তখন অসহ্য লাগে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে, হাতে

ধরিয়ে দেওয়া খেলনা সুইচটা টিপে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে কেমন হয়, কথাটা ভাবনার মধ্যেই থেকে যায়। অসাড়-অসহায় একটা হাত কাঠের মতো পড়ে থাকে, দেহের একটা দিক যে আছে এরকমটা আর বুঝতেই পারে না। ডানহাত দিয়ে হাতড়ানো স্মৃতির দাপটে তখন তার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

'উর্মি, জানালাটা খুলে দে, একটু আলো আসুক।'

'জানলাটা খুলবো কী মা বাইরে জোর বৃষ্টি হচ্ছে।'

'তাহলে পাখাটা বন্ধ করে দে, আমি বৃষ্টির শব্দ শুনি।'

উর্মি পাখা বন্ধ করে দেয়। সন্ধ্যাতারা কান পেতে থাকে, বৃষ্টির কোনো শব্দ নেই। বাইরে দালান কোঠার অরণ্যে বৃষ্টিপাত সশব্দ হয় না। তবু বিষ্টির শব্দ শোনার জন্য কান পেতে থাকে, অসহায় অসফল আকুতি নিয়ে।

'উর্মি শোন, কাছে আয়।

'আমি তো কাছেই বসে আছি।'

'আরো কাছে আয়।'

উর্মি ঝুঁকে পড়ে একেবারে মুখের ওপরে, 'বলো কী বলবে।'

'অরু যে আজ এলো না। কেউ যে এখনো চা দিল না। ওরা কি বাড়ি নেই?'

'চা খাবার সময় হয়নি মা। আজ তো রবিবার দাদা বোধহয় ঘুমোচ্ছে।'

'তুই ঠিক জানিস দাদা ঘুমোচ্ছে, বৌদি ঘুমোচ্ছে, সবাই ঘুমোচ্ছে।'

উর্মি কথা বলে না। ভোর হতে না হতেই দাদা-বৌদি বেরিয়ে গিয়েছে, বলে গেছে, মাকে জানাবি না। আজ সারাদিনটা তুই ম্যানেজ করে নিবি, আমাদের ফিরতে দেরি হলে তুই থাকবি আমরা না ফেরা পর্যন্ত।' উর্মি জানে না ওরা কোথায় গিয়েছে, উর্মির জানার কথাও নয়। বুড়িমাকে সে কীভাবে সামলাবে এসব যখন মনে মনে ভাবছে তখনই সন্ধ্যাতারার প্রশ্ন আর তাৎক্ষণিকভাবে উর্মির উত্তর।

'চা খাবে তো মা?'

'হলে তো ভালোই হয়। তুই করে খাওয়াবি? না বাবা হেঁসেলে হাত দিস না, ওরা বরং উঠুক, তারপর চা খাবো।'

উর্মি এ কথার উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে যায়। আবার নিঃসঙ্গ নির্জনতা। নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতা তো মনের ভূষণই হয়ে আছে, সেই কবে বিভূতি তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে তা হিসেব করে বলতে হয়। তারপর তো ঝড়-ঝঞ্ঝা অপমান গ্লানির মধ্যে কেটেছে। মুখ উঁচু করে দাঁড়াবার পথ রেখে যায়নি মানুষটা, নিজে ডুবেছে, আমাকেও ডুবিয়েছে। স্বামীর কথা ভাবলে সন্ধ্যাতারার মাথার ভেতরটা জ্বলতে থাকে। শরীর জুড়ে হা-হুতাশ। তবু বিভূতি ছাড়া আর কারো কথা, কোনো স্মৃতি তার থাকে না। একটানা বারো বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু দেহটা টেনে চলার বেদনা যে কী তা তো কারোকে বোঝাবার নয়। এক অনিঃশেষ হাহাকারের মধ্যে থাকা, তোমার চারদিকে রোদ-বৃষ্টি-হাওয়া। মাঝে মাঝে পাখির ডাক, মানুষের উচ্চস্বর কথাবার্তা । প্রায় প্রতিদিন নিয়ম করে ফেরিওয়ালার টানা সুরে

'বাসুন লেবে-গো-ও, বাস্-উ-ন।' সন্ধ্যাতারার কাছে এই জীবনের চলমানতা। এই জগৎ একদিকে আর একদিকে কখনও হেলানে বসা, কখনও কাত হয়ে কখনও চিত হয়ে শুয়ে থাকা। সঙ্গী বলতে এই মেয়েটা, এই উর্মি, পোশাকি নাম আয়া, সারাটা দিন দেখভাল করার একটা মানুষ।

উর্মি সঙ্গ দিতে পারে, পরিচর্যা করতে পারে, মনের দোসর হতে পারে না। তবু সন্ধ্যাতারার জীবনে উর্মি বড় অবলম্বন, একদিন না এলে অসহায়তা আরো বেশি চেপে ধরে। অবশ্য সন্ধ্যাতারার জীবনকে সে আর মনুষ্যজীবন বলে মনে করে না, কতগুলি অভ্যাসে চলা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মাত্র। বাঁচতে তো হবে রে ভাই, এভাবে বাঁচাকেও তো বাঁচাই বলে।

গরম চা আর বিস্কুট নিয়ে উর্মি ঘরে ঢোকে। চা-এর কাপ দেখে বুড়িমার চোখে তৃপ্তির ঝিলিক, চা-পানের জন্য সে যে খুবই ব্যগ্র তা চেপে রাখতে পারে না। দেয়ালে ঠেস দেওয়া বালিশে হেলান দিয়ে বসালে নিজের ডান হাতে পেয়ালা ধরেই চা-বিস্কুট খেতে পারে সন্ধ্যা, আজও একই নিয়মের পুনরাবৃত্তি। বাইরে সত্যি বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসে জলকণা বেড়েছে, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা অনুভবে গরম চায়ের উষ্ণতা ভারি ভালো লাগে তার। জীবন বড় বিচিত্র, সোয়াদ বে-সোয়াদের মাত্রা কোথায় গিয়ে থেমেছে কেউ তা জানে না। সন্ধ্যাতারা মগ্ন এখন চা-পানের আস্বাদে।

চা খাওয়া হয়ে গেলে উর্মিকে বলে, 'এবার শুইয়ে দে, গায়ে সুজনিটা টেনে দিবি, একটু শীত শীত লাগছে।'

কথা মেনে শুইয়ে দিয়ে উর্মি দরজার বাইরে পা দেওয়া মাত্র সন্ধ্যাতারা চেঁচিয়ে ওঠে, 'চললি কোথায়? এ ঘরে মন টেকে না বুঝি?'

উর্মি কী করে বোঝায় ওদিকে আজ বাড়তি কাজের কথা। দাদা-বৌদি যে ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে গেছে তা যেমন জানানো যাবে না তেমনই রান্নাঘরের কাজের কথাও বলা যাবে না। কী বলে সবদিক সামলানো যায় তা ভাবতে ভাবতে সে ফিরে এসে খাটের পাশে রাখা চেয়ারে বসে।

'তুই এখানে বসে থাকবি, এক পা নড়বি না, তোমাকে টাকা দিয়ে রাখা হয়েছে ঘুরে বেড়ানোর জন্য?'

এসব কথা উর্মির গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। রেগে গেলে এমন কথা প্রায় প্রতিদিনই শোনায়, এসব গায়ে মাখা আয়া-উর্মিলার কাজের অঙ্গ। আজও তাই চেয়ারে বসে সন্ধ্যাতারাকে দেখতে থাকে, 'মাগো, এ কী জীবন!'

'কী পাখি ডাকে রে?' সন্ধ্যাতারাই নীরবতা ভাঙে।

'পাখি, কই না তো।'

যেন কান পেতে শুনছে এমন ভাব দেখিয়ে বলে সন্ধ্যাতারা, 'পাখির ডাক শুনতে পেলাম যে, কট্‌কট্ কট্‌কট্ করে যে পাখিটা মাঝে মাঝেই ডেকে ওঠে, শুনিসনি তুই?'

'ছাই রঙের একটা পাখি, বেশ বড় গোলগাল দেখতে।' উর্মি সায় দেয়।

'পাখিটার নাম জানিস?'

মাথা নাড়ে উর্মি। সে নাম জানে না।

'একটা পাখি, কট্‌কট্‌ করে ডাকে। পাখিরা কখনও একা থাকে না, ওর সঙ্গীটাকেও দেখেছিস তুই।'

'একটাই পাখি মা। তোমার জানালার কাছ দিয়েও উড়ে যায়, ওর জুড়ি নেই মনে হয়।'

'তুই কিচ্ছুই জানিস না। পাখি কখনও একা থাকে না।'

বসে থাকতে থাকতে উর্মিলার মনে একটা বুদ্ধি আসে। তাকে তো অন্য ঘরে যেতেই হবে, তাই বুদ্ধি আসা। এবার সে বলে, 'তোমার কাপড়-চোপড়গুলি ধুতে-কাচতে হবে। আমি বাথরুমে আছি, দরকার হলে ডাকবে।'

একটা চোখে পুরো হানি। আর একটা চোখের আলোটুকু দিয়ে দেখে সন্ধ্যাতারা। দেয়ালের ঘড়ি পর্যন্ত সে দৃষ্টি স্বচ্ছতা পায় না। উর্মির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'বেলা কত হল রে, এখনও ঘুম ভাঙে না কেন?'

প্রথমে উর্মির মনে হয় মিছে কথা বলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তা পারে না, 'দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি আছে মা।'

'তাও অরু আসে না, বৌমাই বা এতক্ষণ কী করছে।' চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে 'কলার-বেল'-এ চাপ দেয়। ওপাশে অরুর ঘরে কট্‌কট্‌ কট্‌কট্‌ আর্তনাদ ছড়ায় ইলেকট্রিকের যন্ত্র। কেউ আসে না। সেই শব্দ শোনার জন্য কেউ নেই বলেই শূন্য ঘরে একলা পাখির ডাকের মতো ধ্বনিতরঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। উর্মি এই ফাঁকে বেরিয়ে আসে। সন্ধ্যাতারা উন্মাদের মতো বেল বাজাতেই থাকে, বেলও বাজতেই থাকে।

বাড়ি ফিরে অরূপ আর যূথিকা দু'জনেই স্নান সেরে নেয়। মায়ের ঘরে আলো জ্বলছে না, কেন? একেবারে অন্ধকার তো কখনোই থাকে না। সারাদিনের পর এই প্রথম চিন্তা মায়ের জন্য। উর্মি এখনও ও ঘরে আছে, ওকে ছেড়ে দিতে হবে। পায়ে স্লিপার লাগিয়ে এ বাড়ির শেষ ঘরটার উদ্দেশে পা চালায় অরূপ।

দেয়ালের দিক মুখ ফিরিয়ে মা। জাগন কী ঘুমনো বোঝা যাচ্ছে না, দক্ষিণের জানালা দিয়ে রাস্তার আলো তেরচা হয়ে ঢুকে পড়ে এ ঘরে। আলো আর আঁধার পাশাপাশি থাকে তখন। মা কি ঘুমোচ্ছে, ভাবতে ভাবতে খাটের কাছেই চলে আসা। উর্মিলার লাগোয়া বারান্দায়, অরূপের সব রাগ গিয়ে পড়ে ওই মেয়েটারই ওপর, ঘর ছেড়ে বাইরে যাবে কেন ও?

'উর্মি, কোথায় তুই।' আলো জ্বালতে জ্বালতে ডাকে অরূপ।

ত্রস্তে ঘরে ঢোকে উর্মিলা, আর সন্ধ্যাতারাও পাশ ফিরে তাকায়। যুগপৎ ঘটে যায় ঘটনা।

'মা কেমন আছো?'

'যেমন ভালো থাকি, তেমন ভালো।'

'উর্মি মাকে ওষুধগুলি ঠিকঠাক দিয়েছিলি তো?'

উর্মি জানে এ কথার কোনো উত্তর হয় না। ওষুধপত্র খাওয়ানোর ভার তো তার ডিউটির মধ্যেই পড়ে। সেই তো খাওয়ায়, তবু মাঝে মাঝেই এমন জিজ্ঞাসা। নিয়মমাফিকই উর্মি মাথা নেড়ে উত্তর দেয়। সেও তো জানে অরূপের এই জানতে চাওয়া তার ডিউটিরই অংশ।

সন্ধ্যাতারা তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে। কোনো অভিযোগ, কোনো অনুযোগ আর মনে আসে না। অসহায় বোধটাও ধীরে ধীরে মরে গিয়েছে, সে বুঝে নিয়েছে কারো জন্য কেউ বসে থাকে না। কারো জীবনে কেউ অপরিহার্য নয়। তবু, তবু তো আমরা একটা বাঁধনে বাঁধতে চাই, একটা ঘর, একটা সংসার, ভালোবাসাবাসির ঘেরাটোপ। নিজের ছেলে অরূপে তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, 'তুই তো বড় পণ্ডিতরে, বল তো ভালোবাসা কোথায় থাকে। মনে না দেহে না সংসারে?' ইচ্ছে ইচ্ছেই থেকে যায়, মুখ ফুটে কথা বেরোয় না। এখন যেমন সারাদিনের পর ফিরে আসা অরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার কথা মনেই আসে না।

'তুই আজ রাতটাও থেকে যা উর্মি। এ রাতে আর কোথায় যাবি? বারো ঘণ্টার সঙ্গে আরো বারো ঘণ্টা যোগ হলো তোর ডিউটিতে।'

অরূপের শেষের কথাটার ব্যবসায়িক অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না কারো। কিন্তু কথাটা বলেই বড় অস্বস্তি বোধ করে বক্তা, এভাবে বে-আব্রু হতে চায়নি সে, সভ্যতার একটা মুখোশ থাকবে না কেন আমাদের কথায়, আমাদের আচরণে।

'তুই যা, গিয়ে খেয়ে নে। আমি বরং মায়ের কাছে বসি।'

উর্মিলা চলে গেলে অরূপ মায়ের কোল ঘেঁষে বসে। যে দিকটা অসাড়, যে দিকটা পাথর হয়ে যাওয়া সেদিকটা ঠাণ্ডা। আর যেদিকে সাড় আছে সাড়া আছে সেই উষ্ণ দিকের পিঠে হাত বোলায়। সন্ধ্যাতারা চোখবুজে ছেলের হাতের স্পর্শ-ভোগের আরাম গ্রহণ করে। মা যখন নীরব, ছেলে তখন আনন্দ-স্বরে জানায়, 'মা, কাল সকালের ফ্লাইটে দীপ আসছে, তোমার বুবাই।'

'একেবারে তো আসছে না।' সহজ ভাবায় বলে সন্ধ্যা।

'ওখানে ওর রিসার্চ-এর কাজ, একেবারে আসবে কীভাবে।'

'বুবাই কি আর দেশে ফিরতে পারবে?' বলে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর,

'যে যেখানে সুখে থাকে থাকুক।' বলে এক চোখের মমতায় ছেলেকে দেখতে থাকল সন্ধ্যাতারা।

অরূপের মনেও এ কথাটাই বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। খড়্গপুর আই আই টি-র গোল্ড মেডালিস্ট দীপ্ত তালুকদার যে এখনও বছরে অন্তত একবার কেন যে এ দেশে, তার এ বাড়িতে আসে, কীসের টানে এই ফিরে ফিরে আসা, ব্যাখ্যা নেই অরূপের কাছেও।

দুই

ওই যে খোলা জানালার পাশে বসে যে লোকটি দাবার ঘুটিতে চাল দিচ্ছে, নিজেই সাদা আবার নিজেই কালোর হয়ে খেলছে, নাকি নিজের সঙ্গে নিজেরই খেলার একটা ফয়সালা

চাইছে, ওই একক দাবাড়ুটির নাম বিভূতিভূষণ তালুকদার। ওই বৃদ্ধটি একা একাই খেলবে, ওর সহ-খেলোয়াড় কেউ নেই। বিভূতি যে বয়সে, যে অবস্থায় সুন্দরবন সংলগ্ন এই জনপদে এসে উঠতে বাধ্য হয়েছে, তাতে নতুন করে বন্ধু জোটানো সহজ না। আর যেহেতু বিভূতির একা থাকাটাই পছন্দ সেহেতু আগ বাড়িয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করার স্পৃহাই ছিল না, এখনও নেই। মানুষের মধ্যে থেকেও মানুষকে এড়িয়ে চলার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছে তাকে। পারলে জনবসতিশূন্য কোনো জায়গা বেছে নিত সে, পারেনি বাসনা আর শিশুকন্যা আত্রেয়ীর কথা ভেবে। বিভূতির জীবনের সব বিগত হলেও ওদের তো তা হয়নি, ওদের জন্যই না তার বেঁচে থাকার অন্তিম যন্ত্রণা ভোগ।

আজ দাবার কোর্টেও মন বসাতে পারছে না। যতবার খেলে ততবারই কালোর জিত, এমনটা তো হওয়ার কথা নয়, এমনটা হল কেন? অনেক লড়াইয়ের পর ক্লান্ত সৈনিক যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু বিশ্রাম চায় সেরকম অবস্থা তার। বেশ ছিল, অতীতের সব কিছু মুছে দিয়ে ছিন্ন-সম্পর্ক ভুলে যেতে চেয়ে শেষ দিনগুলি আত্মগোপনে কাটানো। এখানে সে সমাজ গড়েনি, কোনো সামাজিকতা স্পর্শ করতে পারেনি তাকে। পরিচয় গোপন রেখে নাম ভাঁড়িয়ে থাকার কসরত্ত করতে হয়েছে। যতটা না নিজের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি বাসনা আর আত্রেয়ীর জন্য। অন্তত ওরা স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাক, স্বাভাবিক হয়ে বাঁচুক। মেয়েকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে, সেই আলো নিভতে দিতে চায় না বিভূতি। তার বন্ধ্যা জীবনে মেয়েটা আষ্টেপৃষ্ঠে মায়ার জড়াতে চায়। বিভূতি জানে শিশুর মনে কোনো কাদা থাকে না, বড় হতে হতে কাদা মাখার শুরু। যেমন সে নিজে পাঁকের মধ্যে ডুবতে ডুবতে বেঁচে থাকা একটা মানুষ। কেবল আত্রেয়ীর জন্যই তার বাঁচা, বাঁচার সার্থকতা।

দাবার ছক নিয়েই কাটে তার দিনের বেশিটা সময়। কার সঙ্গে সে দাবা খেলে? নিজের সঙ্গে নিজে, নাকি তার ভাগ্যের সঙ্গে হারা-জেতার লড়াই, যে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে উজ্জ্ব রাখতে চায় সে।

'বাবু সেই পাখিটা আবার এসেছিল।'

অন্যমনস্ক বিভূতি শুধোয়, 'কোন পাখিটারে।'

'ওই যে কী-হয় কী-হয় বলে রোজ সন্ধ্যায় উড়ে উড়ে বাড়ি ফেরে।'

'তা'লে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পাখিটা বোধহয় সে কথা জানাতেই আসে।'

'বাবু, আজ আর নদীর পাড়ে গেলে না।'

'আজ থাক, কাল যাবো।'

'তুমি তো বলো আজকের কাজ আজই করতে হয়, কাল বলে কিছু ফেলে রাখতে নেই।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বিভূতি। দশ বছরের মেয়েটা তাকে কেমন হুবহু মান্য করে, ওর জগতে ওর বাবু ছাড়া আর কেইবা আছে। তার কাছে যা পায় তাতে মন বাড়ে না, বাবার কাছে তাই বায়না বেড়ে চলে। এ মেয়েটাকে নিয়ে বিভূতির যতটা চিন্তা ততটা বিস্ময়। বুড়ো বয়সে কে যে আধার কে যে আধেয় বুঝতে কষ্ট হয়।

বিভূতি তো বলতে পারে না যে আজ সারাটা দিন বড় অশান্তিতে কেটেছে তার। আত্রেয়ীকে সে অশান্তির খোঁজ দেওয়া যায় না। এই যে নদী আর খাড়ি, খাড়ি আর ঘন গুল্ম ঘেরা ভূ-প্রকৃতির আধা-নগরীতে এসে না-ঢাকা দেওয়া তা তো মেয়েটার বেড়ে ওঠাকে, তার ভবিষ্যৎকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্যই। আত্রেয়ী না, এমনকী বাসনাও নয়, বিভূতির সংকটের ভার কারোকেই দিতে চায় না। বাসনা আর আত্রেয়ীকে ঘিরে গড়ে ওঠা সংসার জীবনে অতীতের ছায়া পড়তে দিতে চায় না সে। অতীতের সকল মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দেওয়াই তার কঠিন তপস্যা।

'জানালাটা বন্ধ করে দে আত্রি, নইলে মশা ঢুকবে।' বাসনা ঘরের দাওয়া থেকে মেয়েকে নির্দেশ দেয়।

আত্রেয়ী বাবার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে। বিভূতি সায় দিলে জানালা বন্ধ করে দেয়। ঘরের আলো জ্বালে নিজেরই বুদ্ধিতে। এবার বই নিয়ে পড়তে বসবে, সেও নিজেরই বুদ্ধিতে। আত্রেয়ী বোঝে, বাবু খুব বুড়ো হয়েছে, বাবুকে বিরক্ত করা উচিত না। বাবুর জায়গায় সে মাকেই মেনে চলে। ফলে বাবুকে রক্ষা করার একটা দায়িত্ববোধ পেয়ে বসে ছোট্ট এই মেয়েটাকে।

'বাবু, চায়ে একটু আদা দিয়ে দিই। সকালে অনেক কাশছিলেন, গরম আদা-চা খেলে আরাম হবে।' বাসনা বিভূতির চুলের ভেতর বিলি কাটতে কাটতে শুধায়।

মিথ্যে বলবে না, বাসনার এই সেবা, এই শরীরী যত্ন বিভূতিকে আরাম দেয়। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে নারীর মমতার ছোঁয়া। বাসনা তাকে আর কিছু দিতে পারুক না পারুক সান্নিধ্যের আশ্রয়ে ভরিয়ে দিতে পেরেছে। ওই দেহের আশ্রয় গাছের মতো বেড়ে উঠেছে, একটা মানুষের মধ্যে যদি গাছের ছায়া পাওয়া যায় তো বুড়ো বয়সে সেটাই বড় পাওনা হতে পারে। তাই কি বাসনা তার জীবনে বড় বিপর্যয় আনা সত্ত্বেও তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেনি বিভূতি। সব খুইয়ে, সর্বত্র রিক্ত হয়েও বাসনাকে ছাড়ার কথা ভাবতে পারেনি এক সময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিভূতি তালুকদার।

চায়ের পেয়ালা বাড়িয়ে দিতে দিতে বাসনা বলে, 'শরীরটা কি খুবই বেজুত লাগে? তাইলে ডাক্তারের কাছে চলেন।'

'না না, শরীর ঠিক আছে, শরীরের কিছু হয়নি।' চা-এ শব্দ করে চুমুক দেয় বিভূতি, 'তুমি এ কথা জিগ্যেস করছো কেন?'

'আপনে আজ বিকালে আর বাইরে গেলেন না। সারাটা বিকাল ঘরের কোনায় বসে তো কাটান না, তাই—।'

'ও কিছু না।'

কিছু তো একটা বটেই। নিত্যদিনের কাজ না করার কারণ তো থাকেই, বাসনাও বোঝে সে কথা। কিন্তু ঘাঁটায় না, ও মানুষটা তার কাছে দেবতা। দেবতাকে একেবারে কাছের করা যায় না, করতে চাওয়াও উচিত নয়। বরং পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে, দুটো মেথির দানা ফেলে সরষের তেল গরম করি। রাতে ঘুমের আগে ওর সুখ পান, বাসনার পাওনাও ওই সুখের মুহূর্তটাই। দেবতাকে ফুল দেওয়ায় ভক্তের যে তৃপ্তি বাসনা সারাটা জীবন সে তৃপ্তি প্রার্থনা করে।

বিভূতি মনকে কিছুতেই বাগে আনতে পারে না।

সব ছেড়ে পালিয়ে এসেও সবকিছু থেকে সে রেহাই পাওয়া যায় না তা বুঝতে বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না। আজ বাজারে হঠাৎ সেই লোকটার মুখোমুখি হওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের মধ্যে নিজে নির্বিঘ্নবোধ করছে। বাজারের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে লোকটা হঠাৎ অন্তরঙ্গে বলে, 'আরে, বিভূতিদা না?'

সত্যিই এতদিন বাদে লোকটাকে চিনতে পারে না সে।

চোখ ছোট করে শনাক্ত করার চেষ্টা চালায়, 'না আপনি ভুল করছেন।'

'না, ভুল করছি না, আপনি কমরেড বিভূতি তালুকদারই।'

'বলছি তো আপনি কোথাও ভুল করছেন, আমি অবনী সাহা।'

'তাই নাকি? একেবারে এক রকম, চোখের পাশের কাটা দাগটা পর্যন্ত এক রকম। আ য়্যাম সরি স্যার, আপনাকে বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য না, দুটো মানুষ একেবারে এক রকম—হতে পারে।'

'হতে পারে কেন, হয়েইছে।' বলে ক্ষমা করার দৃষ্টিতে তাকায় বিভূতি।

লোকটা মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। আর বিভূতি মনের আগুনে জ্বলে ওঠে। লোকটা সে আগুন উসকে দিয়ে গেছে। 'বিভূতিদা না' এই ছোট্ট কথার শলাকা মনের ভেতরটা ছারখার করে দিয়েছে। সারাটা বিকেল সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে মন ভোলাবার চেষ্টা করেও কোনো ফয়দা হয় না। বিভূতিকে কাতর করে তার অতীত, অতীতের অপরাধবোধ।

এই যে এখন, আত্রেয়ী ঘুমিয়ে কাদা আর বাসনা শরীরের সকল ভর বিভূতির পাঁজরে দিয়ে তেল মালিশ করছে। এই যে নারীর ভালোবাসার একটা রূপ, এটাও উচাটন মনকে বশে আসতে পারে না। 'বিভূতিদা না' কথার খোঁচায় সারা আকাশ ফেটে বর্ষার ধারার মতো অতীতের ঘটনাগুলি ধেয়ে আসে। কাতর বিভূতি যতবারই মাথা নেড়ে বোঝাতে চায়, না আমি এখন অবনী সাহা, ততবারই 'কমরেড বিভূতি তালুকদার, হ্যাঁ আপনি বিভূতিদাই', সব প্রতিরোধকে ভাসিয়ে দিতে থাকে। এই ভাসমান মন আজ সারাদিনই সন্ধ্যাতারার খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে, সকল বাঁধন শিথিল করে একবার গিয়ে সন্ধ্যার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য মন ছটফট করেছে, করছে।

সন্ধ্যাতারা বিভূতিকে ক্ষমা করতে পারেনি। বাসনাকে নিয়ে শেষবারের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় বিভূতি একবার ফিরে তাকিয়েছিল। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে সহধর্মিণী সন্ধ্যাতারা তালুকদার থুতু ছিটিয়েছিল। পঙ্গু সন্ধ্যাতারার সে থুতু বিভূতির গায়ে পড়েনি, সারা মনে বিষের জ্বালা ধরিয়েছিল। তবু সেদিন তার হাতের মুঠোয় ছিল গর্ভবতী আর এক রমণীর কাঁপা, ভেজা হাত। বাসনার গর্ভ সঞ্চারের দায় এড়িয়ে যেতে পারেনি বিভূতি। তার ব্যাপক-বিস্তৃত পরিচিতি, তার পার্টি, তার নিজের হাতে গড়া নানা সংস্থা আর সংগঠনকে বিদায় জানিয়ে পা বাড়িয়েছিল নিরুদ্দেশের পথে।

বিধবা বাসনা যেদিন পক্ষাঘাতে অসাড় সন্ধ্যাতারার আয়া হয়ে আসে সেদিন শুয়ে শুয়েই সন্ধ্যাতারা বিভূতিকে ঠাট্টার স্বরেই বলেছিল, 'বয়সটা কিন্তু সর্বনাশী, বাসনা—।' বিভূতি প্রভুর মতোই থামিয়ে দিয়েছিল সন্ধ্যাতারাকে, 'কী যা তা বলছ, শুয়ে থেকে থেকে তোমার

মাথাও খারাপ হয়ে গেছে। আমার বাষট্টি আর বাসনার বড়জোর তিরিশ। ও কথা মুখে আনতে নেই সন্ধ্যা।'

সন্ধ্যা স্বামীর কথা শুনেছে। বিভূতিই নিজের কথা শোনেনি। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বৃদ্ধের আশঙ্কা নাগিনী হয়ে দংশাতে শুরু করে দেয়। দিনের বেলা কাজে-অকাজে সময় কাটে। রাতে কালো ঘুটির জয় জয়কার, রুগ্না স্ত্রীকে পাশের ঘরে রেখে বাষট্টি বছরের প্রেমিকের সঙ্গে তিরিশ বছরের প্রেমিকের দুরন্ত প্রণয়। সকল বাঁধ ভেঙে গিয়ে, বিবেকের সকল দংশনজ্বালা সয়ে বিভূতি বাসনাতে উপগত হয়। এই ঘোর আচ্ছন্নতাকেই ভালোবাসা নাম দিয়ে রাতের পর রাত ভোগ চলতে থাকে।

বিভূতি জানত এই শরীরময়তার পরিণতি চূড়ান্ত হতে পারে। বাসনা যে তাকে শরীর ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না এ বোধও তার ছিল। এই শরীরী টানকেই সে ভালোবাসা ভাবতে শুরু করল। রতিক্লান্তির অবসাদে অকসম্র বিভূতির তখন আর কিছু ভাবার ক্ষমতাও ছিল না। এরকম সময়েই বাসনার গর্ভে আত্রেয়ী আসে। অসহায় নারী লাঞ্ছনার আশঙ্কায় বেশ কিছুদিন গর্ভের কথা গোপন করতে বাধ্য হয়। যখন আর কোনো উপায় থাকে না তখন—।

বিভূতি বলেছিল, 'কী করতে চাও বাসনা।'

বাসনা অঝোরে কেঁদেই চলে, 'আমি মরব। মরা ছাড়া অন্য গতি নেই।'

শুনে আঁতকে উঠেছিল, 'আমাদের সম্পর্ককে কেউ মেনে নেবে না। তবু মরাটা একমাত্র পথ নয়।'

'বাবু, আপনার নামে কালি পড়বে। আপনার মতো মান্য একটা লোককে আমি নষ্ট করেছি। আমি পাপ করেছি, আমার শাস্তি হোক।'

বাসনার অসহায়ত্ব পুরুষের অহংকারে ঘা দেয়। বিভূতি নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। সবার কাছে মাথা হেঁট হলেও বাসনাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে তার পৌরুষে লাগে।

'তুমি হঠাৎ এমনকিছু কোরো না যাতে আমাকে পাপী হতে হয়, এমন কাজ কোরো না বাসনা যা আমাকে চরম অপরাধী করবে। আমরা দু'জনে এখান থেকে চলে যাবে। যে আসছে আমি তার বাবা, সবাইকে একথা জানিয়েই তোমাকে নিয়ে যেতে চাই আমি।'

বাসনার কিছু বলার ছিল না। বিভূতির ওপর ভর দিয়ে চলা ছাড়া অন্যকথা ভাবার মতো মনের জোরও তার নেই।

প্রথম সন্ধ্যাতারাকে জানিয়েছিল বিভূতি। আর্মি অফিসার স্বামী সম্পর্কে গর্ব ছিল, এমন কঠোর আঘাতে সেই গর্বই বুঝি কথা করে ওঠে। বজ্রঘাতেও মানুষ এতটা ফ্যাকাশে হয়ে যায় না বোধহয়, স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে তাই মাথা নুয়ে আসে, 'তোমার বিশ্বাস আমি রাখিনি সন্ধ্যা, তুমিই একমাত্র আমায় সাজা দিতে পারো, আর কেউ না।'

সন্ধ্যার ফ্যাকাশে মুখ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়, অনুকম্পার কোনো চিহ্ন ফোটে না সে মুখে, চিৎকার করে বলে, 'তুমি বিশ্বাসঘাতকই নও, তুমি অধম। আমার সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না, এ বাড়ি আমার, আমার নামে এ বাড়ির দলিল, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে—।'

বিভূতি অরুকে টেলিগ্রাম করেছিল। অরু ছেলে-বৌকে মুম্বাইতে তার কাজের জায়গায় রেখে প্লেনেই চলে এসেছিল।

অরুর মুখ কালিমাখা, এমন বিধ্বস্ত যে তা দেখে বিভূতির মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে। অরু বেশি কথা বলেনি, 'মা আমার, আমি দেখব। তুমি আমার বাবা হতে পারো না। য়ু মে গো নাউ।'

সত্যি অরু আর বাবার মুখ দেখেনি। মা-এর ঘরে মাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পার্টি তাকে এক্সপেল্ড্ করেছিল। না করে পারেও না। আবাল্য বন্ধুরা কেউ তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি, এ আশা করাও ভুল। পরিচিতরা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, কম পরিচিতেরা আঙুল তুলে একে অপরকে দেখিয়ে হেসে উঠেছে। বিভূতি এইসব যন্ত্রণা সইতে সইতে বাড়ি ছেড়ে, পার্টি অফিস ছাড়িয়ে, শিরিষ গাছের তলার আড্ডা ছেড়ে, হাতে-গড়া স্কুলের দালানকে বাঁয়ে রেখে বাসনার কাঁপা ভেজা হাতকেই একমাত্র অবলম্বন ভেবে মনুষ্য সমাজকে স্যালুট জানিয়ে চলে এসেছে।

দশ বছর বাসনার হাত বিভূতির সেবা করে চলেছে। তবু সে শূন্যতা ভরাট করতে পারেনি, ভরাট করার ক্ষমতাও তার নেই। বিভূতির একাকীত্বের চেহারা তাই অন্যরকম। তার বাড়ি, তার ঘর, তার বন্ধু, তার সমাজ, তার কমরেডরা সব ছেড়ে গেছে তাকে। অথবা সেই। নিজেই নির্মল হাতে ছিঁড়ে চলে এসেছে এইসব। এই দশ বছরে নতুন একটা জীবন গড়তে হয়েছে তাকে, এখানে প্রচলিত জগৎ নেই। আছে 'কী হয়, কী হয়', ডাকা পাখি, নদীর তীরে ম্যানগ্রোভ গুল্মের সারি, লাল কাঁকড়ার পুষ্প হাওয়া নদীর চড়া, আর আত্রেয়ীর সরল দুটি চোখ।

বিভূতি ভালোবাসার সংজ্ঞা বোঝে না। সন্ধ্যাতারার মনের আস্থাই কি ভালোবাসা, নাকি বাসনার শরীরের টান ভালোবাসা, এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি করার সাধ্য তার নেই। তবে একাকীত্বের তীব্রতা বাড়িয়ে তার মন সন্ধ্যাতারার শয্যাপার্শ্বে চলে যায়। সেই ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখ সে কোনোদিন ভুলবে না।

বুকের ওপরে রাখা বাসনার হাত ধরে থেকেই সন্ধ্যাতারার উদ্দেশে মনে মনে বলে বিভূতি, 'পারলে ক্ষমা করো। কিন্তু আমি বোধহয় ভুল করিনি।'

তিন

রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়েছে। অ্যালজোলাম গভীর নিদ্রার অতলে ডোবায় না। হাল্কা আবেশে স্নায়ুকে শান্ত রাখে। ফলে পরের দিন আবার নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারে বিভূতি। নিত্যদিনের কাজগুলি করে, এবং আত্রেয়ীকে নিয়ে বিকালে বেড়াতে যায়। হাঁটতে হাঁটতে নদীর কিনারা পর্যন্ত এসে পাড় বরাবর পশ্চিমে চলে যাওয়া। মুখের ওপরে তাই বিদায়ী সূর্যের আলো পড়ে, উত্তাপহীন আলোর ছটা নদীর জল, গাছের পাতা, চরার মাটিকে মায়াময় রূপ দেয়। এই গাছে পাখিরা ফিরে আসতে শুরু করেছে, কিচ্‌কিচ্-কিচির-মিচির ধ্বনির কলরব আসন্ন সন্ধ্যার কথা জানায়। লাল বটফল পড়ে গাছতলাটাকে লাল করে ফেলেছে।

'আত্রি, ওপারে যাবি নদী পেরিয়ে।'

'হ্যাঁ' আনন্দে মাথা নাড়ে আত্রেয়ী।

'এখনও আলো আছে, চল ওপারটা দেখি আসি।'

এসব কথা বলতে বলতে খেয়াঘাটে আসা। নৌকোতে কম 'হর্স-পাওয়া'র-এর মোটর লাগানো, মাঝির কাজ হাল ধরে থাকা। খেয়াঘাটে দু-চারটে চেনা মুখ, ওপার থেকে আসা মানুষেরা, হাটুরেরা, দিনখাটা মজুরেরা বাড়ি ফিরছে। নৌকো ছাড়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না তাই। মেয়েকে কোলের কাছটিতে বসিয়ে বিভূতি বলে, 'আমি তো আর্মিতে কাজ করেছি। ওখানে রেজিমেন্টেশনই বড় কথা, শৃংখলা আর কী—বুঝলি কিছু?'

বাবুর এসব কথা একেবারেই বোঝে না আত্রেয়ী, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তাই। কিন্তু বিভূতির সন্দেহ হয় নৌকোর যাত্রীদের কেউ কেউ কান খাড়া করে তার কথা শুনছে, ভাবামাত্র মুখে কুলুপ আঁটে সে। টলটল জল কেটে ক্রমশ গভীর জলে কোনাকুনি পাড়ি দিতে থাকা গতিতে, পিছনে পিছলে যাওয়া নিসর্গকে দেখতে দেখতে বিভূতি ওপারের অপেক্ষা করে।

নৌকো থেকে নামতে গিয়ে কাদায় পা ঢুকে যায়। বাপ-বেটি দুজনেও কাদা মাখার মজা উপভোগ করে। এখন নদীতে ভাটার টান, সামনের দিকে চলেছে ক্লান্ত জলের ধারা। নদী তীরের বিস্তৃত শয্যায় শয়ান দিনাবসানের লাজুক আলোক। এপারটা একেবারে অজ গ্রাম। ম্যানগ্রোভ নামের গুল্ম, শিরিষ আর শিশু এবং খেজুর গাছ, নারিকেল শ্রেণী, এইসবের মাঝ দিয়ে পায়ে চলা নরম মাটির পথ। এখানে সবুজের তুলনায় গাছ-গাছালির সংখ্যা বেশি, সুন্দরী বা গরান গাছের ঘন অরণ্য একক উপস্থিতিতে। চারিদিকই সবুজে সবুজ কিন্তু শস্যের খেত কম, বরং লঙ্কার চাষ নজরে পড়ার মতো, পাকা লঙ্কার টুকটুকে সৌন্দর্য।

খুদে লাল কাঁকড়ার ঝাঁক নদী সংলগ্ন ভেজা মাটিতে কিংশুক ফুলের মতো ছড়ানো। আত্রেয়ী কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে যাওয়া মাত্র মাটির মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে পড়ে ওরা। ছোটাছুটি করে আত্রেয়ী ক্লান্ত, তবু একটি কাঁকড়াও ধরতে পারে না। দূরে দাঁড়িয়ে এই খেলা দেখতে দেখতে বিভূতি তুষার ধবল হিমালয়ের কোলে। জলপাই রঙের পোশাকের স্থলসেনাদের দূর থেকে ওই খুদে জীবের মতোই দেখাতো। সারি বেঁধে চলা, সু-শৃংখল যান্ত্রিক পিপীলিকার মতো।

আত্রেয়ীকে ডেকে নিয়ে নদীর কিনারা বরাবর হাঁটতে হাঁটতে বিভূতির নিজের মনেই আওড়ায়, 'বুঝলি আত্রি, রিটায়ার করে বাড়ি ফিরে তো আমার হাতে অনেক সময়। অভ্যাস তো তবু ছাড়তে পারা যায় না। বল না যায়?'

বালিকা কিছু না বুঝেই মাথা নাড়ে, 'না পারা যায় না।' বাবুর কথা তার কাছে বেদবাক্য, সায় দেওয়াটা তার কর্তব্য।

'ধীরে ধীরে, বুঝলি, ধীরে ধীরে এক রেজিমেন্টেশন থেকে আর এক রেজিমেন্টেশনে সামিল হওয়া। পার্টিকে পেয়ে আমি বর্তে যাই, আমাকে পেয়ে পার্টিও। যখন যেখানে যে কাজ করেছি, নিজের আনন্দেই করেছি রে।'

'বাবু, বাবু, দেখো কত লোক ছুটছে, ওখানে চলো বাবু।'

'লোক, লোকের ভীড়ে গিয়ে কাজ কী। আমরা দুজন একা একাই হাঁটি।'

নাছোড় মেয়ের কথা না মেনে পারে না। যতটা দ্রুত সম্ভব নদীর খাড়িতে জড়ো হওয়া মানুষের জটলার দিকে যেতে থাকে। ম্লান হতে হতে রোদ উবে গিয়ে ছায়া নামছে চরাচর জুড়ে। নদীর জল নীচে নেমে গিয়েছে, পাড় অনেকটাই উঁচু।

'আত্রেয়ী, তোমাকে যদি এখন নদীর জলে ফেলে দিই।'

কথা শুনে আত্রেয়ী ভয়ে ওই বিভূতিকেই জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে, 'বাবু, আমি তো সাঁতার জানি না।'

'সাঁতার জেনেও কিন্তু মানুষ ডোবে আত্রি। মাগো, তুই ভয় পেয়েছিস?'

বাবার স্বাভাবিক কণ্ঠ সব ভয়-ডর মুছে ফেলে। বৃদ্ধের হাত সজোরে আঁকড়ে ধরে বালিকা এসে পৌঁছয় নদীতীরের মানুষের উৎসুক জটলার কাছে। ভেজা নরম মাটির ওপরে ডেবে যাওয়া একটা গর্তের মতো, অনেকটা জায়গা জোড়া মাটির ধস।

বিভূতির জিজ্ঞাসার উত্তরে লোকগুলি জানায়, 'বড় মিঞার থাবার দাগ, বন থেকে বেরিয়ে এসেছিল জল খেতে।'

বাঘের থাবা।

'আত্রি, তোর ভয় করছে না।'

আত্রেয়ীর চোখ বড়বড় হয়ে গিয়েছে। বাব্বা, ক-ত বড় বাঘের থাবা।

'আত্রেয়ী, তোমার ভয় করছে না।'

চোখ তুলে তাকায় আত্রেয়ী, 'না বাবু, তুমি তো আছো।'

বাঘাচাঁদের জাগরণ পর্ব

অনিল ঘোষ

এইভাবে বাঘাচাঁদ বাদার রাজা হইল
কেউ তারে মানিল কেউ আবার হাসিল।
রাজার সুখ ঢের বাবা দুখও কম নয়
হাসিতে হয় মেপেজুকে কথায় পড়ে কয়।

হ্যাঁ বাবা বলি গো শোনো বাঘাচাঁদের কথা। এ কথা বলে বলেও ফুরোয় না। যত শোনবা তত নতুন। তবে সব কথার আগে একখান কথা, সেটাই আসল কথা, আগেও বলেছি, আবারও বলছি। বাঘাচাঁদ কেডা, কী তার পরিচয়—এই কথা পেরথমে শুনে নাও।

এই যে বন, বিশাল বন, তোমরা বলো সোঁদরবন, আমরা বলি বাদাবন। সেই কোন কাল থেকে মানুষ এখানে ঢোকার তাল করেছে। জঙ্গল হাশিল করবে, জমিন তুলবে, চাষ করবে, ফসল ফলাবে, বসত গাড়বে। আকালের চাবুক খাওয়া সেইসব মানুষ সহজে এখানে ঢুকতে পারেনি। ভয় ছিল। বাঘ-শ্যাল-জিন-দানো-কুবাতাসের চর এখানে রাজত্বি করে। ওলাবুড়ি ঝাঁটা হাতে শাপ দেয়, মনসা মাগি ফণা তুলে ফোঁসফোঁসায়। তবে সব ভয়ের সেরা ভয় বাবা ওই বাঘ। আমরা বলি বড়মিঞা। ওর ভয়ে কেউ পা বাড়াতে পারে না বাদায়। প্রাণের মায়া যে বড় মায়া। অকালে জান খোয়াতে কেউ রাজি নয়। তবে জানের পরোয়া না করে একজনা ঢুকেছিল বাদায়। ইয়া গাঁট্টাগোঁট্টা কালোকুলো তার শরীর। দুই তালগাছের পারা লম্বা, অ-সাগর ধানমাঠের পারা বুকের ছাতি। আর গলার আওয়াজ! সে বাবা দশখান ঢাক একসঙ্গে বাজালে যেমন হয়, তেমনি তার হাঁকডাক। কুড়াল নে আর হাঁক মেরে সে নিকেশ করেছিল বাদাবনের ত্রাস বাঘকে। বাঘ মেরেছিল বলে ওর নাম বাঘাচাঁদ। আসল নাম কেউ জানে না। সে-ও এসেছিল আকাল দেশ থেকে। তবে বাবা, ভয়ে সে কুঁকড়ে যায়নি। একার জোরে বাঘ নিকেশ করেছিল। বাঘ নিকেশ মানে বাঘের ভয়ও নিকেশ। তারপর লাঠি দে, কুড়াল নে জিন-দানো-কুবাতাসের চর টিট করেছিল। ওলাবুড়ি, মনসা মাগিরে তাড়িয়েছিল। আর তাইতে বাদাবনের দরজা খুলে যায়। হুড়হুড়িয়ে ভিনদেশি লোক আসে বাদা সাফ করতে, জমিন তুলতে। আর তাইতে বাঘাচাঁদ এই বাদার দেশের নি-মুকুট রাজা, নি-আসন রাজা। তারে সকলা মানে, দ্যাওতা (দেবতা) জ্ঞান করে। তারে নে পুজো-পাঠ, দোয়া-দরুদ, ভক্তি-সালাম, ছড়া-গান-গপ্পো কথা কত কী। বাদায় যেখানে যাও, সেখানেই শুনবে তার নাম, তার কথা। কার এঁজ্ঞে? বাঘাচাঁদের এঁজ্ঞে।

হ্যাঁ বাবা, এ তো দিনের আলোর মতো সত্যি, আঙ্গা (আমাদের) বাঘাচাঁদের দয়ায় বাদাবন আজ খোলা দরজা। হড়মুড়িয়ে মানুষ আসছে কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে। জঙ্গল হাশিল করবে, জমিন তুলবে, ফসল ফলাবে। তারা সবাই এখন বাঘাচাঁদের মাহাত্ম্য

জেনেছে। তারা বাদায় ঢোকার আগে ওর কাছে আসে। বাদা সাফ করার অনুমতি চায়। এটা করতে হয়। হবেই। বাদায় অন্য সব নিয়মের মতো এটাও একটা নিয়ম। মানতে হবে সবাইকে। নইলে বাদায় ঢোকার পথ বন্ধ। কেন? বাঘাচাঁদের সঙ্গী-সাথী আছে লাঠি নে, কুড়াল নে। চোখ লাল করে, বাবরি চুল ঝাঁকিয়ে হুংকার দিয়ে বলে, অয়্যা শালো বাদা সাফ করতি আইছ ভালো কথা, কিন্তুক এহানে আইছ কার দৌলতে? ওই বাঘাচাঁদ। ও না থাকলি এহানে ঢুকতি পারতে। বাদা সাফ করতি পারতে। জমিন ফসল সব হাওয়ায় উড়ত। এসব বাবা যার লেগে, তারে রাজা বলে মানো, তব্যা বাদাবনে কোদাল কুড়াল নে ঢুকতি পারবা।

এসব যারা মেনেছে, তাদের নিয়ে কোনও গোল নেই। কিন্তু যারা মানেনি, মানতে চায়নি, উল্টে মুখ বেঁকিয়ে বলেছে, বাঘাচাঁদ, সে আবার কেডা। তারে রাজা মানতি হবে ক্যানে? বাঘ মেরেছে বলে কি মাতা কিনকে নেছে!

গোল বাধে তাদের নিয়ে। ব্যাপারটা যখন বাড়াবাড়ি হয়, তখন সঙ্গী-সাথী বেরিয়ে পড়ে। গরাণ কাঠের লাঠি তুলে সপাটে এক বাড়ি। ওতেই ঠান্ডা সব প্যাঁচ পয়জার। বাঘাচাঁদের কাছে আসতে তারা বাধ্য হয়, অনুমতি নেয়। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে চাপা পড়েছে তা নয়। ভিতরে ভিতরে ধোঁয়ায়। তাই নিয়ে বাধে গোল। এ থেকে বার হওয়ার উপায় কী। ভাবে সঙ্গী-সাথী। সে কথাই বলব এবার। শোনো বাবা—।

বাঘাচাঁদ বাদার রাজা সে তো ভাই জানো
কেমনে হল রাজা সে এবার সেটা শোনো।
রাজা হয়ে বাঘার হল কেমন ধারা ভাব
বাদার দেশে দ্যাখো বাবা বাঘার দাপতাপ।

হ্যাঁ বাবা, বাঘাচাঁদ অনেক দুঃখ কষ্টে বাদার রাজা হয়েছে। দিনের পর দিন গেছে সঙ্গী-সাথীর। মাথার ঘাম পায়ে পড়েছে ওকে শেখাতে শেখাতে। কী শিখছে বাঘাচাঁদ? রাজা হওয়ার পথ-পদ্ধতি। রীত-রীত। রাজা সে এমনিতে। সে তো মানে সঙ্গী-সাথী, আর যারা ওদের ভয় পায়। সত্যিকারের ভক্তি-শ্রদ্ধা কি ওতে থাকে? থাকে না। ও তো ভয়ে মানে। সত্যিকারের ভক্তি আসে ভিতর থেকে, গভীর থেকে।

এ তো মহা সমস্যা। বাঘাচাঁদকে এমনিতে সবাই মানে, ভালোও বাসে। কিন্তু এসব তো রাজা হওয়ার গুণ নয়। রাজা হতে গেলে তার ভাবভঙ্গি আলাদা হবে। তার সাজগোজ, চালচলন—সবই আলাদা। মিলবে না কারও সঙ্গে। তুমি যদি সবার সঙ্গে গলাগলি করো, যখন চাও দেখা দাও, হেসে গড়িয়ে কথা বলো, নেচেকুঁদে পয়মাল করো, তবে কি কেউ তোমায় মানবে? মানবে না। বাদার দেশ হল জলজঙ্গলের দেশ। এখানে সবাই ভিনদেশি, ভিন ভাবার মানুষ। এখানে এসেছ ভালো কথা। তবে কিছু নিয়ম মানতে হয়। মানতে হয় রাজাকে। নইলে বাদা ছারখার হয়ে যাবে। সর্বনাশ হবে। জমি নে, ফসল নে মারামারি কাটাকাটি করে মরবে সব। এ কি হতে দেওয়া যায়!

এসব কথা বাঘাচাঁদকে বোঝায় সঙ্গী-সাথী। বাঘাচাঁদ তো ছিল সবার সঙ্গে মিলেমিশে, নেচে কুঁদে, হেসে গড়িয়ে। সে বাবা আলাদা হতে চায়নি। থাকতে চেয়েছিল সবার সঙ্গে। কিন্তু বাদার লেগে, জলজঙ্গল জমিন ফসল রক্ষার লেগে বাঘাচাঁদকে আলাদা হতেই হয়। সঙ্গী-সাথীর পরামর্শে, উপদেশে হেঁকেডেকে প্রচার করে, হাঁ আমি বাঘাচাঁদ, বাদার রাজা হে—।

এমন কথা বলা সহজ, মেনে চলা খুব কঠিন। শেখা তো আরও। সে কি সহজে শেখে। সোজা হতে বললে বাঁকা হয়, গম্ভীর হতে বললে হি হি হাসে। বুক চাপড়ে বলে, এ শালো ক্যামুন রাজার সাজ রে। হাসতি পারব না, কতা কইতি পারব না।

সঙ্গী-সাথি বিরক্ত হয়, আহা-হা পারবি না ক্যানে। তবে সবকিছুর একটা নিয়ম আছে, সেটা মানবি গো। নইলে যা কোদাল কুড়াল নে বাদা সাফ কর। তবে লোক যেভাবে আসতেছে, বাদা আর বাঁচপে না। এখনই না টানিলে দাঁড়ি বাদা যাবে রসাতল।

বাদার কথায় বাঘাচাঁদ মেনে নেয় সব। সঙ্গী-সাথী যা বলে মন দিয়ে শোনে। তাই করে অক্ষরে অক্ষরে। আর কোনও ভুলচুক নেই। কথা সে বেশি বলে না। যে কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না সঙ্গে সঙ্গে। পাঁচটা কথা বললে উত্তর দেয় একটা। তাও ছোট করে। হুঁ হাঁ—এভাবে। ধীর পায়ে চলে, আর দেখা দেয় অবরে সবরে।

এতে হল কী! যার দেখা পাওয়া যায় না, তারে নে প্রচার হয় বেশি। নানা কথা, রং ঢং প্যাঁচ পয়জার মিলিয়ে মিশিয়ে। যেন কত রহস্য তার মধ্যে। সে নিজে কিছু বলছে না, বলছে তার সঙ্গী-সাথী। সত্যি-মিথ্যের মিশেল আছে তাতে। তা থাকুক। শুনতে খারাপ লাগে না। ওই শোনো—

: বাঘ মারিল কেডা?
: বাঘাচাঁদ আবার কেডা।
: বাদায় আবাদ করিল কেডা?
: বাঘাচাঁদ আবার কেডা।
: বাঘ-শ্যাল-জিন-দানো-কুবাতাসের চর বশ করিল কে?
: বাঘাচাঁদ আবার কে।
: ওলাবিবি, মনসা মাগি টিট করিল কে?
: বাঘাচাঁদ আবার কে।
: তব্যা বাদার রাজা কে হে?
: বাঘাচাঁদ বাঘাচাঁদ।
: তারে রাজা মানো, দ্যাওতা মানো?
: মানি গো মানি। কার এঁজ্ঞে? বাঘাচাঁদের এঁজ্ঞে।

চলতে থাকে প্রচার। কখনও কথায়, কখনও ছড়ায়, গানে। কেউ আবার পালা বাঁধে। এভাবে ছড়িয়ে পড়ে বাঘাচাঁদের কথা, ছড়িয়ে যায় সুখের কথা।

হ্যাঁ বাবা, বাদার এই যে সুখ, এই আনন্দ হাসি গান—এসবের মূলে তো একজনা। ওই বাঘাচাঁদ। বাদাবনের রাজা বাঘ মেরে বাঘের ভয় তাড়ায়। তাইতে জঙ্গল হাশিল

হল। আবাদ হল। চাষ হল। ফসল হল। বসতি হল। তাইতে কত সুখ মানুষের মনে। সুখ কী? জমিন ভরা ফসল, পেটভরা ভাত; মাথার উপর ছাউনি, ঘরে বিবি, ছানা পোনা পিগজে (কচি বাচ্চা)। সুখ তো বাবা এইসব। আর যে মানুষটার জন্য এত কিছু, তারে মানে না কে? সবাই মানে। বাদায় কান পাতো, শুনবে তার নাম, তার কথা—

: বাঘাচাঁদ কে হে?

: বাদার রাজা হে।

: ক্যামন রাজা সে?

: নি-মুকুট রাজা, নি-আসন রাজা। ওই শোনো তারে নে মানুষের আর্জি, গানের সুরে, কথায়—

উঠো উঠো বাঘাচাঁদ দেখা দাও ভাই
বাঘ নাই দুখ নাই তুমারে দেখ্যা যাই।
এসো বাঘা বসো বাঘা বাদার রাজা হে
তুমি থাকো পাশে পাশে আর কী চাই রে।

এত কথা যারে নে, সেই বাঘাচাঁদ কী করে। কোথায় সে? সে তো আছে তার কোটরে। পাণ্ডুপাড়ে ঘর বসত করে। বাঘ মেরে ভয়-ডর নিকেশ করে সে তো মুক্তপুরুষ এখন। কোনও কাজ নেই। খাওদাও আর ঘুমোও। লোকে তারে ভয় পায় আবার ভক্তিও করে, ভালোও বাসে। আর সেটা খালি হাতে মোটেও নয়—

: বাঘারে, বাগানের ফল এনিছি, খাও বাবা।

: ও বাবা, তুমার দয়ায় এবার ফসল হইছে ভালো, তুমারে ধামা ভরা ধান দেলাম, নাও বাবা—।

: পুকুরের কই মাছ, নাও বাবা। তুমারে না দে খাই কী করে্য।

: নাও বাবা লাল মোরগ, দয়া করো বাবা।

লোকে বলে কত কথা, আর বাঘাচাঁদ ভাবে অন্য কথা। এত যে খাতির, এমন সমাদর জুটছে উঠতে বসতে, সে কি আর পাঁচজনের মতন হতে পারে। কথা শুধু কথা নয়, কেমন করে যেন বিশ্বাসের ঘরে গিয়ে সেঁধোয়। সঙ্গী-সাথী, আপন মানুষ পরম মানুষ দিনরাত কানের গোড়ায় বসে শোনাচ্ছে, হেই বাঘা তুই বারালি বনের বিরিক্ষ নুয়ে পড়ে, তুই হাঁক মারলি বনের পশু পালায়। রোগভোগ দুখ শোক—সব চলে যায় দূরে। ওরে বাঘা তুই আণ্ডগা দ্যাওতা রে—।

শুনে শুনে বাঘাচাঁদের মাথা খারাপের জোগাড়। হুংকার দিয়ে বলে, আমারে তবে পুজো।

সকলে বলে, পুজিব।

আমারে বলো রাজা।

বলিব। তুই আণ্ডগা রক্ষা কর।

করিব। তোগা ভয় নাই আর।

হই-হই জয়ধ্বনি পড়ে যায় বাঘাচাঁদের নামে। জীয়ন্তে যে দেবতা তারে নে সকলের কী হুড়োহুড়ি। যারা শোনে বাঘাচাঁদের মাহাত্ম্য কথা, তারা আর কিছু বোঝে না, বুঝতে চায়ও না।

বাঘাচাঁদের মনে খুব সুখ। খুব খুশি সে। খুশি যেন রং বাহারি ফুল হয়ে ঝরে। দূরের লোক আসে ওর কাছে। দু-হাত জোড় করে বলে, হেই রাজা, হেই দ্যাওতা দেখা দাও বাপ, পায়ের ধুলো দাও।

তবে যে-ই আসুক বাঘাচাঁদ তারে হাঁকার মেরে বলে, আমারে তবে পুজো—।

পুজিব—পুজিব—।

তা বাঘাচাঁদ মানুষ তো বটে, এসব শুনলে কি মাথার ঠিক থাকে। ক্রমে ক্রমে তার কথা পালটে যেতে থাকে। হাবভাব বদলে যায়। চলা-ফেরাও হয়ে যায় অন্যরকম। সঙ্গী-সাথী যে সব সাজগোজ, নিয়ম কানুন শিখিয়েছিল, সে রকম নয়। তবে অন্যরকম। যা কেউ শেখায়নি, শেখাতে হয়নি। এ যেন নিজেই শেখা, নিজের মতো করে। বাদার মানুষের কথা শুনতে শুনতে একদিন সে সটান উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত আড়াল আবডাল ভেঙে সকলের মুখোমুখি হয়। তালগাছের পারা শরীর খাড়া, বুকের ছাতি ফুলে ফুলে ওঠে। দশটা ঢাক একসঙ্গে বেজে ওঠা গলায় হাঁক মেরে বলে, হাঁ আমিই বাদার রাজা, আমি হে বাঘাচাঁদ—।

চমকে ওঠে সবাই। আই গ এ কোন বাঘাচাঁদ হাঁক দিল। এ তো আগুগা চেনাজানা বাঘা নয়। এ যে নতুন রূপ, নতুন চেহারা, এ কে গা। ওরে যে চেনা যায় না অথচ খুব চেনা।

হ্যাঁ বাবা, এ সেই বাঘাচাঁদ। যার ভয়ে বনের বাঘ পালায় গহিন জঙ্গলে। জলের কুমির ডুব দেয় অতলে। ওলাবিবি মনসা মাগি পর্যন্ত থরথরিয়ে কাঁপে। ওই হাঁকারে পোয়াতি বউ-এর পেট থেকে ছানা খসে পড়ে, মরণপথের মানুষ তিড়িংবিড়িং লাফ মারে। এ তো বাবা সেই বাঘাচাঁদ। এরে তো বাবা তুই তোকারি করা যায় না। এ বাঘাচাঁদ ভয়ের, ভক্তির।

লোকের মাথা নুয়ে আসে। নেমে পড়ে ভূমিতে। মুখে মুখে আওয়াজ ওঠে, হেই বাবা আদেশ করো, কী করব বলকে দাও—।

বাঘাচাঁদ বলে, বাদার দেশে আইছ, আবাদ গড়ছ ভালো কতা। যাও এবার গেরাম গড়ো। সেই গেরামে বাঘাচাঁদের কতা বলো, বাদা থেকে আবাদ গড়ার কতা বলো—।

তাই বলিব হে রাজা। বলে সবাই। বাদার দেশ তোলপাড় করে আওয়াজ ওঠে, কার এঁজে? বাঘাচাঁদের এঁজে—।

বাঘাচাঁদের বারতা ছুটে গেল দিকে দিকে
বাদায় হইল গাঁ গঞ্জ দুখের রং ফিকে।
আঁধার গেল কান্না গেল এল সুখের পরব
বাঘাচাঁদের এঁজে বলো বাড়ুক বাদার গরব।

ভোগ

শঙ্খ ঘোষ

যোগ্য মিলেছে যোগ্যে
মুছে গেছে সব তফাত রোগে-আরোগ্যে।
অশুচি গিলেছে সমস্ত শুচি
ধূপধুনো আর ধরেনি ধুনুচি
সায়ন্তনীর অন্তিম রুচি
জোটে আঘ্রাণ ভোগ্যে—
হোক্ গে-যা খুশি হোক্ গে।

কী পেয়েছে কোন্ লোকটা
কেন নেবে তার হিসেব সে-উদ্যোক্তা?
যা কিছু পায় সে আপন আয়াসে
তারই ঝোঁকে বোঝে নয়া-উল্লাসে
দুয়োরের কাছে হামা দিয়ে আছে
সারি সারি সব ভোক্তা—
হয় যদি তবে হোক্ তা।

অভ্যাস

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এবারেও জন্ম হলো না।
অসফল ঘামে শুধু ভরে যায় দেহ,
লবণপ্রধান জলের বাষ্পীয়ভবন
দেরি হয়, বাতাসেরও সন্দেহ
জাগে। জীবনসৃষ্টির এই নরনারী প্রক্রিয়া, কবিতার
চেয়ে কম অনিশ্চিত নয়,
যার শুরু বা সমাপ্তি নেই
দাস-প্রভু একাকার।
যারা কবিতা পারে না, শরীরের ব্যবহারে
তারাই তো অকালে ফুরিয়ে যায়,
ব্যর্থ কবিতারও ঘাম হয়, অন্ধকারে
নক্ষত্রধিকার বলে দেয় কেন
সব মিলনেই জন্ম হয় না।
এই বিফলতা একমাত্র টের পায় কবি
সে নদীতীরে গিয়ে আনমনা
দ্যাখে নিকট নৌকা ক্রমশ সুদূরে চলে যাওয়া ছবি
দ্যাখে সচল বৈঠার পাশে
দুচোখের লবণাক্ত জল।
তখনো হয়তো শুধু ভাবার অভ্যাসে
আবার সে টেবিলে গিয়ে বসে,
তখনি নিশ্বাস বোঝে
জন্মদান আসলে নতুন এক মৃত্যুর পত্তন,
তবুও কবিটি সাদা পাতা খোঁজে আজীবন।

বৃষ্টিনগর
মণিভূষণ ভট্টাচার্য

উর্বর ছিলে স্থিতধী দৃঢ়তা অঘোর ছিলো সে রাত,
ঝাঁকালো জাহাজ ডোবার আগেই অতি দ্রুত হবে কাত,
মেঘে বিদ্যুতে ধমক লাগিয়ে দোলায় তরুণ তরী,
রানী ভয় পেয়ে ছোটে অন্দরে ডেকে আনে কিংকরী,

জলসম্পদে ভরে যায় দিক মেঘলোক দেয় দাম,
ঝঞ্ঝা ঝাঁকুনি উৎপাটনের ডাক দেয় অবিরাম,
নিচে ঝাঁপ দিয়ে ছোটে অরণ্য লেখে সচকিত পালা
চোখা সংলাপে বিদ্যুতে ভাঙে বন্ধ বুকের তালা,

উঁচু উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে ঢেউ ডুবছে নগরপুরী,
স্মরণে কেবল যাতায়াত করে প্রয়াত স্বর্ণসূরী,
উদ্ধত ছিলো গ্রীষ্মশিবির সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত,
কে খবর দিলো বিশাল রাত্রি এনেছে যুবক দূত,
সমস্ত কথা কাটাকাটি করে ছুঁড়ে দিলো কোলাহলে
ফণিমনসার কাঁটায় শরীর ছিন্নভিন্ন, জলে;

এই রাত শেষ হবে না কখনো তিমির বিছিয়ে শোবে,
প্রৌঢ় তমালে নিশি লেখা জাগে মাথা নাড়ে মহাক্ষোভে
আরো উর্বর চারুচিত্রণে মোছে সঞ্চিত ভয়,
আমাদের আয়ু শেষ হয়ে গেলে পুনরায় শুরু হয়...

একজন তাত্ত্বিকের সেমিনার শুনে

শুভ বসু

ইতিহাস এক অতি নির্মম প্রবল প্রবাহ
যা নিরপেক্ষ নির্মমতায় শুধু কৌতুকে দেখে যায় কোন
বাবুলিনচুখ, কিংবা পাভেল, প্যারাস্যুট থেকে নেমে আসা সব
বারুদবালিকাপুঞ্জ ভিয়েতনামে
ইতিহাস নয়, শুধু কৌতুক রচনা করেছে হায় মূঢ়তায়।

সেই যুক্তিতে স্বপ্নেরও কোনো অস্তিত্বও নেই তো।
নির্মোহ এক নিরপেক্ষতা যদি আমাদের ঠিকঠাক পারে চালাতে
তবেই তো হবে গণতন্ত্রের বিজয়পতাকা ওড়াবার
আমাদের সব সুশীলসুলভ গূঢ় প্রশ্নের নিরসন।

সেমিনারে তাত্ত্বিকের বিনীত ভঙ্গিতে তোলা এসব প্রশ্নের
সামনে স্বভাবসিদ্ধ মূঢ়ের মতন মনে হয়
কৌমের স্বপ্নের তাপে এখনো কেন এত লোক সারা পৃথিবীতে
নাছোড় জেদের বশে নিরন্তর শুধু লড়ে যায়
সে কি শেষবিচারেও শুধুমাত্র মূঢ়তার বশে?

পায়ে পায়ে

মৃণাল বসুচৌধুরী

পায়ে পায়ে কাছাকাছি
পায়ে পায়ে দূরত্বের ভয়
পায়ে পায়ে নদীগন্ধ
পায়ে পায়ে জয় পরাজয়

পায়ে পায়ে সংঘ গড়ে
পায়ে পায়ে স্বপ্ন হেঁটে যায়
পায়ে পায়ে দ্যুতিময়
প্রতিবাদী আগুন ছড়ায়

পায়ে পায়ে আত্মীয়তা
নষ্টচাঁদ বিক্ষোভ মিছিল
পায়ে পায়ে বালিয়াড়ি
আদিগন্ত ছায়া ঈর্ষানীল

পায়ে পায়ে বৃত্ত বাড়ে
জাদুমন্ত্রে মুষ্টিবদ্ধ হাত
মাটির উচ্ছ্বাস নিয়ে
পায়ে পায়ে স্বপ্ন-বৃষ্টিপাত

জানি...

মিতা নাগ ভট্টাচার্য

বাগানের গোলাপচারা শুষ্কতায় ঝরবে একদিন, খালি।
তবুও জলসেচন করে চলি প্রতি সকালে—
এও জানি, শীতের প্রাবল্যে ঝরে যাবে সবুজ পাতা যত।
তবুও বীজের বপন করে চলি নিরন্তর।

মৃত্যুতে জানি, সব শেষ।
তবুও এ জীবনকে ভালোবেসে ফেলি।
প্রতি রাত্রি-দিনে।

সুন্দরীতমা
পিনাকী ঠাকুর

এই রাস্তা দিয়েই একদিন সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলাম
ব্রিটিশ বাংলা থেকে ফরাসি বাংলায়
যেখানে ব্লিচিং পাউডারের বদলে নাকি ল্যাভেন্ডারের সেন্ট
ছড়িয়ে দিয়ে যায় স্ট্র্যান্ড রোডে
ফুলকে যেখানে বলে 'একল'
আর প্রিয়তমাকে 'মন্ আমি'
এই রাস্তা দিয়েই সাইকেল চালিয়ে একদিন হঠাৎ
তখন আমার সতেরো প্লাস
এখানে ইংরেজি শব্দ বললেই জরিমানা হয়, সাবধান!
ব্রিটিশ পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে এই শহরে লুকিয়ে থাকেন
বিপ্লবীরা, এমনকি অরবিন্দ ঘোষ
(প্রবর্তক সংঘের দপ্তরটা যেন কোথায়?)
কোথায় সেই মোরান সাহেবের বাংলো, যেখানে রাখি পূর্ণিমায়
নতুন বউঠানের সঙ্গে দোলনায় দুলেছিলেন
কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ?
ওই তো, আর একটু এগোলেই কোর্ট, ক্রীতদাসের বাজার,
দুর্গ, লাইব্রেরি, একটু দূরে
নেটিভ হসপিটাল, চার্চ, পাদরিপাড়া—গৌতমদের বাড়ি
র‍্যাঁবো-বোদলেয়ার পড়া আভাগার্দ কবিরা তর্ক করছে
স্ট্র্যান্ডের বেঞ্চিতে
জেটি থেকে স্টিমার ছেড়ে যাচ্ছে...

এই রাস্তা দিয়েই ব্রিটিশ বাংলা থেকে ফরাসি বাংলায়
চারদিকে বইয়ে পড়া অতীতকাল
সাইকেল চলছিল স্বাধীন ভারতবর্ষের বর্তমান, এবড়োখেবড়ো
টাইম-স্পেশের রাস্তা দিয়ে
শো-কেসে সাজানো ছিল সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেন'

এক অতীতের মাঝখানে তুমি তখনও ভবিষ্যৎ, কিন্তু জানো
তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে আর একদিন যেতে যেতে
আমি তোমারই শরীরের ফরাসি সুগন্ধ পেয়েছিলাম...

কি? বানিয়ে বলছি, তাই না?

দাহ

নন্দিতা সেন বন্দ্যোপাধ্যায়

দাহের ভেতরে দাহ।
ক্ষয়ের ভেতরে আরো ক্ষয়।
মাথা জুড়ে ঘূর্ণিপাক,
দিগন্ত ব্যথিত করে আলো,
জন্ম নেয় ধীরে ধীরে
তমসার পাথর সরিয়ে।

কোথায় বাড়াবে হাত?
শুয়ে আছে প্লাবনের ঢেউ।
তরুণ সবুজ পাতা মর্মরিত স্মৃতির বিন্যাসে।

মাটির গভীর স্তরে কথা ছিল,
আজ ঢাকা মেঘের মণ্ডপে।
চোখের ভেতরে খরা
ওড়ে ছাই ভাঙা দৃশ্যপটে।

আগমন

আনন্দ ঘোষ হাজরা

যত লাল ছিলে তুমি ততটাই নীল হয়ে গেলে
তার মানে, খুব কাছাকাছি এসে গেছ;
তোমার আলোকভঙ্গ দেখতে পাই
তোমার চরণভঙ্গি শুনি
সব পরিপার্শ্ব শুধু দূরে সরে যায়
খুব ম্লান হয়ে আসে।
এ তোমার কীরকম আগমন আকাশে সমগ্র নীল জুড়ে
শরতের শাদা মেঘই এর কাছাকাছি যেতে পারে।
আমি তো জ্বলন্ত লাল পুড়ে পুড়ে দহনে উত্তাপে
এমন আগ্রাসী বর্ণে সব ভুলে
কী করে উড়াল দেবো পাখিদের মতো?
আমি তো জানি না শুধু তোমার আশ্চর্য সীমা জুড়ে
ক্রম অবলুপ্তি ভালোবাসি।

নির্জনের জন্য সনেট : ২
অঙ্কুরেখ চক্রবর্তী

জীর্ণ অক্ষরের মতো বাহুপাশ...অলীক উদ্যানে
ছায়ার নিজস্ব গতি...তমিস্রার রুদ্ধ ক্যারাভানে
নিদ্রা, পাপ, স্বমেহন, মথিত মৈথুন, পরবাস,
সব মিশে একাকার...একাকার প্রেমের নিঃশ্বাস।

একাকার বিনম্র শাখা... পাতার আড়ালে
একটি মেয়েলি মুখ সাবেক কাব্যের বেড়াজালে
গোপনে জানিয়ে গেল অ্যানিমিক তঞ্চকতা, ক্ষমা...
নির্জন, তোমার কাছে সেই গূঢ় রাতের তর্জমা।

নির্জন, তোমার কাছে সেই শোক...পূর্ণতাবিহীন
যে-কাহিনী ঘূর্ণিপাক, যে-কাহিনী আনুগত্যে দীন
বয়স্ক পৃথিবী জুড়ে আবর্তিত নিজস্ব ভাষায়...
তোমার আপাত যতি... তাতে তার কী বা আসে যায়?

তোমার আপাত যতি, তোমারই এ কারুকাজ, ক্ষণ...
নির্জন, তোমার কাছে তোমারই এ প্রগাঢ় ভ্রমণ।

মুখোমুখি
অনির্বাণ দত্ত

যদি বলি... আরও হারানোর আছে কিছু?
ও বলবে—এ তো রৌদ্রছায়ার খেলা;
ভিতর নদীটি—দেখো, নেবে ঠিক পিছু...
আলোকভাসানে চলবে জলের খেলা।

নেই রাত্রির শরীরে গেরস্থালি...
মাংস খসছে কুষ্ঠরোগীর মতো—
ও তখন বলে, শুনে দিতে পারো তালি :
ছন্দে নাচছে অদৃশ্য গান যত।

খোলা করোটিতে উড়ানের আলো গাঢ়,
বিষাদসানাই, বিদায়ের বাঁশি ঠোঁটে;
বললে তখনও, চুম্বন দাও আরও—
চুম্বন পেলে, পাথরও উথলে ওঠে।

ভরসা

অজিত বাইরী

ঝোড়ো-হাওয়ায় নিভে যাবে বাতি;
আগলে রাখ বুকের কাছে।
যা হবার হয়েছে অনেক ক্ষতি;
আর যাতে না-হয়, দু'হাত নৌকো ক'রে
আগলে রাখ বুকের কাছে।
একে একে নিভে যাবে সেউড়ির সেঁজুতির মত
মানুষের বুকে জমেছে অন্ধকার;
প্রচ্ছায়া আরও ঘনীভূত হবার আগে
বুকের কাছে কিশোরীর দু'হাত যে-ভাবে
আগলে রাখে সন্ধ্যাদীপ, আগলে রাখ।
ঝড় এলেও যেন নির্বাপিত না হয় শিখা—
আস্থাহীনতার ঝোড়ো-হাওয়ার দুর্বিপাকে
জেনো, ওই বাতিটুকুই ভরসা।

নৈশভোজ শেষে

শ্যামল সেন

আজ রাতে শিকার পর্ব। তার আগে মিলনবাসর রচনা হবে।
ঘোর দুঃসময়ে প্রিয়-অপ্রিয় আঙুলে দাবার চাল,
কিস্তিমাত সারা হলে মহাভোজ
নিরুদ্দেশ নিখোঁজ প্রণয়ের অভিমান
মাঝে মাঝে আত্মঘাতী হয়ে ওঠে।
সসম্মানে তাদের জলপিঁড়ি দিতে হয় রাত্রিকালীন মহাজোটে।

টেবিলে দুর্মূল্য আহার পানীয়
হে বন্ধু হে প্রিয়, স্পর্শ করো উজ্জীবিত করো।
দেশবাসী অপেক্ষায় আছে,
হিরণ্য সকাল তার ফুটো চাল ভাসিয়ে দেবে।
আজ নৈশভোজ শেষে নবজাগরণ
মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এক দুই তিন
নক্ষত্র গণনার কাজ-বড় কঠিন।

সমবেত সিদ্ধান্তে পরিত্রাণ এনে দিতে
বেকুফ জনতা নয়, খান খান মোহরের বিনিময়ে
ঈশ্বর সন্ধানে নামে অতিমানব।

কাল ভোরে .ফলকনামায়
সগৌরবে লেখা হবে তাহাদের নাম।

পার্টি

ব্রত চক্রবর্তী

পার্টির ভেতরে তুমি যে কথা বলোনি,
পার্টির বাইরে তুমি যে কথা বলোনি,
পারনি, বলতে, সেইকথা, সেইসব,
কাকে দেবে ব'লে বসে আছো?
পতাকার নিচে যদি কিছু বলো,
পাঁচকান, প্রতিক্রিয়া হবে,
খুলে খুলে বলা ভালো ব্যক্তিগত সেখানে এনো না।
টেলিফোন বাজছে, সেখানেও বিশেষ ভরসা নেই,
দুকথা অন্যকথা যদি রিসিভারে দাও এখন,
পলকে দশ-বিশ ডায়াল নম্বরে পৌছে যাবে।
যারা এসেছিল, যে-কথা বলেছ, সব কথা
মুখে মুখে এর মুখে তার মুখে খোলা রাজনীতি।
তাহলে, যা দাঁড়াল, পার্টির বাইরে, ভেতরে,
এমন কাউকে খোঁজা বাকি রয়ে গ্যাছে,
কিংবা খুঁজেছ, পাওনি,
চুপকথাগুলি যাকে বলা যায়।
গর্জনতীর, ক্ষোভময় ভেতরের, তাকেই দেখাবে।
কিংবা বুকের পেছনে দীঘি,
জলে নেমে শালুক তুলেছ,
তাকে-ই বলবে।
ইশারা, আগাম কয়েকটি, সায়, সমর্থন,
চেয়েছিল, চেয়েও পারনি, বলবে।
কিংবা ফাঁকফোকর, নড়বড়ে কিছু, ব্লাড ডোনেশন
গলা তুলে পার্টির ভেতরে বলেছিলে,
গলা ফিরিয়ে এনেছ, বলবে, তাকেই।

তাহলে এখন, চিক্কণ মেঘল রোদ্দুর
শনাক্ত করল যখন আজ বারান্দায় তোমার,
শান্ত ইজিচেয়ারে, চুপ বসে আছো,
লতানো পাতাবাহারে রোদ মেঘ ইশারা খেলছে,
অর্কিডের ক্যাকটাসের ঘন ঘেরে ক্রিসেনথিমাম,
যত ফুল ফুটিয়েছে বাগানের গাছগুলি, ফুলগুলি,
অমন ঝুঁকলেই,
চুপকথাগুলি, এইবেলা, ওদেরকে বলো

এমন একটা সময়

উৎপলকুমার গুপ্ত

এখন এমন একটা সময়, যখন হাওয়ায় বারুদের গন্ধ
ফুলের গন্ধের মতো তুমি তাই আসতে পারছ না
এখন এমন একটা সময় যে তুমি ভাল আছ কিনা, এমন সংবাদও
কেউ দিতে পারে না।
ফলে যে তুমি আলোর, সুর ও গানের
তার যেন কোনও ভূমিকাই নেই।
আজ এমন একটা সময়, এমন একটা দিন।

এখন চারদিকে বন্দুকের শব্দ, মানুষের রক্তে ভেসে যাচ্ছে
গ্রাম ও শহর
'ভালবাসা' নামে কোনও দেশ কেউ চেনে না
শুধু প্রতিশোধ আর আতঙ্কের ধ্বনি বাতাসে ভাসমান
কেউ কারও কাছে এসে জলটুকু পর্যন্ত দেয় না—
এমন দিন যে আসতে পারে, তা কি কেউ জানত?
তুমি কি জানতে আমাদের দিনগুলি ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে
গ্রেনেডের হুঙ্কারে?

এখন একদিকে সালঙ্কারা তুমি, অন্যদিকে বারুদ
একদিকে প্রেম, অন্যদিকে আগুন
এরই মধ্যপথে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ি স্তব্ধতা
কোথায় যে বয়ে যাচ্ছে ঝর্না গান হয়ে, কেউ জানে না
কেউ জানে না অন্তঃসলিলা রক্তপাতের কথা
সেখানে কোনও শুশ্রূষা নেই
নেই কোনও উৎসারণের উজ্জ্বল আলো

আগামী স্বপ্নের কাব্য

আরণ্যক বসু

যেন বেশ বৃষ্টিবাদলা হলো এই সাদামাটা মফস্বলে
যেন খুব লম্ফঝম্প শেষে পল্লী থেকে ফিরে গেছে জল
শিউলি শাপলা সব মাথাচাড়া দিয়েছে আবার।
না-লায়েক যাত্রাপালা দেড়েমুসে রিহার্সালে ফাটাচ্ছে গলা।
বারোয়ারী কাঠামোটা মাটির পেলবতায় ক্রমশ আদল পাচ্ছে।
বাজারের পথে দেখাশুনো, একেবারে পাকা কথা—
সামনের অঘ্রাণেই চারহাত, চার চক্ষু, দুইমালা, সবান্ধবে ভোজ।
চাষবাস, কলকারখানা, বুকজোড়া কৃষি-শিল্প, সামাজিক
সবুজসৃজন; দুই হাত ভরে কাজ। কাজ শেষে শীতের মোচ্ছবে
দৌড় দৌড়, পিঠেপুলি, বুলোবুলি, চোখ মারামারি।
আসলে কোথাও কোনো শত্রু নেই, বিরোধী পক্ষ নেই, কারখানা
গেটে নেই কর্মী সংকোচন। নদীর পারেই লজ, উইকেন্ডের হাসি
মোটাসোটা দামাল বাচ্চারা যেন দেবশিশু। নদীর এপার যদি
দু'কদম আগে বাড়ে, নদীর ওপার যাবে দুঃসাহসের পথে।
খুন-খারাবির নেশা ছুটে গিয়ে নাবাল জমিতে ফোটে ফুল-উপত্যকা।
ভালো ভালো ছেলেমেয়ে, খুব খেটেখুটে, হিরের টুকরো একেবারে,
এদেশেই খুঁজে পায় আরব্যরজনী। উত্তরের কমলা আর দক্ষিণের ধান,
পাহের সুপুরি, ফল, বরজের পান, শাকসব্জি, মাছমাংস, কতো বিবরণ দেবো।
আমাদের কৃষিজন্ম, আমাদের শিল্পজন্ম, তালুক মুলুক, আগামী ভোটের হালে
ঠিকঠাক পানি। কফ, পিত্ত কুপিত হয় না আর; হলেও কিসের ভয়?
হাসপাতালের শয্যা মায়ের আঁচল পেতে ডাকে। ফটোর দোকানে
হাসিমুখে ধাকাপাড় ধুতির বাঁদিকে তিনপাড় শাড়ির বাহার ছবি তোলে।
চরাচরে সমবেত হাততালি। সুখের পায়রা খায় কতো ডিগবাজি।

দুধ মেরে ক্ষীর হয়ে বসে আছে মহামান্য ধ্যানী রত্নাকর
এতো কিছু ইচ্ছেটিচ্ছে মেটাবার পর
ভাত ঘুমে সন্ধে পার করে
একটানা লিখে যাবে আগামী স্বপ্নের কাব্য

শান্তি কৃষি

অপূর্ব কর

বস্তা বস্তা মেঘ চাপিয়ে মাথায় হাওয়া ছুটছে হড়হড়
যাওয়ার কথা তার অনেক দূর
মাঠ-বাড়িঘর কোথাও খরায় জ্বলছে
আর যে কোনো জ্বলুনি-পুড়ুনি তা যদি দীর্ঘকালের হয়
জানা কথা সকলের মন মেজাজ হতেই পারে তিরিক্ষি

তিরিক্ষিপনা তখন সব কিছুর মধ্যে এত গেড়ে বসে
কেউ শান্তির গান গাইতে চাইলেও মন বলে, ধুত্তুর

খুব চিতাকাঠের পুড়ুনি চলছে হে বিশ্বময়,
আগুন কেউ না কেউ কোথাও জ্বালিয়েছিল
আর আগুন খুব সংক্রামক, হিংসা তার সোদর ভাই
যে কোনো ছুতোয় এদের কোথাও লাগিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে
সু-আগুনকেও তখন সুচতুর জিম্মায় তারিয়ে তারিয়ে আনা যায়

তখন এলোপাথারি জল ঢাললেও দমকল বিভাগ
সমালোচিত; দমকল কর্মীরা ঢিল খায়, তবে উপায়

করে যেতেই হয় মেঘস্তব, হাওয়ারও পা ধরে টানাটানি
বাজল মেঘ সদয় হলে হাওয়া কুলিয়া সদয় হলে
প্রথম প্রথম ঠিক কাজ না হলেও শেষে কাজ হয়
হিংসা মাঠ, খরা মাঠ এক সময় ভেজা মাটি হয়ে নরম এ কথা

তখন বুঝেশুনে নতুন আবাদ শুরু করলে ভালো ধান ভালো কৃষি
দিনকালও প্রসন্ন গোয়ালিনী, তার গরু সুধাক্ষরা দুধ দেয়।

কবিতা ও মন্দাকিনি ধারা
অমিতাভ চক্রবর্তী

কে এড়াতে পারে?
তরতাজা উঠ্‌তি বয়েসে
সমস্ত ফুটন্ত যুবার
মন্দাকিনি থাকে বিদ্যমান
তৃষিত ওষ্ঠে জল দিতে
দিনরাত স্বপ্নে জাগরণে
তার সলাজ দৃষ্টির ছোঁয়া
ঝোড়ো বৃষ্টি হয়ে
আবেগে মাতাল হয়
কোন্ না কোমল হৃদয়?
হাবুডুবু খেতে খেতে
মন্দাকিনি স্রোতের ধারায়।

ঠিক ঐ সময়েই
অশেষ বাসনার মতো
পাঁজর মন্থন করা
এক নদী স্বর
ছন্দের তাল তুলে শুধু
গুম্‌রোয় বুকের ভেতর
জলের সংঘর্ষে ওঠা
বুদ্‌বুদের মতো
অনুভবি অন্তরাত্ম থেকে
মুখ থেকে ঠোঁটে
নিঃসারিত হয় প্রতিক্ষণে
কখনো বা আনমনে
চোখে খেলে যায়
বিষাদ প্রণয় সংহিতা
তা তো অন্য কিছু নয়
উপজ প্রেমের অর্ঘ্য
বুকচেরা মরসুমী ফুল
প্রস্ফুটিত হয়ে—যা কবিতা।

সব যুবা বয়েসেই
কবিতা ও মন্দাকিনি ধারা
সমান মাত্রা নিয়ে
অতি শুদ্ধ নিজের নিয়মে
যৌবনকে অর্থবহ করে
একই খাতে প্রবাহিত হয়
কখনো মধুর মতো
কখনো বা মুক্তমনা
দুরন্ত বেগের ধারাস্রোতে।

আমি যেমন বুঝি

কালিদাস সমাজদার

এই সরোবর অগভীর কিংবা অতলস্পর্শী কেউ জানে না
কিন্তু সমুদ্র বড় দিগন্তবিস্তারী অতলতায় সীমাহীন

এই সরোবর মানুষের পায়ের ধুলোয়
একটু একটু বুজছে অবুঝের মতন
এই সরোবর পাখির সঙ্গীতে কেন দোলে
আমি বুঝি যেমন বুঝি শিশুর কোলাহল

সমুদ্র সুদূর অতি কাউকে চেনে না
সব টেনে নেয় সবই ফেরত দেয় ছুঁড়ে
সবই স্পর্ধিত সমুদ্রে এক অপার শীতলতা

আমার বোধের বাইরে সমুদ্র
আমি এক হতে পারি না কিছুতে
আমি ভালবাসি সরোবরের কোমর ডোবানো ঐ জল
আমি ভালবাসি ভাসছে জলে যে ডাবফল

দুটি কবিতা

সুশান্ত বসু

এসো মেঘ, এসো বৃষ্টি

এসো মেঘ, এসো বৃষ্টি
বেশ ক'দিন চাকরিহীন ছুটির মেজাজে
ভ্যাপসানো গরমে সেদ্ধ আমাদের দিন ও রাত্রির
উঠোনে শব্দের ব্যাঙ ডেকে ওঠে
মানুষের শেখানো গলায়—
এসো মেঘ, বৃষ্টি তুমি এসো।

চলো যাই

চলো যাই দেখে আসি অতল নৈঃশব্দ্য থেকে কারা
ডাক দেয়, প্রতিদিন মৃত্যুময় বাঁচার কাহিনী
কাদের আঙ্গাল থেকে ছুঁড়ে দেয় হিরণ্ময় কথা,
তার তাপে সেঁকে-নেওয়া প্রতিদিন স্নিগ্ধ মনস্তাপ
ছেঁড়া কাগজের যতো টুকরো জুড়ে বানানো ঘুড়ির
উড়ান, উড়ান, আরও উড়ানের চতুরালি ছেনে
শব্দের প্রতিমা গড়ে, বোবা মানুষেরা তাই শুনে
বাধ্যতামূলক যতো হাততালির মন্দিরা বাজায়!

হাওয়া ঘুরছে এ-পথ সে-পথ

অলোক সেন

তোমাকে ভেবেছি বটবৃক্ষ
—আমরা শতসহস্র ঝুরি,
অনেক দিয়েছি ঘামরক্ত : ভোট;
তোমাকে সামনে রেখে বেঁধেছি যে জোট
তিরিশ বছর পরে—এবার পরীক্ষা;

সহনশীলতার পরে বিনাযুদ্ধের ভূমি!

অযুত শিকড় নিয়ে তুমি বটবৃক্ষ
পাতায় পাতায় রেখেছ আশ্রয়,
ছোট ছোট সে-সব ছাউনিতে

আমিও বেঁধেছি ঘর।

দোল খেতে খেতে সহসা সময়
দোল দিয়ে যায় আজ পাতায় পাতায়

বড় দোলাচল ধান্যশীর্ষে
নম্র সবুজ বড় অসহায়
হাওয়া ঘুরছে এ-পথ সে-পথ

আমাকে দেখাবে সে নতুন পথ...

যায় যায় বাঁয়ে হে-এ-এ

রঞ্জিত রায়চৌধুরী

সুধন্য মাঝির কাছে শোনা গল্পে
সাঁকো কিংবা খুঁজো না হে পোল,
শুধোলেও উত্তর দেবে না সে—
কোন ঘাটে মনোহারি আছে।

তা'র দেখা গ্রাম ও নগরে—
নারীরা ছিল কী পটেশ্বরী,
সে প্রশ্নের পাবে না সদুত্তর।

২.
সে তোমাকে হাল ও পাল—
কতদূর বিশ্বস্ত ছিল তার কিছু
বেত্তান্ত শোনাবে।
দু একটা বেপরোয়া চিল—
বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজে ফেরা,
মানুষের মামুলি কাহিনী—
চাঁদের আলোর নীচে উড়ুক্কু মাছেদের
দস্যিপনা—এসবের বর্ণনা দেবে।

৩.
রাতের আঁধারে ওঠা ঝড়ে—
নৌকার উথালপাথাল,

মোহনার মুখে দেখা কোন কোন
আশ্চর্য সকাল,
বলে দেবে কোন ঘাটে
নৌকো বাঁধার মতো খুঁটি জেগে আছে।
এবং মন্ত্রপড়ার সুরে মাঝে মধ্যেই
দেবে হাঁক—
যার যার বাঁয়ে হে-এ-এ।

ছায়াসরণি

সুনন্দ অধিকারী

আসলে, কিছুতেই কিছু যায় আসে না,
তুমি পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ ছোঁয়া বা
পোলিও আক্রান্ত প্রায় পঙ্গু এক মানুষ
মূল সে পরিচয়
তুমি জানো; কাকে বলে বিরহ যন্ত্রণা—

আসলে, কিছুতেই কিছু যায় আসে না।
যে ব্যঞ্জনই তুমি পরিবেশন করো
তা পরমান্নই হোক বা নিছক চাটনি
সর্বাগ্রে দরকার; আগুনের ব্যবহার।

আসলে, কিছুতেই কিছু যায় আসে না।
সেই পারঘাট পার হতে হবে
সাক্ষী রেখে আকাশ
সেদিন পাথরও নমনীয় বেশি
রাইপার মর্টিস আক্রান্ত দেহ।

আসলে, কিছুতেই কিছু যায় আসে না।
একদিন
কেবল একদিনের জন্য হলেও, যদি না
ছায়াসরণি ধরে হেঁটে যেতে পারো...

আগামী বসন্তে

পার্থ শর্মা

আগামী বসন্তে ঠিক জানি কবিতা লেখা হবে
আগামী বসন্তে চারপাশে ফুল ফুটবে সানন্দে—
আগামী বসন্তে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয়
'ম্লান মুখে ভাষা পাবে', একদিন আলো
ও অন্ধকারের আঁধার মুছে নিস্তব্ধ পাখির
মতো শব্দ উঠবে চারপাশে।

এখনো বেঁচে থাকা বক
শব্দ করে জাগিয়ে তুলবে পাড়া
হাতের উপর হাত, বৃদ্ধ শিরা ধমনী
সচল হবে স্পর্শে, সবুজ পাতার গন্ধে
মুখে মুখে আমোদিত হবে চারপাশ;
আগামী বসন্তে তোমার বিশ্বাসের ভিতে
মানুষের হবে জয়
মুখোমুখি মাথা উঁচু করে
'পরিচয়' হবে সভ্যতার
আগামী বসন্তে ঠিক জানি
নতুন কবিতা পড়া হবে, অন্ধকার ঠেলে।

সাংসারিক

অগ্নি ভৌমিক

খুন হয়ে যাওয়া সংসারে
নিজেকে বেঁধে রাখি;
বেঁধে রাখি
কিন্তু কেমন করে যেন
বার হয়ে যাই বারে বারে।
তখন স্বপ্নেরা ডানা মেলে উড়ে যায়
এক থেকে অন্য স্বপ্নের বাসায়।
এখন শারদোৎসব—

ঐ চার দেওয়ালে রয়ে গেছে
আমার স্থাবর অস্থাবর
যা কিছু সব।
অসহায়ের মতো দেখি
আমার ইহকাল পরকাল
সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে
পিছনের দোর খুলে, চুপিসারে
কিভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে সংসারের কালো বেড়াল।

প্রগতি মানে...

দীপঙ্কর পাল

প্রগতি মানে আদিম যুগের পাথরের ঘর্ষণে
আগুনের প্রজ্বলন;
প্রগতি মানে অন্ধকার আর কুয়াশার জাল খুঁড়ে
নব্য জ্ঞানের স্ফুরণ।
প্রগতি মানে ছোট ছোট কিছু শান্তির নীড়—
অপত্য স্নেহ মায়ের;
খোলা আকাশের নীচে মুক্ত, দৃপ্ত মানুষের মেলবন্ধন।
প্রগতি মানে অশুভ শক্তি বিনাশ,
সমাজের উত্তরণ;
প্রগতি মানে নতুন দিনের ইঙ্গিতময়
অভয় সূর্যকিরণ।
প্রগতি মানে আন্দোলিত এ সময়ের বুকে পা রেখে
আগামী যুগের পদধ্বনি শোনা,
দিনবদলের স্বপ্নের জাল বোনা...।

প্রগতি মানে হয়ত আরও বিশাল অনেক কিছুই :
প্রগতি মানে ঘাতক মানব-বোমা;
প্রগতি মানে যুদ্ধ।

অনিকেত

প্রবীর দাস

এ ভূখণ্ডের পরিমাপ যা জানি সঠিক নয়। অনেকের দুঃখ আছে পাহাড়, জানি। অনুভব করি না। আমারও দুঃখ আছে। অন্যের অনুভবে নেই। সাদা কাগজে লেখা সবুজ ইচ্ছাগুলি। অসহায় হই। কিছুটা নিরপরাধ। প্রাপ্তিটুকু পড়ে আছে বাতিল পালক। এই পড়ে থাকার গল্পটুকু সার। সমুদ্রের একপ্রান্তে ভিজে বালি। পদচিহ্ন পড়ে না। ঢেউয়ের মতো দুঃখগুলি। অন্ধকারের বিশেষণযুক্ত হয়ে আক্রান্ত ভীষণ। অলজ্জ আমার প্রয়াস। কতদূর যে দেখা যায় ছন্দহীন। মনে হয় অনিকেত হয়ে যাই। অপ্রাকৃত সমস্ত কিছু করিডরে খলখল হেসে লুটোপুটি...

মিস্‌ডকল

বাসব দাশগুপ্ত

যখনই চিহ্নবৎ গ্রাম, বিভঙ্গে ধরেছে অবিশ্বাস
ক্ষমতা ভিখারি কিছু লোক
মাটিতে ছড়িয়ে যায় ত্রাস।
পমনের বিহ্বলতা জুড়ে বিহগের ডানার আওয়াজ
ওয়াচটাওয়ার থেকে আমি, দেখে যাই
সময়ের সাজ।
স্বাস্থ্যভবন থেকে রোজ, হিলহিলে শীতের বাতাস
স্পৃহাহীন ট্রেন চলে গেলে
বেদনা জাগালো কিছু শ্বাস।
কার স্বরে লুকিয়ে রয়েছো, এমন আতপ দিনে তুমি
মিস্‌ডকল দিয়ে খুঁজে যাই
গত শতকের পটভূমি।

অমৃত-কথা

গুণময় মান্না

১.

আচ্ছা, বলুন তো, পৃথিবীতে পাখি কয় প্রকার? ওঃ, সে গণনার অতীত; এখনও পর্যন্ত কেউ গুণে শেষ করতে পেরেছে বলে জানা নেই; তবে ক্রমে সংখ্যাটা বাড়ছে—আশি হাজার, এক লাখ, দেড় লাখ ক্রমে।

এই রকম বৃক্ষ গো তৃণ ফল ইত্যাদি।

এবার বলুন তো, পৃথিবীতে মানবজাতি কয় প্রকার? প্রশ্ন শুনে নিশ্চয়ই আপনার মাথা ঘুরছে, কারণ আপনার মন ছুটছে ছ'ছটা মহাদেশের অরণ্যে প্রান্তরে সর্বত্র—এ প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারবেন না।

তাহলে আমি বলি শুনুন। উত্তর খুব সোজা—মানুষের দুই প্রকার : নেতা এবং জনগণ। আর কোনও প্রকার নেই।

অতঃপর এদের কিছু কথা শুনুন।

২.

এক বাঙালি সাধক কবি তাঁর এক গানে আর্ত প্রশ্ন করেছিলেন—মা আমায় ঘুরাবি কত কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত; এবং গানটির শেষে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—খুলে দে মা চোখের ঠুলি দেখি শ্রীপদ মনের মত।

এই খুলে ফেলা, ঢাকা সরিয়ে দেওয়ার প্রার্থনা কত যুগ যুগ ধরে চলে আসছে! সত্যের মুখ সোনার পাত্র দিয়ে ঢাকা—তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে; হে পূষণ, সরিয়ে দাও ঢাকা, যাতে সত্যধর্ম দেখতে পাই।

এ কালের কবিও সেই একই প্রার্থনা জানাচ্ছেন বারবার—আর রেখো না আঁধারে আমায় দেখতে দাও; বলছেন, আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও।

কিন্তু সেদিন, আর এদিন। কত সাধক কত মনীষী এত যে প্রার্থনা করলেন, কাঁদলেন ঢাকা খুলে দাও বলে। যা সত্য তাই বলো—কিন্তু কে কার কথা শোনে। আচ্ছা, কে কার কথা শুনবে, কে কাকে দেখাবে? কেন, ওই যে বলে রেখেছি, মানবজাতির দুই ভাগ, নেতা ও জনগণ—এ হচ্ছে তাদেরই দু'পক্ষ নিয়ে কথা। নেতারা চিরকাল মিথ্যা শুনিয়ে এসেছে—জনগণ চিরকাল মিথ্যা শুনে এসেছে। নেতারা তাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে রাখে, কোনও দিন সত্য দেখাতে চায় না। বোকা বানিয়ে রাখে।

এক আমেরিকান নেতা অবশ্য এই সেদিন বলেছিলেন—সব লোককে তোমরা কিছুদিন বোকা বানাতে পারো কিছু লোককে চিরদিন বোকা বানিয়ে রাখতে পারো; কিন্তু সব লোককে সর্বদাই বোকা বানিয়ে রাখতে পারো না।

হায়, সেই রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই; সেই নেতাও নেই সে আমেরিকাও নেই। আর আমাদের এই জম্বুদ্বীপে? সেই কতকাল আগে জাতির জনকের মতো অমন পেল্লায় মাপের নেতা থেকে শুরু করে একেবারে সাম্প্রতিক খুদে পার্টির ততোধিক পুঁচকে নেতা পর্যন্ত, সে কাল থেকে এ কাল পর্যন্ত, জনগণকে টুপি পরিয়ে আসছেন; চোখের ঠুলি তো সরিয়ে দেনই না, আরও টাইট দিয়ে দেন, ফাঁক-ফোকরগুলো পর্যন্ত বন্ধ করে।

৩.

অথ ভারত এবং তার শ্রীমহাভারত কথা; কারণ, যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে। মহাকবি বেদব্যাস রচিত মহাভারত, তদনুসরণে ভাষায় শ্রীকাশীদাসী মহাভারত। তাতে আছে, মহাভারতের কথা অমৃতসমান। তার থেকে অমৃতকথা। সেই অমৃতকথা কিঞ্চিৎ অনুধাবনযোগ্য—কারণ পূর্বে ভারতকালে যা ঘটেছে, বর্তমানে ভারতে তাই-ই ঘটে চলেছে।

অতএব সেই প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ অনুসরণ করা যায়। লেডিজ ফার্স্ট—এই সূত্রানুসারে প্রথমে এক মহিলার কথা।

কমলিনী কাঞ্জিলাল বর্ষীয়সী মহিলা, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন। শ্যামবর্ণ গোল ভরাট মুখ, সাদাসিধে পোশাক, পায়ে সাধারণ চপ্পল। তিনি কিছুদিন যাবৎ অতিশয় দৃশ্যমান হয়ে সকলের চোখের সামনে ঘোরা-ফেরা করছেন। প্রথম দিকে প্রশ্ন উঠেছিল—কে তিনি, কোথা থেকে এসেছেন, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা রুজি-রোজগার কী—যা সচরাচর হয়ে থাকে এই আর কী, কিন্তু কোনও উত্তর মেলেনি। তা নাই মিলুক, এখন লোকে প্রশ্ন করতেও ভুলে গেছে; এটাই মেনে নিয়েছে, তিনি যা তিনি তাই।

কমলিনী কাঞ্জিলালের তিনকুলে কেউ নেই—স্বামী-সন্তানাদি নিয়ে ঘরসংসারও করেন নি; কিন্তু তাই বলে তাঁর নারীসুলভ স্নেহাদিক প্রবৃত্তি নেই তা নয়। সেই যে এক বাঙালি কবি লিখেছিলেন, আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ, সেই আঠারো থেকে আঠাশ পর্যন্ত বয়সের তরুণ ও যুবকদের তিনি অপত্যস্নেহে গ্রহণ করেন—তারাও তাঁকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করে থাকে। কিন্তু তাদের কাছে মহিলা বাঙালি মায়ের মতো প্যানপেনে নন, তিনি মহাভারতোক্ত বীরমাতা বিদুলার মতো বলসে ওঠেন। তিনি যেমন সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুত্র সঞ্জয়কে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—বৎস, ওঠো জাগো, স্ফুলিঙ্গের মতো মুহূর্তের জন্য হলেও জ্বলে ওঠো; তেমনি কমলিনী কাঞ্জিলাল তাঁর তরুণ অনুগামীদের বীরকর্মে উৎসাহিত করেন। ফলে এগার জন তরুণ মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

কমলিনী কাঞ্জিলাল কী করলেন? তিনি প্রতিবাদে তখনই বন্ধ্ ডাকলেন, শোকার্ত পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন—এসব হল তাঁর তৎসাময়িক কার্যক্রম। এ ছাড়াও তাঁর এক স্থায়ী কার্যক্রম আছে—বৎসরান্তে উক্ত তারিখে শহিদ দিবস পালন করেন।

কিন্তু কমলিনী কাঞ্জিলালের কথা থাক, আমরা বরঞ্চ বীতরাগ তপাদারের কাহিনির অবতারণা করি—কারণ তিনিই আমাদের প্রধান আলোচিতব্য।

এক বাঙালি নাট্যকার লিখেছিলেন—কী বিচিত্র এই দেশ; আবার তিনিই গানে লিখেছিলেন—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি। তা সত্যি, কিন্তু কবি নাট্যকার এ দেশ সম্বন্ধে একটু উল্টোরকম বুঝেছিলেন—তা সোজা করে দাঁড়িয়ে দিলে কেমন হয়? না কমলিনী কাঞ্জিলালের মতো মহিলা এবং বীতরাগ তপাদারের মতো পুরুষ জন্মগ্রহণ করে দেশের মাটির গুণে—তাঁরা শ্রীচরণ চালনা করেন এই দেশের মাটির ওপর—দেশবাসী ধন্য এবং দেশজননী কৃতার্থ হন।

এখন, যদিও আমরা প্রথমে এক মহিলা এবং পরে এক পুরুষের প্রসঙ্গ করছি, তথাপি মহিলাদের কথাই বিশেষভাবে গণনীয়। কারণ, শাস্ত্রে যে নদী নখী শৃঙ্গী ও শস্ত্রপাণিদের উল্লেখ করে তাদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে—সেই তালিকায় নারী কথাটা যুক্ত করা উচিত ছিল। কারণ এদেশে এখন দুই রাজধানী, দিল্লি এবং এই অধমাধম কলিকাতা—এই দুই স্থানেই মহিলারা যে সব কাণ্ড বাধাচ্ছেন, সে সবের থেকে আত্মরক্ষা করা মানুষের জন্মগত অধিকার। সে বস্তু কী?—ক্রমেই উদ্ঘাটন করা হচ্ছে, দেখতে থাকুন।

মিল-অমিল সাম্য বিরোধ নিয়েই সংসার। জাগতিক এই নিয়ম কি অস্মদ কথিত কমলিনী বা বীতরাগ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নয়? নিশ্চয়ই প্রযোজ্য—কারণ তাঁরা উভয়েই জাগতিক বিধিবিধানের মতো তাঁদের পিতৃপিতামহের প্রণীত বিধিতন্ত্রের থেকে উৎসারিত এবং সঞ্জীবিত। উদাহরণ—রাবণ-মহীরাবণ-অহিরাবণ যত বিভিন্ন পথে ধাবিত হোক না কেন—সকলেই কিন্তু একই বংশজাত।

যাই হোক, এঁদের মিল অমিলগুলোর প্রতি একনজর দৃষ্টিপাত করা যাক।

কমলিনী মধ্যবয়সি কিন্তু বীতরাগ প্রবীণ—মানে, পোড়-খাওয়া ব্যক্তিত্ব, অস্যার্থ একই ধরনের কাজ তিনি ক্লান্তিহীনভাবে আজীবন করে এসেছেন।

কমলিনী কাঞ্জিলাল অত্যন্ত আবেগপ্রবণ; যখন তারস্বরে বক্তৃতা করেন, তখন এতটাই স্ফীত হন যেন এখনই ফেটে পড়বেন। পক্ষান্তরে বীতরাগ তপাদার ধীর স্থির কথা ফোটে কি ফোটে না, জিহ্বা জড়িয়ে যায়, হয়তো বার্ধক্যের কারণে। অনেক দুষ্ট লোকে বলেন—তাঁদের এই আপাত পার্থক্য পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে—তুমি এইভাবে বলবে আমি বলব অন্যভাবে; নইলে আমাদের কাজ তো সেই একই, জনগণকে ধোঁকা দেওয়া, যা নয় তাই বোঝানো।

দিল্লি এবং কলকাতা এই দুই স্থানের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ দুটি জায়গায় উক্ত দুই ব্যক্তিত্বের, তথা অন্যপার্টি বা দলের ভূমিকা কেমন? প্রথম দিল্লির কথা, কারণ সেটি হচ্ছে আমাদের দেশের রাজধানী। একটা বাংলা প্রবাদ আছে, নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ। এদের অবস্থান হচ্ছে অবিকল তাই। এরা সবাই ওখানে গিয়ে নিজের নিজের নাক কেটে নিজেদের মৈত্রী রক্ষা করেন—সমরেশ বসুর বিখ্যাত উক্তি অনুসারে—তুমো যা আমুও তাই।

ওঁদের নাক কাটা ছাড়া পারস্পরিক ঐক্যের আর একটা পথ আছে—ঘুরিয়ে নাক দেখানো। ব্যাপারটা সেমান্টিক্স বা শব্দের অর্থায়নের আওতায় পড়ে। আমাদের সম্পর্ক কেমন, না মিত্র ও অনমিত্রের। শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ একই—মিত্র; কিন্তু মানুষ ঠকাতে হলে ওরকম আলাদা আলাদা ভেক ধারণ করতে হয়।

এসব নাকানাকির কথা বাদ দিলেও—মহাভারতের কাহিনিতেও এর নজির আছে। হস্তিনাপুরে কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে পাণ্ডবেরা দীন অবস্থায় কাম্যকবনে অবস্থান করছিলেন; কুরুপক্ষ সেই সময় ঐশ্বর্য প্রদর্শনের নিমিত্ত মহাসমারোহে পিকনিক করার জন্য স্ত্রীবর্গকে নিয়ে সেখানে হাজির হন। সেখানে চিত্রসেন গন্ধর্বের হাতে তাঁরা নিগৃহীত হন। পাণ্ডবেরা গন্ধর্বদের পরাজিত করে পরম মিত্রের কাজ করেছিলেন। তখন তাঁরা বৈর ভুলে গিয়ে হয়েছিলেন বান্ধব। যুধিষ্ঠিরের উক্তি স্মরণীয়—আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন/তারা শত সহোদর মোরা পঞ্চজন॥ সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত/ তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত॥'

৪.

এই মিত্র-অমিত্র প্রসঙ্গটি বীতরাগ তপাদারের দিক থেকেও দেখা যায়—কারণ আদিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম যে তাঁর কথা আমাদের বিশেষভাবে বলতে হবে।

কথায় আছে—খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গোরু কিনে। তাঁরও সঙ্গে আরও সব পার্টনার ছিলেন—সকলে মিলে-মিশে বেশ ভালোই চলছিলেন। কিন্তু একদা তাঁদের মধ্যে একটা সংঘাত বাধল।

এখানে আবার মহাভারতের কথা তুলতে হচ্ছে; কেননা আমরা আগেই বলে রেখেছি—যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে। এখন কী কথা? না, দ্রৌপদী ও পাঁচ ভাই-এর কাহিনি।

মা, আজ কী ভিক্ষা এনেছি, দেখবে এসো। মা বললেন, যা এনেছিস, পাঁচ ভাইয়ে ভাগ করে নে। সে রকম। আমাদের কলকাতাবাসী বীতরাগ তপাদারেরা জ্যেষ্ঠাদিক্রমে রাজত্ব ভোগ দখল করে আসছিলেন। কিন্তু কিনা অসন্তোষ এবং উচ্চাশা মানব-প্রকৃতির সহজাত, সে বীতরাগ তপাদারের কানে ফুসমন্ত্র লাগায়। মনোহর সর্পবেশী যেমন ইন্দ্রকে প্রলুব্ধ করেছিল, ঠিক তেমনি। এর মায়াজাল ছিন্ন করা দুঃসাধ্য, তপাদারও পারলেন না। সে অহরহ তপাদারের কানে ঢালতে লাগল—তোমার যে বড় ভাই, তার থেকে তুমি কম কীসে; নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নাও—নির্জীব হয়ে থেকো না। এসো, জানো, রক্ত দাবি করো এবং রক্তদান করো।

বাধল সংঘাত; সেটা আর কারুর সঙ্গে নয়; বড় ভাই-এর সঙ্গে। বড় ভাই সেটা মানবে কেন; খুব জোরে মেজভাই-এর কান মলে দিল—পুলিশ যে তার হাতে; চালাল গুলি—তরুণের পাঁচটি প্রাণ ঝরে গেল।

লাগল ছুটোছুটি, হট্টগোল, ধুমধড়াক্কা। তপাদার তরুণদের ডেকেছিলেন মৃত্যুপণের জন্য। এখন হাঁকলেন অর্থপণ—প্রতি মৃত্যুর জন্য তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু তপাদার বুঝলেন না, যে মায়ের কোল খালি হল, তার কাছে কীবা তিন বা তেত্রিশ লক্ষ।

মৃত্যুর মন্ত্র, মৃত্যুর ডাক বড় মধুর, তরুণের কানে তা মায়াময়। জাতির জনক ডাক দিলেন—ডু আর ডাই, সে তো মৃত্যুর মোহন মন্ত্র। সমকালে আর একজন বললেন—মুঝে খুন দো হাম তুমকো আজাদী দুঙ্গা।

তাহলে তপাদারেরা যা করেন, সে আর নতুন কথা কী; সে নিয়ে এত তর্কবিতর্ক কেন। নেতাদের পুরুষানুক্রমিক অধিকার আছে—অনুগামীদের কানে মৃত্যুর মোহনমন্ত্র জপ করবার। এবং

এবং দে হ্যাভ এভ্‌রি রাইট উলটোপুরাণ গাইবারও।

যেই মাত্র তপাদারের দল বড়ভাই-এর বিরুদ্ধে লড়াই-এ নেমে হারাল পাঁচটি প্রাণ, অমনি ডাক এল বড়ভাই-এর বিরুদ্ধে আর সংগ্রাম নয়, পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।

এমা, এ কী কথা। তাহলে পাঁচপাঁচটি প্রাণ যে ঝরে পড়ে গেল, তার মূল্য কী রইল।

তবে কিনা, এই ঘটনা—এই ডিগবাজি খাওয়া এ তো আগেও ঘটেছে। আমাদের মহাকবি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় সে কথা বলে গেছেন—'মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একটা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল জন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্টোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ; যাদের হাড় ভেঙেছে, তাদের হাড় জোড়া লাগবে না; পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়।'

একটা কথা মনে আসছে—নেতারা কি কোনওদিন মরে? না, নেতারা মরে না, তারা অমৃত। তাই এই অমৃতকথা।

তুহিনশুভ্র

অভিজিৎ সেন

সামনে একটা ধূসর অতিবিস্তৃত নদী। নদীর বিস্তার এবং ধূসরতা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে অনবরত বৃষ্টির কারণে।

নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে দরমার বেড়া দেওয়া একটা পাইস হোটেল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রায়-সব নদীঘাটেই এ রকম ব্যবস্থা আছে। তুহিনশুভ্র হোটেলের নদীর দিকের একটা খোলা ঝাঁপের পাশে এই দুদিন ধরে বসে আছে। বৃষ্টি যখন খুব জোরে আসে হোটেলের লোক ঝাঁপের ডান্ডাদুটো ধরে খোলা জানালার মাপ খানিকটা কমিয়ে দেয়। এভাবে খোলা অংশটা একশো কুড়ি ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রির মধ্যে ওঠা-নামা করছে। কখনো তুহিন নিজেই উঠে এই কাজটা করছে। তার কাছ থেকে হাত পনেরো দূরে হোটেল মালিকের গদির উপরে একটা ট্রানজিস্টার অনবরত কড়্ কড়্ শব্দ করে যাচ্ছে। ট্রানজিস্টারে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাবে মাঝারি, ভারী এবং অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছে।

এসব হোটেলের অবস্থান খুব অস্থায়ী হয়। নদীর এগিয়ে পিছিয়ে আসার যাওয়ার কারণে যেমন ঘাটকেও এগোতে পিছোতে হয়, হোটেলকেও তেমনি। ফলে এই মুহূর্তে নদীর জলের সমতলেই হোটেলের মাটির মেঝে। সেখানে অসংখ্য কেঁচো, ব্যাঙ, কেন্নো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জানালা থেকে তিন-চার হাত দূরে একটা বেঞ্চের উপরে তুহিন আপাতত পা তুলে বসে আছে। লম্বা ঘরটার সামনের দিকে যেখানে হোটেল মালিকের গদি, সেখানে একটা বাল্ব জ্বলছে, যদিও এখনো ঘণ্টা দুয়েকের বেলা আছে।

হোটেল মালিকের সামনে গদির উপরে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে যতীন গিরি। ধুতির উপরে ফুলহাতার সার্ট পরা যতীনের নাকের নীচে বেশির ভাগ পাকা একজোড়া পেরস্থ গোঁফ আছে। এই যতীন গিরিই তুহিনের এজেন্ট, পূর্বপরিচিত মানুষ। ওপারের বাংলাদেশ থেকে একজোড়া মাল আসবে। সেই মাল নেওয়ার জন্য তুহিন এসে বসে আছে হিঙ্গলগঞ্জের এই নদীঘাটে। যারা মাল নিয়ে আসবে, তারা তুহিনকে চেনে না, চেনে যতীন গিরিকে।

এতক্ষণ বেশ জোলো হাওয়া বইছিল, হঠাৎ হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। হাওয়া বন্ধ হতেই আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। অথবা বৃষ্টি নামতেই হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। নদীর ভাটিতে সন্দেশখালি, সেখানে একটা সঙ্গম মতো আছে। নদী দু-ভাগ হয়ে সমুদ্রে গেছে। এক ভাগের নাম রায়মঙ্গল, অন্যভাগ বিদ্যা। রায়মঙ্গলের ওপারে বাংলাদেশ। বাঁ-হাতের নদীর নাম কালিন্দী, তার ওপারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলা। যতীন গিরির লোক যে-কোনো দিক থেকেই আসতে পারে।

ভৌতিক জলযানের মতো বৃষ্টির পর্দা ভেদ করে আচমকাই একখানা ভুটভুটি নৌকো বেরিয়ে এল। নৌকোখানা আসছে সন্দেশখালির দিক থেকে। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘাটে এসে লাগল ভুটভুটি। তুহিন উঠে বাঁপের সামনে এসে দাঁড়াল। তার বাঁ-দিকে শ-খানেক হাত দূরে ঘাট। পনেরো-ষোলো জন মানুষ বাঁশের মাচানের উপর নেমে পারের দিকে এগোতে লাগল। মাচানের উপর দিয়ে যেহেতু পাশাপাশি একজন দুজন করে এগোচ্ছে, তুহিন তাদের প্রত্যেককেই আলাদা করে নজর দিতে পারছিল। না, এদের মধ্য থেকে মাল নিয়ে যে আসবে তাকে খুঁজে বার করা তার কাজ নয়। সে কাজ যতীন গিরির। সে শুধু দীর্ঘ অলস সময় পরে একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষ দেখে একটু ভাবান্তরে উপনীত হয়েছে।

হঠাৎ একজনকে দেখে তার চোখ আটকে গেল। শক্তিনাথ না! হ্যাঁ শক্তিনাথই তো! তুহিন জানালার কাছ থেকে ত্রস্ত মালিকের গদির কাছে এল।

'যতীনবাবু, ওই যে লোকটিকে দেখছেন—ওই যে মাচান থেকে নামল মাথায় ছোটো ছাতা—আরে ওই যে একটু টেনে হাঁটছে—ওই লোকটিকে একটু ডেকে আনতে পারেন?

'ওই লোকটি তো? ঠিক আছে, বসুন আপনি।'

'আমার নাম বলবেন না কিন্তু।'

তুহিন এসে পূর্বের জায়গায় বসল। শক্তিনাথকে চিনতে ভুল হওয়ার কারণ নেই। অসম্ভব স্টাইলিস্ট শক্তিনাথ জখম বাঁ পায়ের স্বাভাবিকভাবে হাঁটার অক্ষমতাও শেষ পর্যন্ত স্টাইলে পরিণত করেছিল। বহু বছর আগে একটা গোপন ডেরায় পুলিশ হানা দিলে পালাবার সময় বাঁ পায়ের উরুতে গুলি লেগেছিল শক্তিনাথের। আহত শক্তিনাথকে কাঁধে নিয়ে অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়েছিল তুহিন এবং আরো তিনজন। আর.জি.করের ড্রপআউট তুহিন দাঁতের নীচে কাঠের টুকরো কামড়ে ধরতে বলে বিবশ না করেই গুলি তুলে ফেলেছিল। বিবশ করার ওষুধ নতুন ডেরার কাছাকাছি পাওয়ার উপায় ছিল না। গ্যাংগ্রিন হওয়ার ভয়ে দেরি করারও উপায় ছিল না। সেই শক্তিনাথ পার্টি, তুহিন, এমনকি তার ভাইদের কাছেও কোনো রকম সূত্র না রেখে বছর দশেক আগে একেবারে উবে গিয়েছিল। সংগঠন এবং অন্যরা শেষ পর্যন্ত ধরেই নিয়েছিল যে পুলিশ তাকে গোপনে নিকেশ করে ফেলেছে। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের কোনো সামান্য সূত্রও না থাকায় তুহিনের নিজের কাছেও ব্যাপারটা একটা ধাঁধাই থেকে গিয়েছিল। সেই শক্তিনাথ সন্দেশখালির ভুটভুটি থেকে হিঙ্গলগঞ্জের ঘাটে নেমেছে! এমন অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা মানুষের জীবনেই ঘটে।

চতুর যতীন গিরি 'আরে আসুন না, আসুন না, আপনার চেনা মানুষকেই দেখতে পাবেন' বলতে বলতে অপ্রস্তুত এবং সন্ত্রস্ত শক্তিনাথের পিঠের উপরে একটা হাত ঠেকিয়ে প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই ভিতরে আনল।

তুহিন উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। দশ বারো বছর বয়স থেকে পয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ঘনিষ্ঠ থাকা দুই বন্ধু পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল মুহূর্তেই।

সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে অবশ্য টের পেল যে আন্তরিকতায় তারতম্য ঘটে গেছে। তুহিনের আলিঙ্গন যত দৃঢ়, শক্তিনাথের তত নয়।

প্রথম কথা বলল শক্তিনাথই।

'এমন অপার্থিব স্থান কালে যে তোমার সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা হয়ে যাবে, এমন আশঙ্কা করিনি। কেমন আছ?'

শক্তিনাথ বেঞ্চের উপর বসল, তুহিনও।

তুহিন বলল, 'যেমন ছিলাম, কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো? কোথায় এবং কেন এমন অদৃশ্য হয়ে গেলে? কোথায় থাকো? কী করো? এত অসংখ্য প্রশ্ন আমার মাথায় ভিড় করে আসছে যে কোন্‌টা আগে করব বুঝতে পারছি না।'

শক্তিনাথ একটু হেসে বলল, 'ব্যক্তিগত প্রশ্ন থাক তুহিন। বরং কেন হঠাৎ তোমাদের সবাইকে, সংগঠনকে এবং বিপ্লব সফল করার আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করলাম সে কথাটা জানতে যদি তোমার আগ্রহ থাকে, তবে বলতে পারি।'

একজন লুঙ্গিপরা লোক এসে যতীন গিরিকে ডেকে বাইরে নিয়ে গেল। তুহিন ব্যাপারটা খেয়াল করল এবং চঞ্চল হল। শক্তিনাথ তুহিনের ভাবভঙ্গি লক্ষ করলেও কোনো প্রশ্ন করল না।

একটু উশখুশ করে তুহিন বলল, 'এখানে কেন এসে বসে আছি জিজ্ঞেস করলে না?'

শক্তিনাথ বলল, 'অনুমান করতে পারছি। একবার আমরা দুজনে এসে এক চাবির বাড়িতে রাত কাটিয়েছিলাম না? ভুলে গেছ?'

'ওঃ, সেই রেডবুকের চালানটা নেওয়ার জন্য। সে তো প্রায় তিরিশ বছর হতে চলল। সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম। সে তো একেবারে সেই প্রথম যুগে', তুহিন বলল।

শক্তিনাথ বলল, 'হ্যাঁ, একেবারে প্রথম দিকে কিন্তু কী রোমাঞ্চকর ছিল ব্যাপারটা, বলো?'

তুহিন অন্যমনস্কের মতো বলল, 'হ্যাঁ, ভারি রোমাঞ্চকর।' যতীন গিরির বাইরে বেরিয়ে যাওয়াটা তাকে অন্যমনস্ক করেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎই সতর্ক হল সে। শক্তিনাথ নিজের তৈরি বিধি মানছে না। অসাবধানে সে নিজেই পরবর্তী নির্ঘাত প্রশ্নের সুযোগ করে দিচ্ছে তুহিনকে। ফলে হেসে তুহিন তাকে ফের জিজ্ঞেস করল, 'সে সব রোমাঞ্চের আর কিছু কি অবশিষ্ট আছে তোমার মধ্যে?'

তুহিন যে স্কুলে পড়ত সেই স্কুলে ক্লাস সিক্সে এসে সহপাঠী হয়েছিল শক্তিনাথ। সে পর্যন্ত তুহিনই সেরা ছাত্র ছিল ক্লাসের। শক্তিনাথ আসার পর পরীক্ষার ফলে ব্যতিক্রম হতে লাগল। তবুও দুজনের মধ্যে প্রথম থেকেই, সেই বয়সেই ভারি সম্ভ্রমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে কিন্তু সম্পর্ক কখনোই 'তুই-তোকারিতে' নিয়ে যায় নি দুজনের কেউই।

শক্তিমান বলল, 'না নেই কিন্তু তবুও সে তো প্রথম যৌবনের সেই উজ্জ্বল সময়ের একটা ঘটনা, স্মৃতি ধরে রেখেছে।'

শক্তিনাথের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকে অতিক্রম করে পিছনের প্রবেশপথের দিকে তাকাল তুহিন। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় শক্তিনাথও। যতীন গিরি ভিতরে এসেছে। তুহিন হাতের ইশারায় তাকে কিছু ইঙ্গিত করতে যতীন গিরি মালিকের তক্তপোশে বসে পড়ল।

শক্তিনাথ তুহিনের ইঙ্গিত দেখেনি কিন্তু লোকটির তুহিনের দিকে তাকানো অর্থপূর্ণ চোখদুটি এবং হঠাৎ ঘাড়নাড়া তার নজরে এল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে এখন আমি যাই, তুহিন?'

তুহিন তার দুই হাতের কনুইয়ের উপর দিক প্রায় যেন ঝাঁপিয়ে উঠেই ধরে ফেলল। প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল, 'এখনি চলে যেও না, শক্তিনাথ। এতদিন পরে দেখা হল, একটু কথা হবে না, শক্তিনাথ? তুমি বোসো আমি আসছি।'

সে উঠে বাইরের দিকে যেতেই তার পিছন পিছন যতীন গিরিও বেরিয়ে গেল।

একটু পরে তুহিন ফিরলে শক্তিনাথ তার চেহারার একটা শিথিল স্বস্তির লক্ষণ লক্ষ না করে পারল না। সে ভাবল তুহিনের চালান নিশ্চয়ই এসে গেছে।

তুহিন কিন্তু বলল উল্টো কথা।

'আমার চালান এসে পৌঁছায়নি শক্তিনাথ, লাইন খারাপ। এ যাত্রা খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে। দ্যাটস গুড। তুমি কি আমাকে আজকের রাতটার সাহচর্য দেবে? আমি তোমার কাছে হাত জোড় করছি শক্তিনাথ।'

তুহিনের হাত দু-খানা শক্তিনাথ ধরে ফেলল। সে একটু আশ্চর্যই হল। তুহিন হল সেই ধরনের বিপ্লবী যারা মনে প্রাণে জানে এবং বোঝেও যে বিপ্লব সূচিশিল্পের মতো কোনো শিল্পকর্ম নয়। কোনো দুর্বলতা, কোনো আবেগ তাকে কখনোই লক্ষ্যবিচ্যুত করেনি। অন্তত শক্তিনাথ কোনো কালেই এ ধরনের কোনো দুর্বলতা দেখেনি তার ভিতরে। কিন্তু আজ তার এমন ভাবান্তর কেন?

'কিন্তু তাতে তো একটু অসুবিধা—'শক্তিনাথ সতর্ক হয়ে বিষয়টা এড়াতে চাইল।

'কেউ অপেক্ষা করে থাকবে? খুব কি অসুবিধা হবে? মানে আজ রাতটা আমরা একত্রে—'

তুহিন বন্ধুর হাত দু-খানা ছাড়ল না।

শক্তিনাথ সতর্ক হল। তার জীবনের গত দশ বছরের গোপনীয়তা আর গোপন থাকবে না। তুহিন ক্ষুরধার বুদ্ধি বিশ্লেষণের মানুষ। তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তার। সারা জীবন এ কারণে গোপনে শক্তিনাথ তার প্রতি ঈর্ষাবোধ করেছে। বেশ কয়েকবার তর্ক করেছে যে বুদ্ধির পাশাপাশি আবেগকেও বিচারের মানদণ্ডে রাখতে হবে কিন্তু তুহিন মানেনি। অকাট্য সব যুক্তি দেখিয়েছে। এ কথাও বলেছে যে আবেগ স্থূল মস্তিষ্কের প্রবৃত্তি। শক্তিনাথ মানেনি কিন্তু অকাট্য যুক্তিও সে সময়ে সে দেখাতে পারেনি। পরবর্তী কালে এ বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিকদের মত পাল্টেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এ নিয়ে তুহিনের সঙ্গে আলোচনার আর কোনো সুযোগই ঘটেনি শক্তিনাথের।

শক্তিনাথ বলল, একরাত একত্রে থেকে কী আর হবে? আর তো কোনো নতুন কথা আমাদের নেই।'

'তবু থাকো, শক্তিনাথ প্লিজ, একটু প্রাণখুলে কথা বলব তোমার সঙ্গে,' তুহিনশুভ্র কাতর অনুনয় করল।

দরমার বেড়া দেওয়া হোটেলে থাকার তেমন কোনো বন্দোবস্ত নেই। হাসনাবাদ গিয়ে যারা সকালে বাস কিংবা ট্রেন ধরতে চায়, অনেক সময় এমন কিছু লোক ভোরের ট্রেকার ধরার জন্য এই হোটেলের তক্তপোশে শুয়ে রাত কাটায়। এ ছাড়া হোটেল মালিকের এক চিলতে ব্যক্তিগত ঘর আছে। বিশিষ্ট খরিদ্দার থাকলে সে ঘরখানাও পাওয়া যায়। মালিক বাড়ি চলে গেলে রাত আটটা নাগাদ শক্তিনাথ এবং তুহিন সেই ঘরে পরস্পরের মুখোমুখি হল।

তুহিন আর একবার শক্তিনাথের হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে নিল।

'বলো শক্তিনাথ, কেন আমাকে ত্যাগ করে অন্তর্ধান করলে? কেন একবার আভাস পর্যন্ত দিলে না?'

'দিলে কি আমি অন্তর্ধান করার সুযোগ পেতাম? সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলার আমিও তো ছিলাম একজন অংশীদার। আর তোমাকে তো ত্যাগ করিনি, প্রতিদিন না হলেও যে-কোনো দুর্বল, আন্তরিক এবং এমনকী প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুহূর্তেও তোমার কথাই ভাবি।' যে কথাটা সে বলতে পারল না, তা হল, ছেলের নাম রেখেছে সে তুহিনশুভ্র।

'আমার যতদূর মনে আছে সংগঠন তোমাকে হায়দারাবাদে পাঠিয়েছিল ল্যান্ডমাইন তৈরি এবং তা ব্লাস্ট করবার পদ্ধতি শেখার জন্য। আমাদের কাছে যেটুকু খবর ছিল ট্রেনিংটা তুমি নিয়েও ছিলে, হায়দারাবাদের কমরেডরা তোমাকে রিজারভেশন করা কামরায় তুলেও দিয়েছিল কিন্তু তারপরে আর তোমার কোনো হদিশ পাইনি আমরা।'

'হ্যাঁ, আমার ইউনিভারসিটির কেমিস্ট্রি বিদ্যাই আমার জীবনের নির্ণায়ক ঘটনা হয়ে গেল। যদিও ল্যান্ডমাইন যারা তৈরি করে কিংবা ব্লাস্ট করে, উচ্চতর কেমিস্ট্রির বিদ্যা তাদের কোনো কাজে লাগে না। তবুও তোমরা আমাকে পাঠিয়েছিলে আর কাজটা আমি শিখেওছিলাম।'

বছর দশেক আগে ল্যান্ডমাইন ব্যাবহারের সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে নিয়েছিল সংগঠন। প্রধানত গ্রাম এবং বনাঞ্চলের ঘাঁটিগুলোতে পুলিশের অভিযান প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই। ছত্রিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, এমনকী ঝাড়খণ্ডেও ততদিনে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ সাধারণ ঘটনা হয়ে গেছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য, পুলিশের বড়কর্তা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নেতারা বিভিন্ন রাজ্যের বিপ্লবীদের হিটলিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রশাসন এবং পুলিশ পাল্টা নানা ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে আধুনিক মাইন নিষ্ক্রিয় করার জ্যামার ব্যবস্থাও এদেশে এসে গেল। ফলে জ্যামার যাতে কাজে না লাগে, সেই উদ্দেশ্যে পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে গেল বিপ্লবীরা। কোরীয় যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ক্লেমার মাইন আবার ফিরে এল।

শক্তিনাথ এই মাইন বানানো শিখতেই হায়দারাবাদে গিয়েছিল। জিলেটিন, লোহার বল এবং লম্বা পেরেক একসঙ্গে কোনো পাত্রে ঠেসে ইলেকট্রিক ডিটোনেটরের সংযোগে দূর থেকে বিস্ফোরণ করানো হয়। মাইনের ডিটোনেটরের সঙ্গে যুক্ত ইলেকট্রিক তারের শেষ প্রান্তে থাকে ড্রাই ব্যাটারি এবং ক্যামেরার ফ্ল্যাশগান। লক্ষ্যবস্তু লুকানো মাইনের উপরে এলে দূরবর্তী আড়াল থেকে কেউ একজন ফ্ল্যাশগান ব্যাটারিতে ঠেসে সারকিট সম্পূর্ণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ হয়।

শক্তিনাথ অন্ধ্রপ্রদেশের গোপন ডেরায় এই প্রক্রিয়া শিখতে গিয়ে বিরক্ত হল। যে-কোনো অশিক্ষিত লোককেও এ ব্যাপারটা শেখানো যায়। এর জন্য কেমিস্ট্রির মেধাবী ছাত্রকে পাঠানোর প্রয়োজন ছিল না।

'ফেরার পথে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আচমকা ফুড পয়েজনিংয়ের কারণে শরীর একেবারে বিকল হয়ে পড়ল। আমার বারবার বমি এবং পায়খানায় যাওয়ার কারণে কামরায় আমার অংশের সহযাত্রীরা ভয় পেয়ে গেল। তাদেরই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত একজন ডাক্তার, খাওয়ার স্যালাইন এবং বমি বন্ধ হওয়ার ইনজেকশনের ব্যবস্থা হল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আর বাড়ল না, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

'ঘুম ভাঙল নীল অন্ধকারের মধ্যে। শরীরে অপর্যাপ্ত অবসাদ, মুখ বিস্বাদ। উঠে ভালো করে মুখ চোখে জল দিয়ে কয়েক ঢোক জল খেয়ে খানিকটা ধাতস্থ হলাম। আশেপাশে সবাই ঘুমোচ্ছে। সংসারী মানুষের পাঁচজন আমার দীর্ঘ সময়ের ট্রেন যাত্রার সঙ্গী। এক প্রৌঢ় দম্পতি যাবে গৌহাটি। পুরুষটির দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্য তারা গিয়েছিল চেন্নাই। ফেরার পথে চোখেমুখে হতাশা। প্রথম বয়সে এমনও কখনো কখনো মনে হত বিপ্লব হলে এসব রোগশোকও নিরাময়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একজন গিয়েছিল এর্নাকুলামে। সংসদীয় কম্যুনিস্ট পার্টির লোকটি দলের কোনো সম্মেলনে গিয়েছিল, ফিরছে চেন্নাই হয়ে, সেখানে চাকরিরত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে। একজন যুবক যতক্ষণ জেগে ছিল একটা ডায়েরি বের করে কীসব হিসাবনিকাশ করে যাচ্ছে। একগোছা ছাপানো কাগজের মধ্য থেকে এটাসেটা টেনে মাঝেমধ্যে দেখে নিচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল, এ ব্যক্তি শেয়ার বাজারের লোক, যাকে ইদানীং কনসালটেন্সি বলে, সেই কাজ করে। পঞ্চম জন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একজন যুবক। কলকাতায় বাবার মৃত্যু হয়েছে, তাই অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছে। বাঙ্গালোরে অনেক টাকা মাইনের চাকরি করে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে। বাবা দু-মাস ভুগে মারা গেছে। একদিনের জন্যও ছুটির ব্যবস্থা হয়নি। মারা যেতে দিন তিনেকের জন্য ছুটি পেয়েছে। কী এক আন্দোলনের কারণে বিমানের টিকিট পায়নি। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জীবনে এই প্রথম বার 'যা হয় হবে' ভেবে ট্রেনে উঠে পড়েছে, কেননা গাড়িতে যেতেই তার তিনদিন লেগে যাবে। আমার তোমার জীবনের ওই বয়সের কথা মনে আছে তো?

'নীল আলোর মধ্যে এই পাঁচজন মানুষের প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ নিজেকে ভারী হতভাগ্য মনে হল। এইসব মানুষের জীবনযাত্রায় কোনো অর্থেই

আমি সঙ্গী নই। সংসদীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ওই লোকটি, শেয়ারের কনসালটেন্ট ওই যুবক, তথ্য প্রযুক্তির বেশ বেতন পাওয়া ওই তরুণ, এরা সবাই এক বোধে আমার শ্রেণিশত্রু। অন্তত এতদিন তো এইভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি। ওই মৃত্যুপথযাত্রী প্রৌঢ়ের সামাজিক বা আর্থিক অবস্থান আমি জানতে চেষ্টা করিনি। তাদের লাগেজের মহার্ঘতায় আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে এরাও নিতান্ত সাধারণ নয়। বস্তুত, এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় স্বচ্ছল মানুষেরাই তো যাতায়াত করে, আমিই বিশেষ কারণে সেখানে প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু এইসব মানুষ সুখদুঃখ মেশানো সংসারে থাকে, যেখানে বহুকাল আর আমার কোনো অধিকার নেই। একটা সময় অর্থাৎ সেই কলেজে পড়ার সময় একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে পূর্ববঙ্গ থেকে বাবা মা ভাই বোনকে আনিয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে থাকব। সেই কবে ন-দশ বছর বয়সে ছেড়ে এসেছি, তারপরে তো বারো বছর পার হয়ে গেলেও মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। তারপর সেই সংসার যখন শুরু হল, পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এই জীবনে যোগ দিলাম।'

তুহিন শক্তিনাথকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সেই কারণে তোমার পরিবারের লোকেরা আমাকেই দোষী করে, দু-এক বার তোমার ভাইদের সঙ্গে কথা বলে আমার এমন ধারণা হয়েছিল।'

শক্তিনাথ বলল, 'সবাই নয়, কেউ কেউ হয়তো। তবে সবাইকে নিয়ে একটা আদর্শ সুখের সংসার করার সামন্ততান্ত্রিক ঝোঁক আমার বরাবরই ছিল। সেই ঝোঁক কাটানোর ব্যাপারে তোমার তো একটা ভূমিকা ছিলই তুহিন।'

'সে যাকগে, তারপর?' তুহিন তাড়া দিল।

শক্তিনাথ বলল, 'ঘুম আর আসছিল না। সেই নীল অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ অবচেতনের সেই গোপন প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাটা ভেসে উঠল—আর কতদিন এভাবে থাকব? জেলখানার সেলে পচে মরা অথবা পুলিশের গুলি খাওয়ার অপেক্ষা ছাড়া আর কি কোনো ভবিষ্যৎ আমাদের সত্যিই আছে?

'এ ধরনের প্রসঙ্গ উঠলেই যে সব কথাগুলো আমরা বলি, যে সব উদাহরণ আমরা দিই যেমন নেপাল থেকে শুরু করে বিহার, দণ্ডকারণ্য, ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং মহারাষ্ট্র হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, এই বিস্তৃতি জুড়ে নিবিড় বিপ্লবী বলয়ের সফল গঠন এবং ক্রমশ তার শক্তিবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক স্তরে—'

তুহিন বলল, 'শক্তিনাথ, ও সব কথা থাক। তুমি তোমার কথা বলো, ও সব কথা থাক।'

শক্তিনাথ বাধা পেয়ে একটু আহত হল। আসলে সে তো দলত্যাগীই। মনের মধ্যে একটা দুর্বল জায়গা তো এ কারণে থেকে গেছেই।

সে বলল, 'এগুলোই তো আমার নিজের কথা, তুহিন। এইসব পজিটিভ ঘটনার পাশাপাশি আমরা তো ভুলে যেতে পারি না যে সেই পাঁচের দশকের কিউবার সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের পর পৃথিবীতে আর কোথাও কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের সশস্ত্র ক্ষমতা দখল

সফল হয়নি, যদিও প্রচেষ্টা ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া বাদ দিয়ে আর সব কটি মহাদেশেই লাগাতার চলছে।'

তুহিন খুব শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কিউবার ক্ষমতা দখলও সারা পৃথিবীর কম্যুনিস্টরা ব্যতিক্রম হিসাবেই দেখেছে। অত সহজে যে ক্ষমতা দখল আর সম্ভব হবে না, এ কথা সবাই জানে।'

'কত কঠিন হবে,' শক্তিনাথ বলল, 'তাও কেউ জানে না। যতদিন লক্ষ্য অর্জন না-হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এ যেন মৃত্যুর পরে কেয়ামতের জন্য ইসলামে বিশ্বাসীদের অপেক্ষা।'

তুহিন বলল, 'তুমি বোধহয় অনেক দিন ধরেই এসব কথা ভাবছিলে, না শক্তিনাথ? কিন্তু কী আশ্চর্য। আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি।'

'তুমি অনেক কিছুই বুঝতে পারো না', শক্তিনাথ বলল, 'তার কারণ তুমি তো সবই তোমার বুদ্ধি দিয়ে, ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাও। সেই যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে বুঝে ফেলো যে দীর্ঘকালীন যুদ্ধ করে জিতে যে বিপ্লবীরা চিনকে মুক্ত করেছিল, তারা শেষ পর্যন্ত ক্যাপিটালিস্ট রোডার। যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সব থেকে বড় লড়াই লড়েছিল এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছিল, সেই ভিয়েতনামীরাও পুঁজিবাদের দালাল, ইউরোপের কম্যুনিস্টরা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সারা পৃথিবীতে প্রতি দশ বছর অন্তর একদল মানুষ সশস্ত্র বিপ্লব করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। দশ বছর পরে তাদের বেশির ভাগই সরে যায়, মরে যায়, অন্য রাজনৈতিক দলে গিয়ে আশ্রয় এবং সুবিধা নেয়। আমি যখন হায়দারাবাদে গিয়েছিলাম, জনযুদ্ধের পিতৃপ্রতিম কোন্দপল্লী সীতারামাইয়া সে সময় এই তত্ত্বের প্রতি সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। পরে তো তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয় অথবা তিনি নিজেই সরে যান। যাই হোক এই অন্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক এবং কট্টর মৌলবাদী সংগঠনগুলোও পড়ে কিন্তু, আসলে আমার তোমার শ্রেণির লোকেরা কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকে। শেষে এ দল ও দলে ঢুকতে চেষ্টা করে, খবরের কাগজের কলমলেখক হয়। এন.জি.ওতে ঢোকে কিংবা ব্যর্থ লেখক হয়। তখন অন্য আর একদল মানুষ এসে বিপ্লবী হয়, খুনখারাপি করে, প্রতিপক্ষকে গুলি করে, ঘরের ভিতরে পেট্রোল কেরোসিন ঢেলে স্ত্রীসন্তান-সহ পুড়িয়ে মারে, সাধারণের চলাচলের রাস্তায় গোপন মাইন পুতে রেখে গাড়ি-সহ উড়িয়ে দেয়, ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহগুলোকে আড়াল থেকে দেখে, টেলিভিশনে বারবার দেখে তৃপ্তি পায়, গোপন আস্তানায় বীরের অভিনন্দন এবং রেড স্যালুট গ্রহণ করে। অসীম তৃপ্তি পায়। আর এই ল্যান্ডমাইন তৈরি শিখতেই তোমরা আমাকে অন্ধ্রপ্রদেশে পাঠিয়েছিলে। আমার তৈরি পাঁচটা ক্লেমার মাইনের কার্যকরিতা দেখার জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল করিমনগরের একটা অ্যাকশনে। তুহিন, সে দৃশ্য দেখা—'

তুহিন তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমার ভাবতে ভারী আশ্চর্য লাগছে যে তুমি বিপ্লব করতে কেন গিয়েছিলে? আর অত দিন, অন্তত বছর পনেরো তো বটেই, আমাদের সঙ্গে

ছিলে কী করে? শক্তিনাথ, "সে দৃশ্য দেখে সাদা ছেলে পেটে ধরে, যার কটি মেয়ে দিয়েছে গলায় দড়ি, সে দৃশ্য দেখে—"

শক্তিনাথ বলল, 'যার কবিতা থেকে এই উদ্ধৃতি তুমি দিলে, সে কবি তো সত্তরের অর্থহীন ভয়াবহতার আঁচ পেতে শুরু করতেই কবিতা লিখে, ঘোষণা করে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। পৃথিবীতে দু-রকমের মানুষ বিপ্লব করতে যায়। এক হচ্ছে, তোমার মতো মানুষ, বুদ্ধিমান স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কর্তব্যকর্ম বলে যা স্থির করে সে সব করতে হাত কিংবা হৃদয় কখনোই কাঁপে না, উদ্ধত এবং আপাদমস্তক ক্ষমতালিপ্সু। আসলে এ হেন মানুষ যা করতে চায়, চরম ক্ষমতা ছাড়া তা তো সম্ভব নয়। আর চরম ক্ষমতাই তাদের লক্ষ্য। আর দ্বিতীয় ধরন হল আমার মতো মানুষ, দুর্বল, অন্যের দুঃখে বিগলিত, অন্যের সঙ্গে সমস্ত কিছু ভাগ করে নিয়ে বাঁচতে চায়। এরাই সমাজে সাম্য এবং যথার্থ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে এবং দেখায়। তুহিন, তুমি এবং আমি এবং আমাদের অনুরূপরা তাই বিপ্লবে সামিল হই।'

তুহিন একটা সিগারেট ধরাল, একটা শক্তিনাথের দিকেও বাড়িয়ে দিল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বার দুয়েক গভীর টান দিয়ে খুব ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। ধোঁয়া ছাড়া শেষ হলে হতাশের মতো বলল, 'এই দুই ধরন ছাড়াও আরো অনেক মানুষ বিপ্লবী দলে আসে, শক্তিনাথ। ভীরু কাপুরুষ মানুষ, স্বভাব-ক্রিমিন্যাল বা বড় ধরনের অপরাধ করে ফেরার মানুষ, নিজের কাছ থেকে বা সমাজের কাছ থেকে পালাতে চায় যে মানুষ, এমন অনেক ধরনের মানুষ বিপ্লবী দলে এসে যোগ দেয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভবিষ্যতে নেতৃস্থানীয় হয়েও ওঠে। তারপর কী করলে? অন্ধকার রেল কামরা ছেড়ে চলে গেলে?'

শক্তিনাথ বলল, 'সেই ক্লাস সিক্স্ থেকে ওই সময় পর্যন্ত এই একটা কাজই আমি করেছি যা তোমার গোচরে নেই। আমি সারাজীবন একটা অভিমান মনে মনে পুষে রেখেছি যে তুমি আমার কাছে অনেক কিছুই গোপন করো কিন্তু ওই একবারই আমি তোমাকে আগে বা পরে কিছু জানাইনি।'

তুহিন নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগল।

শক্তিনাথ আবার বলল, 'কামরার জানালা দিয়ে বাইরের কিছুই দেখা যায় না। আমার আর ঘুম আসছিল না। আমি উঠে বেরোবার দরজার কাছে এলাম। দরজার খড়খড়ি তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কুয়াশা জড়ানো মায়াবী জ্যোৎস্না চরাচর জুড়ে। তার ভিতর দিয়ে ট্রেন চলছে বেশ ধীর গতিতে।

'তোমার হয়তো মনে আছে সেটা ছিল নভেম্বর মাস। গাড়িটা একটা দীর্ঘ ভোঁ বাজাল। গতি আরো কমিয়ে শেষে আস্তে আস্তে এসে একটা খুব অখ্যাত স্টেশনে দাঁড়াল। স্টেশনের নামটা আমার চেনা। আমার জ্যাঠতুতো বোন রানির বিয়ে হয়েছে এই স্টেশন সংলগ্ন একটা গ্রামে। সেই সূত্রে এ জায়গায় বার দুয়েক আমি এসেছিলাম। রানি বিয়ে করেছিল তার এক শিক্ষক সহকর্মী বেলালকে। জ্যাঠামশাইয়ের পরিবার এই বিয়েতে রাজি ছিল না। নানা অশান্তি হয়। আমি রানির পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই সূত্রেই এই জায়গায় আসা হয়েছিল আমার।

'কুয়াশা আর জ্যোৎস্নামাখা চত্বরে গাড়িটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি দরজাটা খুলে ফেললাম। শুনশান নিস্তব্ধ চারদিক। ভিতরে ঢুকে আমার ব্যাগটা টেনে নিয়ে আমি গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। সেই অপার্থিব স্থানকালে আমার মনে হল এ যেন দৈবের ইঙ্গিত।'

এ ধরনের কথাবার্তায় তুহিনের চিরকালই আপত্তি। আগে হলে দৈব ব্যাপারটা তার কান এড়িয়ে যেত না। নিদেন একটু রসিকতা তো করত। বলত, 'দৈবের ব্যাপারে তোমার উৎসাহ চিরকালই একটু বেশি।'

কিন্তু এখন চুপ করেই থাকল। শক্তিনাথ এতক্ষণ ধরে অনেকগুলো তীব্র মন্তব্য করেছে, সমালোচনা করেছে, উপহাস করেছে এবং এর বেশির ভাগটাই আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে। কিন্তু কখনো কখনো তার ভিতরে লুকানো হল, অ্যাসিড তিক্ততাও অনুভব করেছে তুহিন। যে সব আত্মসমালোচনা অনেককে নিয়ে সেই সাধারণ আত্মসমালোচনায় মানুষ অজ্ঞাত কারণে নিজেকে বাইরে রাখে। বহু সময়, যদি সে ব্যক্তি অত্যন্ত সৎও হয়, নিজেও টের পায় না। তুহিন তবু চুপ করেই রইল।

বাইরে রাত বেড়েছে। একপাশের এক টুকরো টেবিলের উপরে হোটেলের কর্মচারী রুটি তরকারি ঢেকে রেখে গিয়েছিল। দুজনে ঢাকা খুলে নিঃশব্দে সে সব খেয়ে জল খেলো। তুহিন গোটা দুয়েক বড়ি খেলো।

'কী ওষুধ খেলে?' শক্তিনাথ না জিজ্ঞেস করে পারল না।

'বুড়ো হতে থাকলে যে সব ওষুধ খেতে হয়—একটা ট্রাংকুলাইজার আর একটা বাতের জন্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ,' তুহিন ভাবলেশহীন মুখে জল গিলতে লাগল ঢকঢক করে।

'বাতের রোগ হয়েছে তোমার!' শক্তিনাথ খুব আশ্চর্য হল।

তুহিন বলল, 'তাতে অবাক হওয়ার কী আছে? যে-কোনো রোগই যে-কোনো লোকের হতে পারে। তা ছাড়া বিপ্লবীরা তো বাতের নির্ভরযোগ্য টারগেট। মাসের পর মাস বছরের পর বছর কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড শেলটারে বসে কিংবা শুয়ে থাকা। কখনো এক আধটা চিঠি লেখা, কখনো মিটিং করতে এখানে ওখানে যাওয়া। কখনো গ্রাম কিংবা জঙ্গলের পথে দীর্ঘ রাস্তা হেঁটে বা সাইকেলে চলতে হয় বটে কিন্তু সে তো তুমিও জানো, কদাচিৎই। অ্যাকশন করতে তো আর আমাকে যেতে হয় না।'

তারে ঝোলানো অল্প পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌বটা নিভে গেল। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। শক্তিনাথ পরিষ্কার বুঝতে পারছিল না যে তুহিনের কথায় কোনো শ্লেষও আছে কি না।

'তুমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছ?' অন্ধকারের মধ্যে সিগারেট ধরালো তুহিন।

'খাই না তেমন আর', শক্তিনাথ বলল, 'কেউ অফার করলে কখনো কখনো খাই। না, আর এখন খাব না।'

সিগারেট শেষ হলে তুহিন শুয়ে পড়ল। শক্তিনাথের মনে পড়ল তিরিশ বছর আগের কথা। এই হিজলগঞ্জেই এক চাবি বাড়িতে রাত্রে শুয়েছিল তারা। অর্ধেক খোলা দাওয়ার

উপরে খেজুরপাতার চাটাইতে তাদের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটা সংক্ষিপ্ত মশারির ব্যবস্থাও ছিল। তাদের যোগাযোগকারী লোকটি গৃহস্থের সঙ্গে সাপ নিয়ে কথা বলছিল।

'সাপের উপদ্রব কেমন এবার এদিকে?'

'নাঃ সাপ এবার কম। একটা শিয়রচাঁদা এই কদিন আগে আপনার বউমার তোরংয়ে কী করে যেন ঢুকি পড়িছিল—'

শক্তিনাথ উঠে বসে চাটাইয়ের নীচে মশারি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে তুহিন বলেছিল, 'বৃথা চেষ্টা শক্তিনাথ, মাথায় কাপড় দিতে গেলে পায়ের কাপড় উঠে যাবে।'

ব্যাগ থেকে টর্চ বার করে শক্তিনাথ প্রথমে নীচের মেঝের আনাচ কানাচ দেখল। তারপর নীচে নেমে একদিকের দেয়ালের সঙ্গে গুটিয়ে রাখা মশারির না-লাগানো দুই প্রান্ত খুঁজে যথাযথ জায়গায় টাঙালো। ভিতরে ঢুকে মশারি খাটিয়ে টের পেল তুহিনের শ্বাস প্রশ্বাস ভারী হয়ে গেছে। কতটা ঘুমের ওষুধ খায় তুহিন! জায়গা করার জন্য তাকে একটু ঠেলে দিতে জড়ানো গলায় তুহিন বলল, 'শক্তিনাথ, একটা অনুরোধ রাখবে ভাই? একটা মেয়েকে আশ্রয় দেবে?'

শক্তিনাথ সহসা কোনো উত্তর দিতে পারল না। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়ে? তোমার স্ত্রী?'

'আমার মেয়ে', তুহিন টেনে টেনে বলল।

'কবে বিয়ে করেছিলে তুমি?'

'সেই পঁচাশি সালে?'

'পঁচাশি সালে! অথচ তুমি আমাকে জানাওনি! কাকে বিয়ে করেছ, দময়ন্তীকে!'

'না, তাকে তুমি চিনতে না।'

শক্তিনাথ কোভে স্তব্ধ হয়ে রইল।

তুহিনের নিঃশ্বাস আবার ভারী হয়ে উঠেছে।

'দেবে আশ্রয়?'

'বয়স কত মেয়ের?'

'উনিশ বছর, মাধ্যমিক পাশ করেছে।'

শক্তিনাথ আবার চুপ করে গেল। একটু পরে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়ের মা কোথায়?'

গাঢ় নিশ্বাস ফেলে তুহিন বলল, 'আমি জানি না, মেয়ে জানতে পারে। তাকেই জিজ্ঞেস কোরো।'

নিজেকে আর জাগিয়ে রাখতে পারল না তুহিন। শক্তিনাথের চুপ করে থাকার অবসরে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। কী ওষুধ খায় তুহিন? নাক ডাকতে লাগল তার। বাইরে এখনো বৃষ্টি পড়ছে।

কিন্তু ঘুম এল না শক্তিনাথের। রাত ক্রমশ এগিয়ে চলল কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না তার। এ কী কঠিন পরীক্ষায় ফেলল তাকে তুহিন।

ঘণ্টা তিনেক পার হয়ে গেলেও শক্তিনাথ জেগেই রইল। নেই, সেই শাণিত বুদ্ধি,

অগাধ পড়াশোনা, যুক্তি তর্কের প্রত্যয় দৃঢ় তুহিনশুভ্র মূর্তিটি তার আগের ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। কেন? তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করতে লাগল, খবরদার শক্তিনাথ, তুমি আজীবন পলাতক অথচ স্বাভাবিক পরিশ্রমী মানুষের জীবন কাটাবে বলে পিছনের সব কিছু ছেড়ে এসেছ। আর কোনো প্রলোভনে, মোহে জড়িও না তুমি। নতুন করে বৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে নদীর উপর থেকে ভেসে আসা হু হু করা ঝোড়ো হাওয়া।

ভোর রাতে কিছু দূরের রাস্তায় প্রথম ট্রেকার ছাড়ার গুঞ্জন শুনতে পেয়ে খুব সন্তর্পণে তক্তপোশ থেকে নেমে এল শক্তিনাথ। রাত্রে চলে যাওয়া বিদ্যুৎ এখনো আসেনি। তুহিন এখনো প্রবল ঘুমে আচ্ছন্ন। জামাটা গায়ে দিয়ে ব্যাগের ভিতর থেকে ছোট্ট নোটবইটা বের করল সে। টর্চ জ্বালিয়ে একটা-পাতায় লিখল, 'যদি অন্য আর কোনো উপায় না থাকে, মেয়েকে আমার কাছে পাঠাও। মনে রেখো আমি দরিদ্র, মেয়ে কষ্টে থাকবে। আমার ঠিকানা : ইসমাইলপুর, ডাকঘর-বড় শিমুলতলা, জেলা—হাওড়া। ঠিকানাটা মুখস্থ রেখে চিঠি ছিঁড়ে ফেলো।'

চিঠিটা তুহিনের ঝোলানো শার্টের বুক পেকেটে রেখে, শক্তিনাথ অন্ধকারের মধ্যেই বেরিয়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দে মেঘ গর্জন করে উঠল।

মাস দেড়েক বাদে টেলিভিশনের পর্দায় একটা খবর দেখল শক্তিনাথ। নদিয়া জেলার বাগপুর স্টেশনের কাছের বিরল গ্রামে অনেক বছর ধরে ফেরার তুহিন রুদ্র পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। তার একজন অজ্ঞাত পরিচয় সঙ্গীও ওই একই সঙ্গে নিহত। উদ্ধার হয়েছে একজোড়া অত্যাধুনিক অ্যাসল্ট রাইফেল যা দিয়ে অনেক দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা যায়। রাইফেল দুটি দুটো অ্যাটাচি কেসে ছিল।

গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হলেও শক্তিনাথ নিজের বিপদ বাড়ল, না কমল—এ চিন্তা থেকে রেহাই পেল না। তুহিনের না দেখা মেয়েটির চিন্তাও তাকে আচ্ছন্ন করে থাকল।

চেনা-অচেনার মানুষজন

শচীন দাশ

শহরে ঢুকতেই দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে শাড়ি চোখে চশমা ও কাঁধে একটা ছোটো ব্যাগ। মোড় মাথায় প্রচণ্ড ঝলমলে একটা শপিং মলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সে নিশ্চুপ রাস্তারই দিকে তাকিয়ে। আমাদের গাড়িটা দেখেই এগিয়ে এল। কিন্তু মুখ গম্ভীর। আর চোখের তারায় যেন অন্য কোনো ভাষা-ফুটে উঠেছে।

আশ্চর্য, এই শহরে আসছ একবার তো অন্তত জানাবে আমাকে! নাকি তার প্রয়োজন মনে হয়নি?

না না, ছিঃ! তা কেন হবে? দরজা খুলে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে হেনরি ততক্ষণে তার মোবাইলটা তুলে ধরেছে, তাহলে ফোন দিলাম কেন রাস্তা থেকে।

সে তো শহরে ঢুকে। আগে জানাতে কী হয়েছিল?

হয়েছিল মানে—

থাক, মানেটা আর শুনে দরকার নেই। এ শহরে এখন তোমাদের কত কবি-বান্ধবী। নিয়মিত ফোন করছ, ই-মেল পাঠাচ্ছ—

বলতে গিয়ে তার গলা বুঝি বা কেঁপে উঠল একবার। মুখ থেকে স্পষ্ট অভিমান। শেষ বিকেলের আলোয় ছেঁড়া পাপড়ির মতোই যেন বা তা ঝরে পড়বে এখন।

না না শোনো, শোনোই না।

হেনরি হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করে। বলতে বলতে একসময় বুঝি তার অভিমানকেও ছুঁয়ে যায়, আসলে যাঁদের আমন্ত্রণে এই সমুদ্র শহরে এসেছি—

থাক না তাদের কথা, কিন্তু আমাকে কি একবার জানানো যেত না?

নিশ্চয়ই যেত। কিন্তু—

কিন্তুর আর কিছু নেই। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন চলো—

কোথায়? হেনরি অবাক।

কেন আমাদের বাড়িতে। তুমি তো তিনতলাটা দেখে যাওনি। এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। ওপরে চার-চারটে ঘর। কিন্তু থাকার লোক নেই। জানালা তাই সারাদিন বন্ধ। কিন্তু যেই না খুলেছ অমনি লাফিয়ে পড়বে সমুদ্র। সমুদ্রের ওপরে নীল আকাশ। আকাশে অজস্র পাখি। জাহাজের মাস্তুল ঘিরে উড়ছে। উড়তে উড়তে হঠাৎ করেই আবার নীচের দিকে।

বাঃ! দারুণ তো?

দারুণ বলে দারুণ! আমি বলতেই তার উত্তর, একবার গিয়ে দাঁড়ালে আর চোখ ফেরাতেও পারবেন না—

কিন্তু—হেনরি কোথায়, ওরা যে হোটেলের ব্যবস্থা করেছে?

কোন হোটেল!

আল-ফয়জল—

ধুর, ওটা একটা হোটেল হল। ভেতরে অন্ধকার। সারাদিনই এখানে ওখানে আলো জ্বলে। অথচ এ-সময় আকাশে এত আলো বাতাসে এমন আমেজ...

কিন্তু ওরা যে ঘর বুক করেছে আমাদের জন্য। হেনরি বোঝায়।

কিন্তু বোঝাবার আগেই তার মুখে আলগা হাসি, সো হোয়াট। বুকিংটা ক্যানসেল করে দিচ্ছি। শামসুল আলমের অনুষ্ঠান তো! আমিই না হয় কথা বলি—

বলে নিজেই তার ব্যাগ খুলে মোবাইলটা বার করল। তারপর একসময় শামসুল আলম। কী যে কথা হল। হতেই একসময় আবার সে আমাদের দিকে।

চলুন সমস্যা নেই। কথা হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যারই তো অনুষ্ঠান। আমাদের বাড়ি থেকেই আপনাদের তুলে নিয়ে যাবে।

আর তুমি? হেনরির ঠোঁটে অচেনা হাসি, তুমি যাবে না?

যদি না যাই।

তাহলে কবিতা পড়ব না—

না পড়লে কি তোমার সম্মান বাড়বে!

কিন্তু তুমি না থাকলে...শত হলেও তো আমার পুরোনো প্রেমিকা—হেনরি হাসতে থাকে শব্দ না করে, যদিও তার স্বীকৃতি আমাকে দাওনি কোনোদিন।

কাউকে কি দিয়েছি কোনোদিন? মহিলার ঠোঁটে হালকা হাসি, কর্মসূত্রে তিনবছর তো ছিলে এই শহরে—

না, তা অবশ্য দাওনি। হেনরি হাসে, তোমার প্রেম-পিরিতি যত ওই সমুদ্রের সঙ্গে! কী পাও বলো তো?

কী যে পাই। মহিলা হঠাৎই একটু নিষ্প্রভ। তারপরেই কী মনে পড়ায় গাড়ির জানলায় ঝুঁকে পড়ল, এটা কিন্তু ঠিক হল না। তুমি কিন্তু এখনও তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাওনি—.

কথাটা হেনরিকে। ফলে লজ্জিতও হয়ে পড়ল হেনরি. এই দেখ তাই তো—

বলে পরিচয়টা করিয়ে দিল আমাদের সঙ্গে। দিয়েই তারপর, আর এই হল শেলি। শেলিনা আখতার মহুয়া। আপনারা ওকে মহুয়াও বলতে পারেন। কিংবা শেলিনা। তবে আমি কিন্তু ডাকি শেলি বলে। কখনও কখনও শিলু। অথবা সমুদ্রকন্যা।

সমুদ্রকন্যা! বাহ্ বেশ তো—

এই রে! সুমনদার কি ভালো লেগে গেল নামটা? হেনরি বলতেই হেসে ফেললাম, তা লাগবে না কেন। ওর চোখের গভীরেই তো সমুদ্র। তাতে কত ঢেউ কত রঙ...

বাস হয়ে গেল। হেনরির দেখি মাথায় হাত, ছিলাম একজন এখন আরও একজন এসে জুটল। জানো তো শেলি—

গাড়িতে উঠে শেলিনাকেও তুলে নিয়ে হেনরি বলল, এই সুমনদা যেখানে যেখানে গেছেন সেখানেই মেয়েরা পাগল। কিন্তু সুমনদা এতই নিরাসক্ত...

নিরাসক্তিই তো ভালো। জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে। বলতে বলতেই শেলিনা মুখ ফেরাল সামনে থেকে, আপনি সমুদ্রকে ভালোবাসেন না?

খুউব। ইন্ডিয়ার প্রায় সব সমুদ্রেই আমি গেছি—

আমিও।

আপনিও?

হ্যাঁ। পুরী বলুন গোপালপুর বলুন কোভলম বলুন জুহু বলুন কিংবা ওই দিঘা...

তাই নাকি! আশ্চর্য তো—

এতেই আশ্চর্য হলেন। হেনরি শুনছিল। শুনতেই বলল একসময়, এরপরে যদি চাঁদে সমুদ্র আবিষ্কৃত হয় শেলিকে দেখবেন সেখানেও গিয়ে হাজির হয়েছে সে। আমি তো ভেবেছি এবারে একটা কাজ করব—

কী কাজ!

ভাবছি সমুদ্রের সঙ্গেই ওর বিয়েটা দিয়ে যাব—

কিন্তু সমুদ্র তো কিছু গ্রহণ করে না। বললাম। বলতে গিয়েই দেখি শেলি মুখ ফিরিয়েছে আবার আমার দিকে, সত্যি!

তিন সত্যি!

কেন?

এই কেন-র উত্তরটা এখানে দেওয়া যাবে না—

তা হলে আমাদের বাড়িতে—শেলির চোখে বিস্ময়, জানলা খুললে সমুদ্র যখন লাফিয়ে পড়বে ঘরের মেঝেতে। সমুদ্র যখন হয়ে উঠবে নীল।

ঠিক উঠল তাই। জানালা খুলতেই সমুদ্র যেন ঘরের ভেতরে। সেই সঙ্গে তার ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় ফেনার পুঞ্জ। পুঞ্জরা এসে ফেটে গিয়ে আবারও কখন ঢেউয়ের বুকে।

মগ্ন হয়েছিলাম। শেলি এসে জানাল, ছাদে গেলে আরও কিন্তু সুন্দর। সমুদ্র তখন যেন বুকের ভেতরে উঠে আসে। তারপর কত যে কথা।

সে কথার অর্থ বোঝেন!

শেলি চুপ। চুপ করেই যেন সমুদ্র ঢেউয়েই ডুবে যায়।

রাতে অনুষ্ঠান সেরে ফিরেছি। খাওয়ার পর শেলিনা বলল, আর কাউকেই বলছি না। শুধু মধ্যরাতে আপনি জেগে থাকবেন। থাকবেন তো?

তো থাকতে পারি। কিন্তু কেন?

শেলিনার কণ্ঠে চাপা স্বর, একটা জিনিস দেখাব—

সেই দেখাতেই যেন ঘরে টোকা পড়ল। আমি উঠলাম। উঠে দরজা খুলতেই দেখি শেলি।

আসুন। তবে শব্দ করবেন না—

না-শব্দ করেই শেলিনার পেছনে পেছনে ছাদে উঠলাম। এবং উঠতেই এক আলাদা পৃথিবী। অসংখ্য নক্ষত্রমালার নীচে কারা যেন কথা বলছে। আর সেই সঙ্গে প্রবল বাতাস।

কারা ওখানে কথা বলে শেলি?

ওই তো আকাশ আর সমুদ্র এখন এক হয়েছে—

হয়ে কী বলছে?

কী বলছে শুনুন—.

যেন শোনার জন্যই এগিয়ে গেলাম আরও সামনে। দূরে আলো। জাহাজের মাস্তুল। তারও পরে অসীম আকাশ। এই মুহূর্তে নেমে এসে বুঝি কী কথা বলছে।

ওখানে যাওয়া যায় না শেলি?

যাবেন! শেলি যেন উত্তেজিত, তাহলে কালই চলুন। পতেঙ্গায় নিয়ে যাই আপনাকে। নিয়ে যাব কৌজদার হাটে।

কিন্তু ওরা যদি যেতে না চায় সেখানে—!

ওরা না গেলে শুধু আমি আর আপনি। যাবেন না?

বললাম, নিশ্চয়ই যাব—

একটু চুপ। চুপ করে যেন সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে রইল শেলি। একসময় আমি কী ভেবে শুধোলাম, আচ্ছা শেলি?

শেলি তাকাতেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম, এত সবাই থাকতে তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন।

কেননা আপনার ভেতরে একটা সমুদ্র আছে। আর আমি তাকে আবিষ্কার করতে পেরেছি—

বলব না বলব না করেও হঠাৎ বলে ফেললাম, আচ্ছা শেলি...একটা কথা জিজ্ঞেস করব। যদিও জিজ্ঞেস করাটা উচিত হবে কিনা জানি না...কেননা আজই সবে পরিচয়...

অন্ধকারেই বুঝি সামান্য হাসল শেলি, এম্মা। একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন তার জন্য এমন সঙ্কোচ কেন। বলুন না?

একটু থেমেই বললাম, তুমি কখনও প্রেমে পড়োনি?

শেলি চুপ। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। এমনকি এ-প্রশ্নের উত্তরও দিল না। অন্ধকারে শুধু সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে রইল।

এভাবে কত যে সময় গেল। কত পল। কত মুহূর্ত। এক সময় নিজেরই আমার খারাপ লাগল। কেন যে প্রশ্নটা করতে গেলাম। একসময় থাকতে না পেরে যখন কিছু একটা বলতে যাচ্ছি সেই সময়েই শেলি।

চলুন রাত অনেক হল। কাল আবার পতেঙ্গায় যেতে হবে না?

নিঃশব্দ শেলিনার পেছনে পেছনেই চলে এলাম। এসেই আবার নিজের ঘরে। কিন্তু শুয়ে পড়েও ঘুম এল না। বারবারই চোখের ওপর শেলির মুখ। মুখখানা সরছে ও সরে যাচ্ছে। সরতে সরতে আবারও কখন আমার সামনে। একসময় দেখি সরে এসে সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সুগোল ফর্সা ও চাঁপার কলির মতো আঙুল তাতে। আমি তার হাতটা ধরলাম। ধরতেই শেলি দৌড়াল। চলো, চলো না সুমন। চলে এসো—

কোথায়?

যেখানে আকাশ ও সমুদ্র মিলেছে। দেখবে না তুমি?

হ্যাঁ, দেখব তো। কিন্তু এত জোরে দৌড়ুলে...তোমার পায়ের পাতা যে পাথরে থেঁতলে যাবে?

যায় যাক। তবু তো দেখতে পারব। দেখব, আকাশ কী করে সমুদ্রকে গ্রহণ করছে—

শেলি দৌড়ুচ্ছে যেন হরিণীর মতো। কিন্তু যেতে যেতে হঠাৎই হাত ছেড়ে গেল। আর তারপরেই দেখি শেলি নেই। শেলি। শেলিনা? আমি চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না। অথচ একটু আগেই ছিল সে। তখন আমি চারপাশে তাকাতে তাকাতেই হঠাৎই যেন আবিষ্কার করলাম মাঝ সমুদ্রে সে। শেলি... শেলি...শেলিনা...চিৎকার করতে করতে আচমকা আবিষ্কার করি কেউ যেন আমার গলা চেপে ধরেছে। আমি গলাটা ছাড়াতে যাচ্ছি কিন্তু পারছি না। অবশেষে কেউ যেন এক ধাক্কায় আমাকে ফেলে দিল সমুদ্রের মাঝে। আর ওই তখনই খেয়াল হতে দেখি কোথায় সমুদ্র আর কোথায়ই বা শেলি। হেনরি এসে আমাকে ধাক্কা মারছে, কী দাদা উঠবেন না। আজ আমরা যে পতেঙ্গা যাব—

পতেঙ্গার কথায় ধড়মড় করে কখন উঠে বসলাম। বসতেই দেখি দরজার মুখে শেলির আব্বু।

কী ঘুমটুম হল তো সবার?

হ্যাঁ হ্যাঁ। এত চমৎকার পরিবেশ। আমার তো ইচ্ছেই করছে না এই জানালা ছেড়ে নড়তে—

এখানেই এমন, পতেঙ্গায় গেল বোধহয় ফিরতেও ইচ্ছা করবে না।

করছিলও না। বোল্ডারের পর বোল্ডার পার হয়ে চৌকো পাথরের টুকরোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে শুধু সমুদ্রের কাছে গেছি। ওই যেখানে কর্ণফুলি গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। বা সমুদ্র যেখানে গিয়ে আরও গভীর সমুদ্রে।

শেলি বলল, এখন তো একরকম। দুপুরে দেখবেন আর এক রকম। আর বিকেলে যা দেখবেন সন্ধের পর থেকে তা আবার আলাদা। তবে সবচেয়ে ভালো হয় মধ্যরাতে এসে দাঁড়ালে—

কেন!

বারে, তখনই তো আকাশ ডাকে সমুদ্রকে। এবং সমুদ্রও তাতে সাড়া দেয়। কিন্তু কেউ জানে না কেউ বোঝে না—

লাফাতে গিয়েই, এক বোল্ডার থেকে অন্য বোল্ডারে পৌঁছুতে সময়ের সামান্য হেরফের ঘটে গিয়েছিল আর তাতেই পড়ে যাচ্ছিল বুঝি শেলি। আমি প্রায় লাফিয়েই তাকে ধরে ফেললাম।

শেলি, মধ্যরাতে আকাশ ও সমুদ্রের মিলন কি তুমি দেখেছ?

আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়েই আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে শেলি। খুবই চাপাস্বরে বলে তারপর, দেখিনি তবে দেখার ইচ্ছেটা বড়ই প্রবল—

তোমার মুখে শুনে আমার ভেতরও সে ইচ্ছে জাগছে। দেখাবে আমাকে?

দেখবেন? শেলির চোখজোড়া যেন মুহূর্তেই ঝিকিয়ে ওঠে, পতেঙ্গায় আমার খালা আম্মার বাড়ি আছি। এখানে এসে না হয় থাকব। তারপর মধ্যরাতে উঠে এসে...

বলতে বলতেই যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল সে, অবশ্য আপনি কালই চলে যাবেন—

তাতে কী হল, তুমি ডাকলেই চলে আসব।

সত্যি।

আবারও তিন সত্যি। কিন্তু—

শেলিনা অবাক, তাহলে আবার কিন্তু কেন?

আমাকে আর আপনি বলা চলবে না—

শেলির মুখটা লজ্জায় লাল। চোখের কোণে যেন ভীরু নম্রতা। চোখে ফিরিয়ে সমুদ্রে দেখতে দেখতে আবারও যখন আমার দিকে তাকাল তখন পেছনে হেনরিদের চিৎকার।

দাদা ফিরে আসুন,। নাহলে দেরি হয়ে যাবে—

দেরি বুঝি হয়েই ছিল খানিকটা, তবু মধ্যরাতে দরজায় টোকা পড়তেই আমি সজাগ। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম। তারপর আবারও শেলির পেছনে সিঁড়ি ধরে। এরপর নক্ষত্রখচিত সেই আকাশ। নক্ষত্রমালা নিয়ে সমুদ্রের বুকে নেমে আসার অপেক্ষায়।

দেখেছেন?

উহুঁ—।

কেন। শেলি থমকে তাকাল যেন অন্ধকারে।

বলেছি তো। এরপর থেকে আর আপনি নয় তুমি—

অন্ধকারেও শেলির মুখে নিশ্চয়ই রঙ উঠে এসেছে প্রবল লজ্জায়। শেলি তাই চুপ। চুপ করেই যেন দূরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

একসময় আমিই বললাম, স্যরি শেলি। খুবই দুঃখিত। আমার এভাবে এগোনোটা বোধহয় ঠিক হয়নি—

না না, নাহ্। শেলি মুহূর্তেই চাপা আর্তনাদে ফেটে পড়ল, কেন এমন করে আমাকে বলছ। আমি তো...

শেলি থামতেই ওর হাত একটা তুলে নিলাম নিজের হাতে।

তোমাকে যখন কাল সকালে প্রথম দেখি তখনই আমার ভেতরের আকাশটা নির্মেঘ হয়ে গেল। আর হতেই সে আবিষ্কার করল এক সমুদ্রকে।

আমিও তো তাই। ফিসফিস করে বলল শেলি, তাই তো এমন করে মধ্যরাতে তোমাকে সমুদ্র দেখাই। কিন্তু—

বলতে গিয়েই যেন চোখজোড়া ছলছল করে উঠল শেলির। আমি ওর হাতে চাপ দিলাম আলতো করে। শেলি যেন কেঁপে উঠল একটু। উঠেই সে চোখ ফেরাল আমার দিকে। এবং অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে রইল। তারপর কী যেন হল, নীরবে অন্ধকারেই ওকে দেখতে দেখতে ওর ঠোঁটের কাছে আমার ঠোঁট জোড়া নিয়ে গেলাম। গভীর চুম্বনের পর ওর স্তনে হাত রাখতে গেছি সেই সময়েই আচমকা এক বিস্ফোরণ।

নাহ্, না না—না—প্রচণ্ড আর্তনাদে আমার আলিঙ্গন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে প্রায় উন্মাদের মতোই সে নেমে গেল সিঁড়ি ধরে।

অনেকক্ষণ, প্রায় অনেকটা সময় নিয়েও অন্ধকারে এরপর দাঁড়িয়ে থেকেছি আমি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখেছি। কখনও দূরের সমুদ্র। এরপর কখন যে নেমে এসেছি,

কখন যে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছি জানি না। টের পেলাম সকালে উঠে। চোখজোড়া তখন করকর করে জ্বলছে।

সকালে বেড-টি দিয়েছিল। চা খেয়ে বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে যখন বেরিয়েছি তখনও শেলির দেখা নেই। ভাবলাম, আমার আচরণে বোধহয় খুবই ব্যথিত সে। মাত্র দু'দিনের পরিচয়। তাতে এমন শ্বাপদের মতো এগোনোটা ঠিক হয়নি। যাওয়ার আগে তাই একবার ক্ষমা চেয়ে নেব। আমি যে অনুতপ্ত তা অন্তত ওকে জানানো দরকার।

কিন্তু শেলি কোথায়। সারা ঘর খুঁজেও শেলিকে কোথাও পাওয়া গেল না। ভাবলাম, যাওয়ার আগে নিশ্চয়ই দেখা হবে একবার। কিন্তু কোথায় কী। শেলি কোথায়ও নেই।

কী হল বলুন তো। মেয়েটা গেল কোথায়?

হেনরি বলতেই রাশেদ জানালেন, মেয়েটা ওই রকমই। ভীষণ আবেগপ্রবণ—

কিন্তু আমাদের যে এখন যেতে হয়। পরশু এঁরা ইন্ডিয়ায় যাবেন। একবার যদি দেখা হত।

হ্যাঁ তা তো ঠিকই—

কথার মাঝখানেই শেলির আম্মা এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে লক্ষ করেই রাশেদ শুধোলেন, কোথায় গেল বলো তো?

কী জানি বলল তো আসছি—

তাহলে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। হেনরি বলতেই আমরা আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু সকাল পার হয়ে বেলা ন'টা নাগাদও যখন এল না তখন আর অপেক্ষারও বুঝি সময় নেই। অগত্যা শেলির আব্বু-আম্মার কাছে বিদায় নিয়েই বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু সীতাকুণ্ড পার হয়েছি কি হইনি হেনরির মোবাইলটা শব্দ করে বেজে উঠল।

ভাইয়া, একবার কথা বলা যাবে?

নিশ্চয়ই যাবে। আর কার সঙ্গে কথা বলতে চাইছ তা আমি জানি। ধরো—

বলেই উড়ো ফোনটা আমার দিকে।

আমি ধরলাম। ধরতেই সেই আবেগমথিত গলা, খুবই দুঃখিত। শেষ সময়ে দেখা হল না—

কোথায় গিয়েছিলে?

কোথাও না। বাড়িতেই ছিলাম। ছাদে—

তা ছাদ থেকে নেমে এলে না যে।

পারলাম না—

আমার তো ভয় হল...

না না, ছিঃ-ছিঃ...তা কবে আবার দেখা হবে?

যেদিন তুমি ডাকবে—

সত্যি তো?

আবারও সেই সত্যি। তিন সত্যি।

আমি তোমাকে ই-মেল দিব—

আমিও।

ভালোবাসা নিও। ভালো থেকো।

তুমিও—

একবার তাহলে ভাইয়াকে দাও—

ফোনটা ফেরত দিলাম। আর দিতেই কত কথা। একসময় কথা শেষ হলে হেনরি তাকাল আমার দিকে, দাদা গোটা চট্টগ্রাম যার মনকে ছুঁতে পারেনি আপনি তা ধরে এলেন—

চমকে উঠেছিলাম। তারপরেই আবার সংযত, কিন্তু আমি তো...

আপনি তো কিছুই বলেননি আবার বলেছেনও অনেক কিছু—

কী যে বলেছি আর কী যে বলিনি কিছুই জানি না। সারাটা রাস্তা তাই চুপ করে রইলাম। এবং নিশ্চুপ থাকতে থাকতেই একসময় ঢাকা। পরের দিন ঢাকা ছেড়েই কলকাতা।

কিন্তু কলকাতায় ফিরেছি কি ফিরিনি এই সময়েই মোবাইলটা বেজে উঠল।

ঠিকমতো পৌঁছেছ তো?

পৌঁছেছি জানাতেই তার উত্তর, একবার ই-মেলটা খুলো—

খুললাম। এবং খুলতেই দেখি সমুদ্রের কথা আকাশের কথা এবং আমাদেরই কতকিছু। জানিয়েছে, এবারে হয়নি আগামীতে সে আমাকে নিয়ে যাবে ফৌজদারহাট বীচে। তারপর মধ্যরাতে উঠে এসে দাঁড়াব একসময় সমুদ্র-সৈকতে। দেখব সমুদ্র-আকাশের মিলন মুহূর্ত।

উত্তরটা দিলাম তখনই। আর দিতে না দিতেই আবারও চিঠি। উত্তর একটা দিলাম তখন আবারও। এবং এরপরেই মধ্যরাতের এক দীর্ঘ ফোন।

দিন গেল এভাবেই। ফোন আসে কথা বলি। ই-মেল আসে উত্তর দিই। দিতে দিতে হঠাৎই এক রাতে এক ব্যাকুলস্বর, একবার আসবে। বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে...। দেরি কোরো না—

দেরি করলাম না। তবু কী করে কী করে যেন দেরি হয়ে গেল। অফিসের ছুটি, ভিসা মঞ্জুর এসবের বেড়ি পার হয়ে যখন এক বিকেলে গিয়ে দরজায় বেল দিয়েছি সেই সময়েই দেখি শেলির আম্মা। আমাকে দেখেই যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লেন, সেই এলে বাবা যদি আর দিন পাঁচেক আগেও এসে পৌঁছুতে—

কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে লাগলেন, যাওয়ার আগে কত যে তোমার কথা বলছিল।

আমি স্তম্ভিত। কী যে বলব। শেলি নেই। শেলি, শেলিনা চলে গেল? কিন্তু...

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। কান্না সামলে কান্না ভাঙা গলায়ই বললেন আম্মা, ভেতরে এসো।

কিন্তু যাব কী, আমার পায়ের পাতা যেন দরজার মুখেই ভারী হয়ে গেঁথে গেছে তখন। তবু কোনোরকমে ভেতরে ঢুকতেই দেখি একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। অনন্ত সাগরের সামনে শেলি দাঁড়িয়ে আছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। এই সময়ই কে আমার পেছনে বলল। ধরা পড়েছিল বছর তিনেক আগেই। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। এমনকি লন্ডনে নিয়ে গিয়ে

লেফট ব্রেস্টটা অপারেট করিয়ে কৃত্রিম ব্রেস্টও লাগিয়ে আনিয়েছি। তবু কি টের পেয়েছিলাম ডানদিকেরটাও...

মুহূর্তে চমকে উঠলাম। উঠতেই মনে পড়ল, সেই রাতে আমি কামনা-তাড়িত হয়ে তো তার বাম স্তনেই প্রথম হাত রাখতে গিয়েছিলাম। আর ওই তখনই ছিটকে পালিয়ে গিয়েছিল শেলি, চাপা এক আর্তনাদে।

ব্যাগটা নীচে ছিল। তুলে কাঁধে নিয়ে ফিরতেই শেলির আব্বা। বাধা দিলেন। — এখন কোথায় যাবে। আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাও না বাবা—

না না। পারব না। পারব না—এ আমি কিছুতেই পারব না।

প্রবল আর্তনাদে ফিরতেই রাশেদ বললেন, তুমি না বলেছিলে সমুদ্র কিছুই নেয় না। সবই ফিরিয়ে দেয়। শেলি কি তাহলে...

উত্তরটা দিলাম না। দিতে পারলাম না। তবে পারার জন্যই বুঝি একসময় বেরিয়ে পড়লাম। এখন আমাকে একবার সমুদ্রের কাছেই যেতে হবে। গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে একবার। অন্তত ততক্ষণ, যতক্ষণ না সমুদ্র ও আকাশ পরস্পর মিলিত হচ্ছে সেই মধ্যরাতে। শেলি এরকমই না বলেছিল আমাকে।

আনডারগ্রাউন্ড

কিন্নর রায়

না, না। ও আবার কবে ওসব করল।

যতটা বলে, ততটা বোধহয় না।

বাড়িয়ে বাড়িয়েই বলে নিশ্চয়। বিশেষ করে জেলটেল—

সুমিত ভট্টাচার্য, ফিফটি ফোর প্লাস, জন্ম ১৯৫৩-র ৬ নভেম্বর, বাংলা বিশে—মানে কুড়ি কার্তিক। স্কুলে দুমাস কমান ছিল। খুঁটিয়ে বললে, পাকা দু মাস নয়। দু মাস পনের দিন। হায়ার সেকেন্ডারির অ্যাডমিট কার্ড অনুযায়ী ১৯৫৪-র ২১ ফেব্রুয়ারি। বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করার সময় বাবা অময় ভট্টাচার্য এই বয়স কমানর ব্যাপারে কি ভেবেছিলেন? সুমিতের সুবিধে হবে সরকারি চাকরি পেতে? এখন যা অবস্থা গভর্মেন্ট সার্ভিসের। দেরি হবে রিটায়ারমেন্টের। অময় ভট্টাচার্য সুমিত ভট্টাচার্যের বয়স কমালেন তো শুধু মাত্র দু মাস পনের দিনই কমালেন কেন? আড়াই মাস বাড়া-কমায় কি এমন যায় আসে? না কি এটুকুর বেশি কমিয়ে দিলে বয়সের যে হিসেব আসে, তাতে ভর্তি হওয়া যেত না তৃতীয় শ্রেণীতে, হয়ত তাই হবে। কিংবা হবে না। যেমন কি না ১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারিতে খাদ্যের দাবিতে, পূর্ণ রেশনিংয়ের দাবি নিয়ে বালি বঙ্গ শিশু বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে যে লেভেল ক্রসিং, সেখানে লাইনের ওপর বসে ট্রেন আটকে দিল সুমিতরা। সুমিত তখন ক্লাস নাইন। নাইন সি। কমার্স নিয়ে পড়তে পড়তে চারপাশের সমাজ, রাষ্ট্র, অভাব, হাহাকার, ক্ষুধাবোধ—তখন খুব রাগ হত।

লেভেল ক্রসিংয়ের ওপর বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বসে পড়েছিল। হাতে হাতে রঙ তুলিতে লেখা প্ল্যাকার্ড—খাদ্যের দাবিতে রেল রোখো চলছে চলবে। নিশ্চিন্দা, ঘোষপাড়া এলাকার আংশিক রেশনিংয়ের বদলে পূর্ণ রেশনিং চালু করতে হবে। দিকে দিকে চাল-গমের দাম বাড়ছে কেন কংগ্রেস সরকার জবাব দাও। এরকম আরও অনেক ছোট ছোট প্ল্যাকার্ড হাতে হাতে। ছাগলের লোমের তুলিতে বাড়ির আলতায় সান্ধ্য গণশক্তির পাতার ওপর এক লিপি কুশলতার মহোৎসব।

হাতের লেখা সুমিতের বরাবরই চমৎকার। অবশ্য একদিনে তো সেটা হয় নি। মা হেমন্তবালা ভট্টাচার্য সুমিতকে রোজ দু পাতা বাংলা, দু পাতা ইংরেজি—এভাবে অভ্যাস করিয়েছেন, যাতে তার লেখার ছাঁদ ক্রমশ মুক্তো যেন হয়ে ওঠে। সুমিতকে হাতের লেখা করতেই হত, মায়ের ভয়ে। না হলে তালপাতায় তৈরি পাখার বাঁট, কাঠের স্কেল, লোহার খুন্তি বা সাঁড়াশি যা হাতের কাছে পাবেন মা, সেটাই প্রহারের অস্ত্র হিসেবে আছড়ে পড়বে সুমিতের পিঠে, হাতে, পায়ে। ফলে দুই দুই চার পাতা হাতের লেখা মাস্ট।

রেল লাইনের এপারে বালি, ওপারে নিশ্চিন্দা। একটা মাত্র ট্রেন লাইন আর লেভেল ক্রসিংয়ের ফারাক। কিন্তু ঘোষপাড়া, নিশ্চিন্দা, দুলেপাড়া, সাঁপুই পাড়ার মানুষ এখনও কেমন

ফাঁকেয় ফাঁকায়। অনেক মাঠ, পুকুর, ধানখেত, মাটির বাড়ি। মাটির দেওয়াল, টালির চাল, মাটির দেওয়াল খড়ের চাল—হামেশাই চোখে পড়বে। এ ছাড়া আছে, পালপাড়া। পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে আসা কয়েক ঘর কুমোর এখানে থাকেন। সেখানে সারা বছরই দেব-দেবী মূর্তি তৈরি করেন পালমশাইরা। এ পাড়ার যিনি সব চেয়ে বৃদ্ধ—সেই বুড়ো পালমশাই গলায় কৃষ্ণনামের কণ্ঠী নিয়ে খালি গায়ে বসে থাকেন তাঁর উঠোনের কুলগাছতলায়। শীতের দিনে গায়ে বড়োজোর একটি বাড়িতে কাচা, প্রায় লালচে হয়ে ওঠা বুককাটা ফতুয়া। তাঁর মাথাটি কদম পুষ্প। গায়ের রঙ বহুদিনের প্রাচীন তামার বাসন বড় কাঠের সিন্দুকের অন্ধকার গহ্বর থেকে বার করলে যেমন হয়, অনেকটা যেমন তেমনই—কল্ পরা। চোখে ভালো ঠাওর হয় না এখন। বিশেষ করে রাতে। পেছনে অনেকেই বলে, রাতকানা বুড়ো। কিন্তু সামনা সামনি সে সব বলার সাহস কোথায়।

পালমশাই ঘন ঘন বিড়ি খান। শাদা সুতোর থানি বিড়ি। দু-চার টান দিয়েই ফেলে দেওয়া যায় মাটিতে। তবে বেশ কড়া। টানলে ধক লাগে। শুধু তো দেবতার মূর্তি নয়, মাটির ভাঁড়, গ্লাস, ফুল গাছ লাগানর টব, হাতে আঁকা লক্ষ্মীসরা—যা কিনা কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় পুজোর জন্য বসান হবে অনেক ঘরে, বিশেষ করে বাঙাল বাড়িতে। তা পালমশাইও তো বাঙাল। তাঁরও তো ফেলে আসা দেশ সেই পদ্মাপার। আর লক্ষ্মীসরাও কি এক রকমের, এক ডিজাইনের না কি। তাই পালমশাই জানেন লক্ষ্মীসরা কত রকমের হয়—তিনপুতলা—মাঝে কমলা—পদ্মের ওপর। দু পাশে শাড়ি পরা ট্যাপা টোপা জয়া-বিজয়া। পায়ের কাছে পেচক বাবাজি। আবার একা একাও আছেন লক্ষ্মী ঠাইরেন। গোটা সরাটি জুড়ে তিনি। একেবারে পায়ের গোড়ায় প্যাঁচা মহারাজ। এ ছাড়াও মা দুর্গা সমেত লক্ষ্মী। নারায়ণ আর লক্ষ্মীর যুগল মূর্তি—সবই আছে। পালমশাইকে আঁকতে হয় এ সবই। আজকাল—কয়েক বছর হল চোখের দৃষ্টি পড়ে আসছে। হাতের আঙুল ঠিক ঠিক নড়ে না। সবাই বলে, বয়েস। তুমি বুড়ো হইছ না।

তবু পালমশাই কাজ করে যান। কাজের মধ্যে না থাকলে শরীর, মন—কোনোটাই জুতের থাকে না। নিজেকে কেমন যেন বাতিল আর সংসারের বোঝা মনে হয়। যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে চাল, ডাল অন্য সব জিনিসের দাম বাড়ছে, তাতে আয় ইনকামের রাস্তা ঠিকমতো খোলা না রাখলে বিপদ আছে। চালাব কি করে? বারো চোদ্দটা, পেট, দুবেলা হাঁ করে আছে। সেই সঙ্গে জল খাবার। কোথা থেকে জোগাড় হবে। ভরসা বলতে তো এই সিজিনের ঠাকুর গড়া। ব্যস। সেইসঙ্গে হাঁড়ি-পাতিল, নেমতন্নবাড়ির গ্লাস, মুসলমান বাড়ির সানকি, তাতে কতটুকু কি হবে।

নিজেদের বাড়ির উঠোনে ঝাড়াল কুলগাছের গাঢ় ছায়া নেমে এসেছে রোদ্দুর আড়াল দিয়ে। খড়ের কাঠামোর ওপর তুষ, খড়-কুচো মাটি দিয়ে একমেটে হয়ে গেছে। তার ওপর দোমেটে। দোমেটে হওয়ার পর মাটি বসিয়ে বসিয়ে, লেপে পুঁছে খাঁজ-খোঁজ, ফাটা-ফুটো রিপেয়ার করতে করতে ফিনিশিং টাচ।

কুলের ছায়ায় বসে বসে মুণ্ডহীন সরস্বতী প্রতিমাদের দেখতে দেখতে পালমশাইয়ের

ভেতরটা কেমন যেন ছমছম করে ওঠে। রোদ্দুরের রঙ শুষে নিতে নিতে ছাঁচে বানান কাঁচা দেবীমুখেরা কাঠের পাটার চুপচাপ শুয়ে। এইসব মুখ বসে যাবে কবন্ধ প্রতিমার ওপর।

দেবীদের হাতের চেটো, আঙুল—কিছুই নেই এখন। সে সবও আলাদা আলাদা তৈরি করে লাগাতে হবে। কেবল তাদের টুন্ডা হাতের সঙ্গে শাদা টোন সুতো, নয়ত পাতলা সুতলি দড়ি দিয়ে ঝোলান বায়নাপত্র। বালি সুহৃদ সংঘ—বায়না ১০ টাকা। প্রতিমার মূল্য ১৩০টাকা। বালি নবীন সংঘ—বায়না ১৫ টাকা। প্রতিমার মূল্য ১২৫ টাকা। নিশ্চিন্দা যুবক দল—বায়না ১০ টাকা। প্রতিমার মূল্য ৭০ টাকা। ঘোষপাড়া বালক সংঘ—বায়না ১০ টাকা। প্রতিমার মূল্য ৯০ টাকা।

ঠাকুর কেনা-বেচায় অনেক দরাদরি হয়। কোনো কোনো ক্লাব বায়না করেও প্রতিমা নিয়ে যায় না। তবে সে ঘটনা খুবই কম ঘটে। শেষ মাঘের হাওয়ায় সরস্বতীর ফিনিশ না হওয়া হাতে বেঁধে রাখা বায়নার কাগজেরা ফরফর ফরফর করে ওড়ে। দূরে রোদমাখা সব প্রতিমা-মুখ নিজেদের শুকিয়ে নিতে চায় তাড়াতাড়ি, নইলে তো মহা বিপদ হবে পালমশাইয়ের।

পুরো রেশন চালু থাকলেও নয় একটা কথা ছিল। খানিকটা সুসার হত সংসারে। চালটা, গমটা, চিনি। মাইলোও দিচ্ছে এখন। ভুট্টার দানা। পাউরুটির ডিউ সিলিপ—সব মিলিয়ে বারো চোদ্দটা হাঁ-মুখ আর পেটের খোলে যে ধিকি ধিকি আগুন, তাতে তো খানিকটা ঢাকা চাপা দেওয়া যায়। কিন্তু সে আর হচ্ছে কই!

লেভেল ক্রসিংয়ের গা-ছোঁয়া রেল লাইনের ওপর বসে পড়ে নিশ্চিন্দার পালপাড়ায় পালমশাইয়ের বাড়ির উঠোনের ছবি একটা জ্যান্ত ফটোগ্রাফ হিসেবে হঠাৎই হাজির সুমিতের সামনে। ট্রেনরা—মানে লোকাল ট্রেন তো বটেই, দূর পাল্লার কোনো ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে।

সুমিতরা লাইনের ওপর থেবড়ে বসে পড়ে স্লোগান দিচ্ছে—

কংগ্রেস সরকার নিপাত যাক

সঙ্গে সঙ্গে এ কথায় তাল মিলিয়ে এক সুরে বলে উঠছে অনেক কণ্ঠ—নিপাত যাক। নিপাত যাক।

দুর্ভিক্ষ, অনাহার সৃষ্টিকারী কংগ্রেস সরকার হুঁশিয়ার
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার
দিকে দিকে মানুষ অনাহারে মরছে কেন কংগ্রেস সরকার জবাব দাও
জবাব দাও। জবাব দাও।
মজুতদার হুঁশিয়ার
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার
কালোবাজারি হুঁশিয়ার
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার
অবিলম্বে সমস্ত রাজ্য জুড়ে ফুল রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে

করতে হবে, করতে হবে
পি এল ৪৮০ চুক্তি বাতিল কর
বাতিল কর বাতিল কর
ভুখা জনতা করে পুকার
ইনক্লাব জিন্দাবাদ

বালি আর ঘোষপাড়ার লেভেল ক্রসিংয়ে ডিউটিতে থাকা গ্যাংম্যান নানকু মাথায় গামছা বেঁধে দাঁড়িয়ে। ধুতির ওপর গ্যাংম্যানের নীল হাফ শার্ট। দু হাতে রেল কোম্পানির লাল আর সবুজ ঝাণ্ডা। লাইন ক্লিয়ার আর ক্লিয়ার না থাকার সংকেত-রং। লেভেল ক্রসিংয়ের লাল আলো এখনও বাঘের চোখ হয়েই জ্বলছে। লাইনের ডিসট্যান্ট পোস্টে সব সিগন্যালই রক্তবর্ণ। এপার থেকে ওপারে যাতায়াত করা সাইকেল, সাইকেল রিকসা, গো-গাড়ি—সবই আটকে গিয়ে মস্ত এক জট তৈরি করে হাঁপাহাঁপি করছে যেন।

লোহার গেট ফেলা আছে দু দিকেই। তার এপারে ওপারে মজা দেখা পাবলিক। মাথার ওপর রোদ চড়ছে। তবে শেষ শীতের রোদ্দুর তেমন মারাত্মক কিছু নয়। বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ের ক্লাস সিক্সের অঙ্ক স্যার রবি ঘোষ—যাকে কি না অনেকেই আড়ালে বলে থাকেন বেঁটে রবিদা, তিনি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে। সরু পাড়ের মিলের ধুতি। তার ওপর বাংলা কাটিং ছিটের ফুলশার্ট। পায়ে খয়েরি আলবার্ট। মাথার চুল বেশ ছোট করে ছাঁটা। চোখের মণিতে বেড়াল।

সুমিতের মনে পড়ল এই রবি ঘোষই স্কুলে অঙ্কের ক্লাস নিতে নিতে মাঝে মাঝেই অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে অতুল্য ঘোষকে অবলীলায় 'কানাদা' বলে নিজের বাক্যের মধ্যে বসিয়ে দিতে পারেন। কিংবা মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে কাঁচকলাবাবু। একটু আগেই ওঁর গায়ে একটা নস্যি রঙের র‍্যাপার ছিল। সেটা খুলে হাতে পাট করে রেখেছেন।

গ্যাংম্যান নানকু কি ভেবে যে স্লোগান দেওয়া ভিড়ের কাছে এসে কাকে যেন বলে, মাস্টারবাবু চায় পিবেন?

বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ের কাছে রবি ঘোষ চা খাবে কি না জানতে চাওয়া হল, তারও তো নানকুর অবস্থাই প্রায়। নানকুর যেমন সাহস নেই, নাটাপানা, গোরা গোরা সা মাস্টারবাবুকে চায়ের কথা জিজ্ঞাসা করার, এই ছেলেটির তো একেবারেই নেই।

স্লোগান উঠছে পর পর।

আকাশে জলহীন সাদা মেঘের এপাশে ওপাশে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে গোটা তিনেক ফিচেল ঘুড়ি। সকাল সকালই কারা যেন ঘুড়ি বেড়ে বসে আছে। মজা মন্দ নয়। আর কদিন পরই সরস্বতী পুজো। বালি, উত্তরপাড়া, বেলুড়, খড়দা—সর্বত্র সরস্বতী পুজোয় ঘুড়ি ওড়ে। কলকাতায় যেমন ঘুড়ির মহোৎসব বিশ্বকর্মা পুজোকে ঘিরে, তেমন নয়।

ট্রেন লাইনের ওপর বসে বসে স্লোগান দিতে দিতে সুমিত ভট্টাচার্যের কেন জানি না নিশ্চিন্দা পালপাড়ার বুড়ো পালমশাইয়ের মুখখানা মনে পড়ে গেল। এই তো লাইন পেরিয়ে ওপারে গিয়ে মিনিট চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ খর পায়ে হাঁটলেই পালপাড়া। বিধানসভা কেন্দ্র যা

আলাদা। কিন্তু থানা এক। নিশ্চিন্দা, ঘোষপাড়া, পালপাড়া, দুলেপাড়া, সাঁপুইপাড়া—সবই ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রে, তবে থানা বলতে বালি থানাই। জয়কেশ মুখার্জি নিশ্চিন্দা ঘোষপাড়ার বড় নেতা সেই সঙ্গে পদ্মনিধি ধরের নামও খুব শোনা যাচ্ছে।

তো সে যাক গে, পালপাড়ার বুড়ো পালমশাই বলছিলেন, ঠাকুর বানায়ে আজইকাল আর কিসুই থাকে না। বুঝলা না, ও মনুরা। বোয়স। প্রফুল্ল স্যানের আমলে চাউল নাই, সইরষার ত্যাল পাই না। যাও বা মেলে হেয়ার মধ্যে পাইল—

সুমিত জানে সর্ষের তেল কিলো প্রতি সাড়ে চার টাকা হয়ে গেছে। পাড়ার মুদি দোকান থেকে খুচরো কিনতে হলে এই দর দিতে হয়। গণেশ মার্কা টিনে যে সর্ষের তেল পাওয়া যায়, তার দাম অনেক। পাঁচ কিলো টিনের দাম তিরিশ টাকা, তাও বড়বাজার থেকে আনলে। অমর ভট্টাচার্য শেয়ালকাঁটা মেশান তেল খেয়ে বেরিবেরি সমেত আরও নানান অসুখ-বিসুখ হতে পারে, এই ভয়ে বড়বাজার থেকে খুব কষ্ট করে পাঁচ কিলোর একটা গণেশ মার্কা সিলড টিন এনেছেন। অময় ভট্টাচার্যের আতঙ্ক—বেরিবেরি হলে আর দেখতে হবে না। পা ফুলবে। হাত ফুলবে। মুখ ফুলবে। দেখতে দেখতে ফুলে গোদমবেশ হয়ে উঠবে সমস্ত শরীর। তারপর অবশ্য মৃত্যু। শেয়ালকাঁটার ভেজালে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

কি আশ্চর্য, স্বাধীনতার পর কুড়ি বছর হতে চলল কিন্তু ভেজাল আটকানর কোনো রাস্তা বের করা গেল না। সেই যে সেকেন্ড গ্রেট ওয়ারের সময় থেকে বাঙালি জীবনে ভেজাল, মজুতদারি, কালোবাজারি—এই সব শব্দ ঢুকে পড়ল, তা থেকে আর কেটে বেরন গেল না। লক্ষ্মী ঘিয়ে ডালডা, সাপের চর্বি, জিরে গুঁড়োয় ঘোড়ার শুকনো গু, সর্ষের তেলে শেয়ালকাঁটা, গোলমরিচে শুকিয়ে রাখা পাকা পেঁপের বীজ, চা পাতায় অন্য অন্য শুকনো পাতার গুঁড়ো। হচ্ছে কি! এসব হচ্ছে কি! নিজের মনেই বিড় বিড় করতে করতে অমর ভট্টাচার্য হাতে রাখা তালপাতার পাখা নাড়ান, গরমের দিনে সব সময় তাঁর হাতে হাতপাখা। অথচ জওহরলাল বলেছিল, ল্যাম্পপোস্টে ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসিতে ঝুলবে কালোবাজারিরা। কোথায়, কোথায় গেল সে সব প্রতিশ্রুতি। হাতি লাদেগা, পাদেগা—ফুউ-উ-স। কোথায় ল্যাম্পপোস্ট, কোথায় ফাঁসির দড়ি, কোথায়ই বা কালোবাজারিদের ফাঁসির দণ্ড। বরং প্রধানমন্ত্রী হয়ে ফ্যাশান বাড়ল জওহরলালের। শাদা চোস্ত পায়জামার ওপর দামি শেরোয়ানি। গলাবন্ধ শেরোয়ানির বুকে লাল গোলাপ। বিরল কেশ মাথাটি ঢাকতে শাদা ক্যাপ। পায়ে ফিতে বাঁধা কালো, ঝকঝকে বুট।

স্বাধীনতার আগের জওহরলাল তো ধুতি, কুর্তা, জওহর কোট। পায়ে কাবলি, মাথায় ক্যাপ। অবশ্য মাউন্টব্যাটেনের বউ হাড়গিলে এডুইনার পাশে সহাস্য নেহরু অনেক বেশি ফিটফাট, স্মার্ট, ঝকঝকে। এসব ভাবতে ভাবতে অময় ভট্টাচার্য তালপাতার পাখার হাওয়া খায়। পাখার শক্ত ডাঁটিতে পিঠ চুলকোয়। তারপর মনে মনে ভাবে রেশনে ছ আনা কিলো দরে যে আমেরিকান গম দেয়, তা তো মানুষের খাবার অযোগ্য। অময় দেওয়ালের পোস্টারে পোস্টারে দেখেছে দুই কমিউনিস্ট পার্টি-ই বলছে পি এল ফোর এইটটি চুক্তি বাতিল করতে। বামপন্থীদের কোনো একটা পথসভায় একজন বক্তা একদিন বলেছিলেন, পি এল ৪৮০ চুক্তি

অস্থায়ী ভারতকে যে গম আমেরিকা দেয়, তা সে দেশের গরু-শুয়োরও খায় না। ওদেশে গমের দাম—বাজার দর ঠিক রাখার জন্য জাহাজ বোঝাই লক্ষ লক্ষ গম ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রে। মানুষের অখাদ্য সেই গম আমরা খাই। খেতে বাধ্য হই।

সত্যি, সত্যি দেশটা যে কোথায় যাচ্ছে। কোথাও কোনো আশার আলো নেই। রেশনে চাল দেয়, তা একেবারেই খাবার উপযুক্ত নয়। তাতে আবার অজস্র কাঁকর, ধান, পোকা, মরা চাল। জোর করে মেশান হয় কাঁকর। সেই চাল কুলোয় ফেলে বাছতে বাছতে দিন যায় হেমন্তবালার। কাঁকর শুধু কালো রঙের নয়, শাদা কাঁকরও মেশান হয় রেশন দোকানের চালে। তাইচুং নামে অখাদ্য একটা চাল দেয়—বর্মা না কোন মুলুক থেকে আসছে যেন। সে চাল আর ফুটে ভাত হতে চায় না। একটা, দুটো গোটা আঁচ চলে যায়। চাল সেদ্ধ হয়ে ভাত হওয়ার পর অনেকটা যেন রবার রবার। দাঁতে চিবিয়ে তল করা যায় না। উড়িষ্যা থেকে আসা পচা, আধপচা আতপও, সেও খেতে হয়। মোটা, মোটা আতপ। তাতে ভয়ানক দুর্গন্ধ। খেলেই হয় কনস্টিপেশান, নয় পেট ছেড়ে দেবে। কিছুদিন পর আমাশা। তখন এন্টার ও কুইনাল খাও, সালফা গুয়াডিন। আমাশা সাময়িক জব্দ হয় তাতে। তারপর আবার সুযোগ পেলেই ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে। ভাতটা—শুধু ভাতটা একটু ভালো হলেই কেবল নুন দিয়ে, তাতে আলুভাতেও লাগে না, শুধু ভাতই খাওয়া যায়। কিন্তু চালটা তো একটু ভালো হতে হবে। নইলে স্বাদু ভাত হবে কেমন করে! কোথায় ভালো চাল। নন রেশনিং এলাকা থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধ কিলো আনতে গেলেও জোর করে কেড়ে নেয় চাল ধরা পুলিশ, হোমগার্ড, এন ভি এফ। ভাতের চাল যেন সোনার চেয়ে দামি। প্রতি সপ্তাহে রেশন ধরার জন্য ভোর সাড়ে তিনটে থেকে লাইন দিতে হয়, পদ্মবাবু রোডের শিশু দত্তের দোকানে। অময় ভট্টাচার্যের তখন দুচোখে ঘুম। আর শুধু তো অময় নন, এরকম কত কত মানুষ—ছেঁড়া চটের ব্যাগ, থান ইঁট, ইঁটের টুকরো, ভাঙা শিশি, টিনের কৌটো দিয়ে লাইন রাখেন। সে এক মহামারী ব্যাপার। মহা হাহাকার যেন। খবরের কাগজে এই তালে এখন কত নতুন নতুন শব্দ—কর্ডনিং, লেভি, ফুল রেশনিং, মডিফায়েড রেশনিং, কন্ট্রোল—যেমন কিনা সেকেন্ড গ্রেট ওয়ারের সময়।

পেটে ম্যাঙ্গো হোপ—মানে আমাশার মোচড়, মর্নিং ডিউটির তাড়া—এসব না থাকলে রেশন লাইনে দাঁড়াতে হয় অময়কে। না হলে সুমিত। তখন সুমিতের দুচোখে ঘুম। লাইন তো এখানেই শেষ নয়। গমের বদলে পাউরুটির স্লিপ। তা আনতে যেতে হবে বালি বাজার। বাড়ি—৫৯/১৩ শান্তিরাম রাস্তা থেকে হেঁটে যেতে সেও প্রায় মিনিট কুড়ি। ছ আনা কিলো গম। সেই সাঁইত্রিশ নয়া পয়সা কে জি গম ভাঙিয়ে আটা করতে কিলো প্রতি আরও তিন নয়া। সেজন্য—মানে আটা ভাঙানর আলাদা লাইন। তাকে তাকে শাদা রঙের ব্যাগে রেশনের গম ভাঙাতে নিয়ে যাওয়ার আগে কুলোয় ফেলে ঝাড়তে হবে। ইঁটের টুকরো, মাটির ছোট ছোট ঢেলা, কাচের টুকরো, পাটের দড়ির খানিকটা, কালো কালো সরষে চেহারার কী কী সব বীজ, সেই সঙ্গে দু এক দানা যবও—সব কুলোয় রেখে ঝেড়ে-বেছে, প্রয়োজনে ধুয়ে তারপর তাকে রোদে ফেলে ভালো করে শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত আটা কলে পাঠানর ব্যবস্থা।

বর্ষায় রেশনের গম মানে প্রায়ই ভিজে আধ পচা, কালো। তা থেকে আটা খানিকটা কালচে, কেমন যেন বদ গন্ধ আর তিতকুটে মতো। খেলে পেট ছেড়ে দেবে নির্ঘাৎ। তখন আবার এন্টার ও কুইনাল-এর শরণ নাও। হে বাবা, এনটার ও কুইনাল, বাঁচাও। বাঁচাও। রক্ষা কর প্রভু। বার বার মোচড় দিয়ে ওঠে তলপেট, আর তো পারি না। সেই সঙ্গে নাভির গোড়ায় ব্যথা। হে মহাশক্তিধর এন্টার ও কুইনাল, তুমি আমাকে রক্ষা কর। রক্ষা কর। প্রাণ বাঁচাও। আমি যে তোমারই শরণাগত প্রভু।

প্রফুল্ল সেনের রাজত্বে, রেশনিংয়ের বাজারে যবের আটা, ভুট্টার আটা, মাইলো, বজরার আটা, মাইলোর খই, সোয়াবিনের ছানা—সবই দেখার সুযোগ হল আমার। এ যেন সেই যুদ্ধের বাজার। ভোর থেকে সারাদিন লাইন। কন্ট্রোলের দোকান থেকে দেবে পেশোয়ারি আতপ—সে অবশ্য খেতে ভালো, সুগন্ধী চাল। হোক না আতপ। তার সঙ্গে সঙ্গে ধুতি, শাড়ি, কয়লা—সবই কনট্রোলে।

বর্ষায় রেশন শপে রাখা ভিজে চিনির বস্তার গা থেকে জল টোপায় প্রায়। চিনি তো নয়, রস তৈরির আগের দশা যেমন হয়ে থাকে, তেমনই খানিকটা চেহারা যেন। সেই সঙ্গে চালও ভিজে, দুর্গন্ধ মাখা। এসবের কোনোটাই মানুষের খাবার হিসেবে উপযুক্ত নয়। তবু খেতে হয়। খাওয়া তো নয়, গেলা। গরিব আবার খাবে কি? সে তো গেলে। খায় তো মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তরা। বড়লোকেরা আহার গ্রহণ করেন। ভোজন করেন। সেই ভোজনের আবার কত রূপ কত ভাগ, মধ্যাহ্ন ভোজন, রাত্রির আহার। সায়েবদের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, সাপার, ডিনার।

রেল লাইনের ওপর বসে বসে ট্রেন আটকে দিয়ে সুমিত তার বাবা অময় ভট্টাচার্যকে দেখতে পায়। চোখের সামনে এসে দাঁড়ান নিশ্চিন্দা পালপাড়ার বুড়ো পালমশাই। শেষ মাঘের রোগা চাঁদ তখন পালমশাইদের আকাশে। মুণ্ডু না বসান, হাতের আঙুল না লাগান সরস্বতীরা নিজেদের লম্বা লম্বা ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে কুমোরপাড়ার উঠোনে। একটু পরেই শেষ শীতের হিম বাঁচাতে তাদের টালির চালার নিচে তুলে দেবে পালবাড়ির ছেলেরা। যে সব দেবী মুখেরা এতক্ষণ চিৎ হয়ে হয়ে পাতা, মণিহীন চোখে তারাদের সাজসজ্জা দেখছিল, তারাও সব একই সঙ্গে চলে যাবে ছাউনির টালির তলায়।

পালমশাইদের মডিফায়েড মানে আংশিক রেশনিং এলাকা। রেশনে চিনি, চাল, গমের কোনো নিশ্চয়তা নেই। কবে সাপ্লাই আসবে, কেউ জানে না। খোলা বাজারে চাল পাওয়া যায়। কিন্তু তার দাম লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ছে। সেই দরের সঙ্গে নিজের যা আয় ইনকাম, তা দিয়ে কোনোভাবেই সঙ্গতি রাখা যায় না।

সুমিত পালমশাইয়ের কল্প পড়া তামার বাসন রঙের মুখখানির দিকে তাকায়। বহু বছরের কষ্ট, অভিমান, যন্ত্রণা-বেদনা যেন মিশে আছে সেখানে। নতুন নতুন দুঃখ, জ্বালার ছাই যেন লেগে যাচ্ছে সেই কল্প পরা তামার বাসন রঙ মুখের গায়ে।

চাঁদের আলো শুষে নেওয়া প্রতিমা মুখশ্রীরা এখন উঠে যাবে বাঁশের খুঁটিঅলা টালির শেডের নিচে। আকাশ থেকে টুপিয়ে নামছে হিম। আকাশে জেগে উঠেছে কুকুর সমেত

শিকারি কালপুরুষ, তার হাতে তির ধনুক। কোমরবন্ধে তলোয়ার। সেই সঙ্গে দপদপাচ্ছে লুব্ধক। স্থির আলো দিয়ে যাচ্ছে ধ্রুবতারা। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। পোটো দাদুর উঠোনে প্রাচীন কুলগাছটি নীরবে একটি বিনম্র ছায়া নামিয়ে এনেছে উঠোনে। তারপর যত্নে বিছিয়েছে তাকে। সেই ছায়াছাপের মধ্যে কত না ডিজাইন, একটু নজর করলেই চোখে পড়বে।

এমন চাঁদের আলোর ভেতরই ডেকে উঠছে অন্ধ কোকিল। হয়ত দূর বসন্তের কোনো গান তার গলায়। তবু পঞ্চম সুরে কি এক অজানা ব্যথা, বিপদ। সেই ডাক শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল সুমিত ভট্টাচার্যের। কেন মোচড়াল? কেন? আর সেই মোচড়ানির সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা নোনা জল এসে জমল চোখের কোণে।

অন্ধ কোকিল আবারও ডাকল। সেই তীব্র হাহাকার রব ছড়িয়ে যেতে থাকল পাল পাড়ার বাতাসে। মাঘ নিশীথের কোকিল কেন যে এমন আকুল সুরে গায়। সুমিতের সঙ্গে ঠাকুর বায়না দিতে আসা পবিত্র হঠাৎই কোকিল-রবকে ভেঙিয়ে ডেকে উঠল—কু-উ-উ—কু-উ-উ—কু-উ-উ—

কুলের ছায়ার কাঠের টুলে বসা বুড়ো পালমশাই সেই কোকিল ভ্যাঙান স্বর শুনে সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা যেন উত্তেজিত হয়েই রি-অ্যাক্ট করে বসলেন—হারামজাদা, কোকিলের মুখে মুখে সাড়া দ্যাও—চুপ যা। চুপ। না অইলে চক্ষু উইঠ্যা মরবি।

কিন্তু পবিত্র পলামশাইয়ের বলা ও সব কথা আদৌ শুনলে তো। পবিত্র গাঙ্গুলি, ডাক নাম গুগলি সে আবারও কোকিলের মুখে মুখে কু-উ-উ-উ, কু-উ-উ—কু-উ-উ-উ ডেকে বেশ বিরক্তই করে ফেলল বৃদ্ধ পটুয়াকে। আর তারপর রাতে প্রায় অন্ধ পালের সামনেই তার কুলগাছ ধরে নাড়া দিল জোরে জোরে। একবার, দুবার—তিন বারও।

সুমিত জানে ভালো বাংলায় কোকিলকে পরভৃৎ বলে। কেন পরভৃৎ? না, বাংলা ব্যাকরণ-স্যার বলেছেন, কোকিল ডিম পাড়ে কাকের বাসায়। কাক তা দেয় কোকিলের ডিমে। তা যে বসে কাক জানতেও পারে না তার শরীরের ওমে যে ছানা হচ্ছে তা কোকিলের। তারপর একদিন ডিমের খোসা সরে গিয়ে বাচ্চা ফোটে। যে বাচ্চা কোকিলের। কাক টের পাওয়ার আগেই চোখ ফুটে যাওয়া সেই বাচ্চা ডানা নেড়ে নেড়ে উড়ে যায় নীল শূন্যে। আর বসন্ত-দূত কেন? ব্যাকরণ স্যার বলেন, কোকিলের কণ্ঠে, গানে গানে ধ্বনিত হয় ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী বার্তা। তা-ই বসন্তদূত।

পবিত্র মানে গুগলি আবারও নাড়া দিল কুলগাছে। টুপটাপ টুপটাপ ঝরে পড়ল পাকা কুল। সাঁঝের প্রথম হিম মাখা বুড়ো পাতা।

হারামজাদা—। বুড়ো পাল চেঁচিয়ে উঠল।

ঠিক তখনই সুমিত দেখতে পেল শেষ মাঘের শীত মাখা সন্ধ্যার কোনো কোনো বাড়ির উঠোনে কুলকুলতি বত্তো করছে মেয়েরা। মাটির উঠোনে চারপাশে কাদা মাটি লেপে তৈরি হয়েছে পুকুর। পুকুরের ভেতর জল। পুকুরে নামার ঘাটলা—সিঁড়ি। সিঁড়ির ধাপে মাটির পিদিম। প্রদীপের ঠোঁট আগুন। সেই আগুনের ছায়া জলে।

ফুরিয়ে আসা মাঘের বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে প্রদীপ শিখা। পাতা সমেত

কুলের ডাল একটি। খেলনা-পুকুরের পাড়ে কুলপাতা। যে কুমারী কিশোরী বা বালিকা ব্রতটি করছে তার গায়ে একটি সস্তার আট হাতি শাড়ি, কোনো মতে ল্যাটপেটিয়ে জড়ান।

শীতে-বাতাসে ঠাণ্ডা লাগছে মেয়েটির। তবু কাঁপা কাঁপা উচ্চারণে সেই মেয়ে বলছে—

কুলকুলতি কুলের বাতি
তোমার তলায় দিয়ে বাতি
বাপ কুল মাতুল কুল
শ্বশুর কুল—তিন কুলে অর্চনারতি

কুলের ভাঙা ডালটি কাঁদছে। বলছে, কেন আমায় মুচড়ে ভেঙে নিয়ে এলে ডাল থেকে। আমার কষ্ট হয় না।

বংতের পুকুর কোনো উত্তর দেয় না। শুধু তার জলের কুলগাছের ছায়াটি ভাসে। ছিঁড়ে আনা কুলপাতারা পরিপাটি করে শুয়ে থাকে পুকুরপাড়ে। অন্ধকারে জেগে থাকে কাঁচা মাটিতে তৈরি ঘিয়ের পিদিম। কাঁপছে সেই পিদ্দিমের বুকে তারার মিয়োন আলো।

পালমশাইয়ের উঠোনে ঝাঁকুনির পর পড়েছে অনেক পাকা কুল। কুল পাতা। সরস্বতী পুজোর আগে কোনোভাবেই খাওয়া যাবে না কুল। অথচ শুগলি নিচু হয়ে কুল কুড়োচ্ছে। ফটফটে জ্যোৎস্নায় এখন এই ঝকঝকে কুলতলায় একটা পাখি-ছুঁচ, সোনামুখী ছুঁচ অথবা সিঁদুর পড়লেও কুড়িয়ে নেওয়া যাবে।

হারামজাদা, শুয়ারের নাতি—গু খাবি গু। বরুই খাইতে আইছস। চুরি কইর‍্যা বরুই খাবি। ক্যান গু খাইতে পারস না। বুড়ো পটুয়া আরও কত কি গাল পাড়ে। উঠোনে বরুই গাছটি তার অকৃপণ ছায়া ছড়িয়ে তেমনই উদার।

শুগলি চাপা স্বরে সুমিতকে বলে দৌড়। দৌড় শালা। বুড়ো ধরতে পারলে পুঁতে ফেলবে। পেঁদিয়ে খগেন করে দেবে বাপের নাম। নেহাৎ রাতকানা তাই—

চোখে কম দেখে বলেই হয়ত বেঁচে গেলাম এ যাত্রা—হাঁপাতে হাঁপাতে সুমিত বলে।

কি বড় বড় কুল রে ভাই। সাইজে যেন বোম্বাই কুল। টোপা কুল আবার এত বড় হয় না কি। ইস, কুড়নো গেল না।

হাতে একটা চটের ব্যাগ ছিল সুমিতের। ঘোষপাড়া বাজার, নিশ্চিন্দাবাজারে বিকেলে, সন্ধের বাজার বসে। সেখানে শীতের টাটকা সবজি। সবই লোকাল। ঘরের পাশের ক্ষেত থেকে তুলে এনেছে চাষিরা। ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক, কড়াইশুঁটি। সেই সঙ্গে হয়ত মটরশাক, ছোলাশাক। সবজির ফাঁকে যদি দু-এক কিলো চাল নিয়ে আসা যায়, তাহলে তো কথাই নেই। খোলা বাজারে চাল বিক্রি হয় নিশ্চিন্দা, ঘোষপাড়া বাজারেও। এখনও বেশ সস্তা। সত্তর নয়া, আশি নয়া কিলো।

রাতে আর তেমন করে চাল ধরা পুলিশ থাকে কই। যে খাওয়ার জন্য লুকিয়ে নিয়ে আসা দু-এক কিলো চাল কেড়েকুড়ে নেবে। হোমগার্ড এন ভি একরাও তো সবাই বাড়ি চলে গেছে।

এখনই তো চাল নেওয়ার সুবিধে। যদিও ওপারে ঠাকুর বায়নার পর ক্লাবের ঠাকুর

কতটা হল, সেটা দেখতে যাওয়ার সময় মা পই পই করে বলেছে সুমিতকে—যাচ্ছ যাও ভালো কথা। সস্তার সবজি টাটকা পেলে কিনবে—সেও ঠিক আছে। কিন্তু চাল আনতে গিয়ে খোয়ার করে না। দোহাই বাবা। সব দিকে বিপদ এখন। চার দিকে যা শুনছি সব। এক কিলো, দু কিলো চাল পেলেও কেড়ে নিচ্ছে পুলিশ। লাঠির বাড়ি দিচ্ছে। জেলে ঢোকাচ্ছে। চারপাশের হাওয়া, গতিক সুবিধের নয়।

পালপাড়ার বুড়ো পালের বাছা বাছা কাঁচা খিস্তি শুনতে শুনতে জোর পায়ে দৌড়ে নিশ্চিন্দার কাঁচা রাস্তা পেরতে পেরতে সুমিত দেখতে পাচ্ছে রাস্তার দুদিকে কার্বাইডের আলো জ্বেলে চাল ব্যাপারী। কত কত চাল। দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা উঠছে, নামছে। কচি লাউ, শিশির ভেজা ফুলকপি, বাঁধাকপি, বড় বড় বেগুন, সবুজ সবুজ পালংশাক, মটরশাক—সব তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

ছুটতে ছুটতে সুমিতের মনে হল এখান থেকে না হয় বালি স্টেশনের গায়ে বসা সন্ধের বিশাল বাজার-হপ্তা বাজার বা সপ্তা বাজার থেকেও তো কিছু সবজি কিনে নেওয়া যেত। এমন কি চালও। সেখানে অবশ্য সব তরকারিই আকাল নয়। লোকাল যেমন আছে, তেমনই আছে চালানি মাল। দেখে কিনতে হবে। তবে দাম সেখানেও বেশ কম। কিন্তু পায়ের নিচে দৌড় আর বুকের মধ্যে দমের ওঠাপড়া থাকলে তখন তো সামনেই এগোতে হয়। ছুটতে ছুটতে তাই কখন যেন সুমিত পার করে এসেছে রাস্তার ডান দিকে থাকা নিশ্চিন্দা বয়েজ স্কুল। সেই সঙ্গে নিশ্চিন্দা গার্লস স্কুলও। পায়ের তলায় দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে মাটি আর ইট বসান রাস্তা। এটা মিউনিসিপ্যাল এলাকা নয়। ছুটতে ছুটতে সুমিত টের পাচ্ছে এই শীতেও প্রবল ঘাম হচ্ছে তার।

পুলিশ এসে গেছে! পুলিশ। কে যেন বলল পাশ থেকে।

পুলিশ দেখে লাইনে বসে থাকা ট্রেন আটকান ছেলেরা তাদের স্লোগান আরও জোর করল। বন্ধ লেভেল ক্রসিংয়ের গায়ে হিন্দুস্থান মোটরস-এর তৈরি কালো ভ্যান বুড়ো গণ্ডার হয়ে দাঁড়িয়ে। ফোর্স নেমে পড়েছে।

পুলিশ এসে গেছে। এবার কী করবি! পাশ থেকে যেন কে জানতে চাইল।

প্রথমটা সেই কথার কোনো জবাব দিল না সুমিত।

তখন আবার একই প্রশ্ন—পুলিশ এসে গেছে। এবার সবাইকে তুলে নিয়ে যাবে, পালা।

যেদিন বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয়, সেদিনই বলে দেওয়া হয়েছিল গোপন জমায়েতে—লেভেল ক্রসিংয়ে, রেল লাইনে চট করে পুলিশ উঠে এসে মারধর, ডাণ্ডাবাজি করতে চাইবে না। তাতে অনেক রিসক আছে। রেল লাইনের ওপর পড়ে থাকা পাথর, তা যদি একবার পাবলিক ছুঁড়তে আরম্ভ করে, তখন পুলিশ ল্যাজ উঁচু করে পালাবে। ইট—আধলা ইট হচ্ছে বাংলার বোমা। লাইনের পাথর তো একদম তৈরি জিনিস। হাতে হাতে ছোঁড়। সাপ্লাইয়েরও দরকার নেই। এর আগে বেলঘরিয়া, অশোকনগরে এমন হয়েছে। লাইনের ওপর ট্রেন আটকান পাবলিক পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে।

দমদম দাওয়াইয়ের সময় কি? খবরের কাগজে যেন পড়েছিলাম।

ঐ সময়েই হবে। কি তাঁর আশপাশে জবাব দিল নেতা গোছের কেউ একজন। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যায় না ভালো করে।

পার্টি অফিসে যাওয়া তো দূরের কথা, খোলাই কঠিন। খুললেই হানা দিচ্ছে বালি থানার পুলিশ। নয়ত রেড করছে সাদা পোশাকের আই বি, ডি আই বি-র লোকেরা। রাস্তার ধারে ধারে দরমায় সান্ধ্য গণশক্তি মারাই এখন মুশকিল।

পুলিশ এসেছে। রিপোর্টারও এসেছে। কে যেন বলল চাপা গলায়। ক্যামেরার শাটার পড়ছে ঝপ ঝপ। ছবি উঠছে। গ্যাংম্যান নানকু আগে থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রবি ঘোষকে। দূর থেকে তার নজরে পড়েছে কালো ভ্যান। গোস্বামী পাড়া হয়ে সোজা আসছে এদিকেই। সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেছে রবিদা।

এবার তো গ্রেফতারের পালা।

যে যেমন পারল দৌড়েছে দিকশূন্য ঠিকানায়। মাঠ ভেঙে, কচুঝোপ পেরিয়ে, পুকুর ধারের কাদামাটি মাড়িয়ে, বড় ভাগাড়ের দিকে, কেউ বা সাঁপুইপাড়া, নয়ত চাঁদমারির দিকে।

সুমিত দৌড়ল না। স্লোগান দিতে দিতেই ধরা পড়ল। তাদের মতো কয়েকজনকে ভ্যানে তুলল পুলিশ। তখনও স্লোগান। তখনও রণহুঙ্কার—কংগ্রেস সরকার নিপাত যাক। সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে কেন কংগ্রেস সরকার জবাব দাও। পি এল ৪৮০ চুক্তি বাতিল কর। অবিলম্বে চাল, ডাল, তেল, গমের দাম কমাতে হবে। বে-আইনি রেশন কার্ড বাতিল করতে হবে।

লেভেল ক্রসিং থেকে বালি থানা পুলিশ ভ্যানে মিনিট কুড়ি।

মোটা থলথলে খাকী পরা অফিসার, লালচে মুখ, ভারী গাল, কোমরের বাঁ দিকে রিভলভার, কালো ছোট চামড়ার বাক্সে গুলি হমকে উঠল—এই সব শালা কমিউনিস্টের বাচ্চা। সব কটাকে লক আপে পোর।

সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান উঠল—অবিলম্বে চাল, চিনি, ডাল, সর্বের তেলের দাম বেঁধে দিতে হবে। কংগ্রেস সরকার নিপাত যাক।

চুপ, চুপ শালা। কমিউনিস্টের বাচ্চা। সব শালা জ্যোতি বসু, সোমনাথ লাহিড়ী। এখানে কোনো চেল্লামেল্লি নয়। এটা থানা।

থানার পেটা ঘড়িতে তখন একটা। খুব খিদে পেয়েছে। জল তেষ্টা। পুলিশ ধরে নিয়ে এলে কি হয়, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই সুমিতের। পুলিশ কি খুব মারে? সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে নাকি দেওয়া হয় কম্বল ধোলাই। তাতে গা, হাত, পা ফেটেফুটে যায় না। কিন্তু যা লাগে না। পরে সারা গায়ে ভয়ঙ্কর ব্যথা। গোপন কথা বার করার জন্য পুলিশ কি এখনও নখের নিচে ঢুকিয়ে দেয় বড় গুণ ছুঁচ! হাত পাততে বললে অবিরাম চলতে থাকে রুলের বাড়ি, চেটোর ওপর! যতক্ষণ না চেটো ফেটে রক্তারক্তি হয়ে যায়! প্লাস দিয়ে একটা একটা করে কি তুলে নেওয়া হতে থাকে হাত-পায়ের নখ! থানা লক আপের ছাদের সঙ্গে আটকান লোহার হুকে উলটো করে টাঙিয়ে—মাথা নিচে পা ওপরে, তারপর পায়ের চেটোয় গুনে গুনে চলতে থাকে রুলের ঘা। এক দুই তিন। খুব জোরাল আলো তখন টরচার

ঘরের ভেতর। রাতের নেমে আসা অন্ধকারে নেশাড়ু খোলাইবাজরা সবাই এক এক জন ড্রাকুলা। কখন কোথা দিয়ে যে টর্চার নামবে, নেমে আসবে মারের মোক্ষম বজ্রাঘাত— কেউ জানে না।

গরম সিগারেট বা জ্বলন্ত চুরুট কথা বলতে বলতে হাতের পাতার উলটো পিঠে ঠেসে ধরা, জোর করে চেপে ধরে রেখে হাসতে হাসতে কথা বলা, সেই সঙ্গে সঙ্গে বার বার একই প্রশ্ন করে করে গোপন তথ্য জানতে চাওয়া—এসব তো জলভাত এদের কাছে। যেমন কি না কথা বলতে বলতে নিজের পায়ের ভারী বুটখানা সটান, একদম সপাটে চাপিয়ে দেয়, যাকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তার খোলা, কুঁকড়ে যাওয়া পায়ের পাতার ওপর। সেখানে হয়ত তাপ্পি দেওয়া চামড়ার চটি কোনো, নয়ত হাওয়াই চটি।

বুটের নিচে চটি কাঁদে।

যার চটি, যার পা সে বলে—উফ!

বল শালা—কলকাতাকে ভিয়েতনাম করবি। ভিয়েতনামের বাচ্চা—

খুব দ্রুত জঙ্গী স্লোগান দিলে নাকি ভয় কাটে। এমন মনে হওয়াতে সুমিত আবার স্লোগান তুলল—দিকে দিকে চাল, গম, চিনির দাম বাড়ছে কেন কংগ্রেস সরকার জবাব দাও। সঙ্গে সঙ্গে স্লোগানের রেশ নিয়ে বিজয়ধ্বনি উড়ে আসছে যেন—জবাব দাও। জবাব দাও। ভিয়েতনাম লাল সেলাম। লাল সেলাম লাল সেলাম—

অ্যাই, অ্যাই শালারা—ভিয়েতনামের বাচ্চারা। সব চুপ। চুপ শালারা। সব কটার পোঁদে রুল ঢোকাব। অ্যামন ক্যালান ক্যালাব না—

স্লোগান দিলে খিদে তেষ্টাও কমে যায়। তাছাড়া এমনিতেই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খিদে খিতিয়ে যায় পেটের কোণে। তখন একটা জলকাটা, টোকো বিস্বাদ ভাব ছড়িয়ে থাকে জিভের গায়ে। সমস্ত মুখটাই কেমন যেন তেতো, বদখত। স্বাদহীন।

মা-র নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নি এতক্ষণ। খবরও কি পৌঁছে গেছে বাড়িতে।

বালি থানায় খবর পেয়ে এসেছেন পতিতপাবন পাঠক, তিনি এখানকার বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড়ান, সি পি আই (এম)-এর হয়ে। এসেছেন জয়কেশ মুখার্জি। তিনি ডোমজুড় কেন্দ্রের নির্বাচিত এম এল এ। সি পি আই(এম)-এরই। বালি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এসেছেন থানায়।

পতিতবাবু ধুতি, ফুল হাতা শার্ট। তার ওপর কালো জহর কোট। পায়ে কালো পাম্প শ্যু। জয়কেশ মুখার্জি এসেছেন সাইকেলে। রোগা, হাড় হাড় চেহারা। লম্বা। পরনে আধময়লা মিলের ধুতি। তার ওপর ছিটের ফুলশার্ট। পতিতপাবন পাঠকমশায়ের মাথায় ঘন কালো চুল, উল্টে পেছন দিকে টেনে আঁচড়ান। ঘাড়ের কাছে সামান্য ঢেউ খেলান বাবরির আভাস। বড় মুখে নাকের নিচে পাকান কালো গোঁফ। গর্দানটি বেশ চওড়া। দেখেই মনে হয় স্বাস্থ্যবান মানুষ। বালি জুট মিলে ট্রেড ইউনিয়ন করেন।

শৈলবাবু ফরসা মানুষ। লম্বা ঝুলের খাদির হাফ পাঞ্জাবি, সেই সঙ্গে পাড় ছাড়া খদ্দরের ধুতি। পায়ে মহাত্মা গান্ধী ডিজাইনের চপ্পল। বাঁ হাতে বেনটেক্স কোম্পানির স্টিল ব্যান্ডের

সঙ্গের পুরনো একটা ওয়েস্ট এন্ড ওয়াচ আছে। তার ডায়ালটি নিচের দিকে ঘুরিয়ে বাঁধা। গায়ের রঙ বেশ ফরসা। তার সঙ্গে মাথাটিও একেবারে কাশফুল বোঝাই কোনো ঢালু প্রান্তর। উজ্জ্বল চওড়া কপাল। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। বিয়ে-থা করেন নি। সব সময় মুখে একটা আলগা হাসি লেগে আছে। খাদির ধুতিটি প্রায় হাঁটুর কাছে তোলা।

তারক গোঁসাই এসেছে থানায়। থানার সঙ্গে তার খুব দহরম মহরম। বালি মণ্ডল কংগ্রেসের একজন কেউকেটা তারক গোঁসাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে টুকুস বোসও এসেছে। টুকুসও লোকাল কংগ্রেস নেতা। তারও খুব জানাচেনা থানার সঙ্গে।

পতিতদা জামিনে আছেন, তবু থানায় এসেছেন। কে যেন বলল চাপা গলায়।

এরা সব স্টুডেন্ট। বই-খাতা আছে—স্কুলের ছাত্র। বালি থানার বড়বাবুর ঘরে টেবিলের সামনে রাখা কাঠের চেয়ারে বসতে বসতে পতিতপাবন বললেন।

স্টুডেন্ট মানে! সব খুদে কমিউনিস্ট। চীন আর ভিয়েতনামের বাচ্চা। ভালোই চালাচ্ছেন পাঠকবাবু, সামনে ছোটগুলোকে আনিয়ে দিয়ে নিজেরা পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন। মুখ থেকে এখনও আঁতুড়ে গন্ধ যায় নি, নাক টিপলে দুধ বেরয়, তারা সবাই খাদ্যের দাবিতে আন্দোলনে নামল, এর পেছনে কোনো প্ল্যান নেই বলছেন!

এরা সব স্টুডেন্ট।

স্টুডেন্ট তো বুঝলাম। কিন্তু এদের লিডারটি কে? কোন নেতা আছে পেছনে?

নেতা আবার কে থাকবে। পতিতপাবন পাঠক একটু যেন ধমকালেন।

তাহলে কি ধরে নেব আপনিই এদের নেতা। সামনে ওদের রেখে আসল সুতোটি টানছেন আপনি।

ওদের ছেড়ে দিন।

এ কথা আপনিও বলছেন শৈলবাবু!

হ্যাঁ বলছি। সবাই-ই এরা ছাত্র। তার ওপর সারাদিন এদের কিছুই খাওয়া হয় নি। জল পায় নি। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে সব। মুখ শুকিয়ে গেছে। ওদের ছেড়ে দিন, ওরা এবার বাড়ি যাক। দরকারে আমি বন্ড দিচ্ছি।

কি বলছেন আপনি। জানেন একটু আগে ওরা কংগ্রেস সরকারকে কি সব যা-তা কথা বলছিল।

তা ভেতরে ক্ষোভ জমেছে, বলেছে। স্বাধীন দেশের ছেলে সব। সত্যি কথা বলবে না!

কি বলছেন আপনি খেয়াল আছে? ওসির গলায় স্পষ্ট হতাশা।

নিশ্চয়ই খেয়াল আছে?

এরা সব জয়কেশবাবু পতিতবাবুর লোক। কমিউনিস্ট। লালের বাচ্চা। সব চীনপন্থী বাম কমিউনিস্ট। এরা সবাই দেশের শত্রু।

তা হক আপনি এদের প্রত্যেককে ছেড়ে দিন।

সে কি হয়! আমি একবার বরং তারকবাবুকে ডাকি। তারক গোঁসাইমশাই দেখে যান একবার যারা অ্যারেস্ট হয়েছে। টুকুসবাবুও আসুন। দেখে নিক। এদের মধ্যে কোনো ছাপ্পা মারা বাম কমিউনিস্ট—

দেখুন, কেন আবার টুকুস, তারক করছেন। আমি এখানকার এম এল এ। আমি বলছি। প্রয়োজনে পার্সোনাল বন্ড দেব। এরা কেউ বোমা ছোঁড়ে নি, ইঁট মারে নি। সোডার বোতল চার্জ করে নি। ছুরি-ছোরা চালায় নি। তবে এদের দোষ কি। এখনই ছেড়ে দিন ওদের। আমি পার্সোনাল বন্ড দিচ্ছি। আরও এতেও আপনি ছাড়তে রাজি না হন, ফোন দিন। আমি হাওড়ার এস পি-র সঙ্গে কথা বলব। দিন, ফোন দিন—

না, স্যার। না মানে—আমাদের তো ডিউটি করতে হবে। চাকরি রাখতে হবে। এতবড় একটা ইনসিডেন্ট ঘটল, কাল পেপারে ছবি বেরবে, কোনো অ্যারেস্ট নেই—

আরে এরা তো কেউ ভায়োলেন্ট হয় নি। পুলিশকে আক্রমণও করে নি। তাহলে আপনি কেন—বলতে বলতে বালি বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস এম এল এ শৈলবাবুর মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠল। তিনি হাই প্রেশারের রুগী। বাট পার করার পর সারাদিন অতি পুরনো একটা সাইকেলে বালির এ রাস্তা ও রাস্তা করে বেড়ান। বিয়ে-থা করেন নি। স্বাধীনতার আগের গান্ধীবাদী। এম এল এল এ ভাতা যতটুকু পান তাও অনেকটাই চলে যায় বনের মোষ তাড়াতে।

ঠিক আছে আপনি যখন বলছেন, তখন এদের সকলকে পার্সোনাল বন্ডে—। কিন্তু দেখবেন স্যার, আমি যেন না ফেঁসে যাই। এস পি সাহেব আমাকে না চেপে ধরেন।

সে আমি কথা বলে নোব এস পি সাহেবের সঙ্গে। নিন কাগজপত্র রেডি করুন। অনেক বেলা হয়ে গেল। সকাল থেকে ছেলেগুলোর কিছু খাওয়া হয় নি। ছোট ছোট ছেলে সব। ওদের খিদে পায় না!

সুমিত ভট্টাচার্য ঠিক তখনই বালি থানার লক আপের ভেতর বসে বসে শুনতে পেল থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে বেলা তিনটে বাজছে।

হলুদ রঙের করেকটা পাতলা পাতলা, নিচে কালো কার্বন দেওয়া কাগজে সই করল সুমিতরা এগারোজন। তার আগেই ওদের লক আপ থেকে বার করে এনেছে কনস্টেবল। বাইরে তখন শেষ শীতের আয়েসি রোদ বেলা গড়িয়ে যাওয়ার কথা বলতে বলতে হাই তুলছে।

লক আপ থেকে মুক্তি।

তারপর থানার বেঞ্চ।

সেখান থেকে বাইরে।

থানার বাইরে মুক্ত পৃথিবী।

লক আপ থেকে বেরনর আগে স্লোগান দিয়েছে সুমিতরা—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। খাদ্যের দাবিতে ভুখা মানুষের সংগ্রাম চলছে চলবে।

বালি থানা থেকে ৫৯/১৩ শান্তিরাম রাস্তা খর পায়ে হাঁটলে বড়জোর মিনিট পনের।

কাঠের দরজা খোলাই ছিল। তবে ভেজান। কড়া না নেড়ে হাতের চাপে দরজা খুলতেই হেমন্তবালা।

ছুটে এসে খানিক দূরে হাত তিন-চার পার দূরে হবে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন হেমন্তবালা। এই শেষ ফেব্রুয়ারি প্রাক-বসন্ত বাতাসে, যখন তাঁর ফরসা কপালে নেমে আসা নারকেল

তেল মাখা কোঁকড়া চুলে বিদায়ী বেলার আলগা হাতছানি, উঠোনের ঝাপড়ানো জবা গাছের সবুজ পাতায় পাতায়, নীল আর শ্বেত অপরাজিতার বেয়ে ওঠা লতা বাহারে দিন শেষের রোদ। দুটো বুলবুলি জমির বেড়া দেওয়া পাঁচিলের মাথায় বসে মজাদার খুনসুটি করছে ঝোটন ফুলিয়ে। একটা টুনটুনি এইমাত্র ভ্যানিশ হয়ে গেল জবা গাছের ঘন সবুজে। ঘাসের মাথায়, গোড়ায় নজর করে করে পোকা শিকার করতে চাওয়া একটা বুলবুলি নিমেষে কি মনে হওয়াতে যেন নিজস্ব উড়ানে কোথাও একটা পৌঁছতে চাইল।

হেমন্তবালার কি মনে পড়ল তাঁর বালিকাবেলার আবছা ভোরে অথবা কোনো সন্ধ্যার প্রাক লগ্নে জ্যাঠামশাই শশধর রায়ের ঘরে ফেরার স্মৃতি? সে কি ব্রিটিশের জেল থেকে বেরনর ক্ষেত্রে দিন? না কি ইনটার্নিতে আটক থেকে, দীর্ঘ কয়েক মাস পর বাড়ি ফিরে শশধর তাঁর ন বীন কালো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে কোথায় কোন দিকে যেন তাকিয়ে থাকতেন। ঠাকুমা হৈমবতী দেব্যা জপের মালা সহ জপ-ঝুলিটি মালা টপটপ করতে করতে— কে, সাধু আইলি—সাধু—বলতে বলতে দীর্ঘ কান্নায় ভেঙে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফরিদপুরের আকসায় তখন হয়ত দুপুর মুছে গিয়ে সুন্দর বিকেল নামছে। হয়ত আদপেই বাস্তব নয়, কিংবা খুবই বাস্তব কিংবা একেবারেই অসম্ভবের কোনো বিকেল। হেমন্তবালা তেমনই কোনো বৈকালিক সমাবেশে।

হেমন্তবালার স্মৃতিতে সেই সব বিকেলের গুঁড়ো লেগে আছে। অখণ্ড বঙ্গের পুরুলিয়া, নয়ত মেদিনীপুর, অথবা বীরভূমের ম্যালেরিয়ায় খাওয়া কোনো গণ্ডগ্রাম থেকে ফিরলেন অন্তরীণ শশধর রায়। যুগান্তর দলের হয়ে তিনি বোমা-পিস্তলের রাজনীতি করেন।

ভেতরে ভেতরে ফুঁপিয়ে উঠলেন হেমন্তবালা। সুমিত তাঁর সতের বছরের সন্তান। ষোলয় বিয়ে হল। সতেরয় সুমিত। বড় ছেলের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক অনেকটা যেন পিঠোপিঠি ভাইবোনের, অনেকটা যেন বন্ধুর। মান-অভিমান, প্রেম-প্রণয়েরও। বড় ছেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন যেন অভিমান ভরা কিছু একটা।

শেষ পর্যন্ত তুমিও আমায় বুঝলে না। তুমিও! হেমন্তবালা ভেতরে ভেতরে ভেঙে যেতে যেতে কেঁদে ফেললেন। দূরে জবা গাছের ঘন সবুজ পাতার ওপর মুখ থুবড়ে পড়া ফেব্রুয়ারির রোদ নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইছে তাড়াতাড়ি।

সুমিত সোজাসুজি তাকাতে পারছে না মায়ের মুখে। কেন? কোনো কি অপরাধবোধ? মা-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য কোনো পীড়ন!

হ্যাঁ রে, থানায় মারে নি তো! মারে নি তো! বলে ছেলের পিঠে, বুকে, গলায় কাল্পনিক কোনো আঘাতের চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে হেমন্তবালা জোরে—খুব জোরে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন সুমিতকে। তারপর দুজনেই কান্নার অকূল দরিয়ার যাত্রী হতে হতে কোথায়, কোন অজানায় যেন চলে যেতে যেতে খেয়াল হল সদর দরজা খোলা আছে। দরজায় খিল নেই।

হেমন্তবালা তাড়াতাড়ি সরে এসে খিল দিলেন দরজায়। তারপর বললেন, খাওয়া তো হয় নি। নাও এবার খেয়ে আমায় উদ্ধার কর।

তুমিও তো খাও নি।

ছেলে থানায় আমি কেমন করে খাই? তার আগে স্নান সারো। কলে সাবান, গামছা দিচ্ছি। গরম জল। এই থানার কাপড়ে আর ঘরে উঠো না। আমাকেও দেখছি কাপড় ছাড়তে হবে।

নকশাল যকশাল আসলে সব গপপো। এই সব ভড়কি টড়কি দিয়ে নিজের জন্য কিছু সুবিধা আদায়ের তাল কেবল। দেখিস না, সেমিনার, সভা, আলোচনা—যেখানেই যা হোক না কেন, নকশাল-নকশাল বলে কাঁদুনি। খালি সিমপ্যাথি ক্রিয়েট করার অঙ্ক।

সুমিত এসব কথা সোজাসুজি কখনও শুনতে পায় না। কারণ তার গায়ে মনে এখনও প্রচুর জোর। চুয়ান্ন পার করার পরও একদম বুড়িয়ে যাওয়ার কথা ভাবে না। খুব ভালো হজম হয়। খিদে পায়। সুন্দরী নারী দেখলে বার বার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, প্রেম-ইচ্ছা জাগে। যারা এসব কথা কফি হাউস, নন্দন চত্বর বা নিজেদের মধ্যে আপসে ফুসফুস গুজগুজ করে বলে, তারা জানে এসব সুমিতের সামনে কিছুতেই বলা যাবে না। সুমিত জানতে পারলে যা-তা তো বলবেই। চাই কি ঘুষি মেরে দাঁতও ভেঙে দিতে পারে।

কেবল রাতের অন্ধকারে তার প্রায় পঁচিশ বছরের বিয়ে করা বউ চাঁদের আলো মেখে যখন মৎস্যকন্যা হয়ে শুয়ে থাকে বিছানায়, তখন তার গায়ে রোজ রোজ হাত দিতে ইচ্ছে করে না সুমিতের। জানলার গ্রিল পেরন চাঁদের আলোয় মিলি কখনও কখনও ডোরাদার আফ্রিকান জেব্রা। তার হাঁ মুখ থেকে বাসি লালার কু ঘ্রাণ টের পায় সুমিত। তখন আর চুম্বনে যেতে ইচ্ছে করে না। পঞ্চাশ পেরন মিলি চিৎ হয়ে সামান্য হাঁ করে ফুরুর ফুরুর নাক ডাকে। খুবই সূক্ষ্ম আর চতুর সে ডাকাডাকি। সুমিতের নাক যেমন ডেকে ওঠে, তেমন ব্যাঘ্র গর্জন নয়।

লাল অথবা গোলাপী ফুল ছাপ ম্যাক্সি উঠে গেছে হাঁটুর ওপর। চাঁদের আলো আর গ্রিলের ছায়া মেশামেশি করে যেখানে যেন কোনো আইভি লতা। তবু তো শরীর জাগে না। বয়স। বয়স। ক্লান্তি আর একঘেয়েমি। একই ধরনের ঘ্যানঘ্যানে জীবন।

কতবার মিলি মানে দেবস্মিতাকে বলেছি, রাতে দাঁত ব্রাশ করে শোও। এতে দাঁত, মাড়ি—দুটোই ভালো থাকে। মুখে, শ্বাসে দুর্গন্ধ হয় না। ব্যাড ব্রেথ থেকে বাঁচা যায়। এ ছাড়াও ওরাল হাইজিন বলে একটা কথা তো আছে, না কি! সেটাও তো খেয়াল রাখতে হবে। বিয়ের পর আমায় দু বেলা ব্রাশ করান অভ্যাস করালে তুমি। আর এখন তুমিই সব ছেড়েছুড়ে দিলে।

নিজেকে ঠিকঠাক পরিচ্ছন্ন রেখে, প্রচুর জল খেয়ে, ব্যালেন্সড ডায়েট—এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে গিয়ে তবেই না বয়েসকে খানিকটা হলেও আটকে রাখা যাবে। তা নয় কোনো নিয়ম মানব না, ঠিকঠাক খাবার খাব, প্লেনটি অফ ওয়াটার টেক করব না, ভেতরটা ফ্লাশ করব না, শুধু অ্যাময় মাখলে হবে। কী কী সব লোশন। রিংকল ফ্রি। চোখের কালি ঢাকার, গলা, চোখের পাশে কোঁচকাঁচ রোধ করার। পয়সা দিয়ে সব হয় না কি। না কি করা সম্ভব।

বয়সকে খানিকটা ঠেকিয়ে রাখতে বিউটি পার্লার আছে। মাসাজ পার্লার, জিম। সেখানে সাওনা, বাথ, ফেসিয়াল, নানা রকম ট্রিটমেন্ট, ট্রেনিং। দরকারে কসমেটিক সার্জারি, হেয়ার ট্রানসপ্লানটেশান। সবাই এখন ইয়ং থাকতে চায়। চুলে কালার কর, হাইলাইটস দাও। সেই সঙ্গে বডি টোনিং, ফুল মাসাজ। সে সব না করে শুধুমাত্র দু চারটে ক্রিম কটাক্ষপাত। তাতে কি বয়স-বিষ আটকান যায়।

ক্রমে বয়স বাড়ে। শরীর আলগা, শিথিল, নিদ্রাপ্রিয় হয়ে উঠতে চায়।

আচ্ছা, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে সুমিত ব্যাটার ভিউজ কি?

ওর আবার ভিউজ কি হবে। শালা সি পি এম-এর দালাল। শাসক দলের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে চলে। দরকারে চেঁছেমুছে ক্রিমটি খায়। এই যে ওর আপাত সরল চাউনি, সোজা সোজা কথা বলা মুখের ওপর, খানিকটা র‍্যাডিকাল, প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাবভাব— সবটাই ঢপ। মিথ্যে মিথ্যে। নিজেকে বিপণন করার নিত্য নতুন কায়দা কেবল। নিজের মাল নিজেকেই বেচতে হবে বাবা।

আবার একেবারে অন্যরকম হাওয়া—কথাবার্তাও আছে সুমিতের সঙ্গে।—এক্স নকশাল তো! ঘুপে আছে। কখন শিড়দাঁড়া দিয়ে জেগে উঠবে, কে বলতে পারে। এক্স নকসদের বিশ্বাস নেই একেবারে। খুবই ধান্দাবাজ, চালু পুরিয়া।

সুমিত কিন্তু সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম নিয়ে কোনো মিছিলই হাঁটছে না। যুক্তি হিসেবে বলছে—

কী বলছে?

বলছে, ও নাকি হত্যা বিরোধী।

ঢ্যামনামো।

ঢ্যামনামো বলে ঢ্যামনামো। একদম পিওর ঢ্যামনামো। বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী।

শিল্পায়ন চায় না চায় না?

বুঝতে পারি না।

কৃষি জমি রক্ষার পক্ষে না বিপক্ষে?

বোঝা যাচ্ছে না।

দু নৌকায় পা দিয়ে আছে শালা। যখন যেটায় সুবিধে দেখবে উঠে পড়বে।

তবে ওর নকশাল কেসটা কিন্তু জেনুইন।

কি রকম।

নানা রকম কথা শুনে মোহনদাকে আমরা ধরেছিলাম।

মোহনদা কে?

মোহন হালদার। বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়-এর ফিজিক্স টিচার। দারুণ মানুষ। ঐ সময়—সেভেনটিজে মুভমেন্টটায় ছিলেন। বালি কামারপাড়ায় বাড়ি। এখন আর সেভাবে স্ট্রেটকাট পলিটিকস করেন না। কিন্তু ফ্রি কোচিং চালান একটা, সপ্তাহে তিন দিন। হেলথ ক্যাম্প করেন। রক্তদান শিবির। গাছ লাগানর প্রোগ্রাম। এন জি ও না করেও যা যা ভালো কাজ করা যায় আর কি।

মোহনদাকে পেলে কীভাবে?

আমাদের বন্ধু সুদীপ আছে না বেলঘরিয়ায় থাকে। ও যায় মোহনদার কাছে। মানে মোহনদাদের ঠেকে। কথায় কথায় সুমিত ভট্টাচার্যের কথা উঠতেই মোহন হালদার মশাই তো দশমুখে ওর কথা বললেন।—দারুণ ছেলেরে। সুমিতটা দারুণ ছেলে। জেনুইন। অনেস্ট। নির্লোভ। বালিতে তো থাকতেই পারল না। ফিরেও এল না। ওদের বাড়িটা পড়ে আছে অন্ধকারে, ভূতের বাসা হয়ে।

তাহলে বলছ, সুমিতের নকশাল কেসটা ফ্যানটাসি নয়। একদম জেনুইন।

একেবারেই জেনুইন। কোনো ভেজালের ব্যাপার নেই।

নকশালেও ভেজাল!

বাবা! নকশালে ভেজাল মানে! প্রচুর ভেজাল।

হাসালে দেখছি। বিপ্লবেও ভুল, মিথ্যে মেশে?

মেশেই তো। বারে বারে মিশেছে। আর এখন তো চারপাশে এক্স নকশালদের ছাড়াছড়ি। যেমন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের? মড়ক লেগেছিল না একসময়। প্রতি তিন জনের একজন হয় সমাজসেবী, নয়ত প্রাক্তন স্বাধীনতা যোদ্ধা। বিশেষ করে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি ভোটে দাঁড়ানর সময়। সেই যে আমরা যখন মহাত্মাজির আহ্বানে ঘর ছেড়ে, স্ত্রী সন্তান ছেড়ে দেশের কাজে, দেশের ডাকে বেরিয়ে পড়লাম—এরকম খানিকটা যেন বাঁধা বুলি ছক করা ছিল তখনকার বহু নির্বাচনী বক্তৃতার। তেমনই এখন এক্স নকশাল। যেন বা প্রাক্তন বিলাত ফেরত। সব রকম ফেসিলিটিজ তাদের চাই। সর্ব ধরনের ভোগ। সামাজিক সুবিধে। পাশাপাশি হাতে গরম বক্তৃতা। দু চারজন যে একসেপশান নেই তা নয়, তবে তা নেহাতই হাতে গোনা কয়েকজন।

আমি তো আনডারগ্রাউন্ডেই ছিলাম।

নিজের বর্তমান বাজার দরের সঙ্গে নকশাল ভ্যালু অ্যাড করলে আরও খানিকটা মার্কেট প্রাইস বাড়বে। এখন তো সবই পণ্য। কমোডিটি।

আমি আনডারগ্রাউন্ডে থাকা ছেলে।

কোথায়?

কেন বাঁকুড়ায় আমাদের দেশে—গ্রামের পাশে।

অ। সুমিত খানিকটা ক্লান্ত হয়।

সন্তোষ রানা আমায় খুব ভালো করে চেনে। ওর বউ জয়শ্রী রানা।

বউ নয়। প্রাক্তন বউ। জয়শ্রীর সঙ্গে সন্তোষবাবুর বহু বছর আগেই ডিভোর্স হয়ে গেছে। দুজনের আলাপ প্রেসিডেন্সি কলেজে রাজনীতি করতে করতে। তারপর বিবাহ।

ওর ভাই মিহির রানা তো সি পি আই (এম) হয়ে গেল।

হ্যাঁ, আগে নকশাল ছিল। ঝাড়গ্রামে সি পি আই (এম) পার্টি অফিসে ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তখন আমি স্টেটসম্যানে। মিহিরবাবু তখন এল সি এম। খুব ঝাড়খণ্ড মুভমেন্ট হচ্ছে তখন ঝাড়গ্রামে। বিনপুরে নরেন হাঁসদা এক সময় নকশাল করত, ঝাড়খণ্ডী হয়ে গেল।

ঝাড়গ্রাম শহরে মনোরঞ্জন মাহাত ঝাড়খণ্ড পার্টি—এন ই হোরোর গ্রুপ। সেই সঙ্গে অজয়, লিয়াকত আলি। লিয়াকত আলির একটা হাত কাটা। বলল, সি পি এম-এর সঙ্গে অ্যাকশানে গেছে। তো সে যাই হক, তুমি এত আনডারগ্রাউন্ডে থাকলে, তাহলে কবেই বা লেখাপড়া করলে। ল পাশ করলে। তারপর বড় কোম্পানির পি আর ও—সময় পেলে কোথায়?

ওসব আনডারগ্রাউন্ডে থাকতে থাকতেই। সন্তোষ রানাকে দেখেছি খুব কাছ থেকে গোপীবল্লভপুরে। অসীম চ্যাটার্জি—মানে কমরেড কাকা সাধু সেজে লুকিয়ে ছিলেন গোপী-বল্লভপুরে।

তার সঙ্গে তোমার আনডারগ্রাউন্ডে থাকা না থাকার সম্পর্ক কি। এটুকু মনে মনে বলে নিজের ভেতরই চিবিয়ে নেয় সুমিত। তার মনে পড়ে বালির কামারপাড়ায় মহাবীর ব্যায়াম সমিতিতে কোনো এক শীতের সকালে এসেছিলেন অসীম। তখন তিনি খুবই রোগা-পাতলা। অসম্ভব ঝকঝকে চোখ, গালে কালো চাপ দাড়ি। শাদা পাজামা, শাদা কাজ করা আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে নীল স্ট্র্যাপের বাটার সাত কি আট নম্বর হাওয়াই। খুব বিড়ি খান। ঘন ঘন বিড়ি। বলছিলেন কেমন করে পুলিশের চরকে ফাঁকি দিয়ে সুবর্ণরেখা সাঁতারে পার হয়ে এপার থেকে ওপারে এসেছিলেন।

কালো সুতোর বিড়িতে ঘন ঘন টান দিতে দিতে অসীম বলছিলেন, তাঁর হাতের জ্বলন্ত বিড়ি বাঁ হাতে এনে, দেখাচ্ছিলেন—হাতের পাঁচটা আঙুল দিয়েই উদাহরণ বুড়ো আঙুল শহর আর হাতের বাকি চারটে আঙুল তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা গ্রাম—এবার এই গ্রাম দিয়ে শহর অঙ্গুষ্ঠকে ঘিরে ধরলাম। বলতে বলতে তিনি ঘাড়, গলা সামান্য নিচু করে চার আঙুলের কোলের ভেতর—আড়ালে বুড়ো আঙুলটিকে নিয়ে নিলেন। তারপর বাঁ হাতের বিড়ি ডান হাতে ধরে মুখে অনেকটা উজ্জ্বলতা বুলিয়ে বললেন, এই গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা হয়ে গেল। এটাই কমরেড মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারা। অসীম তখন প্রেসিডেন্সি স্টুডেন্টস কনসোডিস্লেশন। অসীম তখন পি জি এস এক। সিউড়িতে তাঁর বাবার হোটেল ব্যবসা আছে, সম্ভবত। অসীমের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সির ছেলেরা দেয়ালে দেয়ালে তখন লিখছেন—

ঘটনা ঘটাও ফয়দা ওঠাও
শহরে চে গ্রামে মাও

এর বহু বছর পর অসীম ধরা পড়লেন দেওঘর থেকে। সঙ্গে ওঁর প্রথম স্ত্রী রমাদি। তার আগে চারু মজুমদারকে আনকন্ডিশানালি মানা না মানা নিয়ে প্রায় অসম্ভব এক ভূমিকায় চারবাবুর পক্ষে। সি পি আই (এম-এল)-এর বাংলা-বিহার সীমান্ত কমিটির পক্ষ থেকে লিফলেট বার করে বাংলাদেশ-এর মুক্তিযুদ্ধকে কনডেম করে, ইয়াহিয়া খান ও কম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম শিহানুককে এক রকম দেখিয়ে নিজস্ব থিসিস প্রচার করা।

এসব ভাবলেই আজকাল বড় বড় হাই উঠে সুমিতের। এমন কি তার মেনাপোজ পার করা বউ যখন সামান্য হাঁ করে রাতে ঘুমোয় আর ফুরুর ফুরুর নাক ডাকায় তখন সুমিতের মনে হয় এই নারীর জন্যেই একদিন আমি পাগল ছিলাম। একেই বার বার খনন করতে চেয়েছি। নিজের শরীরী আনন্দে, উল্লাসে ফেটে পড়েছি। এ সবই কি আত্মরতি? যৌনতা

সেও কি গোপন রাজনীতির মতোই উত্তেজক কিছু? অসম্ভব উদ্দীপনাময়? কোনো খুন— যা কিনা খতমের মাদুলিতে মুড়ে প্রায় সর্বরোগহর কবচ বলে দেখান কেউ কেউ, তা কি আসলে শারীরিক উত্তেজনারই কোনো নিজস্ব চলন!

শরীর উত্তেজনা চায়।

শরীর বেঁচে থাকা আকাঙ্ক্ষা করে।

মৃত্যু কামনায় থাকে শরীর।

একই সঙ্গে বাঁচতেও চায়।

সুমিত শালা, নন্দীগ্রাম নিয়ে কিছু বলছে না। নকশাল মারাচ্ছ। স্মৃতি। সংগঠন। সবই তো কনডেমড—'এই বাড়ি বিপজ্জনক' এমন চেতাবনী সহ সাইনবোর্ড লেখা বাড়ি যেমন, তেমনই ভঙ্গুর। গণ আদালত। পিপলস কোর্ট। কে কার বিচার করে। কেমন করে বিচার করে। দশটা লোক চাইল বলেই কি একটা লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়। জীবন অত সোজা?

কেন জানি না সুমিতের আজকাল প্রায়ই মনে হয় মানব মস্তিষ্ক বড় জটিল। সেখানে সমর্থন, বিরোধিতা, সমর্থন প্রত্যাহার—সবই নিজস্ব ভঙ্গিতে বাজে। কেউ সেখানে কোনো থাবা ফেলতে পারে না। মানুষ তাই নিজেই স্বরাট। স্বাধীন। একইসঙ্গে প্রভুত্ব প্রিয়, প্রভুত্বকামী আবার সব রকমের প্রাতিষ্ঠানিকতা ভাঙতে সদা বিদ্রোহী। দর্শন প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠলে মুশকিল। কিন্তু যে কোনো দর্শনই তো শেষ পর্যন্ত এস্টাব্লিশমেন্ট হয়ে ওঠে।

সন্তান থাকলে তাদের নিয়ে খানিকটা স্বপ্ন থাকে। সুমিত-মিলির আদৌ তেমন কোনো খোয়াব নেই। বিয়ের পর পরই প্রথম দুবার কনসিভ করে অ্যাবর্শন করাল মিলি—এত তাড়াতাড়ি মা হব না এই যুক্তিতে। ভ্রূণ মোচনে খানিকটা শারীরিক ধকল তো যায়ই, মানসিক ধকলও। তারপর তো আর পেটে বাচ্চাই এল না মিলির। কত দিন, কত বছর হয়ে গেল। এখন মেনোপোজের পর শরীর শিথিল হয়। মেজাজ খিটখিটে। হঠাৎ হঠাৎ হট ফ্ল্যাশ। হাড় দুর্বল, ভঙ্গুর।

তোরা একটা বাচ্চা অ্যাডপট করতে পারতিস। গার্ল চাইল্ড। একটা বাচ্চা বেঁচে যেত। ভালোমতো থাকত।

সে অনেক ক্রাইসিস। আমার যে খুব আপত্তি ছিল, তা কিন্তু নয়। মিলিই রাজি হল না। নইলে পুষ্যি তো নেওয়াই যেতে পারত। বিছানায় ঘুমের কমার্শিয়াল ব্রেক হয়ে গেলে নিজের বউকে কখনও মারমেড, কখনও কলাগাছ, কখনও বা আফ্রিকান জেব্রা মনে হতে থাকে সুমিতের। জেব্রাটি মুহূর্তে ঘোটকী হয়ে ওঠে। সেই কেশর নাড়ান, চারপাশে দাঁড়িয়ে ওঠা মেয়ে ঘোড়াটি কখনও কখনও শাদা ডানা মেলে উড়ে যেতে থাকে ভরা চাঁদের দিকে। কোনো কোনো পূর্ণিমা রাত্রে এমনটি হয়ে ওঠা দেখতে পায় সুমিত ভট্টাচার্য। মিলি অক্লেশে পক্ষিরাজ ঘোড়া হয়ে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে চন্দ্রপাথারের দিকে।

ন্যানো বেরলে আমরা কেউ আর রাস্তায় বেরতে পারব না। এখনই যা জ্যাম, তারপর আরও যা জ্যাম হবে এই একলাখি হীনযানের দৌলতে।

একজন বর্ষীয়ান কবি হীনযান শব্দটি ব্যবহার করেন অক্লেশে। এন জি ও দের ডাকা সেমিনারে তিনি জমি ও নদী বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা বলে প্রচুর করতালি অর্জন করেন।

সিঙ্গুরে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছুক চাষিদের হাতে জমি ফিরিয়ে না দিলে রক্তগঙ্গা বইবে।

যে ভাবেই হক চারশো একর ফিরিয়ে দিতে হবে চাষিদের কাছে।

সরকারের পক্ষে সত্তর একরের বেশি জমি ফিরিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বরং কৃষকদের জন্য লাভজনক প্যাকেজ হতে পারে। অনেক, অনেক বেশি আর্থিক ক্ষতিপূরণ। প্রত্যেক পরিবারের থেকে একজনের চাকরি।

আচ্ছা, সরকার এখন যতটা নমনীয় হয়েছে ক্ষতিপূরণ, প্যাকেজ চাকরি ইত্যাদির ব্যাপারে, প্রথম থেকেই যদি এটা করা যেত। গোটা এলাকাটার একটা ম্যাপ তৈরি করে, সেখানে কত খানি জমি, তার মধ্যে সত্যিকারের—প্রকৃত প্রস্তাবে জমির মালিক ঠিক কতজন, এর মধ্যে কারা কারা নিজের হাতে জমি চাষ করেন না, শহরে বসে থেকে জমির সামান্য আয় পান বা পান না, সঠিক অর্থে কতজন বর্গাদার, কজন ক্ষেতমজুর, কজনই বা ভূমিহীন কৃষক—তার একটা পূর্ণাঙ্গ হিসেব—সেটা করে, মানুষের সঙ্গে আলোচনায় বসা, কৃষক সভাকে সঙ্গে নিয়ে। বিরোধী দলকে ডেকে। সবাই মিলে কিছু একটা করার চেষ্টা হচ্ছে যেন, এমন একটা ভাব। কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় নয়। গোপনীয়তা নয়। ঠিক কত একর জমি টাটা নেবে মোটর কারখানার জন্য, অনুসারী শিল্পের জন্যই বা কতটা, তার একটা পরিচ্ছন্ন হিসেব। একদম ম্যাপট্যাপ দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর, মৌজা নম্বর—কারও কিছু আর বলার থাকত না। তা হল না। মানুষ প্রথম থেকেই ভেবে নিল কিছু একটা গোপন করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। তারপর পুলিশের লাঠি চলল। খড়ের গাদায় আগুন।

যাঁরা শিখিয়েছিলেন লাঙল যার জমি তার—তাঁদের কাছেই তো সাধারণ মানুষ আশা করবেন জমির পূর্ণ স্বত্বাধিকার। তার ওপর সিঙ্গুরের লাগোয়া গ্রামে তেভাগার সংগ্রাম। গ্রামে গ্রামে জমিদার, জোতদারের গুণ্ডা, পাইক-বরকন্দাজ, লেঠেল, থানা থেকে চৌকিদার-দফাদার, দারোগা-পুলিশ এলেই সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি, উলু উলু উলু। এই সব ঘটে যাওয়া অনেক কিছু তো রূপকথার গল্প হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফাঁকা মাঠে, ক্ষেত আর নদীতে। ঠাকুমার মুখ থেকে সে গল্প ডাল-পালা পেয়ে নাতনির কাছে। দখিনের—ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপের তেভাগার নায়ক কংসারী হালদার, প্রভাস রায়, অশোক বোস, হেমন্ত ঘোষাল—সবাই কেমন যেন একটু একটু করে হয়ে উঠলেন উপকথার নায়ক। অহল্যা-মা, গজেন মালী—এঁরা নিজেরাই তো হয়ে উঠলেন রূপকথা।

নন্দীগ্রামেরও তো একটা তেভাগা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। তার আগের বেয়াল্লিশের কুইট ইনডিয়া মুভমেন্ট। সেখানেও তো শত্রুপক্ষের লোকজন দেখলে রীতি শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি করা। রাস্তা কাটা তো হয়েছে তেভাগার আমলে। বেয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহে। একথাটা কেউ মনে রাখল না। আমি তো এখন আর প্রত্যক্ষ রাজনীতি করি না। তা সত্ত্বেও আমার নিজের যা রাজনৈতিক বাস্তবোধ আছে—অনেক নাম করাদের তা রইল না। তাঁরা মিডিয়ার সামনে বাইট দিলেন, ভালো—তা দিন। প্রেস কনফারেন্স

করলেন। বেশ তো তা করুন। কিন্তু হাতে তো শূন্যই রয়ে গেল। বিগ জিরো। বড় মাপের গোল্লা।

নিজেদের ঘরে বিছানায় মিলির পাশে শুয়ে মাঝে মাঝেই একটা বড়সড় ময়াল সাপ দেখতে পায় সুমিত। বিশাল চওড়া, তাগড়া অজগর। গায়ে তার হলুদ-কালোয় গোল গোল ছাপ। সেই ময়াল কখনও কখনও বইতে থাকে কোল বালিশের ওপর দিয়ে। তখন মিলির ঠোঁট সামান্য হলেও ফাঁক। নাকের ফুরুর ফুরুর আওয়াজ।

চারপাশে ক্রমাগত বাড়তে থাকা এই হিংস্রতা, লোভ, দখলের দেখনদারি মেজাজ সুমিতকে রীতিমত কষ্ট দেয়। ব্যথা দিতে থাকে। এই ধারবাহিক যন্ত্রণায় শিক কাবাব হতে থাকে সুমিত।

ও আবার কবে নকশাল করেছিল। তাকে দেখে সামনাসামনি চট করে কেউ আর বলে না। ঐ যে বললাম, ভয় আছে। ফিজিক্যালি অ্যাসল্টের ভয়। থোবড়া ফাটার ভয়। যদি সত্যি সত্যি মেরেটেরে দেয়, তখন।

সুমিত একদম একা একাই ঘুরে বেড়ায়। বাঁচার যে তীব্র ইচ্ছা তাকে সকাল বিকেল তাড়িত করে, তা যেন কেমন চট করে ফুসমন্তর হয়ে উড়ে যায়। সুমিত এখন ভাবে— একা একাই ভাবতে থাকে—আসলে মৃত্যুকে ভালোবেসেই কি সে গোপন সংগঠনে জড়িয়েছিল। কোনো সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি থেকে—জীবনকে শেষ করে দেব এখনই, কী হবে বেঁচে থেকে—এমনই কোনো পাগলামো। আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া। জোর করে ডেকে আনা বিপদকে।

যে দিন প্রথম বালি থানার লক আপ থেকে ছাড়া পাওয়া গেল, সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে খাদ্য আন্দোলন শুরুর আগেই খাদ্যের দাবিতে ট্রেন আটকে অ্যারেস্ট হওয়ার পর সেদিন মা— হেমন্তবালা যেভাবে রিসিভ করেছিলেন তাকে, তার দু-তিন দিন পর রেশনে লাইন দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে কোনো একটা ঝগড়া, তা, কথা কাটাকাটির ভেতর হেমন্তবালা হঠাৎই বলে উঠলেন, ক্ষুদিরাম, আমার ক্ষুদিরাম এলেন। পুলিশের খাতায় নাম যখন একবার উঠেছে, তখন যখন-তখন বাড়িতে আসবে পুলিশ। সার্চ হবে। তোকে পেলে কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতে হ্যানডক্যাপ দিয়ে নিয়ে যাবে। যেমন নিয়ে যায় দাগী আসামী।

তখনও গ্রীষ্ম আসে নি। কিন্তু ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন তো তখন তুঙ্গে। কৃষ্ণনগর, বারাসত, কলকাতা, দমদম—সবই তো আগুনের গোলা হয়ে ফেটে ফেটে পড়ছে। সবাইকেই হয়ত আনডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে, নয় জেলে। কিন্তু যে দিন সুমিতরা ধরা পড়ল প্রথম, ট্রেন লাইন অবরোধ করে, তারপর তাদের ধরে নিয়ে গেল বালি থানায়, পার্সোনাল জামিনে ছেড়েও দিল—তারপর দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় আটকে থাকা লোকাল ট্রেন, দূর পাল্লার গাড়ি, বন্ধ লেভেল ক্রসিং, জ্যাম—টানা জ্যাম, গাড়ি ঘোড়ার জট, এমনকি জোড়া বলদে টানা একটি ইটের গাড়ি, যা কিনা আসছে উত্তরপাড়ার মাখলা থেকে তাতে বোঝাই প্রিয় কোম্পানির এক হাজার ইট, সেই গাড়ি টানা বলদদের ঘাড়ে জোয়াল টানতে টানতে কালো বেড়ের মধ্যে লালচে থক থকে ঘা, সেই ক্ষতচিহ্নের মধ্যে কালো কালো মাছি দেখলে কেমন

যেন পা বিড়োয়। সেই সব কিছুই নেই। কেবল একটি লোকাল ট্রেন। সেই ট্রেনের সামনে একটি বড় হাত। বাকি সব কালো কালো মাথা। কাউকে দেখেই আলাদা করে চেনার কোনো উপায় নেই। সুমিত কাগজটা নিয়ে অনেক খুঁটিয়ে, নজর করে দেখেছে। কোথাও তার টুকরো, ছিটেফোঁটা নজরে আসে কি না। না, কিছুই নেই। কিস্যু না। এতগুলো কালো মাথা। আর একটা হাত। তার মধ্যে কোথায়ই বা সুমিত ভট্টাচার্য, কোথায়ই বা বেঁটে রবিদা, আর কোনখানেই বা নানকু।

'আনন্দবাজার' নয় গেল বুর্জোয়া কাগজ, মালিকপক্ষের কাগজ কিন্তু 'দৈনিক বসুমতী'তে যে ছবি ছাপা হয়েছে, তা থেকেও কাউকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই। সবটাই কেমন যেন ধ্যাবড়া, ঝাপসা, কালো। জবর জং কিছু একটা। অনেকটা যেন সেই ইটের গাড়ি টানা জরদগবের জোয়াল বহা কাঁধের বিড়বিড়ে ঘা। কালো চক্র, তার ভেতর লালচে বুজবুজে খানিকটা মাংস। তারই মধ্যে কালো কালো মাছি। বসুমতীর ছবিও কাগজের প্রথম পাতাতেই। কিন্তু সে ছবি দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। না আটকে যাওয়া ট্রেন, না পাবলিক, না জ্যাম, না বিক্ষোভ—কোনো কিছুই না।

'যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা'ও ছবি দিয়েছে। তবে সে ছবি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বা 'দৈনিক বসুমতী'-র মতো প্রথম পাতাতে নয়। তাতে খানিকটা সাইকেল রিকশা, সাইকেল, গো-গাড়ি, লরি, আটকে থাকা মানুষ, ট্রেন। না—কোথাও ট্রেন লাইনের ওপর বসে স্লোগান দেওয়া সুমিত ভট্টাচার্য নেই। কোথাও না। স্টেটসম্যান-এ কোনো ছবি নেই। কেবল খবর আছে।

তবে কি সুমিত ভেবেছিল তার এই অবস্থান, কারাবরণ, প্রতিটি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তার ছবি নাম ছাপা হবে? রেডিওর খবরে নাম বলবে? এই আশা কি তার ভেতরে ভেতরে বহু বছর ধরে বেড়েছে গোপনে? কে জানে?

বন্ধ করে দেওয়া লেভেল ক্রসিং একটু বেলা বাড়তে বাড়তেই খুলে দেয় নানকু। ট্রেন তো সব বন্ধ। যাওয়া-আসা নেই। লাইন চেঞ্জও নেই। কর্ড, মেনের ব্যাপার থাকছে না। সিগন্যাল নিয়ে মাথা ঘামানর দরকার কি? সবই তো এখন লাল। নানকু বরং তার মাথায় বাঁধা গামছাটি খুলে হাত-মুখের ঘাম মোছে। মাথার মাঝখানে টাকে জমে থাকা ঘামের ফোঁটা থুপে নেয় গামছা দিয়ে। তারপর গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খায়। ইটের গাড়ি টানা বলদ জোড়া নিজেদের ঘাড়ে জোয়াল টানা ঘা, তার ভেতর উথলে ওঠা ভিনভিনে মাছি নিয়ে জাবর কাটে। দূরে বালি বঙ্গ শিশু বালিকা বিদ্যালয়-এর মেয়েরা দোতলা, তিনতলার বারান্দা থেকে, ক্লাস ঘরের লম্বা উঁচু জানলা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে বিক্ষোভ দেখার জন্য। বালি মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা টানা মোষের গাড়ি রাস্তা পেরয়।

লোহার চৌকা গাড়ি টেনে সিঙ্গল মোষ। তার মুখে পরিশ্রমের ফেনা। কেন শুধু মোষেরাই ময়লার গাড়ি টানবে? বলদ বা ষাঁড় নয় কেন, এমন খুবই সাধারণ খোলা প্রশ্ন সুমিতকে পীড়িত করে ভেতরে ভেতরে। এর কোনো জবাব পাওয়া যাবে না সুমিত জানে। তবু জিজ্ঞাসা তরঙ্গ তো উঠতেই থাকে।

ইদানীং মিলি সুমিতের সঙ্গে কোথাও গেলে—মানে ট্যুর আউটিংয়ে যাওয়ার সময়, তার ভাইয়ের কন্যেটিকে সঙ্গে নেয়। ছোট শালার মেয়ে বাবি। কিন্ডারকিতে এম এ পড়ছে। কোথাও গেলে তারা দুজনে—মানে মিলি আর বাবি—পিসি আর বাবি ঘরের কোণে বসে পুটুর পুটুর করবে।

মেলামেশা হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিকতাতেই বেড়েছে মিলির ছুঁচিবাই। এটা ওখানে রেখো না, এটা কেন ধরলে, কোন হাতে ধরলে—যাও, হাত ধোও—সদা-সর্বদা একই চেতাবনি। বিরক্ত লাগে সুমিতের। কখনও কখনও প্রতিবাদ করে। কখনও চুপ থাকে। কাঁহাতক আর প্রতিবাদ করা যায়। কতদূর পর্যন্ত। সব সময় খেচামেচি।

মিলির এই ছুঁচিবাই ভাব বহু আগে থেকেই। এমনকি শারীরিক ঘনিষ্ঠতার কাছাকাছি আসতে আসতে বহুবার এমনটি টের পেয়েছে সুমিত। সে সব তো এখন প্রায় অতীতের চুকে বুকে যাওয়া প্রসঙ্গ। নিজেকে এখন প্রায়ই কর্পোরেশনের বাতিল কল মনে হয় সুমিতের।

তো সে যাই হোক, এবার বর্ষা শেষে একটা স্কুলের ১২৫ বছর পূর্তি, সেই উপলক্ষে সুমিতের দিঘা যাওয়া। টানা মোটরে। বছর বারো-তেরোর পুরনো অ্যামবাসাডারে কলকাতার বাগুইহাটি থেকে দিঘা প্রায় ছ ঘণ্টা। কোলাঘাট ব্রিজের মুখে ভয়ানক জ্যাম, তাই সেখানে আটকে থাকতে হল অনেকক্ষণ। কাঁথির এই মডেল স্কুলে কিছু দিন ছাত্র ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘা থেকে কাঁথি তিরিশ কিলোমিটার। সুমিতরা রাতে দিঘাতেই রইল। সঙ্গে মিলি, বাবি।

খুব ভোর ভোর উঠে সমুদ্রের ধারে হাঁটতে গেল সুমিত। নোংরা নোংরা বাতিকে সমুদ্রস্নান করবে না মিলি, বাবি তো নয়ই। দূর আকাশে সূর্য এগরোল তৈরির আগে ফাটান ডিমের কুসুম। চামচ দিয়ে একবার ঘেঁটে দিলেই হল বড় বড় তাওয়ায়, পুরো আকাশ লাল হয়ে উঠবে।

রাতে জল অনেকটা এগিয়ে এসেছে সিমেন্ট বাঁধান ঢালের দিকে। ভোরে তা সরে যেতে কালো কালো বাসি শ্যাওলা, জল-ছাপ। অন্যমনস্ক সুমিত চটি পরে—তার চটির নিচেটা অনেক দিনই ক্ষয়ে গেছে, সেই ক্ষয়া—সমান হয়ে যাওয়া সোল নিয়ে কালচে শ্যাওলার ফাঁদে। ব্যস ধপাস।

পড়ে গিয়ে সুমিত প্রথমে দেখল চারপাশে তাকে কেউ দেখছে কিনা। দেখে ফেলল কি। একটা টেকো, আধমোটা, মাঝবয়েসি পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে হাতের ভরে নিজেকে তুলল সুমিত। সিমেন্ট-পাথর ঢালাই শক্ত জমির ওপর জমে থাকা চোরাই শ্যাওলা আলাদা করে চেনার কোনো উপায় নেই। তারপর সূর্যের বাড়তে থাকা আলোয় যে মায়া বিভ্রম, তাতে কোনটা সরে যাওয়া, পিছিয়ে যাওয়া পুরনো জলের দাগ, কোনটাই বা শ্যাওলা বোঝা মুশকিল।

বাঁ হাতের ভরে আছাড়-মুদ্রা থেকে উঠতে উঠতে সুমিত টের পেল—না, তার পা ভাঙেনি। কোমর অটুট। কলার বোন ভাঙেনি। হাতের কবজি ভাঙেনি। সব ঠিক আছে। সমস্ত কিছু ঠিকঠাক। কেবল বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের কোণায় তীব্র যন্ত্রণা। ডান

হাতের চেটোয় বুড়ো আঙুলের দিকে—ঠিক নিচে যে উঁচু মাংসল জায়গা—সেখানে ব্যথার আভাস।

সুমিতের হাঁটতে ইচ্ছে করল না। খানিকটা ভয়। কিছুটা ব্যথা। ঢালাই করা উঁচু, আয়তাকার সিমেন্টের ওপর বসে পড়ল। হোটেল ব্লু ভিউ'-এর দোতলায়—১৪ নম্বর ঘরে, সরাসরি সি ফেসিং, খোলা সমুদ্র, সুনীল আকাশ এখান থেকেই নজরে পড়ে সবচেয়ে বেশি, সেখানে খাটের ওপর গভীর নিদ্রায়, মিলি-বাবি। সুমিতের ঘরের নম্বর ১৫। সেখানে পৌঁছে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, ঘর খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল পা না ধুয়েই। এখন সে স্বাধীন।

নিচে 'বিলি বয়' নামের খাওয়ার জায়গায় ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে সুমিত তার চোটের কথা বলল। প্রথমে ভেবেছিল বলবে না। তারপর বলেই ফেলল।

পড়ে গিয়ে হাতে চোট পেয়েছি—

মুভ দাও। মাখন ছাড়া টোস্ট চিবোতে চিবোতে বলল মিলি।

মুভ লাগাও পিসেমশাই। একটা পেইন কিলার খাবে।

এসব খুরো কথার কোনো জবাবই দিতে ইচ্ছে হল না সুমিতের। কোনো সহমর্মিতা, সমবেদনা ফিলিংস—কিছুই নেই। এভাবে সংসার হয়। থাকা যায় একসঙ্গে। ভাবতে ভাবতে চায়ের কাপে চুমুক দিল সুমিত।

সেও কি সব দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করে? পালন করতে পারে? এই তো গেলবার পুজোয় বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজ থেকে বিকেল বিকেল রিকশা না পেয়ে তারা মূল শহর থেকে বেশ অনেকটা দূরে শ্যাম রায়ের মন্দির দেখতে গেল, তাতেও অর্বাচীনের রিসক ছিল না কি। সঙ্গে বাবি আর মিলি।

জোড় বাংলা টেরাকোটা মন্দিরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এ মোড় ও মোড়, এ পাড়া ও পাড়া, এ পুকুর সে পুকুর করতে করতে তারা যখন পাথর-দওয়াজার সামনে পৌঁছল, তখনই প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। সারাটা শহর টেরাকোটার মন্দির কিন্তু এখানে কেন ভারী পাথরের দেউড়ি, বুঝতে পারল না সুমিত। অনেকটা যেন দিল্লি, আগ্রা।

সুমিত অবশ্য বলেছিল রিকসা ছাড়া তোরা দুজনে এতটা রাস্তা হেটে যেতে পারবি না।

ঠিক পারব পিসেমশাই। ও তুমি ভেব না। তাছাড়া ফেরার পথে রিকশা পেয়ে যাব।

বড় পাথর দওয়াজা, তার পাশে খানিকটা সবুজ সবুজ কচুরিপানা মোড়ান জলা। তারপরই ছোট পাথর দরওয়াজা। আকাশে ততক্ষণে দশমীর ক্ষীণ তনু চাঁদ পাটি পেতে বসেছে।

বড় পাথর দরওয়াজার আশপাশে কোনো জনবসতি নেই। সবটাই উদোম মাঠ। খানিকটা খানিকটা উঁচু ঢিবির স্থাপত্য কোথাও কোথাও। এমন জায়গায় খুন করে ফেলে দিলেও কেউ টের পাবে না। সুমিতের হাতে একটা তিন সেলের এভারেডি। বাবির হাতে একশো টাকায় কেনা চিনা টর্চ। অসম্ভব জোর সেই আলোয়। ফোকাস খুব ভালো। ছোট পাথর পেরনর পর আরও খানিক রাস্তা। আলিগলি, গোলকধাম। তারপর শ্যাম রায়ের মন্দির। টেরাকোটা। কি অপূর্ব কি অপূর্ব যে কাজ, বলে বোঝান যাবে না। ঠিক যেন সৌরভ গাঙ্গুলির সেঞ্চুরির

কোনো ইনিংসে। বাঙালি সেভাবে পাথর দিয়ে পারে নি বটে। কিন্তু পোড়া মাটিতে, টেরাকোটায় যা করেছে—অসাধারণ।

আবছা অন্ধকারের শ্যাম রায়ের মন্দির আরও যেন রহস্যমাখা। আকাশে দশমীর রোগাটে চাঁদ আলোর ঘুঁটি সাজাতে চাইলেও অন্ধকার তাকে বার বার কিস্তি দিচ্ছে। তিন সেলের টর্চ জ্বেলে জ্বেলে সুমিত মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা দেখতে চাইছে। কালীয় দমন, বৃন্দাবন লীলা, গোষ্ঠযাত্রা, রামায়ণের কোনো কোনো ছবি—অপূর্ব অপূর্ব। সুমিতের কথার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের ক্ষয় লাগা চাঁদও যেন কাশতে কাশতে হাততালি দিয়ে উঠল।

এবার ফিরতে হবে।

প্রায় সাতটা বাজে।

চারপাশ ঘন অন্ধকার।

ফেরাটাতেই ক্যাঁচা হবে—মনে মনে বলল সুমিত।

তারা যখন মন্দিরে ঢুকেছে—তখনই একটা ট্যুরিস্ট বাস ঢুকল মন্দির চত্বরে। সঙ্গে প্রচুর ক্যালর ম্যালর পাবলিক। তারা ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখছে। সুমিতের টর্চ ফোকাশ দিয়ে সবটা দেখার আগেই তারা চলে গেল।

এরপর ফাঁকা রাস্তায় ফেরা।

একটা রিক্সা নেই।

যে দু-একজন দেখা যায়, তারা কেউ বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজ যাবে না। সন্ধের পর পেটে খানিকটা টালমাটাল হওয়ার জিনিসও ঢুকেছে।

এবার হাঁটতে হবে। অন্ধকারে।

শ্যাম রায়ের মন্দির থেকে বিষ্ণুপুর লজ মিনিট পঞ্চাশের রাস্তা।

সুমিত আগে। পেছনে বাবি। সবার শেষে মিলি। সুমিতের হাতে টর্চ। বাবির হাতে টর্চ এখন মিলির কাছে। সরু রাস্তা। একটু চওড়া পথ। আঁকা বাঁকা করতে করতে ছোট পাথর। কোথাও কোনো আলো নেই। ছোট পাথর থেকে বড় পাথরের যে ফারাকটুকু। সেখানে তো শুধুই চাপ চাপ অন্ধকার। মাঝে মাঝে অজস্র জোনাকির ফ্লোয়াড্রন। তাদের ফ্লাইট দেখার মতোই বটে।

ছোট পাথর থেকে বড় পাথর—এই পথটুকু দূরত্বে তেমন বেশি নয়, কত হবে, সিকি কিলোমিটার বড় জোর, কিন্তু তাকে পেরিয়ে আসা, অতিক্রম করাটুকু, সে তো যেন কোন মহাপ্রস্থানের পথেই চলে যাওয়া। আকাশ চাঁদের যেটুকু ছলাকলা, তাতে সামান্যই আলো। তবে ফাঁকা মাঠে জ্যোৎস্না সব সময়ই অনেক বেশি আলোময় মনে হয়। জোনাকির আলো ফুটকিরা তো আছেই। আর আছে বড় পাথরের যে পাথরে ছাদ, তার নিচে আগুন। কারা যেন—তা হবে তিন চারজন মুখের ভেতর রাখা কেরোসিনের ছিটের আগুন আরও ব্যাপ্ত আরও শোভাময়, লেলিহান করে তুলছে।

এ পথ পেরতেই হবে। লোকগুলোক পেরিয়ে পেছনে রেখে চলে যেতে হবে। সঙ্গে মিলি আর বাবি। চাপা গলায় তারা কথা বলছে। মুখের ভেতর থেকে পুচ করে দেওয়া

কেরোসিনে অন্ধকার আরও কালচে হয়ে উঠছে। এই আগুনই হয়ত আজকের প্রতিমা ভাসানে কোনো বিশেষ অলঙ্কার হয়ে উঠবে।

কালো কালো পাথরের নীচে শরতের নিজস্ব ঠাণ্ডা আমেজ। বাঁ দিকে চলছে আগুন খেলার রিহার্সাল। অন্ধকারে তাদের মুখ দেখা যায় না। কেবল বিড়ির আগুন, শুধু চাপা ফিসফাস, অগুনতি জোনাকির টিপ ছাপ।

হাতের বড় টর্চে লম্বা ফোকাস দিয়ে বড় পাথর দরওয়াজাও পেরিয়ে এল সুমিত। সঙ্গে বাবি, মিলি। তারপর তারা খানিক হেঁটে শহরে। শহর বিষ্ণুপুর। ট্যুরিস্ট লজ।

রাতে তারা রাবণ কাটা দেখতে গেছিল। লোকাল সাংবাদিক বন্ধু অর্জুন। এখন ডিস্ট্রিক্ট করেসপনডেন্ট, জেলা সংবাদদাতা। অর্জুন একটা বড় গাড়ি দিল—সুমো। সেও তো লজ থেকে বেশ অনেকটা দূরে। সে দিনই দশমীর রাতে। কাঁচা মাটির রাবণ। তাকে ধনুক থেকে বাণ ছুঁড়ে বধ করবেন রঘুনাথ জিউ। রামের মূর্তি, কষ্ঠি পাথরের। একটি রথ ধরনের জিনিসে তিনি বসে। খুব কাঁসি বাজছে। বড় বড় চেহারার সঙ চারপাশে। ভাল্লুক, হনুমান, অঙ্গদ। নল-নীল, বালি সুগ্রীব, রাক্ষসসেনা।

উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে দশানন। রঘুনাথ জিউ তির ছুঁড়লে কাটা পড়বে। বাণ অবশ্য ভগবানের নামে ছুঁড়বে পুরোহিত। তারপর সেই রাবণের পায়ের মাটি নিতে কাড়াকাড়ি। সেই মাটি ঘরে রাখলে নাকি পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হয় না। লঙ্কাধিপতিকে ন্যাপথলিন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করেনি সুমিত। রাবণ আর রঘুনাথজিউ ঘিরে তখন অনেক লোকজন। যাকে বলে মেলা লেগে গেছে একেবারে। গরম গরম পাঁপড়ভাজা, ঘুগনি, তেলেভাজার গন্ধ। খেলনাপাতি, প্লাস্টিকের বাঁশি। তার পোঁ পোঁ আওয়াজ। নারীদের কলতান, বালিকা-কিশোরীদের কৌতূহল, পুরুষের কলহাস্য। কালো কড়াইয়ের কালচে তেলে ছাড়া হচ্ছে হলুদ পাঁপড়। একদম গোটা একটা মেলা লেগে গেছে। রাবণ কাটার মেলা।

লরির উঁচু ডালার ওপর রাক্ষসরাজ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে। তার পেল্লাই চওড়া গোঁফ, টেনে ধুতি পরার ভঙ্গি, পায়ের ভারী জুতো—সব মিলিয়ে যেন কোনো বাঁকড়ি জমিদার, ফিউডাল লর্ড। এখনই হাঁক দেবে বুঝি। ডেকে নেবে পাইক-বরকন্দাজ, লেঠেলদের। সেই তুলনায় রঘুনাথজিউ অনেক শোভন, ছোট্টখাট্ট। দেবতা মূর্তি সাধারণত যেমন হয়ে থাকে।

যদুভট্টের নামে তৈরি মঞ্চের পাশ দিয়ে অর্জুনের দেওয়া সুমো ফিরে আসছে। নামিয়ে দেবে বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজের সামনে। গেটে কলা আছে। খুলে দেবে গেট। ছোট পাথর দরওয়াজা থেকে বড় পাথর দরওয়াজার যে অন্ধকার, তা এখন আর নেই। আলো মাখা বিষ্ণুপুরের রাস্তা ফাঁকা।

এতক্ষণ মিলির মুখের দিকে তাকানর কোনো অবকাশ হয় নি সুমিতের। কেবল লজে নিজেদের রুমে ফিরে সে শুধু বলেছে, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। ভীষণ রিসক্। অত রাতে তোমাকে বাবিকে নিয়ে ওভাবে হেঁটে হেঁটে হারা উদ্দেশ্যে আসা ঠিক হয় নি। অতটা হাঁটা পথ। অন্ধকার। অচেনা জায়গা—কিছু একটা হয়ে গেলে—

আমার কথা বাদ দাও। বয়স হয়েছে। বাবির কিছু একটা হয়ে গেলে—ভাইকে আমি কি করে মুখ দেখাতাম—

মুখ দেখান তো পরের কথা। অন্ধকারে কিছু করাই তো যেত না। কোনো বিপদ হলে বোকা হয়ে যেতাম একেবারে—

রাবণ কাটা দেখতে নিয়ে গিয়ে অর্জুন হঠাৎই বলেছে, এই যে সঙ দেখছেন না। এরা কিন্তু এই রাবণকাটার আগে থেকে এক মাস ধরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষে করে। চালটা, সবজিটা—। যা পায়, তা ফুটিয়ে কিছু একটা বানিয়ে নিয়ে খায়। ব্রতকে ব্রতও হল, চড়ুইভাতিকে চড়ুইভাতি। রোজই পিকনিক। বনভোজন।

এই সমস্ত সঙেরা? যতজন আছে! সুমিত জানতে চাইল।

হ্যাঁ, সকলে। বেশ একটা মজাই বলতে পারেন। বলতে বলতে টাক চুলকে নিল অর্জুন।

সত্যি, পথে যদি কিছু হয়ে যেত। আমি তো বলছি, আমার কথা আমি ভাবছি না। কিন্তু বাবির?

মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে কতদিন আগে দেখা বালির বাড়ির উঠোনের সেই ছবিটা, তা হবে আজ থেকে বেয়াল্লিশ বছর আগে। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের ঠিক একটু আগে, খাদ্যের আগে, খাদ্যের দাবিতে লাইনে বসে পড়ে ট্রেন আটকে ধরা পড়ে বালি থানার লক আপ থেকে ফেরার পর মা—হেমন্তবালার দু' চোখে ওষ্ঠভঙ্গিতে ফুটে ওঠা সেই চিহ্ন—তুমিও, তুমিও বুঝলে না আমায়। তুমিও বুঝতে পারলে না। কেন যেন নতুন করে মনে পড়ে গেল সুমিতের।

মিলি বার বার বলছে, ইস, বাবির যদি কিছু হত। আমি তো ভাবতে পারছি না আর। সুইসাইড ছাড়া কোনো পথ থাকত না আমার। সুইসাইড করতাম। আত্মহত্যা।

মিলির চোখে সেই অভিমানই হয়ত। যেমন আজ থেকে বেয়াল্লিশ বছর আগে এক বিকেলে, হেমন্তবালার দুটি আঁখি বড় পুত্র সন্তানের প্রতি তাঁর হয়ত বা সেই নীরব প্রণয়-সম্ভাষণ—তার মধ্যে ফ্রয়েড নেই, হ্যাভলক এলিস নেই। ইয়ং, পাভলভ—কিছুই থাকে না। তবু, তবু তো আর্তি কেবল নিজের প্রথম পুরুষ সন্তানের প্রতি—তুমিও, তুমিও বুঝলে না আমায়। শেষ পর্যন্ত তুমিও—তুমিও বিশ্বাসঘাতকতা করলে! যে কিনা নাড়ি ছেঁড়া ধন।

ধন ধন ধন বাড়িতে ফুলের বন

এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন

তুমিও বুঝবে না আমায়। তুমিও বুঝবে না। একান্ত আমার বলতে তো তুমি। তুমিই কেবল—

নিবিড় অন্ধকার চারপাশে।

বাবির যদি সত্যি সত্যি কিছু হয়ে যেত। কি ভাবে মুখ দেখাতাম তাহলে।

সুমিত এখন সি আই এ—

না, না কে জি বি।

কে জি বি কবেই উঠে গেছে সোভিয়েত ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে। এখন তো রাশিয়া।

তো। রাশিয়ার কি সিক্রেট পুলিশ নেই নাকি।

আছে?

নিশ্চয়ই আছে। রাষ্ট্র রাখতে গেলে পুলিশ থাকবে না। তাছাড়া ভ্লাদিমির পুতিনই তো এক্স কে জি বি। প্রাক্তন কে জিবি-র লোক।

এন জি ও-র টাকা খেয়েছে সুমিত।

হয়ত খেয়েছে। কিন্তু সুশীল সমাজের সঙ্গে তো নামছে না।

আবার ওদের সঙ্গেও নেই—মানে সরকারি শান্তি উন্নতি-অলাদের সঙ্গে।

ও কি চায় শিল্প হক? ন্যানো বেরুক সিঙ্গুরে টাটা কারখানা থেকে।

ও কি চাইছে কৃষি জমি—মানে চারশো একর ফিরে পাক কৃষকেরা?

কৃষকদের কমপেনসেসান প্যাকেজ কি মেনে নিল সুমিত?

ধুস, কি একটা ফালতু মালকে নিয়ে আমরা কথা বলছি। কে, কে সুমিত— কোন এইচ পি। কোন শালা হরিদাস পাল। সুমিত কোন এমন কেউকেটা যে ওকে নিয়ে ভাবতে হবে?

শালার নকশাল আন্দোলন করার গপপো কিন্তু ফুটো। একদম বাতেলা। খালি ইনিয়ে-বিনিয়ে এক গপপো মারা, সিমপ্যাথি ক্রিয়েট করার জন্য।

ফোটা শালাকে। ফোটা। ফুটিয়ে দে। ওকে নিয়ে এত ভাবনার কি আছে? আমরা যখন আনডারগ্রাউন্ডে ছিলাম। ওফ্ কত দায়-দায়িত্ব। সেভেনটিজে আমাদের বাঁকুড়ার পুরো বাড়িটাই তখন আর্মারি। পাশেই জঙ্গল না। বিহার, উড়িষ্যা, মেদিনীপুর। গেরিলা লড়াইয়ের দারুণ স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট। আমরা গ্রামের ছেলে। গ্রাম জানি। জানি কেমন করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হয়। ও সুমিত জানে কি। নেহাৎ চাকরি-বাকরি হয়ে গেছে বলে আমরা ওর মতো আমি নকশাল-বড় নকশাল বলে কাঁদুনি গাই না। আনডারগ্রাউন্ডে থেকে লেখাপড়া করা কত অসুবিধার। হস্টেলে থেকে পড়া। কলেজে রাজনীতি। সাতাত্তরে বামফ্রন্ট এসে সব মামলা তুলে নিল না। জ্যোতিবাবু বললেন, সব রাজনৈতিক মামলা তুলে নেওয়া হবে, এমন কি নকশালদের ওপর থেকেও। সব রাজবন্দীরা মুক্তি পাবে। পেলও তো। আমাদের অনেকেরই তো তখন বডি ওয়ারেন্ট। শ্যুট অ্যাট সাইট অর্ডার। সে সব মাথায় নিয়ে লেখাপড়া। হায়ার স্টাডিজ। চাকরির পরীক্ষায় বসা। রেডিও প্রোগ্রাম। কম হ্যাপা গেছে।

সুমিত কোনো দিন আনডারগ্রাউন্ডে ছিল?

থাকতে পারবে? অ্যাবসকনড ছিলও কোনোদিন। আমাদের মতো। আমার মতো?

ফিজিওথেরাপিস্ট শান্তিপ্রসাদ পাল

সোহরাব হোসেন

সন্ধ্যা সাতটা থেকে দশটা—পাক্কা তিন ঘণ্টা তার হাত-পা-মুখের কোনও বিরাম থাকে না। তিনি ক্রমাগত এঘর থেকে ও-ঘর, আর ওঘর থেকে সে-ঘরে ঘোরাফেরা করেন। তিনি অ্যাকের-পর-অ্যাক দু'হাতে এই আলট্রা-সাউন্ড দ্যান তো ওই স্টিমুলেট-যন্ত্র চালু করেন এবং দরকার মতো ট্রাকশনের ওজন কমান-বাড়ান। তিনি মুখের ও স্বরের নানামাত্রার তুলুনি-পাড়ুনি খেলিয়ে অ্যাকবার একে বোঝান তো অন্যবার ওকে নির্দেশ দ্যান ফের আরবার তাকে ব্যায়ামের কৌশল বাতলে দ্যান। তিনি শান্তিপ্রসাদ পাল। নিজেকে ডাক্তারবাবু বলে পরিচয় দিতেই তিনি বেশি পছন্দ করেন। তার কাছে উপশম-প্রার্থী যতো লোক আসে তারা কেউ তাকে শান্তিবাবু বা শান্তিদা কিংবা মিস্টার শান্তিপ্রসাদ বোলে আহ্বান কোরলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বোলে ওঠেন—'অমনভাবে ডাকবেন না প্লিজ। দয়া কোরে ডাক্তারবাবু বোলুন। এটা তো বাড়ি নয় ডাক্তারখানা। বাড়ির সম্পর্ক এখানে অচল, বুঝলেন। যেখানে য্যামন সেখানে ত্যামনই হওয়া দরকার তাই না?'

এহেন শান্তিপ্রসাদ পাল অ্যাক রোগিণীর কোমরে স্টিমুলেট-যন্ত্রের মাত্রা ও সময় বেঁধে দিয়ে দ্বিতীয় ঘর ছেড়ে তৃতীয় ঘরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যেমনি দরজার বাইরে বেরুলেন অমনি বেজে উঠলো বুক-পকেট। মোবাইলের আহ্বান—য্যানো ঘোর বর্ষার মধ্যে কোলাব্যাঙের মত্ততা। মোবাইলটা অ্যামন অসময়ে বেজে ওঠায় তিনি একটু বিরক্ত হলেন। কপাল-কুঁচকে চোখবুজে সে-বিরক্তি প্রকাশও কোরলেন। চকিতে অ্যাকটাবার অপেক্ষমান রোগীদের দিকে তাকিয়ে বোতাম-টিপে ফোন ধোরলেন :

—হ্যাঁ, ফিজিওথেরাপিস্ট শান্তিপ্রসাদ পাল কথা বলেছি।—শান্তিপ্রসাদ তারপর অতিক্রত স্বরক্ষেপণে কথা শুরু করেন—ওহ্ : তুই? সমরেশ? ক্যামন আছিস? কী খবর, তোর?

—...মোবাইলের ওপার কিছু কথা বলায় তারপর নীরব থাকেন শান্তিপ্রসাদ।

—হ্যাঁ অ্যাকদম ঠিক বোলেছিস।—ওপারের প্রসঙ্গ মিলিয়ে তিনি প্রত্যুত্তর দ্যান—আমার এখানেও ওই অ্যাকই চিত্র। গত চার পাঁচদিন ধোরে যতো রোগী আসছে সব মাজার, মানে মেরুদণ্ডের প্রব্লেম নিয়েই আসছে।

—...! —ফের থেমে শান্তিপ্রসাদ ওপারের কথা শোনেন।

—হ্যাঁ এটাও মিলে যাচ্ছে। —এপার থেকে তিনি মাথা নেড়ে জানিয়ে দ্যান—মাজার, মানে এল-ওয়ান থেকে এল-এস ফাইভের সমস্যা নিয়ে গত চারপাঁচদিন যারাই এসেছে সবাই পুরুষই—কথা থামিয়ে স্মৃতি হাতড়ানোর ভঙ্গিতে একটু মাথা চুলকিয়ে ভেবে নিয়ে ফের বলেন—না কোনও মহিলা এই প্রব্লেম নিয়ে আসেনি। তোর পর্যবেক্ষণ সঠিক।

—...! —বন্ধু ফিজিওথেরাপিস্ট সমরেশের কথা শোনার জন্য আবার শান্তিপ্রসাদ কয়েক সেকেন্ড থামেন।

—কী বোলছিল? কেস জন্ডিস লাগছে—ওপারের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এপার থেকে তিনি বিস্মিত বাক্য ছাড়েন—কোথাও গণ্ডগোল, মানে মারদাঙ্গা হয়েছে? তুই নিশ্চিত?—ক্ষণিক থেমে ফের ক'সেকেন্ড ওপারের আলাপ শুনে বলে ওঠেন—হতে পারে বস। রাজনীতিতে সবই হয়। কারা যে কখন কাদের মাজা ভাঙছে...।

কথা যখন অ্যামন ক্লাইম্যাক্সে ঠিক তখনই দ্বিতীয় ঘর থেকে স্টিমুলেটের সময়সীমা শেষ হবার যান্ত্রিক-বাঁশি বেজে ওঠে। অগা শশব্যস্ত হয়ে কথা থামিয়ে দ্যান তিনি—'রাখিরে সমরেশ। পরে কথা হবে।' বোলেই ত্বরিতে দু'নম্বর ঘরে ঢুকে রোগীর কোমরের বাঁধন খুলে অন্য স্থানে বসিয়ে দ্যান পজিটিভ-নেগেটিভ প্লেট। তারপর মেশিন চালু কোরে রোগীর কাছে জানতে চান—'আর একটু দ্রুত কোরে দেবো না এই মাত্রা থাকবে?' রোগী মিনমিন গলায় অ্যাকই মাত্রা রাখার কথা জানালে শান্তিপ্রসাদ যোগা করেন—'আজ আর গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না ক্যানো দাদা? গতকাল তো বেশ গলা ছেড়েই কথা বোলেছিলেন। কী বোললেন, ব্যথাটা বেড়েছে? কতোটা? বাড়ুক-বাড়ুক। সবে তো তিনদিন এলেন। একটু বাড়তে দিন। ক'টা দিন সবুর করুন। শান্তিপ্রসাদের হাতটাকে একটু খেলে ব্যাড়ানোর সুযোগ দিন। হ্যাঁ ওই বারো থেকে পনেরো দিন আসবেন। তারপর গ্যারানটি দিচ্ছি, দৌড়ে ব্যাড়াবেন আপনি।'

যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ রোগীকে সুস্থ হবার আশ্বাস দিয়ে শান্তিপ্রসাদ টেবিলে রাখা অবিরাম জিমন্যাস্টের মতো দোল খাওয়া পুতুলটার দিকে তাকান। তাকিয়ে আশ্বস্ত হন। পুতুলটার ক্রমাগত উল্টোপাকে-সোজাপাকে দোল-খাওয়া মানেই সব কিছু ঠিকঠাক চলা। শান্তিপ্রসাদের ত্যামনই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসে দুলতে-দুলতে তিনি তৃতীয় ঘরে ঢোকেন। এ ঘরে অ্যাতোক্ষণ ঘাড়ের যন্ত্রণায় কাতর অ্যাকজনের হিট-থেরাপি চলছিলো। গরম বায়ুপূর্ণ হটব্যাগের বাঁধন খুলে তাকে ছেড়ে দিয়ে মেরুদণ্ডের কশেরুকার গাঁথুনিতে ফাকা হয়ে যাওয়া অ্যাক রোগিণীকে ডেকে নেন। ভদ্রমহিলা ত্রস্ত পায়ে তিন নম্বর ঘরে ঢুকতে শান্তিপ্রসাদ জানতে চান :

—ক্যামন আছেন? ব্যথা কি আগের মতোই?

—না। সামান্য কমেছে।

—গুড।—আলট্রা-সাউন্ডের যন্ত্রটা ঠিকঠাক সেট কোরতে-কোরতে শান্তিপ্রসাদ নির্দেশ দ্যান—শুয়ে পড়ুন। পিঠের দিক থেকে জামাটা তুলুন। সালোয়ারের দড়িটা খুলে একটু নামিয়ে দিন। আর দাদাকে ডাকুন।

—উনি আজ আসতে পারেননি। —রোগিণী কাঁচুমাচু গলায় উত্তর দ্যায়—আমার কোনও অসুবিধে নেই। আপনি থেরাপি শুরু করুন।

—উহুঁ। —শান্তিপ্রসাদ দৃঢ় গলায় অস্বীকার করেন—মোটেই না। আমি ডিফেন্সে চাকরি করা লোক। এথিক্স আর ম্যানার আমার কাছে অনেক বড়ো।

—মানে? থেরাপি দেবেন না আজ।—রোগিণী অসহায় জানতে চান।

—সে দেখছি। —শান্তিপ্রসাদ ত্বরিত মাথা চুলকান—আসলে যাদের পোশাক সরিয়ে

থেরাপি দিতে হয়, অ্যামন মহিলাকে, অ্যাকা-অ্যাকা চিকিৎসা করিনে আমি। দাদাকে সঙ্গে আনবেন অবশ্যই।

—পরের দিন থেকে অবশ্যই আনবো। —রোগিণী য্যানো গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলো—আজকেরটা দিয়ে দিন, প্লিজ।

—দাঁড়ান দেখছি কী করা যায়।

শান্তিপ্রসাদ দরজা খুলে দ্রুত বাইরে চোলে যান। বাইরে অপেক্ষায় বোসে আছে অনেক রোগী। নানান বয়সের নারী পুরুষ সব। অ্যাক লহমায় প্রত্যেকের দিকে চোখ-বুলিয়ে মাঝ-বয়সী অ্যাক-মহিলাকে ডেকে নেন। তারপর ফিরে এসে রোগিণীর পোশাক উন্মোচন করেন। দুই-নিতম্ব আর মাজার মাঝখানে দিতে হয় আলট্রা-সাউন্ড। ফলে পাছার দিকের অনেকখানি খুলে ফেলতে হয়। শুধু তাই না এনার ক্ষেত্রে ব্যথাটা কুঁচকি পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকায়, উল্টোদিকে কাত্ করিয়ে, সেখানেও ঘষে ঘষে সাউন্ড-যন্ত্রের কম্পন দিতে হয়। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। তাই তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতি জরুরি হয়ে পড়ে। গোড়েছেও। অ্যাখন বোতল থেকে লিকুইড ছড়িয়ে দিয়ে, মেশিন চালু করে, নির্দিষ্ট জায়গায় ঘষতে শুরু করেন শান্তিপ্রসাদ। ঘষতে-ঘষতে জানতে চান :

—কী কোরে বাধালেন এই বিপত্তি? গোড়ে গিয়েছিলেন কখনও?

—না। —উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা রোগিণী উত্তর দ্যায়—আমার জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তো মনে নেই।

—তবে? ভারী-ভারী চাদর বা কাপড় কাচতেন নাকি আছাড় দিয়ে?

—হ্যাঁ। আইবুড়ো-ব্যালায় কাচতাম।

—মনে হচ্ছে তখনই ইনজুরিটা হয়েছিলো। —একটু নামেন তিনি। তারপর জানতে চান—কোমর থেকে নিতম্বের নিচ-বরাবর কাঁপনটা গোড়ালি পর্যন্ত নামছে তো?

—না। হাঁটুর নিচে নামছে না।

—নামছে না?—শান্তিপ্রসাদ কম্পন-যন্ত্রের হ্যান্ডেলটা নিতম্ব ও কোমরের মাঝখানের বিশেষ অ্যাকটা গর্ত-মতোন জায়গায় চেপে ধোরে প্রশ্ন করেন—এবার?

—নাহ :

—যাচ্ছে না?

—না।

—তালেই বুঝুন কতোটা বাধিয়ে ফেলেছেন। যেদিন কাঁপুনি গোড়ালিতে নামবে সেদিন সুস্থ হবেন।

বোলেই আলট্রা-সাউন্ড যন্ত্রের সুইচ অফ কোরে দিয়ে, দরজার ছিটকিনি খটাস কোরে খুলে, বাইরে চোলে যান—একটু অপেক্ষা করুন। ও ঘরের স্টিমুলেট-মেশিনটা অফ কোরে দিয়ে আসি। নড়বেন না। ওইভাবেই থাকুন।' অ্যাক-নম্বর ঘরের রোগীকে হিট-থেরাপিতে বোসিয়ে ফের এঘরে এসে জানতে চান :

—ঘর মোছাটোছা কোরতেন বাড়িতে?

—কোরতাম। —রোগিণী উত্তর দ্যায়।

—আর কোরবেন না, বুঝলেন?

—হ্যাঁ। —রোগিণী অকস্মাৎ ঘাড়-ঘুরিয়ে জানতে চায়—আমি কি ভালো হবো না ডাক্তারবাবু?

—পুতুল তো তাই বোলছে। —শান্তিপ্রসাদ টেবিলের দোলায়মান পুতুলের দিকে তাকিয়ে মিচমিচ হাসতে থাকেন।

—পুতুল বোলচে? —রোগিণীর সঙ্গে-সঙ্গে অন্যজনও বিস্মিত প্রশ্ন করেন—মানে?

—মানেটা খুব সোজা। —শান্তিপ্রসাদ টেবিলে-রাখা ব্যালান্সের পুতুলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন—ফিজিওথেরাপি দেওয়ার সময় যদি ওটি সমানে দুলতে থাকে তবে বুঝবেন সব কিছু ঠিকঠাক চোলছে। আর যদি ওর দোলা থেমে যায় তো বুঝতে হবে কোথাও-অ্যাকটা গোলমাল আছে। ক্যামন?

—হ্যাঁ। —রোগিণী দু'জন অ্যাকদৃষ্টে অ্যাকপাক-সোজা আর ফিরেপাক-উল্টো-গতিতে অনবরত দোলখাওয়া পুতুলটার দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকেন—আমরা ভাবতাম ওটা সো-পিস্।

—মোটেই না।

শান্তিপ্রসাদ দ্রুত মাথা নাড়েন। তার মধ্যেই আলট্রা-সাউন্ড যন্ত্র হুইসেল বাজিয়ে সতর্কতা দ্যায়। আর যন্ত্রের সুইচ অফ কোরে শান্তিপ্রসাদ জানিয়ে দ্যান—কোমরের পর্ব শেষ। এবার কুঁচকিতে দিতে হবে। রেডি হোন তারে। আমি অন্য ঘরদুটো সামলে আসি।' বোলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। সেই অবসরে দুই রোগিণী বাক্যালাপ শুরু করে :

—ডাক্তারবাবুটা একটু পাগল আছে।

—ক্যানো?

—দেখছেন না কন্‌টিনিউয়াস ক্যামন বকবক কোরে যায়।

—ওটা পাগলামি না।

—তবে?

—শুনেছি লাগাতার কথা বোলে যাওয়াটাও পেশার অঙ্গ। বুঝেছো।

—তা বুঝলুম। কিন্তু ওই পুতুল-দোলার ঘটনা। এটাকে কী বোলবেন?

—কী জানি! এক্ষুনি ব্যাখ্যা কোরতে পারছি নে।

—আমি পারছি।

—কী ব্যাখ্যা?

—ওটা ডাক্তারবাবুর পাগলামি ছাড়া কিছু না।

—বোলছো?

—হ্যাঁ বোলছি। ফিজিওথেরাপির সঙ্গে, আমাদের মাজা ব্যথার সঙ্গে, ও পুতুল নাচের কী সম্পর্ক? কিচ্ছু না। অথচ...।

রোগিণীর কথা শেষ হবার আগেই দরজা-ঠেলে শান্তিপ্রসাদ এ ঘরে ঢোকেন। দুই

রোগিণীর অপ্রস্তুত মুখের দিকে ক্ষণিক তাকিয়ে থাকেন। তারপর আলট্রা-সাউন্ডের যন্ত্রটা রোগিণীর কুঁচকি থেকে পিঠের একপাশ পর্যন্ত ঘষতে-ঘষতে বলেন—'তো যে কথা বোলছিলাম, খেয়াল কোরে দেখেছেন নিশ্চয়ই, যে-তিনটি ঘরে আমি ফিজিওথেরাপি কোরি সবকটার টেবিলে এই জিমন্যাস্টিকের দোল-খাওয়া পুতুল রাখা আছে। ওরাই আমার ইন্ডিকেটর। কতো কী সংকেত যে ওরা দ্যায়।' শান্তিপ্রসাদ হঠাৎই কথা থামিয়ে দ্যান। ডান হাতে যন্ত্র ঘষতে-ঘষতে বাঁ-হাত বাড়িয়ে দোদুল্যমান পুতুলটাকে চেপে ধোরে নামিয়ে দ্যান। তারপর রোগিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—'যাচ্ছে কম্পন অ্যাখন?' রোগিণী অস্ফুটে 'না' বলেন। আর শান্তিপ্রসাদের মুখে ফুটে ওঠে রহস্যলাগা হাসি। তিনি চকিতে পুতুলটাকে ছেড়ে দ্যান। যন্ত্রের পুতুল আবার দুলতে থাকে। তিনি সেদিকে তাকিয়ে ফের রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করেন—'এবার কী বুঝছেন?' রোগিণী ঝ্যানো বশ হওয়া মানুষ। বলে—'বার্তা পাচ্ছি ডাক্তারবাবু। তিরতির কাঁপন আর স্বস্তির বার্তা চারিয়ে যাচ্ছে কোমর থেকে কুঁচকি, কুঁচকি থেকে হাঁটু পর্যন্ত।'

দুই

বিগত ক'দিন ধোরে চারপাঁচজন রোগীকে নিয়ে বেশ বিপাকে পোড়েছেন শান্তিপ্রসাদ। নয়-নয় কোরে ফিজিওথেরাপিতে পনেরো বছর হাত-পাকাচ্ছেন। কিন্তু অ্যামনটা কখনও ঘটেনি। সাত-সাতটা দিন আলট্রা-সাউন্ড থেরাপি চোলছে অথচ উন্নতির ছিটেফোঁটাও পর্যন্ত হয়নি। পাঁচজন রোগীই পুরুষ। চারজন তরুণ-যুবা। কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে বয়স। অ্যাকজন মাঝ-বয়সি, বয়স বোঝা মুশকিল। তবে চল্লিশের নিচে নয় কোনওমতেই। প্রথম চারজন আসে সন্ধে-সন্ধে। পঞ্চমজনা আসে অ্যাকদম শেষে। রাত পৌনে দশটায়। প্রথম চারজনের ক্ষেত্রে শামুক-গতিতে সামান্য উন্নতি হলেও শেষের জনের অবস্থা নট-নড়ন-চড়ন। প্রথম চার জনের চিকিৎসা যখন চলে তখন জিমন্যাস্ট-পুতুল খুব ধীরে দোলে। কিন্তু শেষের জন যখন আলট্রা-সাউন্ড নেয় তখন পুতুলটা থেমে থাকে। বারবার দুলিয়ে ভারসাম্যকে পিন-পয়েন্টে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কোরেও ব্যর্থ হন শান্তিপ্রসাদ। প্রথমদিন ভেবেছিলেন যার বলে দোলে পুতুল সেই স্প্রিং-টাই বোধহয় নষ্ট হয়ে গেছে। পরে প্রমাণিত হয়েছে খারাপ হয়নি পুতুলের কলকব্জা, ঠিকই আছে। পুতুল ঠিক আছে অথচ সেটা দুলছে না, থেরাপিতে কাজ হচ্ছে না—অ্যামনটা হওয়ার কথা নয়। নয় বোলেই ভাবনা। দ্যাখন-যন্ত্রে আলো ফেলে এম. আর. আইয়ের ফটোপ্লেট তাই বারবার পরীক্ষা করেন শান্তিপ্রসাদ অবসর সময়ে রিপোর্ট নিয়েও নাড়াচাড়া করেন। কিন্তু না কিছুতেই কিছু কোরতে পারেন না।

তার ওর নতুন বিপদ, দীর্ঘ পনেরো বছুরে ফিজিওথেরাপিস্টের জীবনে যা কখ্‌কোনও হয়নি, এই পঞ্চম জনের সঙ্গে বছর ত্রিশের যে মহিলা আসেন তার দেহে আলট্রা-সাউন্ড দেওয়ার সময় পিঠের আবরণ উন্মোচন কোরলেই কামনায় কেঁপে ওঠে তার মন। হ্যাঁ গত ক'দিন ধোরে অ্যামনটাই হচ্ছে। অথচ হওয়ার কথা নয়। ব্যাপারটা তার পেশার নীতি-বিরোধী। যখন সে ফিজিওথেরাপির কোর্স করেছিলো তখন প্রায় প্রত্যেক স্যারই

এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দিতেন। বিশেষ কোরে আর. কে. পি-স্যারের ক্লাসের কথা তার আজও মনে পড়ে। অ্যাকদিনের ইন্‌টার‍্যাকশনের কথা অ্যাখনও তার কানের পর্দায় য্যানো আঘাত করে। তখন তারা শেষ-বছরের ছাত্র। স্যার বোলেছিলেন :

—সব্বাই অ্যাকটা কথা মনে রাখবে, ফিজিওথেরাপিস্টের পেশা বড়ো নাজুক!

—ক্যানো স্যার?—আচমকাই শান্তিপ্রসাদ জানতে চেয়েছিলেন।

—কারণ এ পেশা মানুষের দেহ-নিয়ে কারবার করে। রোগীর দেহের অনেক অনাবৃত অঙ্গে তোমাদের স্পর্শ পোড়বে। তাতে কী রোগী কী থেরাপিস্ট দু'পক্ষেরই অস্বস্তি আসতে পারে। অ্যামন সময় নিজেকে সামলে রাখতে হয়। রোগীর অস্বস্তি কাটিয়ে দিতে হয়। নইলে বিপত্তি বাধে।

—ক্যামন কোরে ওই বিপত্তি কাটানো যায়, স্যার।

—খুব সহজে। ক্রমাগত কথা বোলে। গল্প কোরে। নিজের পেশার, চিকিৎসা পদ্ধতির, বিবরণ দিয়ে। ক'টা রোগীকে তুমি সারিয়েছো, কতোটা কঠিন রোগীকে ম্যাজিকের মতো উপশম দিয়েছো—এসব কথা ক্রমাগত জানিয়ে।

—এতেই হবে?

—হবে। নিজের কামনা দূর হবে। রোগী সহজ থাকবে।

আর. কে. পি-স্যারের এই পরামর্শ বেদবাক্যের মতোই এ যাবৎকাল মেনে এসেছেন শান্তিপ্রসাদ। রোগীর, বিশেষ কোরে রোগিণীদের, জঙ্ঘা কিংবা বক্ষস্থলের থেরাপি করানোর সময় অনর্গল বকবক কোরে যান তিনি। বছর পাঁচেক আগে প্রায় কাদার দলার মতো, অ্যাকপ্রকার হাড়গোড়হীন, বাঁদিকে জন্ম থেকেই ঘাড়-কাত্‌অলা যে বালকটিকে হাঁটচলা করিয়েছিলেন তার গল্প বলেন। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই কোরে কীভাবে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সে-বিবরণীও দ্যান। তাতে কাজ হতো, অ্যাখনও হয়। ব্যর্থতা কেবল এই একটি ক্ষেত্রে দ্যাখ্যা যাচ্ছে।

তার তাতে নিজের ওপর ভয়ানক রেগে যাচ্ছেন শান্তিপ্রসাদ। রেগে গিয়ে প্রতিজ্ঞা কোরলেন আজ আর কিছুতেই নীতিচ্যুত হবেন না। হ্যাঁ কোমরের এল-ওয়ান থেকে এল-এস-ফাইভের অবস্থান সরে-যাওয়া পঞ্চমজন ওই রীতেশবাবুর সামনেই ওনার সঙ্গে আসা অমলা দেবীর থেরাপি দেবেন। উদাসীন নিরাসক্তভাবেই দেবেন। মন-নড়ে-যাওয়ার সামান্য আভাস পেলেই তার ফিজিওথেরাপিস্ট হওয়ার রহস্য গল্পটিই ফেঁদে বোসবেন। এবং সর্বপ্রকার অস্বস্তি কাটিয়ে জয়ী হবেন। —এই বাসনায় রীতেশবাবুকে আগে না দিয়ে, আজ, অমলা দেবীকেই প্রথমে বেছে তুললেন। ব্লাউজের অ্যাকদিকের হাত খুলে উপুড় হয়ে শুয়ে রোগিণী তৈরি। অনাবৃত দুধে-আলতা রঙের পিঠ। সেদিকে তাকিয়েই কেঁপে উঠলেন শান্তিপ্রসাদ। আজ য্যানো রোগিণীর পিঠ আরও মোহময়। চকিতে তিনি পুতুলের দিকে তাকালেন। না দুলছে না। প্রমাদ গুনলেন তিনি। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে অমলা দেবীর পিঠে লিকুইডের কৌটা ফেলে চালু কোরলেন আলট্রা-সাউন্ড যন্ত্র। সঙ্গে মুখও :

—জানেন তো জেলাশহরের সব ডাক্তারই আমার ওপর ভরসা করেন।

—না। —অমলা দেবী টুক কোরে উত্তর দ্যায়—আমি, মানে আমরা দুজনই, এ শহরে নতুন শান্তিদা।

—উহুঁ। শান্তিদা নয় ডাক্তারবাবু বলবেন ক্যামন?

—হ্যাঁ।—অমলা দেবী শুধরে নেয়—আমরা আপনার সম্পর্কে সে-অর্থে কিছুই জানিনে ডাক্তারবাবু!

—শুনবেন আমার কথা?

—বোলুন।

শান্তিপ্রসাদ, তারপর গড়গড়িয়ে বোলে যান নিজের অতীত। মাতাপিতৃহীন জীবনে মামার বাড়িতে থেকে মানুষ হবার অনন্ত লড়াই দিতে হয়েছিলো তাঁকে। মামার ছিলো ছা-পোষা সংসার। তাই আট ক্লাশে উঠতে-না-উঠতেই পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলো মামা। ক'দিন স্কুল বন্ধ রেখে অ্যাকটা লেদ-কারখানার কাজেও লেগে পোড়েছিলেন তিনি। এবং মারাত্মক কষ্টকর সেই কাজের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ষ্যামন কোরেই হোক পড়াশুনা চালিয়ে যাবেন। অনেক ভেবেচিন্তে ধোরেছিলেন বড়োলোক বাড়িতে ম্যাসাজ করার কাজ। সকাল-বিকেলে কাজ কোরতেন। দিনে চলতো স্কুল। আর রাত জেগে পড়াশোনা। তো ম্যাসাজ কোরতে-কোরতে, নানা বয়সের নারী পুরুষের গা-টিপতে-টিপতে ওই টেপাটিপির নেশাতে পেয়ে বোসেছিলো শান্তিপ্রসাদের। নেশা-বোলতে-নেশা মারাত্মক নেশাতে মজে গিয়েছিলেন বলা যায়। বি.এ-পাশ কোরে অ্যাকটা কোম্পানিতে কেরানিও হয়েছিলেন ক'দিন। কিন্তু হাত তার টেপাটিপির জন্য নিশপিশ কোরতো। মন খারাপ থাকতো। সে অ্যাক দমবন্ধ অবস্থা। ভয়ংকর টানাপোড়েনের দিন গেছে সেসব। অ্যাকদিকে কেরানির চাকরি। আয় পাতি আর সংসার পাতার সুযোগ। অন্যদিকে তার ভিশন। বডি-ম্যাসাজের জাদুতে বাঁকা-কোমর কিংবা ভাঙা-মাজা মানুষকে সারিয়ে তোলার নেশা। শান্তিপ্রসাদ যেদিন রিস্ক নিয়েছিলেন। যুদ্ধ কোরেছিলেন। এবং শেষতক অ্যাক বন্ধুর পরামর্শে টেপাটিপির লাইনে থাকার জন্য পেশাদারি পথে ফিজিওথেরাপিস্টের কোর্স কোরে তবে স্বস্তি মিলেছিলো।—ম্যাসাজম্যান থেকে ফিজিওথেরাপিস্ট হওয়ার সিঁড়ির বিবরণী দিয়ে শান্তিপ্রসাদ অমলা দেবীর পিঠের দিকে অপলক তাকিয়ে নীরবে ছিলেন। সেই ফাঁকে রোগিণী উসকে দিয়ে জানতে চেয়েছিলো :

—আপনি তালে বডি-ম্যাসাজও কোরতে পারেন?

—পারি।—শান্তিপ্রসাদ গর্বভরে বলেন—শুধু পারি তাই নয়, দেহ টেপার কাজেও রীতিমতো দক্ষ আমি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ তো।—আবেগ-প্রাবল্যে শান্তিপ্রসাদ বোলে ওঠেন—প্রমাণ নেবেন?

—নেবো। দিন-না দেখি পিঠটা ম্যাসাজ কোরে।

সদর্পে নেশা-পাওয়া মানুষের মতোই, আলট্রাসাউন্ড যন্ত্রটা বন্ধ কোরে, শান্তিপ্রসাদ দু'হাত রাখেন অমলা দেবীর গোলাপি-মোহময় পিঠে। তারপর যেমনি বিচিত্র কৌশলের

চাপ দ্যান অমনি অমলা দেবী কথা বলেন—'আহা! আরাম! ভারি আরাম লাগছে শান্তিদা!' শান্তিপ্রসাদ চমকে ওঠেন। রোগিণীর কণ্ঠেও কামনার ইশারা পান। এবং মুহূর্তে সামলে নিয়ে জানান—'ব্যাস্-ব্যাস্। এটা আরামের জায়গা নয়। উঠুন। রীতেশবাবুকে বেড ছেড়ে দিন।' বোলেই অমলা দেবীকে কাপড় ঠিক কোরে নেবার অবকাশ দিতে তিনি বাইরে যান। তারপর ফিরে এসে নজর দ্যান রীতেশবাবুর দিকে। রীতেশবাবুর অ্যাখন আলট্রা-সাউন্ড থেরাপি চোলছে। তিনিই শেষ রোগী। বাইরে ফাঁকা। যে ওষুধের দোকানে তিনি চেম্বার চালান তারাও নীরব অপেক্ষা কোরছে। শান্তিপ্রসাদ যন্ত্র চালু কোরে একটু চেঁচিয়ে দোকান-মালিককে আশ্বস্ত করেন—'আর দশ মিনিট পার্থবাবু!' তারপর মুখ-ঘুরিয়ে সাউন্ডযন্ত্রে চোখ রেখে রীতেশবাবুর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দ্যান :

—কোমর ছেড়ে কম্পন পায়ের দিকে নামছে?

—না।—রীতেশবাবু দৃঢ় উত্তর করেন।

—নামছে না?

—না।—রীতেশবাবু সামান্য হাসেন—আর নামবেও না, বুঝলেন।

—ক্যানো?

—নামবে না, আমাদের কেউ কাঁপাতে পারে না বোলে। ফের...।

—ফের কী?—রীতেশবাবুর কথায় বাঁকা-বাতাসের গন্ধ পেয়ে শান্তিপ্রসাদ দ্বিরোক্তি করেন—ফের কী?

—ফের আমরা সবাইকে কাঁপাই বোলে। —রীতেশবাবু ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে অমলা দেবীর দিকে তাকান—অথচ আপনি ট্রিটমেন্ট কোরছেন উল্টো! আমাদের কাঁপাতে চাইছেন। এটা হয় নাকি?

—মানে?

—মানে-ফানে পরে বুঝবেন। —রীতেশবাবু ঘ্যানো সামান্য বিদ্রুপ মিশিয়ে ফের বলেন—এবার অন্য কথা শুনুন।

—বলুন। জীবনে এই প্রথম কোনও রোগীর দিক থেকে ট্যারা বাক্যের আভাস পেয়ে শান্তিপ্রসাদ ঠান্ডা মেরে যান।

—বোলছি অমলার পিঠে নোলা রাখার অপরাধে অ্যাতোক্ষণ আপনাকে কাঁপিয়ে দিতাম বুঝলেন! দিলাম না শুধু অ্যাকটা কারণে।

—কী কারণে? —শান্তিপ্রসাদ সামান্য ভয় পেয়ে জানতে চান।

—আপনিও আমাদের মতো জনযোদ্ধা বোলে।

—মানে?

—আপনার অতীত ইতিহাস যা বোললেন ও-লড়াই তো জনযোদ্ধারাই দ্যায়। আপনার যুদ্ধও জনযুদ্ধ। হাজার মানুষকে এই ধ্বজভঙ্গ-দশা থেকে মুক্তি দিয়ে আপনি সোজাভাবে দাঁড় কোরিয়ে দিচ্ছেন আমার মতে এটাও জনযুদ্ধ। তাই...। —রীতেশবাবু ফট কোরে থামেন। তারপর শান্ত কিন্তু কাটাকাটা স্বরে বলেন—অনেক কাঁপা কাঁপিয়েছেন।

এবার স্টিমুলেট ধরুন। আর অ্যাক সপ্তাহ সময় পাবেন। তার মধ্যে সারিয়ে দিতে হবে। পাথর হয়ে আর কতোদিন বোসে থাকবো? বোসে থাকলে তো আমাদের চোলবে না। যা করার অ্যাক-সপ্তার মধ্যেই করুন। এটাই শেষ কথা। বুঝলেন?

মাথা কিংবা ঘাড়-নেড়ে হ্যাঁ বোলতে ভুলে যান শান্তিপ্রসাদ। তিনি টেবিলের দিকে তাকান। হ্যাঁ প্রত্যাশামতোই অনড় জিমন্যাস্টিকের পুতুল। সেদিকে সামান্য সময় চেয়ে থেকে রোগীর দিকে দৃষ্টিপাত কোরতেই দ্যাখেন, ভিজিট বাবদ পঞ্চাশ-পঞ্চাশ একশ টাকার নোট বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অমলা দেবী, টাকাটা শান্তিপ্রসাদের হাতে দিয়ে বোলেন—'পুতুল নাচান শান্তিদা। অনড় ক্যানো?' বোলেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

তিন

অপমানে চোখ মুখ লাল হয়ে গ্যালো শান্তিপ্রসাদের। অপমান তার ব্যক্তিত্বের। পেশারও। পুতুল তো নাচারই কথা। নাচছে না মানে কোথাও ভালোরকম গণ্ডগোল আছে। বেশ-কোরে ভাবেন তিনি। আলট্রা-সাউণ্ডের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্রমবর্ধমান গুণ-ভাগ-যোগ-বিয়োগ আরও অ্যাকবার করেন। স্টিমুলেটের তিড়িক-তিড়িক মাত্রা ঠিক আছে কিনা পরখ করেন। না কোথাও হিসেবে কোনও ভুল নেই। তবে কি ভুলটা রোগ কিংবা রোগীতে আছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা মনের মধ্যে আসার আগে মোবাইল বেজে ওঠে। ও প্রান্তে সমরেশ। দু'জন বাক্যালাপ করে। ডায়ালগ-বিনিময় হয় :

—কে সমরেশ বোলছিস?—শান্তিপ্রসাদ মাথার চাপ হালকা কোরতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন—বল ক্যামন আছিস? চেম্বার শেষ কোরেছিস আজ?

—হ্যাঁ। —ও প্রান্তে সমরেশ যোগ করে—নতুন রোগীদের ব্যাপার সব ঠিক আছে হ্যাঁরে?

—না। ক্যামন অদ্ভুত ঠেকছে। আলট্রা-সাউণ্ড সিস্টেম ফেল কোরছে। কম্পন দেছে-দেছে চাউর হচ্ছে না।

—হবে না।

—ক্যানো?

—ক্যানোর কথা পরে বোলছি। তার আগে শোন, শুধু আমার তোর কাছে না, আমি খবর নিয়ে জেনেছি শ্যামল-দেবাশিস-বিবেক-রামলাল-অনুপ-সংঘমিত্রা-কল্যাণী সবারই অ্যাক অভিজ্ঞতা।

—তাই? —শান্তিপ্রসাদ বিস্মিত হয়—তালে এরা কি কোনও চক্রের অঙ্গ?

—হ্যাঁ তো। জানিসনে?

—না।

—দেশের মধ্যে এরা জনযুদ্ধ চালাচ্ছে। জমি নিয়ে যে খুনোখুনি দেশে চোলছে এরা তার সক্রিয় যোদ্ধা। পুলিশের ভয়ে অ্যাখন দেশময় ছড়িয়ে এইভাবে গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

—তালে তো এরা অপরাধী।

—হতেও পারে। ফের নাও হতে পারে। —সমরেশ সাবধানী দ্যায়—তাতে তোর কী? ও বিচারে তুই যাবি ক্যানো?

—যাবো না?

—না। তোর চিকিৎসা করার কথা কোরবি। ব্যাস্।

—কিন্তু ওরা নিখাদ রোগী নয় বোলে থেরাপি সিস্টেমটা যে ফেল কোরছে সেটাও কি ওদের জানাবো না?

—না।

—তবে কী কোরবো?

ওপার কোনও উত্তর দেবার আগেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। শান্তিপ্রসাদ সংযোগসূত্র রক্ষা কোরতে সচেষ্ট হন। পারেন না। অ্যাকবার-দুবার-তিনবার ব্যর্থ হয়ে রেগে যান। এবং মনস্থ করেন ডাক্তার হিসেবে কাউন্সিলিং কোরে রীতেশ অমলা দেবীকে সব জানানো দরকার। তিনি সে উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়েন :

—'মে আই কাম ইন স্যার।'—শান্তিপ্রসাদ রীতেশবাবুর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেন। অসম্ভব গম্ভীর স্বর। কব্জির ঘড়িতে এগারোটা দশ। রাত্রি গাঢ় তবে নিশুতি নয়। তাদের এই শহর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে বোলে চেম্বার বন্ধ করার পরও অন্যের বাড়িতে আসতে পেরেছেন শান্তিপ্রসাদ। রীতেশবাবু আর অমলা দেবীও জেগে আছে। সদর দরজা বন্ধই। খোলা-জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল না-টিপে, শান্তিপ্রসাদ আবার প্রার্থনা জানান—'মে আই কাম ইন স্যার।'

জানালার পর্দা সরিয়ে কৌতূহলী উঁকি মেরেই অমলা দেবী 'আরে শান্তিপ্রসাদদা যে, আসুন-আসুন' বোলে আহ্বান জানিয়ে দুধ-উথলানো উচ্ছলতায় দরজা খুলে দ্যায়। এবং শান্তিপ্রসাদ ঘরে ঢুকলে একশ-আশি ডিগ্রি ঘুরে রীতেশবাবুর দিকে কথার অভিমুখে ঘুরিয়ে বলে—'দ্যাখো মহম্মদই পর্বতের কাছে এসেছেন।' রীতেশবাবু দৃশ্যত বিরক্ত, তবুও নাগরিক ভদ্রতার খাতিরে, ছদ্ম-প্রসন্নতার রেখা মুখের চামড়ায় ফুটিয়ে বোলতে বাধ্য হয়—'বোসুন।' শান্তিপ্রসাদ বোসলে রীতেশবাবু সরাসরি জানতে চায় :

—অ্যাতো রাতে? কী উদ্দেশ্যে? জরুরি কিছু?

—হ্যাঁ—শান্তিপ্রসাদ দৃঢ় গলায় জানান—জরুরি। তবে সেটা আমার দিকে নয়।

—কার দিকে? —রীতেশবাবু থমথমে গলায় জানতে চায়।

—আপনাদের।—চেম্বারে বাইরে হলেও শান্তিপ্রসাদ কণ্ঠে ও আদবে ফিজিওথেরাপিস্টের কেতা বজায় রেখে উত্তর দ্যান।

—মানে?

—ফিজিওথেরাপিস্ট হিসাবে আমার যা অভিজ্ঞতা, যা কিছু অর্জন বা সাফল্য, তার নিরিখেই বোলছি আপনাদের পাঁচজনের মাজার প্রব্লেম সারার নয়।

—মানে?

—সারার নয় মানে সারার নয়। ও কোনওদিন সারবে না।

—সারবে না মানে? বোলছেন কী আপনি? আপনারা আছেন কেন তবে? রোগ সারাবার জন্য নয় কি?

—হ্যাঁ অবশ্যই আমরা রোগ সারাবার জন্যই আছি। তবে তার মধ্যে অ্যাকটা কথা আছে।

—কী কথা?

—আমরা আছি। থাকবো এবং রোগও সারাবো। তবে সে রোগ অবশ্যই মেডিক্যেল-কারণে হওয়া চাই।

—মানে? আমাদের রোগ তবে কোন কারণে হলো—রীতেশবাবু উত্তেজিত জানতে চাইলো।

—রাজনৈতিক কারণে।—শান্তিপ্রসাদ একটুও উত্তেজিত না হয়ে স্বাভাবিকের চেয়েও শান্ত কণ্ঠে বোলতে শুরু কোরে দিলেন—আমার থেকে আপনারাই ভালো জানেন। আপনারা জনযোদ্ধা। রোগের জন্য রোগ সে আপনাদের হয়নি।

—মানে?

—মানে সাধারণভাবে লোকের রোগ হয়। হয় নানা বৈজ্ঞানিক কারণে কিংবা দুর্ঘটনার জন্য। সাধারণ মানুষ যারা যাদের রোগ হয় তারা বেছে রোগ নেয় না। আর আপনারা রোগ বেছে নিয়েছেন। লোকের মাজা ভেঙে দিতে গিয়ে নিজেদের মাজায় আঘাত খেয়েছেন।

—বেশ তাই সই।—রীতেশবাবু অধৈর্য হয়—তো তাতে কী হলো?

—আলট্রা-সাউন্ড ফেল। স্টিমুলেট-সিস্টেমও কোনও ফল দিচ্ছে না। শুধু...।—শান্তিপ্রসাদ হঠাৎ থেমে যান।

—শুধু কী?

—শুধু বডি-ম্যাসেজে সামান্য আশার আলো দেখছি।

—শান্তিবাবু।—রীতেশবাবু হঠাৎই চাপা জলবোমার মতো খেপে যায়—সাবধান!

উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে রীতেশবাবু। শুধু কাঁপা নয় উঠেও দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে শান্তিপ্রসাদের চোখে লাল-চোখ রেখে গরগর কোরছে—'শুনুন মোশাই, অনেক সহ্য কোরেছি। রাত দুপুরে আর নাটক কোরবেন না। যান চোলে যান। যা বলার চেম্বারেই বোলবেন। যান এক্ষুণি চোলে যান!'

আবার খানিকটা অপমানের হলকা শান্তিপ্রসাদের চামড়ায় লাগে। তিনি তোয়াক্কা করেন না। রীতেশবাবু যতো ডিগ্রি চড়া সুরে কথা বোলছেন তিনি ততো ডিগ্রি মাইনাস গ্রেডে গলা নামিয়ে উত্তর কোরলেন—'রাগবেন না প্লিজ। আমি ডাক্তার। আর্মিতেও কাজ কোরেছি। মিথ্যে কাউন্সিলিং কোরতে পারবো না। কোনও বৈধ-ডাক্তারি মতে আপনাদের মাজা ভাঙেনি। হাজারো বাঁকা-মাজা সোজা কোরেছি। আপনারা সে জিনিস নন। আমার আয়ত্তের বাইরে আপনারা। এ রোগ সারাবার নয়। সারবারও নয়। শুধু...!'

—'চুপ, অ্যাকদম চুপ। আর অ্যাকবারও বডি-ম্যাসাজের কথা মুখে আনবেন না।'—রীতেশ ফের হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। দু'হাত বাগিয়ে শান্তিপ্রসাদের দিকে এগিয়ে যায়। তবে অঘটন কিছু ঘটে না। তার আগেই এগিয়ে আসে অমলা। রীতেশের সামনে দাঁড়িয়ে, য্যানো ক্ষমামূর্তি, বলে—'তুমি ধৈর্য হারাচ্ছো, ভিতরে যাও।' এবং ম্যাজিক রীতেশ ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। ততোক্ষণে অমলা শান্তিপ্রসাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে—'কিছু মনে কোরবেন না আপনি। বাড়ি যান শান্তিদা। আমরা কালকে কথা সময়ে আলট্রা-সাউন্ড নিতে যাবো।' এবং আবারও ম্যাজিক, শান্তিপ্রসাদ দ্বিতীয় বাক্য-ব্যয় না কোরে প্রস্থান করেন।

—'মে আই কাম ইন স্যার।'—চারদিন বাদে ফের শান্তিপ্রসাদ রীতেশ অমলার জানালায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানান। অতঃপর দরজা খোলার এবং অমলা দেবীর আহ্বানের অপেক্ষা করেন। অ্যাক্-দুই-তিন-চার কোরে পাঁচ মিনিট কেটে যায়। না কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। যায় না বোলে জানালার পর্দা-সরিয়ে শান্তিপ্রসাদ ঘরে উঁকি দ্যান। আগুন-রঙা জিরো-বাল্‌বের অ্যালোময় শূন্য ঘর। তা দেখে তিনি, একটু জোরে, ফের প্রার্থনা জানান—'মে আই কাম ইন স্যার।'

এবার কাজ হয়। ভিতর-ঘর থেকে দ্রুত পদশব্দ বাইরের ঘরে আসে। ক্যামন অ্যাকটা ধাতব-যান্ত্রিক শব্দে সিটকিনি খোলার পর রীতেশবাবু আহ্বান করে—'আসুন।' শান্তিপ্রসাদ অ্যাকটা চেয়ারে বোসে সরাসরি কথা শুরু করেন :

—আপনাদের রোগ সারবার নয় রীতেশবাবু।

—ক্যানো? —রীতেশবাবু কিছুটা রুক্ষ স্বরে জানতে চান।

—আলট্রা-সাউন্ড ব্যর্থ। হিট-থেরাপি ব্যর্থ। স্টিমুলেট-ব্যবস্থা ব্যর্থ। —ধীরকণ্ঠে শান্তিপ্রসাদ জানিয়ে দ্যান।

—আর আপনার টেঁপাটিপির থেরাপি?—রীতেশবাবু বিদ্রূপভেজা বাক্য হানে।

—ওইটা শুধু অ্যাপলাই কোরতে বাকি।

—ওটা বাকিই থাকবে বুঝলেন?

—বুঝেছি।

—বেশ বুঝেছেন যখন তখন ফিরে যান। রাত অনেক হয়েছে।

—হোক। —শান্তিপ্রসাদ অত্যাধিক শান্ত গলায় পাল্টা দ্যান—একটু কাউন্সিলিং দরকার।

—মানে?

—মানেটা বুঝিয়ে বোলতেই এসেছি। অমলা দেবীকেও ডাকুন।

—ও আসবে না। যা বলার আমাকেই বোলুন। ওদিকে হাত বাড়াবেন না।

—আচ্ছা তাই বোলছি।—শান্তিপ্রসাদ মৃদু কম্পনে বোলতে লাগলেন—আপনাদের রোগটা ব্যামন তেমনি তার কারণটাও অবৈধ।

—মানে?—রীতেশ উত্তেজিত হয়—কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে শিল্প হবে আমরা বাধা দেবো না? কৃষকের হয়ে লড়বো না? আমরা জনযোদ্ধা। জমিখেকোদের মাজা ভেঙেছি। ভাঙতে গিয়ে আঘাত পেয়েছি। এতে অবৈধের কী আছে?

—অবৈধতা জমেছে রাজনীতির কারণে। রাজনীতির আবর্ত তুলে জল ঘোলা করার কারণে। আঘাতটা যদি মেডিক্যালি-অ্যাপ্রুভ্ড্ হতো তো কথাই থাকতো না।

—মানে?

—থানা থেকে আমার কাছে কয়্যারি এসেছে। ওরা জানতে চেয়েছে অচেনা কোনও রোগী মাজার প্রব্লেম নিয়ে এসেছে কিনা।—শান্তিপ্রসাদ স্বকীয় শান্ত-মুদ্রায় লীন হয়ে ঘোষণা দ্যান।

—আপনি কী বোলেছেন?—য্যানো জোঁকের মুখে নুন পোড়েছে অ্যামন চুপসে-যাওয়া ভঙ্গিমায় রীতেশবাবু এবার ফিসফিস কোরে জানতে চায়—সব বলে দিয়েছেন?

—না।

—বলেন নি?—ঘর থেকে অমলা দেবীও অ্যাতোক্ষণে বেরিয়ে আসে—ক্যানো?

—আমি ডাক্তার। আমার অ্যাকটা এথিক্স আছে। যতোক্ষণ-না সবরকম পদ্ধতি অ্যাপ্লাই কোরে ব্যর্থ হচ্ছি ততোক্ষণ রোগীকে অন্যের হাতে রেফার কোরি না।

—মানে?—রীতেশ অমলা দু'জনে অ্যাকযোগে এবার জানতে চায়।

—অ্যাখনও ম্যাসাজ-থেরাপি বাকি। যদিও...।—শান্তিপ্রসাদ আবারও থেমে যান।

—যদিও কী? —সেই যাঁকে ওরা জানতে চান।

—সারবার কোনও লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি নে। আসলে মেডিক্যাল গ্রাউন্ড জিরো হওয়ায়...।

—'থামুন আপনি।'—শান্তিপ্রসাদকে খরিসের হিসহিসানি-দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দ্যায় রীতেশ। দাঁতে দাঁত চেপে টিবিয়ে-টিবিয়ে বলে—'শুনুন। পাগলামির অ্যাকটা সীমা থাকে। আপন-ভালো পাগলেও বোঝে। চিকিৎসা আপনাকেই কোরতে হবে। ফের পুলিশের কাছে টুঁ শব্দটি কোরবেন না, বুঝলেন'—শান্তিপ্রসাদ ঘাড়-নেড়ে হ্যাঁ বলেন। কী একটু ভাবেন। তারপর বলেন—'আপনারা বোললে আমি চিকিৎসা চালিয়ে যাবো। তবে তার আগে এটা আপনাদের বিশ্বাস কোরতে হবে—আপনাদের রোগ সারবার নয়। ঠিক আছে।'—অতঃপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি।

—'মে আই কাম ইন স্যার।'—মাঝখানে আরও বার-কতোক ঘুরে যাবার পর আজ সপ্তমবার রীতেশ-অমলার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছেন শান্তিপ্রসাদ। আজ যদিও তাকে অপেক্ষা কোরতে হলো না। প্রার্থনামাত্র দরজা খুলে গ্যালো। আর ঘরে ঢুকেই তিনি অবাক হলেন। ফিজিওথেরাপির সবকটা ব্যবস্থা ব্যর্থ কোরে দেওয়া পাঁচজন রোগীই হাজির। ভিতরে-ভিতরে একটু কি চমকে গেলেন শান্তিপ্রসাদ? হয়তো, সেই চমকের ধাক্কায় কব্জির

ঘড়ি দেখলেন। রাত আজ আরও খানিকটা গাঢ় হয়েছে—পৌনে বারোটা। তিনি তারপর সরাসরি রীতেশবাবুর চোখে চোখ রেখে বোললেন :

—কলের পুতুল দুলছে না।

—মানে?—রীতেশ বিস্মিত জানতে চাইলো।

—পুতুল দুলছে না মানে মাজা আপনাদের সোজা হবে না।

—মানে?

—মানে ওই ভাঙা-মাজা নিয়েই আপনাদের কাটাতে হবে।

—এ হয় না শান্তিবাবু! —রীতেশ জেদি গলায় বলে—এ আমরা হতে দেবো না।

—তা বোললে চলে না রীতেশবাবু। আমি ডাক্তার। মিথ্যে কাউন্সিলিং কোরতে পারবো না, তাই ফের এসেছি। আপনাদের সারবার নয়—যতোক্ষণ না এ কথা আপনারা বিশ্বাস কোরছেন, আমাকে আসতেই হবে। এবং সত্য কথাটা বোলতেই হবে।

—আপনার বোলতে ভালো লাগলে আপনি বোলুন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস কোরিনে। রোগ আপনাকে সারাতেই হবে।

—এ সারার নয়। আমি ব্যর্থ। শুধু...

—কোনও শুধুমুধু বুঝিনে। মানিনে। কাল চেম্বারে যাবো। যা খেল্ দ্যাখাবার কাল দ্যাখাবেন। আর কিছু জানিনে।

—মানে? —শান্তিপ্রসাদ শান্ত জানতে চান—মেডিকেলের নিয়ম মানবেন না?

—না।

—না? ক্যানো?

—কারণ ভাঙা-মাজা নিয়ে বাঁচা আমাদের দস্তুর নয়।

—তবে?

—অন্যের, মানে শত্রুর, মাজা ভাঙাতেই আমরা অভ্যস্ত।

—আপনাদের মাজা সোজা হবার নয়। এ সারবে না। এটা আগে বিশ্বাস করুন আপনারা।

—সারবে-সারবে! ম্যাসাজ-থেরাপি ছেড়ে আপনি সোজাপথে আসুন, দেখবেন সারবে।

—যদি না সারে।

—যদি না সারে তো আপনার মাজাটাই আমরা ভেঙে দেবো। বুঝেছেন? —রীতেশ উত্তেজিত হয়—ফের আর অ্যাকটা কথা শুনুন অ্যামনভাবে রাতে-রাতে আর আসবেন না।

—না এসে তো আমার উপায় নেই। আমি সত্য-ভাষক। যতোক্ষণ না আমার কাউন্সিলিং-এ আপনারা বিশ্বাস আনছেন ততোক্ষণ তো আসতে হবে।

—চোপ।—রীতেশ দাঁত খিঁচিয়ে বলে—আমাদের মাজা আপনাকেই সোজা কোরে দিতে হবে।

—এ অবৈধ ভাঙন। এ সোজা হবার নয়। এটা আপনারা আগে বিশ্বাস করুন।

—মেডিকেলের অসাধ্য কিছু নেই, তা তো জানেন শান্তিবাবু।

—এ মেডিক্যালি-প্রুভ্‌ড্‌ রোগ নয়। আমি ফিজিওথেরাপিস্ট শান্তিপ্রসাদ। জীবনে মিথ্যে বোলিনি। এ সারবে না। জীবনের যতোটা গভীরে গিয়ে আলট্রা-সাউন্ড পেনিট্রেট করার কথা কোরছে না। সব লাইন, সব রাস্তা আপনারা কেটে রেখেছেন। এ সারবে না। বরং...।

—বরং কী?

—ওই যে বোললুম মিথ্যে বোলতে পারবো না। এরপরও আমার চেম্বারে গেলে মাবার অবস্থা আপনাদের আরও খারাপ হবে। বুঝলেন।

রীতেশবাবু 'হ্যাঁ' বা 'না' বোলে কোনও উত্তর দ্যান না। অন্য চারজনেও না। উল্টে তারা ইঙ্গিতে কিছু কথা বলেন। আর রীতেশ অমলা বাদে তিনজনে ঝপাঝপ ক্যারাটের প্যাঁচে শান্তিপ্রসাদকে আঘাত করে। এলোপাথাড়ি। না টুঁ-শব্দটিও করার সময় পান-না শান্তিপ্রসাদ। মিনিট-দুয়ের মধ্যেই তার মাজা ভেঙে যায়। তিনজন ধরাধোরি কোরে তাকে দরজার বাইরে কোরে দ্যায়। ঝপাৎ কোরে মানব-পতনের শব্দ হয়।

তারও ঘন্টা-দুই পরে রীতেশবাবুরা পাঁচজনে দরজা খুলে বাইরে বেরোয়। অমলা দেবীও। শহর ছেড়ে চোলে যাচ্ছে তারা। রাত্রি নিশুতি। চরাচর শব্দহীন। বাইরে বেরিয়ে নজরে পড়ে অমলার। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত প্রার্থনা জানাচ্ছেন শান্তিপ্রসাদ—'মে আই কাম ইন স্যার।' অমলার ওঁচানো আঙুল-বরাবর সবাই দ্যাখে সোজা-মেরুদণ্ড দাঁড়িয়ে আছেন ফিজিওথেরাপিস্ট। না ভাঙনের কোনও চিহ্ন তার দেহে নেই। শুধু শব্দ আছে—'মে আই কাম ইন স্যার।' তা দেখে পদসঞ্চার থেমে যায় দলটার।

কেউ যায়, কেউ যায় না

অভিজিৎ তরফদার

এক

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। সপ্তাহের এই একটা দিনই একসঙ্গে রাতের খাওয়া হয়। অন্য দিনগুলোয় ফিরতে ফিরতে ক্যালেন্ডারে সংখ্যা বদলে যায়। অন্যরা তখন গভীর ঘুমে, একসঙ্গে খেতে বসা নিতান্তই অসম্ভব। শনিবারে সামান্য তাড়াতাড়ি, বড় মেয়ের পড়াশোনা, ছোটজনের সঙ্গে খুনসুটি, সংসারের খুঁটিনাটি।

আজ আমার জন্য এই চমৎকার রঞ্জনা রেঁধে দেবে ভাবতে পারিনি। খাওয়া শেষ হলে রান্নাঘর থেকে যে বেরিয়ে এসে রঞ্জনাকে টেবিল পরিষ্কারে সাহায্য করতে শুরু করল তাকে দেখে আমি অবাক।

পরে একা পেয়ে রঞ্জনাকে পেড়ে ফেললাম।

এ আবার কে?

ও মধু, শ্রীকান্তর মামাতো ভাই।

শ্রীকান্ত?

মধুরিমার বাড়িতে সবসময় থাকে।

এখানে এল কী করে?

মধুরিমারা তিনমাসের জন্য সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। শ্রীকান্ত দেশে গেছে।

শ্রীকান্ত দেশে, এই কান্তকে তোমার কাছে গছিয়ে দিয়ে গেছে? ওকেও নিয়ে যেতে পারল না?

মধুদের দেশে বন্যা, মধু জানে না। শ্রীকান্ত তাই ওকে নিয়ে যায়নি। জল নামলে এসে নিয়ে যাবে।

সে তো অনেক দিনের ব্যাপার। রাখবে কোথায় ঠিক করেছ?

ছাদে।

ছাদে? বৃষ্টি পড়লে কী হবে?

চিলেকোঠায় আরো দুতিনজন থাকে। আর একটা খাট পাততে অসুবিধা হবে না।

অন্যরা আপত্তি করবে না?

হাউসিং-এ অতজন রয়েছে। কে কার খোঁজ রাখে?

আর একটা ব্যাপার আছে। দেখে তো তেরো-চোদ্দর বেশি মনে হয় না। শিশুশ্রমিক রাখা বেআইনি। সরকারি চাকরি করি। ফ্যাসাদে না পড়ে যাই।

শ্রমিক তো নয়। ওকে বাড়ির কাজ করানোর জন্য রেখেছি কে বলেছে? বন্যা, বাড়ি ফিরতে পারছে না। সে জন্যই কটা দিন........

অন্যেরা অত কথা শুনবে? অনাত্মীয় একটা অল্প বয়েসের ছেলেকে রেখেছ। গৃহস্থালি কাজে তোমাকে সাহায্য করছে। লোকের চোখে ওটুকুই যথেষ্ট। খোঁজ নিয়েছ বয়স কত?

বলছে তো ষোলো। ক্লাশ এইটে পড়ত। গ্রামদেশের ষোলো মানে আঠারো। শিশু নয়। ওটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও।

শিশু না হলে তো আরও বিপদ। তোমার ঘরে দু'দুটো মেয়ে তারাও বড় হচ্ছে।

ছেলেটা অসম্ভব সরল, আর ইনোসেন্ট। এসে পড়েছে। একটা বিড়ালছানা হলেও তাকে আশ্রয় দিতে হত। আর এ তো মানুষ। তাড়িয়ে দেব?

এর ওপর যুক্তি চলে না।

মধু থেকে গেল।

দুই

জাহাঙ্গীরের কদিন ধরেই মন খারাপ। নুরজাহান উধাও। সঙ্গে সাজাহান। হাসপাতালের গেটে দেখা হল। হেসে কুর্নিশ করল। ডাক্তারের গাড়ি নয়, ওর লক্ষ্য ট্যাক্সি। অ্যাম্বুলেন্সে কায়দা নেই, হেসে বলেছিল ওরা দাঁড়ায় না।

লিকলিকে রোগা, খালি পা, ছেঁড়া শার্ট, হাঁটুর ওপর লুঙ্গি। গাড়ির জানলা গলিয়ে হাসপাতালের টিকিটটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এক ঝলক চোখ বুলিয়ে খপ করে হাত থেকে টিকিটটা টেনে নিয়েছিলাম। ততক্ষণে সিগনাল পেয়ে গেছে গাড়ি। পেছন পেছন ছুটেছিল জাহাঙ্গীর। ছুটতে ছুটতে হাসপাতাল। গাড়ি থামলে এক হাত জিভ বের করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল,—কসুর মাফ করে দিন হুজুর, আর হবে না।

ঘরে ডেকে নিয়েছিলাম। জাহাঙ্গীর সব বলেছিল। বলেছিল ওদের লাইনের কথা। সকালবেলা মহাজন এসে মাল হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায়। জাহাঙ্গীরের যেমন, হাসপাতালের টিকিট। কারো অন্ধ হবার মলম, কারো কাঠের পা। কিছুই না থাকলে শুধু ফুটো বাটি, ছেঁড়া চট আর গলার ট্রেনিং। সন্ধেবেলা মহাজন মাল তুলে নিয়ে যাবে। সঙ্গে নিজের ভাগ। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। পুলিশ, ঝামেলা সব মহাজনের। এমনকী অসুখ বিসুখ অ্যাক্সিডেন্টও মহাজনের দায়। একজন দুজন তো বছরে ছুটির দাবিও তুলতে শুরু করেছে।

কত হয়?

ঠিক নেই। শনি-মঙ্গল, শিবরাত্রি, দুর্গাপুজো-দেওয়ালির দিনে তিনশ টাকাও হয়েছে। আবার ঝড় বৃষ্টি, বন্ধ মিছিলে বিশ-তিরিশ টাকা হলেই চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

রবিবার?

রবিবারে এখানে থাকি না স্যার। চিড়িয়াখানা, নইলে নিক্কোপার্ক।

নিক্কোপার্ক? সে তো অনেক দূর। যেতে বাসভাড়াও লাগে।

পুষিয়ে যায় স্যার। এখানে আধুলি দিলেও নিয়ে নিই। ওখানে রেটটা বেশি। এক টাকার কম দিলে ফিরিয়ে দিই। পাশে নলবন। ওখানে আরও বেশি। কিন্তু ওদিকে লাইনের লোক আছে। ঘেঁষতে দেয় না।

জাহাঙ্গীরই বলেছিল, ওর দুখানা হাত দু'টো পা, দুটো চোখ, কোনও অঙ্গহানি নেই। তাই আমদানি কম। ওপরওয়ালা কবে যে মুখ তুলে চাইবেন, বলতে বলতে চোখে জল এসে গিয়েছিল জাহাঙ্গীরের। ভয় পাই। প্রাণটাই যদি চলে যায়! নইলে একটা হাত একটা পা একখানা চোখের ওপর দিয়ে যদি যায়! বাসের ধাক্কা, পাথরের টুকরো, আগুনের ফুলকি কত কিছুই তো হতে পারে। একটা অঙ্গ চলে যাওয়া মানেই রোজগার দুশো। হাত কাটা জগা, ওষুধ মাখানো হাত দেখিয়েই মাসে পাঁচ হাজার ঘরে নিয়ে যায়।

কটা দিন জাহাঙ্গীরকে দেখিনি। হঠাৎ মোড়ের মাথায় জাহাঙ্গীর, মুখে চওড়া হাসি।

পোমোশন হয়েছে স্যার।

পেছনে তাকিয়ে দেখি স্তনবতী নারী, এক স্তনে বানর সন্তানের মতো একটি শিশু ঝুলছে।

আমার নূরজাহান। শিয়ালদা স্টেশনে ঘুরছিল। তুলে এনে নন্দনের ফুটে বসিয়ে দিলাম। রোজগার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মহাজনও খুশি।

দেখো বাবা, তোমার সাজাহানের যা চেহারা। হাসপাতালের অন্ধিসন্ধি সবই তো জানা। ওষুধ বিষুধ খাইয়ে ঠিক রেখো। সাজাহান না থাকলে নূরজাহান একা আর কত তুলবে?

যা বলেছেন স্যার? কান এঁটো করে হেসেছিল জাহাঙ্গীর।

সেই জাহাঙ্গীরের মুখে আজ হাসি নেই।

কী ঘটল, কেন নূরজাহান ওকে ছেড়ে চলে গেল, জাহাঙ্গীর বলেনি, আমারও জেনে ওঠা হয়নি। আজ মুখ দেখে মনে হল, জাহাঙ্গীর ওর মনের কথা বলতে চায়। দেখা যাক, আমারও সময় পাওয়া দরকার।

তিন

শঙ্কর মামার সঙ্গে আমাদের যে বিরোধ তার মূলে সেই জল। শরীর ফুলে ঢোল, নিঃশ্বাসের কষ্টে সারারাত জেগে বসে থাকা, এ অবধি পাড়াপ্রতিবেশী মেনে নিয়েছিল। একদিন যখন প্রাণটাই যেতে বসেছে তারা আর বাড়িতে রাখতে ভরসা পায়নি। নিজেরাই চাঁদা তুলে একটা অ্যামবুলেন্স ভাড়া করে হাসপাতাল অবধি পৌঁছে দিয়ে গেছে। হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে ডাক্তারবাবু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করে ফেললেন। সুগার-এর রোগী। ওষুধপত্র খেত না। সেই করতে করতেই রোগ বাড়তে বাড়তে কিডনি এবং হার্ট। অবশেষে হাপাতালের একটি বিছানা এবং ডায়লিসিস।

বিছানা, কিন্তু খাট নয়। খাটে উঠলেই দৈনিক বাট টাকা খাট ভাড়া। মাটিতে বিছানা পাতলে সেটা মকুব। অতএব মাটি থেকে বিছানায় ওঠার পয়সা এল যখন, শঙ্কর বেঁকে বসল,—না, না, আমার মাটিই ভাল। এ তো আমাদের গাঁ গঞ্জের মাটি নয় যে গায়ের ওপর সাপ-বিছে ঘুরে বেড়াবে। খাটিয়ার চড়ার আগে খাটে উঠব না।

তার আগে অবশ্য ডায়লিসিস্ নিয়ে এক প্রস্থ নাটক হয়ে গেছে। বুকে জল জমেছে,

ডায়লিসিস করে জল বের করতে হবে, নইলে নির্ঘাত মৃত্যু। কষ্টের মধ্যেও শঙ্করের মুখে হাসি, বেঁচে যাই ডাক্তারাবু! ওটাই করে দ্যান। নিজের হাতে তো আর পারব না।

মহা মুশকিল। সুপারকে ধরে স্পেশাল অর্ডার। ডায়লিসিস ফ্রি। ওষুধ কোম্পানির কাছে হাত পাতা। বিনি পয়সার ওষুধ। সেই যে হাসপাতালের জিম্মা করে দিয়ে গেল, তারপর থেকে প্রতিবেশীদেরও দেখা নেই। আত্মীয়স্বজন?

আবার হাসি শঙ্করের,—ভাগ্যিমান মানুষ তারা। কষ্ট সহ্যি করবার লেগে কেউ বেঁচে নাই। ভগবান কাছে ডেকে নিয়েছেন।

শঙ্করের দার্শনিকতা ঠেকে যেত পার্বতী নার্সের কাছে এসে।

আবার জল খেয়েছ তুমি?

কোথায় জল?

ওই তো, চাদরের তলায় লুকিয়ে রেখেছ। বের করো, বের করো বলছি।

ধরা পড়ে কাঁচুমাচু মুখে বিছানার চাদরের আড়ালে রাখা জলের বোতল বের করে দেয় শঙ্কর।

বলে, জল না খেলে মানুষ বাঁচে? জলই জীবন, ছোটবেলায় বইয়ে পড়েছি। তুমি বই পড়ো নাই দিদিমণি?

পার্বতী রেগে আগুন, না, আমি বই পড়িনি, তুমি পড়েছ। পড়ে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছ। আমি তো না হয় জল না খাইয়ে তোমাকে মেরে ফেলার তাল করেছি। শুধোও না ডাক্তারবাবুকে, দেখো তিনি কী বলেন?

কিডনির অসুখ, শরীর ভর্তি জল, সেই জলই বুকের মধ্যে ঢুকে শ্বাসকষ্ট। কে বোঝায় শঙ্করকে? জল খাওয়া বন্ধ না করলে যে ডায়লিসিস চালিয়ে যেতে হবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে সবাই। এখন লুকোচুরি খেলা। পায়খানা করতে ঢুকে সেখানেও মুখ লাগিয়ে জল খেয়ে আসে, এমনি পাগল শঙ্কর মান্না।

চার

মধুকে নিয়ে সবার আগ্রহ।

মধুদাদার কী সাহস জানো বাবা? ছোট মেয়ে রাত্তিরে ফিসফিস করে বলে,—জানলা দিয়ে একটা বোলতা ঢুকেছিল, খালি হাতে ফটাস করে মেরে ফেলল।

বড় মেয়ে চোখ থেকে চশমা সরিয়ে বলে, মোটেও না। ও একটা ভীতুর ডিম। কানে আই-পডের ইয়ার ফোন দুটো গুঁজে দিয়েছিলাম। ভয় পেয়ে হাউমাউ করে কী কান্না! শেষ অবধি মা এসে আমাকেই বকতে লাগল, কেন ওর কানে ওসব ঢোকাতে গিয়েছিলি?

মধুর টিভিতে আসক্তি নেই, সিরিয়াল দেখে না। পুরনো একটা রেডিও পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল, সেটাই রিপেয়ার করে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা পানের দোকান, রেডিও মির্চি। এ ঘর ও ঘর যাওয়া আসার সময়ও মধুর হাতে কমণ্ডলুর মতো দুলতে থাকে রেডিও।

রঞ্জনা একদিন আঁচলে হাসি আড়াল করে মধুর খাওয়া দেখাতে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। ডাল, আলুসেদ্ধ, পোস্তর বড়া আর মাছের ঝোল। মধু খাচ্ছে। মাটিতে থালাখানা সাজিয়ে, পেছনে বাবু হয়ে আসন পেতে তার ওপর বসে। প্রতিটি অন্ন খুঁটে খুঁটে মুখে ঢোকাচ্ছে মধু, জিভের ওপর স্থাপন করছে। জিভ দিয়ে ঠেলে সেই ভাতের কণিকাটাই আলুর সঙ্গে পিষছে, দাঁতে কামড়াচ্ছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। চিবোচ্ছে, চিবিয়েই চলেছে। ডাল, ভাজা, পোস্ত প্রতিটির খাদ্যগুণ জিভ দিয়ে ঠোঁট দিয়ে, দাঁত দিয়ে,—মুখগহ্বরের প্রতিটি ইঞ্চি— সেন্টিমিটার দিয়ে অনুভব করছে মধু। বহুক্ষণ, অনেক অনেক সময় দিয়ে। তারপর, যেন একান্ত বাধ্য হয়েই খাবারটা গিলে ফেলছে মধু। পরের গ্রাসটির দিকে হাত বাড়াচ্ছে। খাওয়াও যে এত ধ্যান এত অধ্যবসায়ের হতে পারে মধুকে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

এক ঘণ্টা।

কী এক ঘণ্টা?

খেতে। দুপুর আর রাতের খাওয়া। পাকা একটি ঘণ্টা লাগে মধুর। আর কেমনভাবে খাওয়া দেখলে তো?

অস্বস্তি লাগছিল। কারও খাওয়ার দিকে ওইভাবে নজর দেওয়া উচিত নয়। দরজার পাশ থেকে সরে আসি।

সন্ধেবেলা বই নিয়ে বসে মধু। রঞ্জনা খোঁজ নিয়ে ক্লাস এইটের বইপত্র কিনে এনে দিয়েছে। ড্রয়িংরুম-এর মেঝেতে কার্পেটে বসে পড়াশোনা করে মধু। এমনিতে ছোট মেয়েকে পড়াতে বসতে হিমসিম খায় রঞ্জনা। মধুকে দেখে সেও পড়তে বসে। পড়তে পড়তে খাতা বের করে মধু। লিখতে থাকে। লিখতে লিখতে আনমনা হয়ে যায়। কলম থামিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

হ্যাঁরে মধু, তোর বাড়ি কোথায়?

গড়গড় করে কয়েকটা লাইন বলে যায় মধু। গ্রাম, থানা আরও কত কী। পটাশপুর, নামটা কানে লেগে থাকে। পটাশপুর? চেনা নাম।

টিভির চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে নিউজ চ্যানেল। বন্যা। থইথই জল, নৌকা, স্পিডবোট, রিলিফ, রিলিফ নিয়ে দলবাজি। ঘোষক পড়তে থাকেন,—ময়না, সবং, পটাশপুর। পটাশপুর। আড়চোখে দেখি। মুখ নামিয়ে অঙ্ক কষছে মধু। ক্লাশ এইটের অঙ্ক। ভগ্নাংশ, দশমিক। পটাশপুর। শুনতে পেয়েছে ছেলেটা?

ফটাস করে চ্যানেল পালটে ফেলি, নৃত্য হচ্ছে, সঙ্গে গান। ভালবাসা। টিভির পৃথিবীতে নাচ-গান ছাড়া অল্পই কিছু পড়ে থাকে। যেমন পটাশপুর। সুইচ অফ করে দিই।

পাঁচ

জাহাঙ্গীর এল দেখা করতে। পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে। প্লাস্টার।

ইচ্ছে করে নাকি?

কী যে বলেন স্যার? এ তো আজ আছে কাল নেই। ডাক্তার বলেছে দু'মাস পরেই খুলে দেবে। পার্মেন্টি কিছু না হলে.....

কেন তোমার সেই নুরজাহান? পার্মেন্টি করতে পারলে না?

আর বলেন কেন? বন্যায় ঘর-দোর ভেসে গেছে। বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে এসে উঠেছিল। খাবার জোটে না, বাচ্চাটাও মরো মরো। দেখে মায়া হল, নিয়ে এলাম। ভালই ছিল। দু-বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছিল, বাচ্চাটাও নাদুস নুদুস হয়ে উঠেছিল। সইল না।

কেন? অন্য কারও সঙ্গে ভেগে গেল?

না স্যার। ওপরওয়ালা সাক্ষী, কখনো গায়ে হাত দিই নাই। দিনরাত এক কথা। জল নেবে গিয়েছে, আমারে দিয়ে এসো। ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখেছিলাম। একদিন রাস্তাতেই চেনাজানা কার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওদিককার লোক। সঙ্গে সঙ্গে ভোল বদল। পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে তৈরি। কত বললাম। কানে নিলে তো।

মহাজনও তোমার মাইনে কমিয়ে দিল।

দেবেই তো। কিন্তু আপনিও দেখবেন স্যার। ওকে আবার ফিরে আসতে হবে। জলের মাছ ড্যাঙায় উঠলে আর জল তাকে ফিরোয়ে নেয় না। কথাটা মিলয়ে নেবেন।

শঙ্করকেও বাধ্য হয়ে ছুটি নিতে হয়। মাসের পর মাস হাসপাতালের বিছানা আগলে পড়ে থাকবে, কর্তৃপক্ষ শুনবে কেন? ছুটি লেখা ছিল। অনেক ধরনের ভাঁজ মেরে শঙ্কর ছুটি পিছোচ্ছিল। লুকিয়ে জল খেয়ে শ্বাসকষ্ট বাড়িয়ে ফেলেছিল শঙ্কর। ফলে ছুটি দেওয়া যাচ্ছিল না, আর একটাও অসুবিধা ছিল। হাসপাতালের রোগীর ছুটি হলে কারওকে দায়িত্ব নিয়ে সইসাবুদ করে রোগীকে বাড়ি নিয়ে যেতে হয়। শঙ্করের ক্ষেত্রে সেরকম কারওকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

আমরাও জানতাম ওর ছুটি লেখা মানে মৃত্যু-পরোয়ানায় সই করা। বাড়ি গেলেই ও জল খাবে। প্রতিবেশীদের দায় পড়েছে বারবার ওকে কাঁধে করে হাসপাতালে দিয়ে যাবার।

নতুন জামা পরেছে শঙ্কর।

কে দিল শার্টটা?

আঙুল দিয়ে পার্বতী নার্সকে দেখাল শঙ্কর। পার্বতী? তার সঙ্গেই না ওর দিনরাত কাজিয়া? খুঁজতে গিয়ে দেখলাম পার্বতী মুখ লুকিয়েছে।

একটা কথা বলব স্যার?

বলো।

কলকাতা এলাম, থাকলামও। কিন্তু কলকাতার জল আমার জুটল না।

শুধু কলকাতা নয় শঙ্কর। তোমার গাঁয়ের জলও ভাল নয় তোমার পক্ষে। বুঝে সমঝে খেও।

কলের জল আমাদের কোথায় জোটে স্যার? তবে ভগবান অভাব পুষিয়ে দিয়েছেন। পেট বোঝাই করে চোখের জল খেয়ে গেলাম। পা দুটো একটু বাড়ান। একবার পেন্নাম করি।

শ্রীকান্ত ফেরেনি। মধুরিমারা ফিরে এসেছে। ওরা সবসময়ের কাজের লোক পেয়েছে। এক বয়স্ক বিধবা ভদ্রমহিলা। রঞ্জনার সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা হল। শেষ অবধি সাব্যস্ত হল ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়াই ভাল। দায়টা বর্তাল আমার ওপর। কিন্তু ওকে নিয়ে দেশ-গাঁ অবধি পৌঁছে দেব অতখানি সময় কোথায়?

মধু তুই একা একা যেতে পারবি?

কেন পারব নি?

কীভাবে যাবি?

হাওড়া থেকে বাস। বাস গিয়ে থামবে গঞ্জে। সেখান থেকে ভ্যান রিক্সা।

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বাসে তুলে দিলে নিজে বুঝেসুঝে নামতে পারবি তো?

একবার তুলে দিয়েই দেখো না।

টাকাপয়সা দিতে চেয়েছিল রঞ্জনা। মধু নেয়নি। ভাইপোদের জন্য জামাকাপড়। ও আমি বুঝতে পারব নি, বলে সেটাও নেয়নি মধু। মায়ের জন্য একখানা শাড়ি, জোর করে গছিয়ে দিয়েছে রঞ্জনা, আর এক বাক্স সন্দেশ। আমাদের সন্দেশ এখানকার চেয়ে ঢের ভাল, এখানে আটা মিশায়, অহঙ্কারের সঙ্গে বলেছিল মধু।

যাবার আগে প্রণাম করল মধু। বড় মেয়ে বলল, মধুর লোভে বোলতা ঢুকত ঘরে, আর আসবে না। ছোট মেয়ে ছলছল চোখে বলল, আবার এসো।

বোঁচকাখানা কাঁধে ফেলে মধু হেসে বলল, আমি রেডি।

কয়েকটা ইংরিজি শব্দ রপ্ত করেছে মধু। তার মধ্যে একটা রেডি। মধুর মুখে "রেডি" শুনে রঞ্জনাও হাসল। বলল, সাবধানে যাবি। আর গিয়ে একটা পোস্টকার্ডে পৌঁছ সংবাদ দিতে ভুলবি না।

যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কলকাতা দেখছিল মধু। ময়দান, আকাশবাণী, হাইকোর্ট, গঙ্গা। গঙ্গা নদীর দিক একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মধু। এমনকী হাওড়া ব্রিজও তার চোখ থেকে নদীকে মুছে দিতে পারল না।

ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে খুঁজে খুঁজে বাস-স্ট্যান্ড বের করলাম। ওদের বাস। ছাড়তে মিনিট পনেরো দেরি আছে। ছাদ-ভর্তি লোক। ভেতরে জায়গা আছে তো? কনডাকটর আশ্বস্ত করল। টিকিট কেটে সিট দেখিয়ে বসিয়ে দিলাম মধুকে। কন্ডাকটরের হাতে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, একা কোথাও যায়নি, চিনতে পারবে না, দেখেশুনে নামিয়ে দেবেন।

চিন্তা করবেন না, আপনি ফিরে যান, কনডাকটর আশ্বস্ত করল।

দেখতে দেখতে বাস ছাড়ার সময় হয়ে এল। স্টার্টারের হুইশ্‌ল্‌। হেঁকে হেঁকে লোক তুলতে লাগল কনডাক্টর। ড্রাইভার স্টার্ট দিল। জানলার ধারে বসে আছে মধু, দেখতে

পাচ্ছি। হঠাৎ দেখি মধু নেই। গাড়ি নড়ে উঠেছে। ছেলেটা গেল কোথায়? অস্থির হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। হঠাৎ দেখি সামনে মূর্তিমান। হাতে তার সবেধন পোঁটলাখানা।

কী রে, যাবি না? বাস যে ছেড়ে গেল।

কোথায় যাব?

কেন পটাশপুর। তোর গ্রাম।

নাই।

নাই মানে?

কিছুই নাই। কেলেঘাই সব খেয়ে নিয়েছে। ঘর নাই, জমি নাই, ক্ষেত নাই। মানুষগুলাও কেউ নাই। কার কাছে যাব? কোথা যাব?

গর্জন করে বাস এগিয়ে যায়, পটাশপুর, যেখানে কেলেঘাই নদী তার গর্ভে টেনে নিয়েছে মধুর আপনার গন্তব্য।

মধু দাঁড়িয়ে থাকে।

পাকা ধানের গন্ধ

সুকুমার রুজ

ওর পায়ের তলার মাটি বেশ নরম। দেবে যাচ্ছে পা। পা সরিয়ে নিলে গাঢ় পায়ের ছাপ মাটিতে। ডানহাতে ধরা শাকম্বকে কাস্তেখানা। হেঁট হয়ে আছে ও। বাঁ হাতে মুঠি করে ধরছে নুইয়ে পড়া ধানগাছের কোমর। ডানহাতের কাস্তে পোঁচ দিচ্ছে গাছের পায়ে। কুচুৎ—কুচুৎ শব্দ উঠছে। মুঠি ভরে উঠতেই আলতো হাতে শুইয়ে দিচ্ছে মুঠিভরা ধানগাছ। এক পা এক পা করে ও সরে-সরে যাচ্ছে আর সোনালি সতরঞ্চিটা ক্রমশ বাড়ছে।

সোনাবাকুড়ির চওড়া আলের উপর দাঁড়িয়ে আছে তরণী। বেঁটে-খাটো, গাবদাগোবদা, পেটমোটা। সোনাবাকুড়ির মালিক। মাঝে মাঝে ও হাঁক পাড়ছে—ও কম্‌লি! কী হল রে তোর! কেদে যে নড়চে না দেকচি। ধার কমে গেল লেকিনি। ছোটদিনের বেলা; হাত চলা হাত চালা।

তরণীর কথাগুলো কম্‌লির কানে যেতে, হেঁট হয়ে মুখ উঁচিয়ে দেখে মনিবকে। কোনও কথা বলে না। ভ্রূ কোঁচকায় শুধু। তারপর মুখ নামিয়ে একই গতিতে ধান কেটে চলে। সোনাবাকুড়ির সন্তানভারে হেলে পড়া সমস্ত ধানগাছকে শুইয়ে বিশ্রাম দেওয়ার ঠিকে নিয়েছে কম্‌লি আর ওর মরদ নগেন বাউড়ি। নগেনটা আজ নেই, সদরে গেছে সাতসকালে। তাই ও একাই মাঠে নেমেছে। কিন্তু আজও কেমন যেন আনমনা। সত্যিই প্রতিদিনের মতো গতি নেই হাতে। মাঝে মাঝে ওর দৃষ্টি সোনালি জমি পেরিয়ে উড়ান দিচ্ছে দূরে লাল মোরাম-রাস্তার দিকে।

একসময় কম্‌লি কাস্তে ফেলে কোমর থেকে আঁচল খুলে টানটান হয়ে দাঁড়ায়। মাজাটা ধরে গেছে বেশ। অদূরে আলের ওপর দাঁড়িয়ে তরণী। সে গলায় জোর এনে বলে—কী হল? আবার দাঁড়ালি কেনে? বেলা যে গড়াল! ইদিকে আকাশের ভাবগতিকেও ভাল ঠেকচে নাকো। শুকাক্ না শুকাক, কাল বাদ পস্যুর মধ্যে মা লক্ষ্মীকে খামারে তুলতে হবে। অসময়ে বিষ্টি হলে আবার...।

কম্‌লি আবার গাছ-কোমর করে আঁচল বাঁধে—না গো মোড়ল। বিষ্টির কোনো লক্ষণ নাই। দেকলা না, ভোরবেলা ক্যামন কুয়ো পড়েছিল। সাদা হয়েছিল চারধার। গাচপালা দেকা যেছিল নাকো।

তরণী মাথার টুপি খুলে ফেলে—তা অবিশ্যি ঠিক বলিচিস্। কুয়াশা পড়লে বিষ্টি হবার 'চাঁস' কম। নে-নে ম্যালা বকিস না, হাত চালা। পস্যুদিন কটা মোড়লের ট্যাক্টর বলা আচে ধান বওয়ানোর লেগে।

মনিবের মুখ থেকে কমলির চোখ সরে গেছে কখন। ওর চোখ এখন সোনাভরা ধানজমির ওপারের গ্রামে। মেটে ঘর, খোড়ো চালের বাড়িগুলো যেন ধোঁয়ার চাদর-মুড়ি দিয়েছে। কম্‌লির মনটাও আজ ধোঁয়া-ধোঁয়া। ওর এখন ইচ্ছে করছে দূরে ওই ধোঁয়ার

চাঁদরের ভেতর ঢুকে যেতে। সদর থেকে ওদের ফেরার সময় হয়ে এল। ওরা আসার আগেই তো...।

কমলির রুখুশুখু চুলের ওপর উড়ে এসে বসল একটা কাচপোকা। ধূসর রঙের পোকাটার পাখা তিরতির করে নড়তেই চিক্‌চিক্ করে ওঠে রামধনু-রং। কমলি মাথা তুলে একবার দেখে নেয় জমিটা। এখনও অনেকখানি বাকি। গাছগুলো নড়ছে না চড়ছে না। কাঁচা ছেলে বুকে করে আলসে পোয়াতির মতো মাথা ঝুঁকিয়ে একে অপরের গায়ে ঠেস দিয়ে আছে। পাকা ধানের বাসে ম-ম করছে এতোল-বেতোল হাওয়া। ওই গন্ধের সঙ্গে কমলির বেতোল মনটাও যেন একটু একটু করে হাওয়ায় মিশতে থাকে। ওর মনের মাঝে একখানা বরণডালা। সে বরণডালা ওকে টানছে। মন উড়ু উড়ু হয়ে যাচ্ছে সে টানে। সোনাবাকুড়ির মা-লক্ষ্মীকে পরশু না হলেও তরশু বরণ করতে পারবে মোড়ল-গিন্নী। কিন্তু ওদিকের বরণটাকে আজ করতেই হবে ওকে। ঠিক সময়ে না পৌঁছলে...।

পাঁচ-পিসি বলেছিল—বরণডালায় একটা নুড়ি পাতর দিস কমলি। ওটা নক্ষণের জিনিস। পাতরের মতন শক্ত-সমত্ত ছেলে হবার কামনা করে ওই পাতর বরণডালায় দিতে হয়। কালো পাতর দিতে নাইকো, তাইলে ছ্যানা কালো হয়। বিটিছেলে কালো হলে তো বিষম্ জ্বালা; তার নেগে ওই ফস্‌সা নুড়ি-পাতর।

কমলি তাই ভোরবেলা কাজে আসার সময় নয়ানজুলির ধার থেকে একটা নুড়ি কুড়িয়ে কোঁচড়ে গুঁজে রেখেছে। নুড়িটা ঠিকঠাক আছে কিনা তা হাত দিয়ে পরখ করতে করতে আলের দিকে আসতে থাকে কম্‌লি।

কী হল! উঠে আসচিস কেনে রে? কালকের মধ্যে এ জমিটার...।

মোড়ল! আজ আর হবে নাকো। বাড়িতে আমার একটা জরুলি কাজ আচে। কাল পেত্যুষে এসে লেগে পড়ব আমরা দুই মানুষে। আজ চললাম।

কম্‌লির মাথায় কাচপোকা। ফিরফির করে পাখা নাড়ছে। আবার উড়ান দেবে পোকাটা; হয়তো তারই প্রস্তুতি। কমলি ছুট লাগায় দূরে ঝাপসা গ্রামের দিকে। তার আগেই ওর মাথার চুলে বসে থাকা কাচপোকা উড়ান দিয়েছে কোন্ অজানায়। এদিকে তরণী গালমন্দ করে চলেছে কাজ উঠল না বলে। ছুটন্ত কম্‌লির পেছনে ধাওয়া করে সে সব গালমন্দ ওর কানের নাগাল পায় না।

দুই

লাল মোরাম রাস্তায় উঠে দৌড় থামায় কম্‌লি। কিন্তু হাঁটে প্রায় দৌড়ানোর মতোই। ওর পাথর-রঙা পা-পাতরে লাল ধুলো উড়ে উড়ে লাগছে।

বাড়ি ফিরেই খড়ের চালে গুঁজে রাখা, আধক্ষয়া বাটি-সাবানখানা নিয়ে কুঁচপুকুরের দিকে এগোয় কমলি। একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে হাতমুখ যতটা সম্ভব ধুয়ে নেয় সাবান দিয়ে। ঠান্ডা জলে এখন আর গা ভেজাতে ইচ্ছে করে না ওর। তাড়াতাড়ি উঠে আসে পুকুর থেকে। শাড়ি বদলে নিয়ে, দ্রুত হাতে চুলে চিরুনি চালিয়ে নেয় ও। তারপর একহাতে ছোট আয়না ধরে সিঁদুর পরে। সিঁথি আর কপাল জুড়ে এয়োতির চিহ্ন আঁকতে আঁকতে

ওর বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে। হঠাৎ করে কোনও কিছু হারিয়ে ফেলার কষ্ট বুকের ভেতর। চোখ ঝাপসা হওয়ার আগে আয়নায় চোখে পড়ে, গলার নীচে সবুজ মতন কী যেনে লেগে রয়েছে। নখ দিয়ে খুঁটে নেয়, কুঁচপুকুরের দাম-শ্যাওলা। সারা পুকুর জুড়ে এই দাম। এত বাড়বাড়ন্ত ওদের। খেয়ে না খেয়ে বেড়ে ওঠা ওর শরীরটার মতো যেন। যত্ন-আত্তি নেই, তবুও...। হাতের আয়না আর একটু নামিয়ে বুকের আঁচল সরায় কমলি। আ-ফলা খেজুরগাছে বাঁধা দুটো রসের ভাঁড় যেন। একফোঁটা রস জমল না ভাঁড়ে। বৃথাই মেয়ে-জনম তার। ওই দামগুলোর এত বংশবৃদ্ধি হয় কী করে কে জানে। ফল তো দূরের কথা; ফুলও ফোটে না দাম-শ্যাওলায়। তবুও কী করে যে...।

পাশের সুঁড়িপথে কার পায়ের শব্দ। তবে কি ওরা এসে পড়ল। নাহ্। বেচু বৈরাগী মাধুকরী করে ফিরল। তাহলে সাঁঝ নামতে আর বেশি দেরি নেই। কমলি দ্রুত পায়ে বাড়ির পাঁদাড়ে যায় দুব্বোঘাস ছিঁড়তে। একটা ধাড়ি ছাগল দুব্বোঘাস খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। তার ঝোলা 'পালান'-এর দুটো বাঁট চুষছে কালো কুচকুচে দুটো ছাগলছানা। আর একটা ছানা পাশে তিড়িং-বিড়িং লাফাচ্ছে। সেটা মাঝে মাঝে ছুটে এসে মায়ের তলপেটে গুঁতোচ্ছে। দুব্বোগুলো খেয়ে সাবাড় করেছে ছাগলটা। ওকে হ্যাট-হ্যাট করে তাড়ানোর চেষ্টা করে কমলি। কিন্তু কোনও হেলদোল নেই ছাগলটার। ঠেলে সরাতে গেলেও নড়ে না। ভাবখানা এমন—ছানাদের দুধ খাওয়াচ্ছি এখন, বিরক্ত কোরো না তো। কমলির কেমন যেন রাগ হয় ছাগলটার ওপর। হতচ্ছাড়ি হাড়-বিরজিরে হয়েও তিনটে ছানার মা, তাই ভারী দেমাক। আর ও...।

কমলি ছাগলটার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে সরিয়ে দেয়। তারপর খুঁজে পেতে দুব্বোঘাস ছিঁড়তে থাকে পুটপুট শব্দে। সে শব্দ ওর কানে দশগুণ হয়ে বাজে। ওর বুকের মধ্যেও যেন কিছু একটা ছিঁড়ছে নিঃশব্দ।

আলো কমে এসেছে। বাড়ির পাঁদাড়টা কেমন স্যাঁতসেঁতে। কমলির মনটাও স্যাঁতসেঁতে। নগেন বাউড়ির ঘরনি হয়েছে সাতটা বছর। কিন্তু এই সাত বছর ধরে কামনা করেও নগেন বাউড়ির ঘর আলো করা এক নন্দদুলাল এনে দিতে পারল না। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শাশুড়ির তত্বাতাশ শুরু হয়েছিল—কী গো বউ। বলি তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার কী? একনও গা-ভারী হওয়ার নক্ষণ দেকচি নাকো।

কমলি লজ্জা পেয়েছিল শাশুড়ির কথায়। ঘোমটা বেশি করে টেনে দিয়ে ঠোঁট টিপে হেসেছিল। তারপর অস্পষ্টভাবে বলেছিল—সোমায় হলেই হবে মা। এসব কি আমাদের হাতে? ভগবান না দিলে...।

রাতে বিছানায় শুয়ে স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে মায়ের কথা। তারপর দুজনে যেন শঙ্খ-লাগা নাগ-নাগিনী। এমনি করে আরও বছর দুয়েক। তখন শাশুড়ি কথার সুর পাল্টেছিল—টাকার নোবে কী ভুল যে কল্লাম। ও-বাড়ির বড়-বউয়ের বুনটাকে পচন্দ ছিল আমার লগেনের। তেমন কিছু দেয়া-থোওয়া করতে পারবে না বলে ঘরে তোললাম নাকো। এ মাগি যে আঁটকুড়ি, সেটা তো বুজিনি। ভগমান।

আমার কপালে এ-ও ছিল। সে মিনসে আমাকে একা ফেলে সগ্গে চলে গেল। ভাবলাম, শেষ জেবনটা নাতির নিকেমানি করে কাটাব। তা আর বুঝি হল নাকো। ঝ্যাটা মারি অমন বউয়ের মুকে।

কমলি শাশুড়ির কথা শুনে আঙুল দিয়েছে কানে। বাড়ির পাঁদাড়ে গিয়ে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে মা ষষ্ঠীর কাছে মানত করেছে—আমার কোল ভরিয়ে দাও মা। সোনার টিকলি দোব, ছেলের রোজোনের ভোগ দোব।

রাতে নগেনের পাশে শুয়ে, ফোঁসফোঁস শব্দ মিশিয়ে শাশুড়ির কথাগুলো বলতেই নগেন তেরিয়ান হয়ে উঠেছে—থামাও তো তোমার ফোঁসফোঁসানি। বাঁজা মেয়েছেলে কোতাকার! শাঁসালো গতরখানা-ই আচে শুধু; একটা ছেলে দেবার খ্যামতা নাইকো, তার আবার এত লপ্‌চপানি কীসের! ও-বাড়ির বড় বউদির বুন মালুতি হলে এদ্দিন...।

কমলির চোখ ছলছল করে ওঠে সে রাতের কথা মনে পড়ায়।

পশ্চিম আকাশে সূর্যটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। চারিদিকে পাতলা আঁশের মতো এক কুয়াশার আস্তরণ। পৌষ আসতে এখনও কয়েকদিন বাকি। এরই মধ্যে বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। সূর্য আড়াল হতে না হতেই কেমন হিম-হিম ভাব। কমলির মনের মাঝেও হিম ঝরছে। হালকা একটা কষ্টের বাতাস বইছে মনে। তবে, এতদিনের মনোকষ্টের তুলনায় এ কষ্ট কিছুই নয়। দুঃখে-কষ্টে সে চাষের কাজ করা, মাঠে-ঘাটে যাওয়া একপ্রকার বন্ধই করে দিয়েছিল। তার জন্য ওই মানুষটার খিঁতুনিও কি কম সহ্য করতে হয়েছে! মাঠে-ঘাটে পাড়ার মেয়ে বউদের সামনাসামনি হলেই, তারা মুখ ফিরিয়ে বলে—ম্যাগো! সাতসকালে আঁটকুড়ির মুক দ্যাকলাম, দিনটা ক্যামন যাবে ক্যা জানে!

ওদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার চোখ নাচিয়ে শরীরের দিকে ইঙ্গিত করে গুজগুজ-ফুসফুস করে অন্যজনের কানে। তারপর হাতে মুখ চাপা দিয়ে খুকখুক করে হেসে ওঠে। তাই দিন দুপুরে ঘাটে যেত না কমলি। সন্ধেবেলায় গিয়ে কোনোরকমে ঘাটের কাজ সেরে আসত।

কোনও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ও যেত না খুব একটা। ওই বাপের বাড়িটাই যা...। এবার দুর্গাপুজোর পর বিজয়া করতে বাপের বাড়ি গিয়েছিল কমলি। কমলির ভাইয়ের বউ বলেছিল—দিদি! এদ্দিনে বাচ্চাকাচ্চা হল নাকো, ডাক্তার-ফাক্তার দেখিয়েচ তোমরা? ঠাকুরজামাইয়েরও তো কোনও গণ্ডগোল থাকতে পারে।

পাটের কারবারি পয়সাওয়ালা ভাই ডাক করিয়েছিল জামাইবাবুকে। তারপর দিদি, জামাইবাবু দুজনকেই শহরের ডাক্তারের কাছে দেখিয়েছিল। দুজনেরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছিল এককাঁড়ি টাকা খরচ করে।

দিন পাঁচেক পর রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বলেছিল—নগেন বাউড়ির সব কিছু ঠিক আছে। কিন্তু কমলা বাউড়ির শরীরে দোষ আছে। ওর বাচ্চা হওয়ার ঘর ছোট। তাছাড়া ডিমও তৈরি হয় না ঠিকমতো।

কমলি তা জেনে হাপুস নয়নে কেঁদেছিল। আর নগেন খেপে উঠেছিল—আমার

পুরুষত্ব নিয়ে সন্দ। ডাক্তারি 'টেস' করালি আমার! ওরে! আমার সে খ্যামতা আচে। তোর মতোন দু'পাঁচজনকে আমি...।

তিন

হালকা কুয়াশা চারধারে। উঠোনে ঝুপসি আমগাছটার ডালে পাতায় থোকা-থোকা কুয়াশা। শুধু শিবডগালে একটু আলো লেগে রয়েছে। পাখিগুলো আমগাছের ডালে জড়ো হয়ে কলকল করছে। গাছের তলায় কয়েকটা ছাতার পাখি এক নাগাড়ে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করছে আর মরা-আলো মেশানো ধুলো মাখছে। কমলি বরণডালা সাজিয়ে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে। ওর মনের মাঝে নিঃশব্দে ক্যাঁচর-ম্যাচর করছে নানান কথা। সেগুলোর কোনওটাতে আলো আবার কোনওটাতে ধুলোমাখা।

শাশুড়ি-মা শেষের দিকে রোগে পড়ল। দিনরাত খণ্ডর খণ্ডর কাশি। কফের সঙ্গে রক্ত। তারপর শয্যাশায়ী। বিছানায় পেচ্ছাপ-পায়খানা। সেই সঙ্গে কাশি-জড়ানো কথা—আমি ভাল হয়ে উটি; তারপর আবার নগার বিয়ে দোব। ও-বাড়ির বড়-বউয়ের বুনটা বেধবা হয়ে বাপের ঘরে ফিরেচে শোনলাম। বচর দুয়েকের ছেলেও আছে। একটা, তা থাকপা। ওকেই ঘরে তুলবো। বংশে বাতি দেবার লেগে লাতির তো দরকার। সে হতভাগিরও গোত্ হবে।

ভাল হয়ে ওঠেনি শাশুড়ি। কমলি একদিন সকালে উঠে দেখে, ওর গা-হাত-পা আড়কাঠ মেরে ঠান্ডা হয়ে রয়েছে। কমলি বুঝতে পেরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শাশুড়ির কাঠ-কাঠ বুকের ওপর। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল। শাশুড়ির মরায় শোকে, নাকি নিজের একা হয়ে যাওয়ার দুখে সে কান্না, কে জানে।

মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার সময় সেদিন ওকে শুনিয়ে পালবাড়ির ছোটবউ ও-বাড়ির বড় জাকে বলছিল—দিদি! তোমার বুন মালুতিকে দেকে মনে হয় না যে ওর বিয়ে হয়েচে। ক্যামুন ডাঁটো শরীল। ছাপা কাপড় পড়লে আইবুড়ি লাগে আখুনো। কী অদেষ্ট মেয়েটার। শুনেছেলাম, তোমাদের ও-বাড়ির বউ হবে। তা নগেন ঠাকুরপো তো...। যার কপালে যা নেকা আচে। কে আর খণ্ডাবে বল। তোমার খুশশাউড়ি তো শেষের দিকে বলত ঠাকুরপোর আবার বিয়ে দেবে। তোমার ওই বেধবা বুন মালুতিকেই নাকি ঘরে তুলবে। কাল তো দেকছেলাম...। এরপর পাল-বউ গলা নামিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিল, আর গলা তুলে দুজনে হাসছিল।

পাল-বউ কী বলছিল, না শুনতে পেলেও কমলি জানে। তার আগের দিন বিকালে মাঠ থেকে ফিরছিল ওর মানুষটা। মালতি তখন পথের ধারে খামার বাড়িতে দাঁড়িয়ে শেষ-রোদে চুল শুকোচ্ছে। ওকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে মানুষটা। রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে কমলি দেখছিল মালতি দু-পা এগিয়ে এল মুচকি হেসে। দু'জনে সামনাসামনি। তারপর কী কথা বলতে বলতে হো হো করে হেসে উঠল। মানুষটা কতদিন এমন দিলখোলা হাসি হাসতে দেখেনি। এসব কথা-ই হয়তো বড় জাকে বলছে ওই পাড়া-বেড়ানি পাল বউ।

কমলির খুব ভাল লেগেছিল মানুষটার ওই হাসি। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলেছিল ওরা দু-জনে। এমন সময় মালতি দু'বছরের বাচ্চাটা টলমল পায়ে বাড়ির ভেতর থেকে

বেরিয়ে এল। তার পরনে সবুজ পা-প্যান্ট, গায়ে লাল সোয়েটার, মাথায় নীল টুপি। পায়ের জুতো থেকে পিঁক-পিঁক শব্দ বেরোচ্ছে পা ফেলার সাথে সাথে। বাচ্চাটা ওদের কাছাকাছি এসে মায়ের দিকে এগোতে গিয়ে টলমল করে উঠল। মাটিতে পড়ার আগেই বাচ্চাটাকে ধরে ফেলল মানুষটা। কোলে তুলে নিল। পেটে মাথা ঘষে আদর করল। বাচ্চাটার কী খিলখিল হাসি। ও হাসি ওদের দু'জনের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। তা দেখে ওর বুক টনটন করে উঠেছিল। ওরকম একটা বাচ্চা এ বাড়িতে থাকলে ওই মানুষটা অমন হাসি খুশি থাকত।

নগেন বাড়ি ফিরলে কমলি কথায় কথায় বলেছিল—মালুতি মেয়েটা খুব ভাল বলো। বেশ হাসিখুশি সবসোমার। ওর ছেলেটাও বেশ সোন্দর। শুধু মনে হয় কোলে তুলে নিয়ে চুমু খাই। দেকা হলে কাল একবার আসতে বলো তো এ বাড়িতে।

নগেন ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল—তুমিই তো বলতে পারো।

চার

কমলি এবার অধৈর্য্য হয়ে দাওয়া থেকে উঠোনে নামে। এখনও তারা এসে জমল না তো! এত দেরি হবার তো কথা নয়! কোনও অঘটন ঘটল না তো। এসব ভাবতে ভাবতে ও মোরাম রাস্তার দিকে পায়ে পায়ে এগোয়। মোরাম রাস্তা গিয়ে মিশেছে পাকা সড়কে। যেতে যেতে কমলির মনে পড়ে পরশু রাতের কথা। বোধহয় পুর্ণিমা ছিল পরশু। অঘ্রানের মাঝামাঝি। হালকা শীত পড়েছে। নগেনের বাড়ির উঠোনের আমগাছে বাঁধভাঙা আলো। নগেনের খোড়ো চালের ঘরেও চুঁইয়ে পড়ছে রুপোলি চাঁদ। ঘরের ভেতর নগেনরা দুই মানুষে মাদুর আর ছেঁড়া কাঁথার বিছানায়। শোওয়ার আগে টেমিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়েছে কমলি। তবুও যেন ঘরের ভেতরে অন্ধকার জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। খড়ের চালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে দু'একটা রূপোলি রেখা ঘরের ভেতর। তেলচিটে বালিশে মাথা রেখে নগেন পাশ ফিরে শুয়ে। ওর চোখ বন্ধ। কমলি মশারি ঠিকঠাক গুঁজে গা আলগা করে নগেনের পাশে শোয়। নগেনের গায়ে ঢাকা নেওয়া কাঁথার মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে নিতে নিতে বলে—কী গো ঘুমুলা নাকি?

নগেন কিছু বলে না। গলা ঝেড়ে শব্দ করে শুধু। কমলি ওর চুলে আঙুল ডুবিয়ে বলে—এদিকে পাশ ফেরো না।

চিৎ হয়ে নগেন। কমলি ওর বুকের ওপর থুতনি রেখে বলে—ও বেলায় মালুতি এইছিল।

নগেন চুপ থাকে। কমলি বলতে থাকে—মেয়েটা কপালপুড়ি। অল্প বয়েসেই...। ওর ছেলেটাও হতভাগা, বাপ চিনল না।

এই রেতের বেলা আবার ওর কতা কেনে?

না, এমনিই। ওকে আসতে বলেছেলাম তো, আজ এইছিল। কত সুখ-দুখের কতা বলল। শ্বশুর-বাড়িতে থাকতে দেয়নি ওকে। তাই বাপের বাড়িতে। কিন্তু বাপ-ভাই তো খুব গরিব। তার লেগে দিদির বাড়ি এয়েচে সেই দুগ্গাপুজোর সোমায়, আর যায়নিকো। ও একছেলের মা হলে কী হবে, গতরটা টসকায়নি একদম, বলো!

ওর গতর দেকে আর কী হবে, ওসব কতা ছাড়ান দাও।

কমলি নগেনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে—এট্টা কত বলব, তোমাকে রাকতে হবে কিন্তুক।

কী কতা?

বলচি, ওই মালুতিকে তুমি 'এস্টারি' করে বিয়ে করে ঘরে তোলো। মায়ের ইচ্ছাও তাই ছিল।

কী বলচিস তু কমলি।

আমি ঠিকই বলচি। ওর সনে কতা বলে বোজলাম, ও গররাজি হবে না। তোমারও পচন্দ আচে, আমি জানি। সেদিন দেকলাম হেসে হেসে কতা বলছিলা ওর সনে।

তাতে কী হয়েচে?

না, তাতে কিচু হয়নিকো। আসলে, আমি তো তোমাকে এট্টা ছেলে দিতে পারলাম না; ওকে লিয়ে আসলে...। তোমার মনের কষ্ট আমি আর সহ্য কত্তে পাচ্চি না গো। ও থাকলে তুমিও হাসিখুশি থাকবা, আমার ভাল লাগবে।

কিন্তু তোর কী হবে?

কী আবার হবে, আমুও থাকবো। খাটবো, খাবো। সতীন লিয়ে আমি ঠিক ঘর কত্তে পারবো। দেকবা, ঝগড়াঝাঁটি করবো নাকো। ওর ওই ছেলাটাকে লিয়েই থাকবো আমি। আমাকে মা বলতে শেকাবো। নিজের পেটের না-ই বা হল, 'মা'-তো বলবে।

শেষের দিকে গলা বুজে আসে কমলির। আর কোনও কথা বলে না ও। নগেনও চুপচাপ। ঝিঁঝির শব্দ কানে আসছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে কমলি নিজেকে আয়ত্তে এনে বলে—তাইলে কালই কতা বলি মালুতির সনে।

নগেন কোনও কথা না বলে কমলিকে বুকে টেনে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চাইল।

পাঁচ

দূরে পাকা সড়ক আর দেখা যাচ্ছে না। ধোঁয়া-ধোঁয়া চারিধার। কমলি মোরাম রাস্তার ধারে বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে। ওর চোখ ব্যস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটা মানুষ আর লাল রংয়ের নকল বেনারসি পরা একটা মেয়েমানুষের খোঁজে। সকালে নগেনকে পরিষ্কার ধুতি আর বিয়ের সময়ের পাঞ্জাবিটা বের করে দিয়েছিল। লাজুক লাজুক মুখে নগেন পরেছিল সেগুলো। অনেকদিন আগে কেনা প্লাস্টিকের চটিজোড়াও খুঁজে-পেতে বের করে, ধুয়ে-মুছে দিয়েছিল। ও বাড়ির বড় বউ, লাল শাড়ি পরা মালতি। তার দু'বছরের ছেলে আর মানুষটা একসঙ্গে বেরিয়েছিল। গাঁয়ের পঞ্চায়েত মেম্বার রতন সামন্তর সঙ্গে পাকা সড়ক ধরে লাজুক-লাজুক মুখে এগোচ্ছিল নরম নরম রোদ্দুর গায়ে মেখে। ঝাপসা চোখে কমলিও বেরিয়ে পড়েছিল দক্ষিণে সোনাবাকুড়ির পথে।

ওর এখন মনে পড়ে, সোনাবাকুড়ির অর্ধেক ধানও কাটা হয়নি। জমির মালিক তরণী গালি- গালাজ করছিল ধান না কেটে মাঠ ছেড়ে বিকালবেলায় চলে আসার সময়। সেও এতক্ষণে জমি ছেড়ে বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে। আজ না হলেও কাল-পরশুর মধ্যে

সোনাবাকুড়ির সব ধান কাটা হয়ে যাবে। হালকা শীতের মিঠেল রোদে শুকিয়ে গেলে, সেগুলো আঁটি বাঁধা হবে। তারপর কটা মোড়লের ট্রাক্টরে চাপিয়ে মোড়লের খামারে, রাশি-রাশি ধান দেখে মোড়ল-গিন্নীর মুখে হাসি ফুটবে। সে মা-লক্ষ্মীকে বরণ করে নেবে তেল-হলুদ, মেটে সিঁদুর আর জলছরা দিয়ে। শাঁখ বাজাবে, উলুধ্বনি দেবে। তরুণীর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠবে হাসি। কমলি ভাবে—আজকের পর থেকে তার মানুষটার মুখেও হাসি লেগে থাকবে সারাক্ষণ, সারা জীবন।

উত্তর দিকের রাস্তায় ছায়া ছায়া কাদেরকে দেখা যাচ্ছে। ওরা-ই আসছে নিশ্চয়। কমলি ঝট্ করে বটগাছের গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে লুকোয়। মালতি আর নিজের মানুষটার জুটিকে কেমন মানিয়েছে দেখবে আড়াল থেকে। দু'জনে নিশ্চয় পাশাপাশি গল্প করতে করতে আসছে। বাচ্চাটা বোধহয় বড়-জা সামলে রেখেছে। কমলির বুকের ভেতরে যেন হাল চলছে। ওলট-পালট হচ্ছে মাটি। শেষকালে সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে। হাড়হাভাতে মালতিটা নিজের কপাল পুড়িয়ে, এবার তার কপালও পোড়াতে এল। দিদির বাড়ি এসে আর যাবার নামগন্ধ নেই। আর এ মানুষটা তেমনি! আর যেন সেই মালতি আছে! ভাতারখাগি, এক ছেলের মা-কে দেখেও যেন ওর...। মনের মাটি ওলটায়—না না এসব কী ভাবছে ও। সে তো বলেনি। মালতিও বলেনি। বরঞ্চ ও নিজেই বলে-কয়ে রাজি করিয়েছে। ওদের আর দোষ কী।

ছায়া-ছায়া মানুষগুলো কাছাকাছি হতেই স্পষ্ট দেখতে পায় কমলি। ওর নিজের মানুষটা আর ও-বাড়ির বড় জা। বড় জায়ের কোলে দু'বছরের বাচ্চাটা। আর কেউ নেই সঙ্গে। অবাক হয়ে কমলি বেরিয়ে আসে গাছের আড়াল থেকে। ওদের সামনাসামনি দাঁড়ায়—কীগো এত দেরি হল তোমাদের। 'এস্টারি' হয়নি নাকি? আমার সতীনকে দেকচি না তো।

নগেন হাসি-হাসি মুখে বলে—হ্যাঁ 'এস্টারি' হয়েচে বইকি। এস্টারি করেই তো তোমার আর আমার লেগে এই সোনার চাঁদটাকে পুষ্যি নেলাম। মালুতিরও ছেলে মানুষ করার চিন্তা গেল। বাপের ঘরে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে ওর একার পেট ঠিক চলে যাবে। মাজে-মদ্যে এসে ছেলেকে দেকে যাবে।

কমলির মুখ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না। কোনওক্রমে বলে ওঠে—এখন কোতা সে হতভাগী?

সে পরের বাসে আসবে রতনদার সঙ্গে। কিছু কেনাকাটা করার আচে। অল্প কিছু টাকা ছিল, তা-ই দেলাম মালুতিকে। দেক-দেক, তোমার দিকে দুষ্টুটা কেমন হাত বাড়াচে। মা ভেবেচে নিশ্চয়।

কমলি বড় জায়ের কোল থেকে বাচ্চাটাকে যেন ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বুকের মধ্যে মিশিয়ে ফেলতে থাকে। তা দেখে নগেন তৃপ্তির শ্বাস নেয়। ওর নাকে হু হু করে ঢোকে দূরের মাঠ থেকে আসা পাকা ধানের গন্ধ।

খোয়াব খেয়ালি আদমালি

নীহারুল ইসলাম

আদমখালি খোয়াব দেখে। খোয়াব দেখাটা তার বরাবরের অভ্যাস। খোয়াব তার ভাল লাগে। কারণ, খোয়াবে সে নিজেকে দেখতে পায়। খুব ভালভাবে দেখতে পায়। নিজের দোষগুণ, ভালমন্দ, নিজের অবস্থান—সবকিছু পষ্টভাবে তার নজরে আসে। সে কারণেই সে খোয়াব দেখে।

তাছাড়া খোয়াব দেখতে দেখতেই আজ সে বড় একজন গেরস্থ হয়েছে। বর্তমানে চারখানা হালের জোত তার। আগান-বাগানও কম নেই। পেয়ারা বাগানের পেয়ারা, কলাবাগানের কলা, আমবাগানের আম, লিচু বাগানের লিচু বিক্রি করে তার বার্ষিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা।

এইসব দেখে বিবি হাওয়া খাতুন একদিন তার কাছে বায়না ধরল, 'হ্যাঁ জী—ঘর-সংসার তো খুউব করনু, চলো এবার হজ কর‍্যা আসি। হুট কর‍্যা কবে মর‍্যা যাব। বয়স তো কমই হইল না।'

বিবি হাওয়া খাতুনের এই কথাগুলি আদমালির কলিজায় ঘ্যাক্ করে লাগল। বয়স যথেষ্ট হয়েছে তো সত্যি। কখন হুট করে মরে যাবে এটাও সত্যি। তাহলে একবার হজে যেতে আপত্তি কীসের?

আদমালি আপত্তি করল না, বিবি হাওয়া খাতুনের প্রস্তাবে চট করে রাজি হয়ে গেল। সম্ভবত তাদের চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে বিবির প্রস্তাবে তার এভাবে রাজি হওয়া এই প্রথম। খোদার ভয় নাকি অন্য কিছু এর কারণ, আদমালি তা অবশ্য বুঝতে পারল না। বুঝতে চেষ্টাও করল না। বদলে নিয়ম-পদ্ধতি মেনে বিবি হাওয়া খাতুনকে সঙ্গে করে উড়োজাহাজে চেপে বসল।

দুই

উড়োজাহাজ আসমানে উড়ছে। হাওয়া খাতুন রীতিমতো নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

আদমালির চোখে ঘুম নেই কিন্তু। কিছু ভাবছে সে। উড়োজাহাজের কাচঢাকা খিড়কি দিয়ে বাইরেটাও দেখছে। বাইরে বলতে নীচের ধরণীতল। অতীব সুন্দর সেই দৃশ্য। আদমালি অনুভব করছে ঠিকই, কিন্তু উপভোগ করতে পারছে না। ভাবছে নিজের জোতসম্পত্তির কথা। চাষবাসের কথা। যদিও ওসবের দেখভালের দায়িত্ব সে বর্তে দিয়ে এসেছে তার নিজের ছেলের ওপর। অথচ এখন উড়োজাহাজে বসে দেখা নীচের ধরণীতল তার মনে প্রশ্ন তুলছে। নহরের ধারের জমিতে গম লাগা আছে। সেই গম কেটে জমিতে চাষ দিতে হবে। ছেলেরা ঠিক ঠিক চাষ দেবে কি না। লাখদহের বিলে বোরোধান আছে। সার-পানি ঠিক সময়মতো দেবে তো। আমবাগানে এ বছর প্রচুর আম ধরেছে, সেদিকে

খেয়াল রাখবে তো? হঠাৎ আদমালির মনে হয়, এ কী ভাবছে সে? বিষয়-আশয়ের ভাবনা তো এখন তার ভাবা উচিত নয়। এখন সে হজে যাচ্ছে।

মনে মনে তিনবার 'তৌবা' উচ্চারণ করল আদমালি। কেননা, এ যাবৎকাল সে শুনে এসেছে, "মাটি থেকে অন্তত এক আঙুল ওপরে মনকে তুলে রাখো। মাটির সঙ্গে টান কমাও।" অথচ মাটি থেকে বিশ-তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে তার অবস্থান। আর কিনা সেই মাটিতেই তার মন পড়ে আছে? ছিঃ! ছিঃ!

নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেয় আদমালি। তারপর জানলার বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে উড়োজাহাজের ভেতরে। কী আশ্চর্য! সে দেখতে পায় তার আশপাশে সব হুরের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, হুরই সব। প্রত্যেকের হাতে ধরা ট্রে। কারও ট্রেতে পানীয় ভরতি গেলাসের সারি। কারও ট্রেতে আবার লজেন্স, শুকনো খাবার। কী খাবার ওগুলি? না, ওসব ভাল করে দেখবার সময় নেই আদমালির। সে ভালভাবে হুরগণদের দেখতে চাইছে। ভাবতে চাইছে বেহেস্তের কথা। যদিও বিবি হাওয়া খাতুনকে পাশে দেখে বুঝতে পারছে এটা বেহেস্ত নয়। এটা একটা উড়োজাহাজ। তাহলে হুরের মতো ওই মেয়েগুলি কে?

আদমালির মনে পড়ে গেল সে হুর সম্পর্কে যা জানে সেই তথ্যগুলি :

"হুরগণের সর্ব শরীর নুরানী সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য আলোক দর্শনের ন্যায়। যেন একটা স্বচ্ছ স্ফটিক। যাদের দিকে তাকালে তাদের ভেতরকার হৃদয় পর্যন্ত দেখা যায়। আর সেই হৃদয়ে, নেকবান্দা যারা হবে তারা নিজেকে দেখতে পাবে।"

আদমালি ভাবল, সে কি নেকবান্দা? অমনভাবে সে কি নিজেকে দেখতে পাবে? কিন্তু নেককাম সে কী করেছে দুনিয়ায়? মনে করতে চেষ্টা করল। সাধারণ মানুষের জীবন তার। ধ্যানজ্ঞান ছিল চাষবাসে। ওই চাষবাস করতে গিয়ে অন্যকিছু করবার বা ভাববার সময় পায়নি। তবে হ্যাঁ, কখনও কখনও নামাজ পড়েছে। পবিত্র রমজান মাসে রোজা রেখেছে। ফকির-মিশকিনদের দান-খয়রাত করেছে। কুরবানি-যাকাত দিয়েছে ঠিকঠাক। কিন্তু ওসব তো ছিল নিয়মমাত্র। আসল এবাদত ছিল তার চাষবাসে। না হলে বাপের কাছ থেকে পাওয়া মাত্র আট বিঘা থেকে আশি বিঘা সম্পত্তি হয় কী করে?

আদমালি হঠাৎ নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল। নিজের পাপ-পুণ্যের হিসাব নিজেই করতে বসল। স্বভাবতই তার দৃষ্টি আবার উড়োজাহাজের খিড়কির বাইরে আশ্রয় খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল।

নীচে তখন অথৈই নীল।

আদমালি ওই নীল দেখে প্রথমে চমকে উঠল। দুনিয়ায় অত নীল কী থাকতে পারে ভাবতে বসল। এতদিন দুনিয়ায় বসে আকাশের নীল দেখেছে। আর আজ আকাশে বসে দুনিয়ার নীল দেখছে। আচমকা মনে পড়ে গেল তাদের গাঁয়ের মুকদ্দম হাজীকে। মুকদ্দম হাজী যখন হজ করে তখন পানি জাহাজের চল। হজ করে এসে মুকদ্দম হাজী গল্প করেছিল, 'কী বুলবো ভাই? জাহাজ তো লয়, য্যানো বশির ল্যাংড়ার ডাঙাখ্যান নীলপানির ওপর

ভাসছে। আর চারদিকে এত নীলপানি যার কুনু কুল-কিনারা নাই। আল্লারে আল্লা— না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।'

আদমালির মনে হল, তাহলে সে ওই নীল পানিই দেখছে। তাদের নিয়ে উড়োজাহাজটা উড়ছে আরব সাগরের আশমানে।

হঠাৎ কোথা থেকে কী ঘটে যায়, উড়োজাহাজের ভেতরে কার গমগমে কণ্ঠ শোনা গেল, 'যাত্রী সাধারণের প্রতি বিশেষ অনুরোধ—আপনারা আপন আপন বেল্ট বেঁধে নিন। বিমানের ইঞ্জিনে সামান্য গোলযোগ দেখা দিয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কী ঠিক হয়ে যাবে? আদমালি দেখল ওই ঘোষণার পর যেসব ঘটনা ঘটতে লাগল, কোনওটাই স্বস্তির নয়—শান্তিরও নয়। যেমন উড়োজাহাজটি সাংঘাতিকরকম ঝাঁকাতে শুরু করল। ঠিক যেন তাদের গ্রামের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় গরুগাড়ি চড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। বিবি হাওয়া খাতুনেরও ঘুম ভেঙে গেছে। জিজ্ঞেস করছে, 'রাস্তাটো খুউব খারাপ নাকি জী? হাঁরঘের ডাবরার রাস্তাটোর মুতোন।'

বিবির কথায় আদমালি হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না। বিমানসেবিকারা ততক্ষণে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। তাদের চোখে মুখেও আতঙ্ক। এত প্রসাধনীর প্রলেপ তবু আতঙ্ক চাপা থাকছে না, ফেটে বেরিয়ে আসছে। আর উড়োজাহাজটা কখন 'চোঁ' করে নীচে নেমে যচ্ছে, কখন 'সোঁ' করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। যা দেখে আদমালির মনে হয়, বিবি হাওয়া খাতুন এবার হয়ত বলে উঠবে, 'কী জী এটা নাগরদোলা নাকি?'

কিন্তু না, বিবি হাওয়া খাতুন কোনও কিছু বলার সুযোগ পেল না। আদমালির শোনার সৌভাগ্য হল না তার আগেই বিমানটা বিকট গর্জন করতে করতে ওদের সবাইকে নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল।

তিন

রোজ হাশরের ময়দনে দাঁড়িয়ে আদমালি। তার পুনরুত্থান ঘটেছে। ধু ধু প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সে দেখছে কোথাও একখানা ঘরবাড়ি নেই। একটিও গাছপালা নেই। পাহাড় পর্বত নেই। খালি ধু ধু বালি। আদমালি অনুভব করল তার মাথার ঠিক আধহাত ওপরের সূর্যটাকে। ভয়ে সে মাথা উঁচু করতে পারছে না। তবে কোনওরকম তাপ লাগছে না তার।

তৎক্ষণাৎ আদমালির মনে পড়ে গেল কেতাবের কথা—"যারা নেকবান্দা হবে হাশরের ময়দানে তারা কোনওরকম তাপ অনুভব করবে না।"

আদমালি ভাবল, তাহলে সে নেকবান্দা নাকি? তাহলে তার আশেপাশে এত 'ত্রাহি ত্রাহি' রব কেন? সে ভাল করে কান পাতল। শুনল 'ইয়া রব্বী' 'ইয়া নফসী' রব। তখন আর তার কোনও সন্দেহ রইল না যে, সে সত্যি সত্যি হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তাহলে দিনটা কেয়ামতের দিন নিশ্চয়। শেষ বিচারের দিন। এই দিনে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভাল মন্দের হিসাব নেবেন স্বয়ং আল্লা। তারই জোর প্রস্তুতি চলছে।

আদমালি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

অবশ্য সেটা যে অনর্থক, আদমালি তা ক্ষণিকের মধ্যে বুঝতে পারল। এবং দৃষ্টি মেলে তাকাল চারপাশে। দেখল তার মতো অসংখ্য মানুষকে। তারা প্রত্যেকেই ভীত, সন্ত্রস্ত, তটস্থ যেন। প্রত্যেকের শরীর অনর্গল ঘেমে যাচ্ছে। সে ঘাম কারও হাঁটু ডুবিয়ে রেখেছে। কারও কোমর। কারও বা বা বুক। কারও আবার গলা। অনেকে তো হাবুডুবু খাচ্ছে পর্যন্ত।

শুধু কি তাই? আদমালি আরও দেখল—যারা ঘুষ খেত, উপঢৌকন নিত, হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করত—তাদের আকৃতি হয়েছে শুয়োরের মতো। যারা কাজী-মুফতি হয়ে মিথ্যা কথা বলত, মিথ্যা ফতোয়া দিত, বিপরীত হুকুম দিত—তারা সব অন্ধ হয়ে গেছে। যারা নিজেকে অপর হতে শ্রেষ্ঠ মনে করত এবং নিজের এবাদতের জন্য মনে মনে গর্ব অনুভব করত—তারা সব বোবা-বধির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আদমালি কেতাবের বর্ণনানুযায়ী মানুষের পরিণতি দেখছে রোজ হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে। নাকি খোয়াব দেখছে? ভয়ঙ্কর খোয়াব। যেখানে সে একজন দর্শকমাত্র। না হলে তার শরীরে ঘাম নেই কেন? মাথার ঠিক আধহাত ওপরে সূর্য অথচ কোনওরকম তাপ অনুভব করছে না কেন? পায়ের নীচে খটখটে বালি অথচ তার কেন মনে হচ্ছে যে, সে যেন মখমলের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে? আশ্চর্য। এও কি সম্ভব? দুনিয়ায় কি তাহলে সে কোনও পাপ করেনি?

আদমালি আশ্চর্য হয়। তবে বেশিক্ষণ আশ্চর্য থাকতে পারে না। কেননা, শেষবিচারে সে দারুণভাবে উত্তীর্ণ হয়। বেহেস্তবাসের ছাড়পত্র পেয়ে যায় হাতে। স্বভাবতই তার খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু সে খুশি হতে পারে না। তার দৃষ্টি তখন হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের দুর্ভোগ দেখে। তাদের মধ্যে বিবি হাওয়া খাতুন কোথায় কী অবস্থায় রয়েছে তার দৃষ্টি খুঁজে ফেরে। পায় না তাই কষ্ট হয়। তবু কিছু করতে পারে না। ফেরেস্তা তাকে বেহেস্তে নিয়ে যাবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। খোদার নির্দেশ আদমালি তা বুঝতে পারে।

চার

অদ্ভুত এক আশ্চর্য স্থানে নিজেকে পড়ে থাকতে দেখল আদমালি।

অদ্ভুত এক আশ্চর্য স্থান বলতে সিক্ত বেলাভূমি। যেখানে তার পা ছুঁয়ে যাচ্ছে সমুদ্রর ঢেউ। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকটাও দেখল আদমালি। পেছনে ঝাউয়ের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের বাতাসে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। যা শুনে তার মনে পড়ল মর্ত্যের এক সুরকারকে, যিনি নিজে বধির হয়ে অন্ধকে জ্যোৎস্নার ধারণা দিতে এক আশ্চর্য সুর সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সুরই যেন এখন শুনতে পাচ্ছে আদমালি।

আদমালি আর পড়ে থাকে না, উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে পারে না। বদলে নিজেকে দেখে। দেখে নিজের পরিবর্তিত রূপ। কত বয়স কমে গেছে তার। শরীর টানটান হয়েছে। মুখে দাড়ি গোঁফের চিহ্ন নেই। মাথার চুল কুচকুচে কালো।

আদমালির তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল কেতাবের কথা—"বেহেস্তে পুরুষের বয়স হবে বাইশ বছর, নারীর আঠারো।"

তাহলে আমি কি সত্যি সত্যি বেহেস্তে এসে উপস্থিত হয়েছি? আদমালি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল। কোনও উত্তর পেল না। তখন পায়ে পায়ে ঝাউবনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিছুটা হাঁটতে না হাঁটতে তার মনে হল, ওই ঝাউয়ের জঙ্গলে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে যেন কেউ। শুধু অপেক্ষা করে নেই, আশ্চর্য এক সুর বাজাচ্ছে। তাকে আকৃষ্ট করছে। আর সে নির্ভীক হেঁটে যাচ্ছে। তার কোনওরকম পিছুটান নেই। সঙ্গীত ঘোরে আবিষ্ট সে। লক্ষ্য তার সেই সুর। আর কোনওদিকে খেয়াল নেই।

না, একটা দিকে তার খেয়াল আছে। বহুদিন আগে, যখন তার যৌবনকাল। না, ভুল হল। তখন নবযৌবনকাল। তিনবন্ধুর সঙ্গে দিঘার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গেছিল। প্রচুর মদ্যপান করেছিল। তারপর নেশার ঘোরে ঝাউয়ের জঙ্গলে একজন দেহপোজীবিনীর কাছে তারা এক এক করে গেছিল। সেদিন এরকমই ঘোর ছিল তার। আশেপাশে কী ছিল না ছিল, কী ঘটছিল না ঘটছিল—কোনও খেয়াল ছিল না।

কিন্তু সেটা ছিল দুনিয়ার ঘটনা। আর আজকেরটা বেহেস্তের।

দুনিয়া আর বেহেস্ত ব্যাপারটা মাথায় খেলতে আদমালি সচেতন হল। হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে দৃষ্টি ঘোরাল। ঝাউবন আছে ঠিক, কিন্তু এই ঝাউবন সেরকম নয়। এখানে শুধু ঝাউয়ের গাছ নেই। আরও অনেক কিছুর গাছ আছে। অপরিচিত গাছ সব। গাছে গাছে বহু কিসিমের ফুল আছে, ফল আছে। বিচিত্র বর্ণের পাখি আছে। তাদের কলকাকলি আছে। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের তা হল, ফলের গাছগুলির মূল উপরদিকে, মাথা নীচের দিকে। সব গাছের কাণ্ড যেন সোনার তৈরি। বাকল মসৃণ এবং কারুকার্যময়। পাতাগুলি অদ্ভুত সুন্দর। আরও একটা সেটা আশ্চর্যের সেটা হল, মৃদুমন্দ বাতাসে সেইসব পাতা থেকেই সেই অদ্ভুত আশ্চর্য সুরের সৃষ্টি হচ্ছে।

ব্যাপারটা আবিষ্কার করে আদমালির খুব আনন্দ হয়। সেই আনন্দে আপন খেয়ালে সে বেহেস্তের বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বেহেস্তের বাগানে যে অসংখ্য নহর প্রবহমান, যেগুলির দুই তীর মণিমুক্তা দ্বারা বাঁধানো এবং অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যেগুলির উভয় তীরে নানারকমের ফুলের গাছ এবং মণিমুক্তা, হীরাজহরত খচিত অগণিত বসবার জায়গা আছে, আদমালির তা দৃষ্টি এড়াল না। তখন তার আবার মনে পড়ল কেতাবের কথা—" বেহেস্তের মধ্যে তিন প্রকার ঝরনা আছে। একটির নাম 'কাফুর'। এর পানি নির্মল, শীতল এবং মৃদু সুগন্ধ যুক্ত। দ্বিতীয়টির নাম 'জানজাবীল'। এর পানি চা বা কফির মতো মদু উষ্ণ। তৃতীয় ঝরনাটির নাম 'তাসনীম'। এটি শূন্যে ভাসমান অবস্থায় প্রবহমান।" আদমালি সেগুলি খুঁজতে আরম্ভ করল। একে একে সেগুলির সাক্ষাৎ তো পেলই, সঙ্গে 'হাউজে কাউচার'-এরও সাক্ষাৎ পেল। দুধের মতো সাদা পানি যার, মধুর মতো মিষ্টি, বরফের মতো ঠাণ্ডা, কস্তুরীর মতো সুগন্ধিযুক্ত। সেই পানি পান করে সে তৃপ্ত হল। আর তার মনে পড়ল বিবি হাওয়া খাতুনের কথা। হাওয়া খাতুনের গতি জান্নাতে হয়েছে

না জাহান্নামে, সে জানে না। যদি জান্নাতে হয়, কীভাবে তার সাক্ষাৎ পাবে তাও জানে না। এ ব্যাপারে কেতাবে কিছু পড়েছিল কি না, সেটাও মনে করতে পারে না। অগত্যা সে একস্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিবি হাওয়া খাতুনকে স্মরণ করে। বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়। ঠিক সেই সময় একটি উল্টোমুখী গাছের শাখা অনেকগুলি বড় বড় ফল নিয়ে তার চোখের সামনে নুয়ে আসে। কেন আসে কে জানে! আদমালি বুঝতে পারে না। তবে পেল্লাই সাইজের একটা ফল ছিঁড়ে হাতে নেয় সে। তার পর বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলতে সেটিকে নিয়ে লোফালুফি শুরু করে। সবটাই অন্যমনস্ক ভাবে করে। ফলে যা ঘটার তাই ঘটে। একসময় ফলটি হাত থেকে নীচে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তবু আদমালি 'এঃ্যা' বলার সুযোগ পায় না, সে হতবাক হয়ে দেখে এক পরমাসুন্দরীকে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। বিস্ময় কিছুতেই কাটে না তার। এর মধ্যে মেয়েটি যখন বলে ওঠে, 'হে জান্নাতবাসী বন্ধু—পরম আল্লাহতালার নির্দেশে আমি আপনার খিদমতে উপস্থিত হলাম।' আদমালি তখন অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইল, 'আপনি কে?'

পরমাসুন্দরী বলল, 'বেহেস্তের অনেকগুলি নিয়ামতের আমি একটি।'

'—আপনি আমার কী খিদমত করতে চান?'

'—আপনি যা চাইবেন!'

আদমালির মনে পড়ে যাচ্ছে তার সেই নবযৌবনকালে দেখা দিঘার ঝাউবনে এক দেহপোজীবিনীকে। মাত্র দু'শো টাকার বিনিময়ে একটা ভাঙা ঝাউগাছের আড়ালে সে উলঙ্গ হয়ে শুয়েছিল তাদের চার বন্ধুর জন্য। অন্য বন্ধুরা মেয়েটির সঙ্গে কী করেছিল সে বলতে পারবে না তবে সে কিছু করেনি, করতে পারেনি। আসলে ব্যাপারটা সে বিশ্বাস করতে পারেনি।

এখানকার ব্যাপারটাও সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। পরমাসুন্দরী সেটা বুঝতে পেরে বলে উঠল, 'কী হল? চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আল্লাহতালা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। ভাববেন আমি আমার কর্তব্যে গাফিলতি করছি।'

আদমালির মনে পড়ছে দিঘার ঝাউবনে সেই দেহপোজীবিনী এমন কথা এমন স্বরেই উচ্চারণ করেছিল। যা শুনে সেখান থেকে ভয়ে পালিয়ে এসেছিল সে।

তাহলে এখন সে কী করবে? পালাবে? কিন্তু কোথায় পালাবে? বেহেস্ত ছেড়ে কি কোথাও পালানো যায়? বেহেস্তে তো সবাই আসতে চায়। বেহেস্তে আসবার জন্য জিন্নতির জিন্দেগি কাটাতে হয় দুনিয়ায়। তাহলে?

পাশে বিবি হাওয়া খাতুন থাকলে আদমালি তাকে জিজ্ঞেস করত। তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে বিবি হাওয়া খাতুনের জুড়ি মেলা ভার। বিবি হাওয়া খাতুনের বুদ্ধিতেই সে সফলভাবে দুনিয়াদারি করেছে। সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে থেকেছে জীবন। অভাব থাকতেও অভাব টের পায়নি। সমস্যা হলেও সমস্যা অনুভব করেনি। এসবই বিবি হাওয়া খাতুনের জন্যই সম্ভব হয়েছে। 'সংসার সুখের হয় গৃহিণীর গুণে'—বিবি হাওয়া খাতুনের জন্য

তার সংসার সুখের হয়েছিল। তাহলে তার বেহেস্তবাসের শরিক তার বিবি হবে না কেন? হাওয়া খাতুন কোথায় আছে? সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পরমাসুন্দরীকে জিজ্ঞেস করবে নাকি? ভাবল আদমালি। ভাবলই, জিজ্ঞেস করতে পারল না, তার আগেই পরমাসুন্দরী বলে উঠল, 'নিশ্চয় আপনি আপনার বিবি হাওয়া খাতুনের কথা ভাবছেন?'

আদমালি ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল সুন্দরীর দিকে। তার মনের কথা সুন্দরী পড়তে পারছে দেখে তাজ্জব বনে গেল। যদিও বিবি হাওয়া খাতুনের কথা উঠতেই তার বুকের ভেতরটা কলকল করে উঠল। সে আর বেশিক্ষণ হতবাক হয়ে থাকতে পারল না, জিজ্ঞেস করে বসল, 'হাওয়া খাতুন কোথায় আছে বলতে পারবেন?'

পরমাসুন্দরী বলল, 'জাহান্নামে।'

—'জাহান্নামে! কেন জাহান্নামে আমার হাওয়া খাতুন?' খুব করুণভাবে জানতে চাইল আদমালি।

পরমাসুন্দরী মায়া-দয়াহীন ভাবে বলল, 'পাপী, সেই জন্য।'

—'কী পাপ করেছিল আমার হাওয়া?' আবার জানতে চাইল আদমালি।

পরমাসুন্দরী বলল, 'কেন, আপনি জানেন না? সেটা তো আপনারই ভাল জানবার কথা। আপনাকে না বিবি হাওয়া গন্দম ফল ভক্ষণ করতে প্ররোচিত করেছিল।'

—'মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথা। আমাকে কেউ প্ররোচিত করেনি, বরং আপনি আমাকে প্ররোচিত করেছেন।'

—'আমি প্ররোচিত করেছি? আমি!' বলে সুন্দরী হো হো করে হাসতে শুরু করল। সেই হাসিতে তার দেহবিভঙ্গ মাদকতার সৃষ্টি করল। আদমালি দেখেও দেখল না, জোর গলায় বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আপনি আমাকে প্ররোচিত করেছেন, আপনি।'

পরমাসুন্দরী পরিবেশে ল্যাবণ্য ছড়িয়ে বলল, 'আপনি সেটা বলতেই পারেন। তবে আমি কিছু করছি না। আমি শুধু পরম আল্লাহতালার নির্দেশ পালন করছি।'

আদমালি খেয়াল করল, দিঘার ঝাউবনে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকা দেহপোজীবিনীটি এমনই কিছু কথা বলেছিল সে যখন জিজ্ঞেস করেছিল, 'এ কাজ তুমি স্বেচ্ছায় করছো না বাধ্য হয়ে করছো?' কী বলেছিল দেহপোজীবিনীটি? মনে করতে চেষ্টা করল আদমালি। হ্যাঁ, মনে পড়ল তার। দেহপোজীবিনীটি তাকে বলেছিল, 'কেউ স্বেচ্ছায় করে বাবু? বাধ্য হয়ে করে। আমিও বাধ্য হয়ে করছি। ধরুন কারও নির্দেশ পালন করছি।' তারপর স্বতস্ফূর্তভাবে দেহপোজীবিনীটি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, 'আসুন বাবু—আমাকে সম্ভোগ করুন। আপনি তৃপ্ত হোন আর আমাকে দয়া করুন।'

ভীষণ ভয় পেয়েছিল আদমালি। দেহপোজীবিনীটিকে দয়া করা দূর, সে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ, একটি যুবতী এভাবে উপার্জন করতে পারে, সে বিশ্বাস করতে পারেনি। যেমন বিশ্বাস করতে পারছে না এই পরমাসুন্দরীকে। যে আল্লাহতাল্লার নির্দেশে তার খিদমতের জন্য তার সামনেই উপস্থিত।

সত্যিই কি এটা আল্লাহতাল্লার নির্দেশ না শয়তানের কারসাজি? আদমালির মনে দ্বন্দ্ব

দেখা দিল। পরমাসুন্দরী সেটাও টের পেয়ে গেল। বলল, 'আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না তো যে, আমার সৃষ্টি আপনার খিদমতের জন্য। তাহলে শুনুন, আল্লাহতালা আপনাকে সৃষ্টি করার বহুপূর্বে আমাকে সৃষ্টি করে এই যে বৃক্ষ দেখছেন, এর যে বড় বড় ফল—এরই একটিতে আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আপনি যখন বিবি হাওয়া খাতুনের বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়ে ভেতর ভেতর ছটফট করছিলেন, আল্লাহতালার নির্দেশে এই বৃক্ষের শাখা আপনার কাছে নুইয়ে এসেছিল, খেয়ালবশত একটি ফল ছিঁড়ে আপনি হাতে নিয়েছিলেন। তারপর সেটিকে দু'হাতে লোফালুফি করছিলেন। আপনার অন্যমনস্কতার সুযোগে ফলটি শেষ পর্যন্ত আপনার হাতে থাকেনি, নীচে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেছিল, আর আমি তা থেকে বেরিয়ে এসে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম.....'

আদমালি যেন গাঁজাখোরি গল্প শুনছে এক পরমাসুন্দরীর মুখ থেকে। কিন্তু এর বেশি শুনতে পারল না। অসুস্থবোধ করতে শুরু করল। কোথাও বসতে পারলে ভাল হতো—হয়ত সুস্থ বোধ করত। এমনই ভাবল।

পরমাসুন্দরী তার মনের কথা আবারও পড়তে পারে। বেহেস্তের বাগানে প্রবহমান নহরের একটির পাড়ে মণিমুক্তা-হীরাজহরত খচিত অসংখ্য বসবার জায়গার একটিতে আদমালিকে সঙ্গে নিয়ে বসবে ভাবল। সেইমতো তার সুন্দর লিকলিকে একখানি হাত আদমালির দিকে বাড়াল। আর আদমালি চমকে উঠল। সাপের ভয় পেল যেন। চকিতে সে দু'হাত পিছিয়ে গেল এই বলতে বলতে, 'আপনি আমাকে ছোঁবেন না—আপনি সরে যান—আপনি আমাকে নষ্ট করবেন না।'

পরমাসুন্দরী পরিবেশে আরও বেশি লাবণ্য ছড়িয়ে বলল, 'আপনি কিন্তু আমাকে নষ্ট করছেন।'

আদমালি জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে?'

—'আমাকে আপনার খিদমতের সুযোগ না দিয়ে।'

পরমাসুন্দরীর এমন কথায় আদমালি চিৎকার করে বলে উঠল, 'আচ্ছা ঝনঝাট তো!' ওতেই পাশে শুয়ে থাকা বিবি হাওয়া খাতুনের ঘুম ভেঙে গেল। খোয়াব খেয়ালি মরদের জন্য হামেশা তার এমন হয়। হাওয়া খাতুন অভ্যস্ত। মরদ যে খোয়াব দেখতে দেখতে আজ আবার কোনও ঝন্‌ঝাটে পড়েছে তাও বুঝতে পারল। এখন সেই ঝন্‌ঝাট থেকে মরদকে উদ্ধার করাটাও সে তার কর্তব্য বলে মনে করল। তৎক্ষণাৎ মৃদু ধাক্কা মেরে মরদকে জাগাল। জিজ্ঞেস করল,'কীসের অত ঝনঝাট? কাকে লিয়ে ঝন্‌ঝাট? হামাকে লিয়ে না তোমার খোয়াবকে লিয়ে?'

আদমালি বিবির এমন কথায় খুব লজ্জা পেল। সেই লজ্জা থেকে বাঁচতেই বোধ হয় বিবিকে সে হুকুম করল, 'বেশি বকবক করিস ন্যা তো। জলদি এক গেলাস পানি লিয়ে আয়, জোর পিয়াস লেগ্যাছে।'

ক্যাপ্টেন

জয়ন্ত দে

রায়চৌধুরী। ক্যাপ্টেন রায়চৌধুরী। নামটা কখনও নিমাইদা আমাদের কাছে বলেনি। নাম জিগ্যেস করলে নিমাইদা বলেছে, ক্যাপ্টেন রায়চৌধুরী।

ক্যাপ্টেন রায়চৌধুরী কোনও নাম হয় না কি? নিশ্চয়ই কোনও নাম আছে, যা বাবা মা দিয়েছে, সেই নামটা কী? আমরা জানতে চেয়েছি।

আমাদের কথার উত্তরে সবসময়ই নিমাইদা গম্ভীর গলায় বলত, ভেবে নে না ক্যাপ্টেনটাই নাম, আর রায়চৌধুরীটা পদবী।

নিমাইদার কথায় আমরা ঠিক খুশি হই না। আমরা পালটা যুক্তি দিই। শোন, কেউ জন্ম থেকে ক্যাপ্টেন হয় না। কর্ম করে ক্যাপ্টেন হয়। তা কর্ম করার আগে অমুক রায়চৌধুরী, তমুক রায়চৌধুরী তো কিছু একটা নাম ছিল। সেটা কী বলো?

আমাদের কথা শুনে নিমাইদা হাসল, বলল, মনে হচ্ছে তোরা যেন গভমেন্টের ঘরে গিয়ে খাতা উলটে খোঁজ নিবি।

নিমাইদার এইসব ভ্যানতাড়া মার্কা কথা শুনে হারানদা অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবার সে আর থাকতে পারে না। তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে। খোঁজ নিতে যাব কেন, তুই কি ভাবছিস আমরা আমাদের মেয়ের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের সম্বন্ধ করব?

নিমাইদা গম্ভীর মুখে বলল, ক্যাপ্টেন বিয়ে করবে না। আর করলেও ওর জন্যে সব ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মেয়ে এক সময় লাইন দিয়ে বসে থাকত। তোদের স্ট্যান্ডার্ডে ক্যাপ্টেনকে জামাই করা হত না।

নিমাইদার কথায় হারানদা ফায়ার, খো তোর ক্যাপ্টেন রে। তোর কী স্ট্যান্ডার্ড আমার জানা আছে। তুই আবার আমার স্ট্যান্ডার্ড তুলে কথা কস!

নিমাইদা আগাগোড়া স্বাভাবিক। আমার স্ট্যান্ডার্ড কী তোরা জানিস। আমি ক্যাপ্টেনের স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে কথা বলছি। নিমাইদাকে এমন স্বাভাবিক থাকতে দেখে হারানদা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন হই হই করে হারানদাকে বসায়। চা আসে। বেঞ্চে আবার বসতে বসতে হারানদা বলল, এই বানচোতের ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তবু একবার ওই ক্যাপ্টেনকে একবার চোখের দেখা দেখতে পেলাম না রে!

হারানদার কথায় নিমাইদা কান না দিলেও পারত। তবু নিমাইদা স্বগতোক্তি করার মতো বলল, পাবি পাবি, সময় হলে ঠিক দেখতে পাবি।

কবে দেখব নিমাইদা। তুমি লাস্ট দেড় বছর হল ক্যাপ্টেনের গল্প দিচ্ছ, কিন্তু মালটাকে একবার চোখের দেখাও দেখালে না। সে কি এমন ভি আই পি! রাধেশ্যাম ফোঁস কাটে।

নিমাইদা ধীর গলায় রাধেশ্যামকে বলল, অত বেইমানির কথা বলিসনি। ক্যাপ্টেনের পাঠানো স্কচ তুই খেয়েছিস? এত কঠিন স্কচটার নাম যে তুই বানান করে উচ্চারণ করতে পারছিলি না, এখন বড় বড় বাত বাড়ছিস।

রাধেশ্যাম চুপ মেরে যায়। নিমাইদা বলে, আমার অত ক্ষমতা আছে অমন দামি একটা স্কচের বোতল কিনে নিয়ে আসার? আর শোন যদি কিনতে পারতাম তাহলে তোদের চন্নমিত্যও দিতাম না।

আমি টিউশনে চলে যাচ্ছিলাম তবু নিমাইদার কথা শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি, তাহলে যে তুমি পুরো বোতলটা আমাদের ধরে দিলে।

নিমাইদা বলল, আমি দিইনি ক্যাপ্টেন দিয়েছে। ক্যাপ্টেন তো তোদের জন্য পুরীর খাজাও পাঠিয়েছিল। খাসনি?

ক্যাপ্টেন কেন আমাদের দিতে বলল? আমার দেরি হচ্ছে, পর পর টিউশন তবু আমি দাঁড়িয়ে যাই।

নিমাইদা হাসল, ক্যাপ্টেন আমার কাছে তোদের কথা শুনেছে। শুনে শুনে তোদের চিনে গেছে।

দুলাল ঝটকা মেরে উঠল, আমাদের সবাইকে চিনে গেছে।

নিমাইদা বলল, আলবাত। কে কেমন দেখতে। কে কী করে সব জেনে গেছে। এই তো আমাকে মাঝে মাঝেই এর তার নাম করে বলে ওকে একদিন নিয়ে এসো।

দুলাল গা ঝাড়া দিল, আমার নাম করলে, বলবে আমি চলে যাব। তেমন হলে ডিউটি ধরব না চলে যাব।

হারানদা বলল, তোকে ডাকবে না সমন পাঠাবে। চলে যাস।

নিমাইদা হারানদাকে থামিয়ে বলল, দুলাল তোর নাম ক্যাপ্টেন কোনও দিন বলেনি। না, বলেনি। বললে আমার ঠিক মনে থাকত। তবে তুই যখন বড় মুখ করে বলেছিস আমি তোকে নিয়ে যাব। ক্যাপ্টেনের বাড়ি তুই আমার গেস্ট হয়ে যাবি।

হারনদা মুখ বেঁকায়, কোন হরিপদ দাস এল রে, তার আবার গেস্ট!

হারানদাকে আমরা কোনও দিন দেখিনি নিমাইদার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে। সারা সময় দুজনের ঝটাপটি চলে। তবে সেটা খুব ভালো করে দেখলে বোঝা যায় হারানদাই লড়ে যায়, নিমাইদা নির্বিকার।

দুলাল একটু বিমর্ষ মুখে বলল, তুমি কি ক্যাপ্টেনের কাছে আমার নাম কোনও দিন করোনি।

যথেষ্ট করেছি। আসল কথা কী জানিস, নাম তো শুধু নাম নয় নামের সঙ্গে গুণপনা থাকে। আলো থাকে, আঁধার থাকে। রং থাকে, ঘ্রাণ থাকে। সেসব কম থাকলে মানুষ ইন্টারেস্টিং হয় না। তখন সেই মানুষের নাম-ডাক কমে যায়।

নিমাইদার কথা দুলাল কিছু বুঝল না। সে গাল ফুলিয়ে বলল, আমি সেন্ট্রাল গভমেন্টের স্টাফ ক্যাপ্টেন জানে?

ক্যাপ্টেনও সেন্ট্রাল গভমেন্টের স্টাফ ছিল। তবে?

দুলাল মিন্টে কাজ করে। বাবার চাকরি পেয়েছে। মালটা গবেট। কিন্তু চোদ্দো হাজার টাকা মাইনে পায়। শালা, সরকারের ফালতু টাকা আছে নইলে এইরকম একটা মাল পোষে।

নিমাইদা বলল, ও সব তুই বুঝবি না। কে সেন্ট্রাল, কে স্টেট, কে খুচরো বিক্রেতা তাতে কিছু আসে যায় না। আসল ব্যাপারটা হল মন। এই যে তুই বড় কৃপণ। আমাকে তোর গপ্পো করতে গেলে তোর কিপটেমির গপ্পো করতে হয়। ব্যাস, সেই গল্প থেকেই ক্যাপ্টেন তোকে চিনে গেছে।

নিমাইদার কথা শুনে দুলাল গুম মেরে যায়।

নিমাদা বলল, এসব শুনে ক্যাপ্টেন তোর নাম দিয়েছে লু। লু মানে জানিস, লু মানে গরম হাওয়া। লু মানে দীর্ঘশ্বাস। তুই যে দিকে তাকাবি সেদিক শুকিয়ে যাবে। তবু আমি তোকে আমার গেস্ট করে নিয়ে যাব ক্যাপ্টেনের বাড়ি।

এর তিনদিন পর- শনিবারে দুলাল আমাদের অবাক করে হুইস্কির দুটো বোতল এনেছিল। আর মাল খেতে খেতে আমাদের সবারই আলোচ্য বিষয় ছিল একটা, দুলাল কেন বোতল দিল? ওর কি প্রোমোশন হয়েছে? ওর বউ কি প্রেগনেন্ট? না কি অনলাইনে মাল বেঁধেছে? দুলাল কোনও উত্তর দেয়নি। শুধু একবার নিমাইদাকে বলেছিল,একদিন ক্যাপ্টেনকে ইনভাইট করো আমি মালের সঙ্গে মাংসও লাগিয়ে দেব।

দুলালের কথায় নিমাইদা কোনও কথা বলল না। তবে গ্লাসটাকে আদর করতে করতে হারানদা বলল, ক্যাপ্টেন পাঁঠা খায়। চিকেনকে মাংস বলে জানিস তো।

আমরা অবাক হলাম, হারানদাও শুনতে শুনতে কত কী জেনে গেছে।

দুই

নিমাইদার কাছে আমাদের নামের লিস্ট আছে। তাতে ঠিক করা আছে ক্যাপ্টেনের বাড়িতে কে কে যাবে। এই যেমন প্রথম নাম আছে টোটার, তারপর তপার, এভাবে এক এক করে সবার, আমি আছি আটে। এখনও পর্যন্ত লিস্টে আছে ন-জন। গেস্ট একজনই দুলাল।

ক্যাপ্টেনের অনেক বাড়ি। ফ্ল্যাট। এইসব বাড়ি ফ্ল্যাট সারা কলকাতায় ছড়ানো। তবে আমরা যাব সাউদার্ন অ্যাভিন্যুর ফ্ল্যাটে। এখানে ক্যাপ্টেন উল্লাস জীবন কাটায়। যেমন আহিরিটোলার বাড়িতে ক্যাপ্টেন আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করে। গোসাবার বাড়িতে হয় ক্যাপ্টেনের বনবাস। তেমনই সাউদার্ন অ্যাভিন্যুর এই ফ্ল্যাটে ক্যাপ্টেনের ভোগের জীবন। এইসব বাড়িতেই নিমাইদা গেছে। ক্যাপ্টেন নিয়ে গেছে। অন্য কাউকে এনট্রি দেয়নি, সেখানে আমাদের নিমাইদাকে দিয়েছে। নিমাইদা সব স্বচক্ষে দেখে এসেছে। নিমাইদা ক্যাপ্টেনের সব জীবনের গল্পই করতে চায়।

আহিরিটোলার বাড়িতে আধ্যাত্মিক জীবনে ক্যাপ্টেন ধর্মকথায় মজে কীভাবে হাউহাউ করে কাঁদে। গোসাবার বাড়ির বনবাস জীবনে ক্যাপ্টেন শুধুমাত্র আলো চাল আর ডাল ভাত খেয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করে। এরকম কতশত গল্প। তবে আমরা সে গল্প থামিয়ে দিই। আমাদের সমস্ত আগ্রহ, রস-কষ-তেতো-ঝুলঝুলই হল ক্যাপ্টেনের সাউদার্ন অ্যাভিন্যুর ফ্ল্যাটে। ক্যাপ্টেনের উল্লাস জীবনে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমরা ওই ফ্ল্যাটে উল্লসিত হতে চাই।

তবে নিমাইদা শুনিয়ে দিয়েছে একসঙ্গে সবাই হবে না। সবাই যাবে, তবে খেপে

খেপে। নিমাইদা তার লিস্ট ধরে পর পর একজন করে আমাদের নিয়ে যাবে ক্যাপ্টেনের ফ্ল্যাটে।

ক্যাপ্টেনের ফ্ল্যাটে দেদার মজা! বিয়ার হুইস্কি রাম সবই পাবে। কপাল ভালো থাকলে স্কচ-শ্যাম্পেনও মিলতে পারে। নিমাইদা বলে দিয়েছে যে যার ভাগ্যে খাবে। যা খেতে ইচ্ছে করবে তাই নিয়ে নেব। কেউ দেবার নেই, কেউ বাধা দেওয়ারও নেই। আর খাবার, ডবল ডোর আড়াইশো লিটারের বিদেশি ফ্রিজে থরে থরে সাজানো। চিকেন, মাটন, পর্ক, বিফ থেকে টার্কি, ডাকও আছে। তবে দিলীপের এই নিয়ে একটা আপত্তি আছে। ওর মতে ক্যাপ্টেনের তো টাকার অভাব নেই, ইচ্ছে করলেই ফ্রিজ কিনতে পারে। সেখানে বিফটা রাখবে। বরফের ভেতর জমে থাকা মাংস, চেনা তো সহজ নয়।

নিমাইদা আশ্বাস দেয়, সব চিনতে পারবি। বরফ ছাড়িয়ে মাইক্রোআভানে দিয়ে রোস্ট করে নিবি, ব্যাস। মেয়েগুলো তো এসে বড়ে খেয়ে যায়। মেয়েগুলো এত মাংস দেখে এমন হামলা হামলি করে যেন পুরো ফ্রিজটাই খেয়ে নেবে। কিন্তু শেষে কী দেখা যায়, ওরা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট খালি করতে পারেনি।

আমরা চাপা গলায় প্রশ্ন করি, এক মেয়েরাই প্রত্যেকবার আসে?

নিমাইদা আমাদের থেকেও আরও চাপা গলায় বলল, ক্যাপ্টেনের ওখানেও একটা লিস্ট আছে। পরপর দুজনকে ডেকে নেয়। আমার একটা, ক্যাপ্টেনের একটা। কাউকে ডিপ্রাইভ করে না। আসলে সবাই তো ক্যাপ্টেনের বাড়িতে আসার জন্য পাগল। তোরা গেলে একটা বেশি আসবে। তিনটে মেয়ে চান্স পাবে। এক একজনের সাড়ে সাতশো টাকা রেট। দুজন দেড় হাজার নেয়। তিনজন হলে দু-হাজার আড়াইশো। মোট কথা এক একজনের পৌটা।

তারপর? আমাদের মধ্যে কেউ ফিসফিস করে।

তারপর আবার কী। যার যেমন ইচ্ছে সে সেভাবে এনজয় করবে। কারও খবরদারি নেই। এই যে ক্যাপ্টেন শুধু চান করে। বাথটবে ডুবে বসে থাকে। মেয়েগুলো ক্যাপ্টেনকে সাবান মাখায়, চান করায়।

আমরা ফিসফিস করি, তুমি কী করো মেয়ে নিয়ে?

নিমাইদা পরিষ্কার বলে দেয়, আমি ক্যাপ্টেনের মতো সাধু নই যে জলে ডুবে চুপ করে বসে থাকব। আমি ফুল এনজয় করি।

নিমাইদার কথা শুনতে শুনতে দুলাল বলল, তাহলে কি বাথটবে দুজনে মিলে চান করো?

হারানদা বলল, হাগল। ওরা বিছানায় গিয়া সাঁতরায়। তুই সাঁতার দিবি তো একটা সুইমিং কস্টিউম কিনে ফেল।

নিমাইদা গম্ভীর মুখে বলল, তুই তোর মতো এনজয় করবি, সেদিন তুই আমার গেস্ট। 'গেস্ট' কথাটা এমন ভাবে নিমাইদা গলা কাঁপিয়ে টেনে দিল যে একরাশ সুখচিন্তায় দুলাল চোখ বন্ধ করে ফেলল।

আমাদের মাঝে মাঝেই ক্যাপ্টেনকে নিয়ে নানা কথা হয়। কখনও আমরা সেই কথা

শুরু করি। কখনও নিমাইদা শুরু করে। তবু আমরা ক্যাপ্টেনের দেখা পাই না। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সামনা সামনি আলাপ পরিচয় হয় না। সে কথা নিমাইদাকে বললে নিমাইদা লিস্ট দেখায়। যে এই কথা তোলে সে কত নম্বরে আছে সেটা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে ভরসাও দেয় এইবারেই পাকা কথা বলে আসব, কবে থেকে তোরা যাবি।

নিমাইদা সেই অদৃশ্য মানুষটিকে ক্যাপ্টেন রায়চৌধুরী বলে উল্লেখ করে। আমরাও তাই করি। আমার একদিন এক স্টুডেন্টের একটা কথা মাথায় লাগল। ঠেকে ফিরে আমি নিমাইদাকে জানতে চাইলাম তোমার রায়চৌধুরী সাহেব কি জাহাজের ক্যাপ্টেন? না উড়োজাহাজের?

আমার কথায় বেশ বিব্রত হল নিমাইদা। আমার কথা শুনে প্রশ্নটা অনেকেরই মনে উঁকি দিল। এবং তারা যথারীতি বলতে শুরু করল, ক্যাপ্টেন কি জাহাজ চালাত? ক্যাপ্টেন কি প্লেনের পাইলট।

নিমাইদা কোনও উত্তর দিল না। আমার কেন জানি মনে হল নিমাইদা উত্তর খুঁজছিল। ঠিক পাচ্ছিল না।

এইসব কথার মাঝে হঠাৎ হারানদা বলল, বাসের দরজায় দেখেছিস ড্রাইভার নয় পাইলট লেখা থাকে। আমাদের নিমাইয়ের ক্যাপ্টেনের কি সেই রকম কেস?

এই কথায় নিমাইদা রেগে গেল। নিমাইদাকে এমন রেগে যেতে হারানদা কোনও দিন দেখেনি। প্রচণ্ড রেগে নিমাইদা বলল, তোমরা একজন ভদ্রলোককে অপমান করছ। এই অপমান করার অধিকার তোমাদের নেই। কথা শেষ করে নিমাইদা চলে গেল। তারপর তিনদিন নিমাইদার পাত্তা নেই। আমরা অবাক। রোজই খোঁজ নিয়েছি। আর রোজই নিমাইদার ঠাকুরমার কাছ থেকে শুনে আসছি, নিমাইদা ক্যাপ্টেনের বাড়িতে।

ঠিক তিনদিন পেরিয়ে চারদিনে নিমাইদা এল। নিমাইদার শান্ত সমাহিত চোখ মুখ। আমরা খুব উদ্বেগের সঙ্গে জিগ্যেস করলাম, কোথায় ছিলে এই তিনদিন?

নিমাইদা বলল, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে।

আমরা সবাই বললাম, তিনদিন? তাহলে বহুত মৌজ মস্তি করেছ।

নিমাই আমাদের দিকে বহু দূর থেকে দেখার দৃষ্টিতে তাকাল।

দুলাল বলল, তিনদিন একটা ফ্ল্যাটে কাটিয়ে দিলে? তিনদিনে কী কী মাল খেলে? আর মেয়ে? দুটো মেয়েকেই তিনদিন ওই ফ্ল্যাটে পুষলে...।

নিমাইদা বলল, তিনদিন নয়, ওই ফ্ল্যাটে একদিন ছিলাম। স্কচ ছিল। পায়েল আর পূজা ছিল।

দুলাল বলল, তবে আর দু-দিন?

একদিন আহিরিটোলায়, একদিন গোসাবায়। আমরা এই তিনদিন তিনভাবে জীবন অতিবাহিত করলাম।

হারানদা বলল, ও, একদিন মদ মেয়েছেলে করে ফুর্তি করলি। আর বাকি দুদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে আহিরিটোলায় আর গোসাবায় ধম্ম ধরলি।

নিমাইদা হারানদার কথা যেন শুনতেই পেল না। বলল, আমাদের আহিরিটোলার

আধ্যাত্মিক জীবনেও দুজনের সাধনসঙ্গিনী ছিল, পাত্র ভর্তি সোমরস ছিল। আমাদের গোসাবার বনবাস জীবনেও দুজন বনবালা জুটে গিয়েছিল। দ্রাক্ষারসও জোগাড় করেছিল ক্যাপ্টেন। আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিল না তিনদিন।

আমরা একসঙ্গে সবাই বলে উঠলাম, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে দিতেই হবে। আমরা কোনও কথা শুনব না। নাহলে আমরা জোর করে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ সেরে আসব।

নিমাইদা বিষণ্ণ মুখে হাসল, এই কথাটাই আমি তোদের মুখ থেকে শুনতে চাইছিলাম। ঠিকই তো ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তোরা কেন ওয়েট করবি। কেন লিস্ট মেনে একজন একজন দেখা করতে যাবি। কক্ষণও না।

আমরা অবাক হয়ে নিমাইদার দিকে তাকিয়ে বললাম, তাহলে আজই দেখা হবে।

নিমাইদা বলল, আজ হলে তো ভালোই হত। কিন্তু ক্যাপ্টেন যে আজই পাড়ি দিল দূর দেশে।

আমরা সবাই বললাম, দূরদেশে!

নিমাইদা বলল, অনেক আটকানোর চেষ্টা করেছিলাম, হল না। ক্যাপ্টেন ক'দিন ধরেই বার বার বলছিল, স্বজাতির মধ্যে থাকতে এসে শুধুই অপমান পেলাম। কেউ বুঝল না। সবাই সন্দেহের চোখেই দেখল। আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করল। শেষ দিকে খুব দুঃখ ছিল ক্যাপ্টেনের মনে।

ফুঁসে উঠল দুলাল, কে অপমান করল ক্যাপ্টেনকে? কে দুঃখ দিল?

বিষণ্ণ মুখে নিমাইদা বলল, কে দেয়নি? চেনা অচেনা সবাই। এই তোরাও কি ছেড়ে দিয়েছিস? যা মুখে এসেছে তাই বলেছিস। একজন মানুষের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ করেছিস। অপমান করেছিস।

নিমাইদার কথায় হারানদা মাথা নিচু করল। আমরাও।

তবু আমাদের মধ্যে কেউ একজন বলল, দূরদেশে মানে কোন দেশ?

নিমাইদা বলল, তা আমি কী করে জানব, যে পাড়ি দেয় সেই জানে।

আমি বললাম, পাড়ি! ক্যাপ্টেন কি জাহাজে পাড়ি দিল, জলপথে? না কি উড়োজাহাজে রওনা হল, বায়ুপথে?

নিমাইদা বিষণ্ণ মুখে বলল, ক্যাপ্টেন কীসে গেল আমি দেখিনি। আসলে আমি পিছন ফিরে তাকাইনি। সত্যি বলছি, আমি পিছনে তাকাতে পারিনি।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হবে না। সবাই চুপ করে বসে। মানুষটাকে আমরা কেউই চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না। আমরা তার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করলাম, নানা কথায় মানুষটাকে অপমান করলাম। সেও আমাদের দেখল না। কিন্তু আমাদের অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে চলে গেল।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পড়াতে চললাম। অন্য টিউশন থাকলে যেতাম না। ঠেকেই সবার সঙ্গে মাথা নিচু করে বসে থাকতাম। কিন্তু আজ সুজানকে পড়াতে যেতেই হবে।

ওরা বেড়াতে গিয়েছিল। আঠারো দিন সিমলা কুলু মানালি ঘুরে এল। আমার এই ক-দিন ছুটি ছিল। আজ সকালে ফিরেছে। ওর বাবা বলেছেন, আজ তুমি আসতে পারো।

কিন্তু ওদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম সবার মুখই থমথমে। সুজান আমার সামনে এল না। ওর মা বলল, সুজান আজ পড়বে না। আপনি পরশুই আসুন।

ওর বাবা আমাকে একটা সুন্দর সোয়েটার দিল, এটা মানালি থেকে তোমার জন্য পছন্দ করে সুজান কিনেছে।

আমি বললাম, কী হয়েছে সুজানের, শরীর খারাপ?

সুজানের বাবা বলল, না, আসলে ওর খুব মন খারাপ। এসে কান্নাকাটি করছে। তুমি তো জানতে ওর দুটো নিও পেট ছিল।

আমি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে ওই দুটো ভ্যারচুয়াল পেট রেখেছিল। ইন্টারনেটেই ওদের খাওয়াত, বাওয়েল ক্লিয়ার করতে রাস্তায় ঘোরাত, কত কেয়ার নিয়ে পুষত...

সুজানের বাবা বলল, হ্যাঁ, আঠারো দিন আমরা বাইরে বাইরে ঘুরেছি। ওই নিও পেট দুটোর দেখাশোনা হয়নি। খাওয়ানো হয়নি। কেয়ারের অভাবে ওই দুটো মারা গেছে। সুজান বড় ভেঙে পড়েছে বুঝলে। ওর মা কত করে বোঝাচ্ছে, তুই আবার ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে আর দুটোকে পুষ্যি নে, কিন্তু সে কথা ছেলে শুনবে না। খালি বলছে, ওরা বড় কষ্ট পেয়েছে।

আমি ফিসফিস করি, ক্যাপ্টেনও বড় কষ্ট পেয়েছে। বড় কষ্ট নিয়ে আমাদের নিমাইদার ক্যাপ্টেন আজ দূর দেশে পাড়ি দিয়েছে।

ওই দুটোর কথা সুজানের ভাবা উচিত ছিল। কোথাও রেখে যেতে পারত। শুধু অবহেলায় ওরা মারা গেল। সুজান বার বার এ কথাই বলছে। আসলে ইন্টারনেটেই তো ওদের রাখার জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা ছিল। বুঝলে, ওদের তো শরীর নেই, ওদের শুধু মন। তাই ওরা বড় অভিমানী হয়। মানুষের মতো অপমান অবহেলা ওরা সয় না, চলে যায়।

শুধু অবহেলায়, অপমানে ক্যাপ্টেন আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আর ক্যাপ্টেন যাবে না-ই বা কেন? আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কোন অধিকারে ক্যাপ্টেনকে অপমান করে?, আমরা ভেবেই নিয়েছিলাম,ক্যাপ্টেন আমাদের মতো অবহেলা, অপমান সহ্য করা ভীতু কোল কুঁজো মানুষ।

সিদ্ধ বকুল

অশোক বিশ্বাস

এক

কাগজে খবরটা পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে কেমন হয়ে গেল শুভ।...এই জনার্দন মাজিই কি তার অফিসের মোহরার জনার্দন।.....বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। কাগজের রিপোর্টারকে যে স্টেটমেন্ট সে দিয়েছে তাতে সমস্ত কিছুই ঠিক ঠিক; অফিসের ব্যাপারও.....।

একটু বেশি বয়সেই শুভর ডব্লু.বি.সি.এস.-এ চাকরি পাওয়া—তারপর কংসাবতী নদী প্রকল্পের ক্যানেল ডিভিশানের রেভিনিউ অফিসার হয়ে এই অফিসে আসা।—বাঁধের সঞ্চিত জল চাষিদের বেচে ফসলপিছু জলকর আদায় করার কাজ—ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের টেস্ট-রিপোর্ট-এর নির্ভর করে। চারজন তহশিলদার আর পাঁচজন স্টাফ নিয়ে অফিস।

ট্রেনিং শেষে প্রথম পোস্টিং পেয়েই এখানে এসে জায়গাটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। একটা প্রাচীন শিরীষগাছ বিশাল ছায়ায় ঢেকে রেখেছে তিনখানা ঘর নিয়ে একতলা ছোট্ট অফিস.....আর অফিস সংলগ্ন তার ছিমছাম্ বাংলো। চারিদিকে গ্রাম। আঁকাবাঁকা পথ। লালমাটি। মহুয়া-পলাশ-শাল-পিয়াসাল। পশ্চিমের আকাশে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বিদায়ী সূর্যের একচিলতে লাল আভা জানলা দিয়ে এসে পড়েছে তার নিজের বসার ঘরটির একদিকের দেয়ালে। দেয়াল জুড়ে কংসাবতীর উদাসী বহে যাওয়ার ছবি।.....মনে পড়ে গিয়েছিল বন্ধু ভূপাল চক্রবর্তীর কবিতার একটি লাইন,.....'একমাত্র নদী জানে কোন পাপ পাপ নয়, অপুষ্পক মূলত আদিম'.....। জন্মের শেষ সুতো দুটোর বন্ধন অনেক দিন আগেই ছিন্ন; তাঁরা এখন মাথার কাছের ছবি। সময় এত দ্রুত ছোটে.....আজ ছেলে তো কাল লোক। বিয়ে করে গুছিয়ে বসার সময়ও পায়নি শুভ। সুতরাং বন্ধন এখন আর অন্য কিছু নয়, বই; শুধুই বই। প্রথম পোস্টিং-এর পর অন্যত্র আর ট্রান্সফারও হয়নি। আর,—এই তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে দেখে আসছে সে জনার্দনকে। ভাঙা গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখ দুটো দুঃখী দুঃখী। নীরব। তবে, কত কয়েকদিন ধরে যেন আরও নীরব। দিন দুয়েক আগে একটা কাজ নিয়ে ঘরে আসতে শুভ জানতে চেয়েছিল, ব্যাপার কী.....আবার কিছু ঘটেছে নাকি। এরকম জানতে চাওয়ার মানে একটাই, মা-মরা একমাত্র ছেলেটাকে নিয়ে ও সবসময়ই বিব্রত থাকে। ছেলে কথা শোনে না। দিনকে দিন বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। লেখাপড়ার পাট কবেই চুকিয়ে দিয়েছে। এখন শুধু খায়দায় আর টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। অথচ বয়স কম হল না। বাইশ-তেইশ তো বটেই। ব্যবসা-ট্যাবসা কিছু একটায় বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু ধৈর্য কম বলে ছেলে পারেনি। এত রাগী, বাড়ির কাছে একটা কুকুর সবসময় ঘেউ ঘেউ করত বলে একদিন দা নিয়ে তেড়ে গিয়ে এক কোপে দু-টুকরো.....।

শুভর প্রশ্নের জবাবে জনার্দন বলেছিল, দশদিন আগে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছি বলে বাইক নিয়ে বেরিয়েছে, তারপর আর খবর নেই.....।

বন্ধুবান্ধব কেউ গিয়েছে সঙ্গে?

কিছুই জানি না স্যার।

জনার্দনের চিন্তা তাকেও আচ্ছন্ন করল......ঝাড়গ্রাম যায় ক্ষতি নেই, কিন্তু ওই বয়সের ছেলে, সঙ্গে যদি বন্ধুবান্ধব থাকে, তার ওপর বাইক....যদি ঝোঁক চাপে কাঁকড়াঝোড়টা ঘুরে যাই তাহলেই মুশকিল। বাঁশপাহাড়ি বেলপাহাড়ি পার হয়ে......।

জনার্দন শুকনো মুখ করে চলে গিয়েছিল।

আসলে বাইকটাই হল সর্বনাশের মূল। বছর দেড়েক আগে যখন জনার্দন মোটর বাইকের অ্যাডভান্সের দরখাস্ত দেয়, ওকে ঘরে ডেকে শুভ বলেছিল, বেশ তো ছিলে, হঠাৎ বুড়ো বয়সে এসবের শখ হল কেন, শেষে কি হাত-পা ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকতে চাও! জনার্দন বলেছিল, আমার জন্যে নয় স্যার, ছেলের আবদার।...ছেলের আবদার। এই তো ক-দিন আগে একটা দামি মোবাইল কিনে দিলে, আবার এখন.....। জনার্দন মুখ নিচু করে নীরব হয়ে ছিল। শুভ বলেছিল, শুনেছি তান্ত্রিকরা পঞ্চ 'ম'-কারের সাধনা করে, এখনকার উঠতি বয়সের ছেলেরা তিন 'ম'-কারের সাধনায় মেতেছে—মোবাইল, মোটরবাইক আর মেয়ে; সেও তবু ভাল, মেয়ের মতো মেয়ে হলে ভাল, কিন্তু তা যদি না হয়ে অন্য কিছু হয়? জনার্দন বোবা চোখ তুলে তাকাতে বলেছিল, তুমি অ্যাডভান্স নেবে তুমিই শোধ করবে, আমার কিছু নয়; কিন্তু ছেলেটার দিকে একটু নজরটজর রেখো, ওই বয়সের ছেলে, কাঁচা মাথায় থাকা একদম ঠিক নয়, শেষে এমন পাল্লায় গিয়ে পড়বে ফেরার আর পথ থাকবে না। তোমায় একটা গল্প বলি শোনো...গল্পই বা কেন বলছি, সত্যি ঘটনা। কানাডার হ্যারিস নামে এক অভিযাত্রী বেরিয়েছিলেন নরখাদকদের খুঁজে বের করার অভিযানে। উত্তর আমেরিকার একেবারে দক্ষিণে ছোট্ট একটা দেশ, গুয়াতেমালা। তিনি খবর পেয়েছিলেন, গুয়াতেমালার উত্তর-পশ্চিমে ফুয়েগো আগ্নেয়গিরিকে ঘিরে গড়ে-ওঠা ঘন অরণ্যের মধ্যে কোনও এক পাহাড়ে নরখাদকরা আছে। হ্যারিস সায়েবের সঙ্গে অভিযানের লোকজন ছাড়াও ছিল তাঁর দশ বছরের ছেলে ক্যান্‌বা। একদিন বিকেলের দিকে সেদিনের মতো তাঁবু ফেলার উদ্দেশে দলবল নিয়ে চলেছেন গাছপালার ফাঁকফোকরে সমতল জায়গার খোঁজে। অস্ত্রশস্ত্র একটু আগেই গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। হঠাৎ একটা গাছের নিচে দিয়ে যাওয়ার সময় ওপর থেকে ঝুড়ির জাল ফেলে নরখাদকরা তুলে নিল তাঁর ফুটফুটে ছেলেটাকে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে ঘন অরণ্যের এক গাছের ডাল থেকে আর এক গাছের ডাল ধরে চোখের আড়ালে উধাও হয়ে গেল চার-পাঁচজনের একটা দল। সায়েবের কিছুই করার থাকল না। শেষে পাথর হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু ওরই মধ্যে দেখে নিলেন তাদের চেহারা। আর ছবিও তুলে নিলেন... রোগাটে, সাধারণ আকৃতির তামাটে ফর্সা রঙের চেহারা। চোখেমুখে অদ্ভুত এক বন্যতার ছাপ। ফিরে এসে একটা বই লিখলেন...... 'মাউন্টেন অব দ্য কনিবল গড'। খুব নাম হল। কিন্তু পুত্রশোক

ভুলতে না পেরে দিনগুলো কাটতে লাগল যন্ত্রণায়। বাইশ বছর পর দলবল নিয়ে আবার তিনি গেলেন সেই অঞ্চলে।—চারদিকে অনেক কিছু বদলে গেছে; বদলায়নি শুধু জঙ্গল, আর পাহাড়টাই। আবার দেখা পেলেন নরখাদকদের। তাঁর দলের একজন কুলিকে গোপনে তুলে নিয়ে গিয়ে তারা তখন খাচ্ছিল। হ্যারিস সায়েব অবাক হয়ে দেখলেন ওই দলে তাঁর সেই বাইশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছেলে ক্যান্‌বাও রয়েছে। নরখাদকরা তাকে না খেয়ে ফেলে নিজেদের মতো নরখাদক করে তুলেছে।—তিনি যেমন ছেলেকে চিনতে পারলেন, ছেলেও তেমনি চিনতে পারল তাঁকে। হ্যারিস সায়েবের ব্যাকুল চোখের সামনে ইশারায় জানালো সে—আর ফিরবে না। ছেলের ছবি তুললেন হ্যারিস, তারপর ফিরে এলেন।...এমন কত ফাঁদ আছে কে জানে, একবার গেলে আর হয়ত ফেরা যায় না।....

ঘরের বাইরে পদশব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে শুভ দেখল অফিসের ফরাস দেবেন হেমব্রম এসেছে। আজ ছুটির দিন না হলে সে এতক্ষণ অফিসে আর দেবেন অফিসের ঝাড়মোছ সেরে তার কোয়ার্টারে এসেছে কাজে। খাওয়ার টেবিলে একটা টিফিন কেরিয়ার রেখে দেবেন বলল, বাড়িতে হাঁসের মাংস রান্না হয়েছে, বউ একটু পাঠিয়ে দিল, একটু শক্ত হলেও খেতে ভাল, খাবেন তো স্যার?

আড়মোড়া থেকে শুভ উঠে বসল বিছানায়, আমার বোন যখন আদর করে পাঠিয়ে দিয়েছে খাব বৈকি। আচ্ছা দেবেন, জনার্দনের বাড়ি এখান থেকে কতটা দূর....জানো?

বাসে এক ঘণ্টার মতো লাগে। কেন স্যার?

শুভ খুঁটিয়ে পড়ল দেবেনের মুখ.....এখনও সে কিছু জানে না বলেই মনে হল; বলল, ভাবছি আজ একবার যাব। বহুবারই যেতে বলেছে....যাওয়া হয়নি....।

দেবেনের মুখে একটা ছায়া পড়ল, ওদিকের জায়গা ভুঁই খুব খারাপ হয়ে গেছে স্যার....।

ও তুমি ভেব না, সাবধানে যাব। ফিরবও বেলাবেলি।

দেবেন উঠে পড়ল। —তাহলে আজ আর রান্নার ঝামেলায় যাবেন না। চানটান করে নিন। আপনার জন্যে দু-মুঠো ভাত নিয়ে আসি বাড়ি থেকে।

দেবেন চলে যেতে কাগজটা আবার খুলল শুভ।

কাগজে জনার্দনের কথা লিখেছে কিন্তু তার ছবি দেয়নি। ছবি দিয়েছে তার ছেলের। ধরা পড়ার পর ক্যামেরার সামনে মুখ ঢাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ছবি উঠে গিয়েছে। ও মুখ চেনা শুভর। বাপের কাছে কাজে অকাজে কতবার এসেছে অফিসে।

নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন—

অস্ত্রশস্ত্রসমেত কয়েকজন দুর্বৃত্ত ধরা পড়েছে স্থানীয় একটি ইটভাটার মধ্যে। পুলিশ ব্যবহার করে না এমন সব অস্ত্র তাদের কাছে পাওয়া গেছে। বেশ কিছুদিন ধরেই দলটি ওখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওখানে তল্লাসি চালায়

এবং বামাল সমেত ধরে ফেলে। খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি ওই অঞ্চলে জোর করে চাষের জমি নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কৃষকদের সমুচিত শাস্তি দিতেই ওদের ওখানে আমদানি করা হয়েছিল। কয়েকদিন আগে তাদের সম্মিলিত পরিকল্পিত আক্রমণে বেশ কিছু নিরীহ কৃষকের প্রাণ যায়। নারী এবং শিশুরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। অনেকগুলো ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য...অষ্টাদশী পাপিয়া দলুই নামের একটি মেয়ে। সে এবারে উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী ছিল; রাতে তার বাড়িতে গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়। আর এই ধর্ষণের জন্য অভিযুক্ত হয় খোকন মাঝি। মেয়েটির বা মা পুলিশের হাতে আটক আসামিদের মধ্যে খোকনকেই সনাক্ত করেন। সেদিন রাতে খোকন ই তাঁর বাড়িতে যায় এবং তাঁর মেয়েকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। সেই গ্লানি আর লজ্জায় মেয়েটি পরের দিনই কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করে।

মেয়েটির ছবি ছেপেছে কাগজে। বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা ছবি। উদ্ভিন্নযৌবনা প্রাণবন্ত একটি মেয়ে, যার চোখের তারায় কৌতুক। অত সহজে আমি হাসি না, ওষ্ঠের ভঙ্গি অমন কথা বললেও সারা মুখ ভরে তার চোরাবাণের মতো ছড়িয়ে রয়েছে চাপা হাসির মূর্চ্ছনা।

কাগজটা ভাঁজ করে চোখ বুজল শুভ।

দুই

গুমটি দোকানের চা-অলা জিজ্ঞেস করল, আপনি কাগজের লোক, না টিভির?

শুভ বলল, অফিসের।

দোকানদার দেখিয়ে দিল পথ।—বাঁদিক দিয়ে কিছুটা এগোলে চৌপথী। জায়গাটাকে বলে দোলতলা। তারপর ডানদিকের রাস্তা ধরে এগোলে একটা বড় বকুল গাছ। গাছের পেছনেই বাড়ি।

লম্বা হয়ে শুভর ছায়া পড়ছে রাস্তায়। একদল হাঁস হেলেদুলে কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। দড়িতে বাঁধা একটা ছাগল দু-পায়ে একটা ডুমুর গাছে ঠেলে উঠে তেলাকুচোর লতা টেনে খাচ্ছে। ঘড়ি দেখল শুভ। ফেরার বাস সন্ধে ছ-টায়।

এই সেই বকুল গাছ। নিচেয় বেদী বাঁধানো। চারিদিকে ছড়ানো রঙমাটি ঝরে যাওয়া ঠাকুরের চালচিত্র-কাঠামো। বেদীর ওপর গাছের গোড়ায় তেল-সিঁদুর লেপা একটা গোল কালো পাথর। তাতে শুকনো মালা। এ পাশে ওপাশে ধূপের পোড়া কাঠি। প্রদীপ।

গাছটা ছেড়ে শুভ পাশের শুঁড়িপথটা ধরল।

সদর অন্দর নেই। পথ উঠোনে গিয়ে শেষ। রাঙচিতা আর বিশল্যকরণীর বেড়া। একপাশে একটা ঝাঁকড়া বাসক।

উঠোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জনা কয়েক লোক। টালির চালের ঘর। মাটির উঁচু দাওয়ায়ও ক-জন। তার মধ্যে রয়েছে জনার্দনও।

শুভকে দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল সে। উঠে দাঁড়াল। মুখে কথা সরল না।

ধীর পায়ে শুভ উঠোন পেরোল। দাওয়ার নিচেয় জুতো খুলে তাল গুঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠল। যারা দাওয়ায় বসে ছিল জনার্দনের ভাবসাব দেখে তারাও উঠে দাঁড়াল। চারিদিকে চেয়ে কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে যেতেই হাত বাড়িয়ে ধরে নিল জনার্দন, আর এতক্ষণে তার মুখে কথা সরল, স্যার আপনি....।

উঠোনের লোকগুলোও দাওয়ার কোলে এসে দাঁড়িয়েছে......সকলের মধ্যেই একটু বিভ্রমের ভাব। জনার্দন বলল, আমার সায়েব। বলে, ঘরের ভেতর ব্যাগটা রাখতে গেল।

একজন বয়স্ক লোক বলল, অতদূর থেকে এসেছেন, গরমে কষ্ট হয়েছে নিশ্চই....। লোকটা একজনকে ডেকে কী ইশারা করতেই সে একদিকে চলে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেয়াল ঘেঁষে জনার্দন উবু হয়ে বসল। আদুল গায়ে লুঙ্গির ওপর এখন হাফশার্ট চাপিয়েছে।

মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল সে। একজন বলল, জনা, মাথায় হাত দিয়ে বসতে নেই।

কথা খুঁজে পাচ্ছিল না শুভ। যে লোকটা চলে গিয়েছিল সে ফিরে এল। হাতে দুটো ডাব আর দা। পেছন একগলা ঘোমটা টানা একটা বউ, হাতে একটা বড় কাচের গ্লাস।

আপত্তি টিকল না, দুটো ডাবই খেতে হল শুভকে।

বয়স্ক লোকটি বলল, আজ কিন্তু আপনার ফেরা হবে না স্যার। কাল রোববার, একটা দিন থেকে যান। আপনার কথা জনার মুখে অনেক শুনিছি। আপনি থাকলে ও তবু দুটো কথা বলে হালকা হতে পারবে।

কিন্তু আমার যে বলা আছে যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরব।

সে আপনাকে ভাবতে হবে না, আমরা খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। শুধু একটু অনুমতি করুন।

কিছুক্ষণ ভাবল শুভ, তারপর বলল, বেশ তা-ই হবে।

কথাটা শুনে জনার্দন শুধু তার মুখের দিকে একবার তাকাল।

বেলা পড়ে আসছে। লোকজন ফাঁকা হতে লাগল। সেই বউটি উঠোনের কোণের টিউবওয়েল থেকে এক বালতি জল আর একটা এনামেলের ঘটি এনে রাখল দাওয়ার ধারে, ঘর থেকে একটা নতুন গামছা আর একটা পাট ভাঙা ধুতি এনে দাওয়ার আড়ায় টাঙানো বাঁশের ওপর রেখে উঠোনের ওপাশে রান্নাঘরে চলে গেল।

শুভ হাতমুখ ধুয়ে ধুতি দোভাঁজ করে লুঙ্গির মতো পরে সুস্থ হয়ে বসতেই বউটি চা মুড়ি নারকোল নাড়ু দিয়ে গেল।

বয়স্ক লোকটি খুঁটি ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসেছিল....জনার্দনের দিকে একপলক তাকিয়ে শুভকে অনুযোগের গলায় বলল, কত করে ওকে বলছি স্যার, পুলিশের হেপাজতে তো রয়েছে ছেলেটা, একবার গিয়ে দেখে এসো, তো কে আর কথা শোনে। উঠল লোকটা, যাই বাড়ি পানে গিয়ে একবার ঘুরে আসি.....।

লোকটা চলে যেতে শুভ কিছুক্ষণ জনার্দনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ছেলেকে দেখতে গেলে না কেন, গেলেই পারতে একবার।

নাঃ.....।

না কেন?

ও মুখ আমি আর দেখব না।

হঠাৎ শুভর মুখে কোনও কথা জোগাল না। উঠোনের নোনাগাছটার ওপর ছায়া ঘনিয়ে আসছে। সেই ঘনায়মান ছায়ার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলল, কেন?

বউটি দাওয়ার একটা হেরিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল।

মাটির দিকে ঘাড় হেঁট করে চেয়ে ছিল জনার্দন। শুভর কথায় এবার মুখ তুলে শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, কাকে দেখতে যাব স্যার, এ তো আমার সে খোকন নয়, একে তো আমি চিনি না। বলে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরল। কথা হারিয়ে গেল শুভরও।

অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। কোথাও কোনও গাছের কোটরে বসে একটা কালপেঁচা ডেকে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরল জনার্দনের। ব্যস্তভাবে বলল, দেখবেন স্যার আমার খোকনকে? বলে, হেরিকেন নিয়ে ঘরে গেল। ফিরে এল একটা বাঁধানো ছবি নিয়ে। আলোর সামনে মেলে ধরে বলল, এই হল আমার খোকন।

চেনা মুখ, তবু নতুন করে দেখল শুভ। বছর বাইশ তেইশের তরতাজা যুবক, সুস্বাস্থ্য, মাথা ভরা চুল, ঘন ভ্রু, সুচারু গোঁফ, চোখদুটোর একটু যেন বা অসন্তুষ্টির ছোঁয়া।

শুভ বলল, মুখ দেখবে না বলছ, কিন্তু সে তো বেকসুর খালাস হয়েও যেতে পারে। তখন বাড়িতেই ফিরে আসবে, তুমি তার বাবা, এ-বাড়িই তার ঠিকানা।

খালাস যে হবেই জানি স্যার। যারা ওকে জল্লাদ তৈরি করেছে তারাই ওকে বের করে আনবে নিজেদের দরকারে। এসে উঠবেও সে এ-বাড়িতে। কিন্তু আমি ও মুখ আর দেখব না। ওর পিতৃপরিচয়ে আর থাকতে পারব না এখানে।

কথা ফুরিয়ে গেল।

কী মনে হতে উঠে দাঁড়াল জনার্দন। বলল, একটা জিনিস দেখাই আপনাকে। ঘর থেকে একটা খবরের কাগজ নিয়ে এল।

শুভ দেখল, আজকেরই কাগজ, যেটা তার ব্যাগেও রয়েছে।

উঠোনের দিকে একনজর দেখে নিয়ে কাগজের ভাঁজ খুলে পাপিয়া নামে মেয়েটার ছবিটা খুলে ধরে বলল, বলুন তো স্যার মেয়েটাকে কেমন দেখতে? ভারি লক্ষ্মীমন্ত না....বলুন? আমার মা বলত, নাক মোটা চোখ ভাসা সেই মেয়ে দেখতে খাসা।

হেরিকেনের স্বল্প আলোকেও শুভর দেখতে অসুবিধে হল না জনার্দনের ভাঙা মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে খুশির রেণু। ছবিটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চাপা স্বরে বলল, বেটির মুখখানা বড় আদেরে-আদেরে গোছের। এইরকম একটা মেয়ের সঙ্গেই খোকনের বিয়ে দোব ইচ্ছে ছিল.......।

উঠোনে কারও গলা খাঁকারির আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি কাগজটা লুকিয়ে ফেলল জনার্দন। ছেলের ছবিখানাও।

খাওয়ার শেষে উঠোনে নামল শুভ একটু পায়চারি করতে।

আকাশের পশ্চিম ঘেঁষে একফালি চাঁদের দেখা পাওয়া গেছে এতক্ষণে। একটু হাওয়াও ছেড়েছে। একটা রাতচরা পাখি ডাকতে ডাকতে আকাশ পেরোল।

খেয়ে উঠে জনার্দন এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে বিছানা পাততে গেল। তারপর ডাকল, রাত হয়েছে, শোবেন আসুন স্যার।

শুভর শোওয়ার ব্যবস্থা চৌকির ওপর। মেঝেতে জনার্দনের। মশারিও খাটানো। টর্চ এগিয়ে দিল জনার্দন, যদি লাগে রাখুন—।

আমার কাছে আছে।......ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে নিয়ে চৌকিতে উঠে পড়ল শুভ। মাথার পাশে টর্চ হাতঘড়ি গেঞ্জি খুলে রেখে টান টান হল। নতুন জায়গায় ঘুম আসবে না মনে হয়েছিল। কিন্তু এলোমেলো চিন্তার মধ্যে কখন যে চোখে ঘুম জড়িয়ে এল বুঝতেও পারল না।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল জানে না, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘড়ি দেখল, রাত দুটো।

একবার বাইরে গেলে হয়....জনার্দনকে ডাকবে কি না ভাবল। তারপর মনে হল, থাক। আলোর ছটা যথাসম্ভব আড়াল করে রেখে দরজার দিকে ফেলল। এগিয়ে গিয়ে দেখল, দরজার আগল খোলা। ভেজানো।

জনার্দনও কি তাহলে বাইরে গেছে। কই, বিছানায় নেই তো।

দরজার ভেজানো পাল্লা খুলে বাইরে এল শুভ। কলতলার দিকেই চাতাল। সেদিকে আলো ফেলল। জনার্দনকে দেখা গেল না। উঠোনের কোথাও দেখা গেল না।

বাইরে ওঠার কাজ সেরে উঠোনের মাঝখানটায় এসে দাঁড়াল। বয়ে যেতে দিল কিছুটা সময়। দেখা নেই জনার্দনের। আরও কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিকে শুধু জোনাকি ঘুরছে।

হঠাৎই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।......

সন্ধেবেলায় একান্তে জনার্দনের বলা কথাগুলো আনুপূর্বিক মনে পড়ল। আঘাত পেয়েছে লোকটা। ভয়ানক আঘাত। মানুষের জীবনে যত আঘাত আসে তার মধ্যে বোধহয় সব চাইতে মারাত্মক সন্তানের কাছ থেকে পাওয়া আঘাত। শেষে কি লোকটা একটা কিছু করে বসল। দ্রুত হাতে চারিদিকে টর্চের আলো ছুঁড়ল শুভ, বিশেষ করে উঠোনের প্রান্তে নোনাগাছটার দিকে। না, তেমন কিছু নেই তো ওদিকে। তাড়াতাড়ি দাওয়ায় উঠে দরজার শিকল তুলে দিয়ে উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল।

চাঁদ ডুবে গেছে, কিন্তু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। হয়ত নক্ষত্রের আলো। হয়ত আকাশের নিজস্ব আলোর আভা। শুভ এগোল। রাস্তার পাশে মাদার, সজনে। একটু দূরে ঝুপসি বকুল গাছ। হঠাৎ চোখে পড়ল বকুলগাছের তলায় একটা আলো। এত রাতে ওখানে কীসের আলো।

পায়ে পায়ে এগোল শুভ।—একটা মোমবাতি জ্বলছে। থেকে থেকে কেঁপে উঠছে তার শিখা। আলোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে জনার্দন।

শুভ আরও দু-চার কদম এগোল।—

বেদীর কালো পাথরটার পায়ে ঠেস দিয়ে রাখা খোকনের ফটোর পাশে কাগজে ছাপানো ভাঁজ করে রাখা পাপিয়া নামের মেয়েটার ছবি।

শুভ আর একটু কাছে গেল।—

সংবিৎ নেই জনার্দনের। পাথরটার সামনে সেও এক পাথর।

পাখিরাও এক একসময় কেমন ভুল করে। ভোর হয়ে এল ভেবে কোন্ এক গাছ থেকে ডেকে উঠল একটা পাখি; যে ডাকে সাড়া দিয়ে আর সব গাছ থেকে কোলাহল করে উঠল আর সব পাখিরা। পাখিদের কোলাহল থেমে যেতেই ডুকরে উঠল জনার্দন—আমি তোদের বিয়ে দিলাম রে। কী লগ্ন কী তিথি জানি না, সিদ্ধ বকুলকে সাক্ষী রেখে তোদের বিয়ে দিলাম....। বেদীর ওপর মুখ গুঁজড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল জনার্দন। ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার হাড় পাঁজরার খাঁচা। শিশির সিক্ত বকুল কি ঝরিয়ে দিল ক-ফোঁটা জল!

নিঃশব্দে পায়ে পায়ে পেছিয়ে এল শুভ।

শুধু কি বকুলই সাক্ষী রইল? সে নয়?

না-আ—। নীরব আর্তস্বরে বিস্ফোরিত হল সে। স্বপ্নের মৃত্যুর সাক্ষী সে যে হতে পারবে না কখনও।

হ্যাপির স্বীকারোক্তি ও পাড়াতুতো একটি সম্পর্ক

বিকাশকান্তি মিদ্যা

ঠিক আয়নার মুখটা আনলেই হারিয়ে যায় ছবিটা। এ কেবল আমার নয়, আপনাদেরও। অথচ যতক্ষণ মনের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ কত স্পষ্ট, কত একাত্ম। কিন্তু যেই আপনি হাত দিয়ে ধরতে কিংবা চোখ দিয়ে দেখতে চাইবেন, অমনি শূন্য, হাওয়া। মনে করুন, আপনি যাকে হিরো ভাবেন, আপনার ঘাড়ে সেই হিরো চেপে বসেছে, অনেকটা বেতাল-বিক্রমাদিত্যের মতো। একটা সময় নিজের ওজন হারিয়ে ভক্ত-ভগবান, জীবাত্মা-পরমাত্মা একদেহে অবস্থান করছে ভেবে আয়নায় নিজের ভগবান-দশার অবস্থা দেখতে চাইবেন, তখনই হিরো ফক্কা ফুঃ।

কি জানেন? আমার মনে হয়, আমরা, আমরা যারা থার্ডপার্সন প্লুর্যাল বা সময় সময় সিঙ্গুলার নাম্বার; তাদের সঙ্গে ওই যে হিরো বা সেলিব্রিটির দল, অর্থাৎ ওই পপুলার নাম্বারদের একটা পার্থক্য থাকেই। সেটা ভুললেই সমস্যাটা হয়।

আসল হলো অবলম্বন। কিছু একটা অবলম্বন করে বেঁচে থাকার একটা আলাদা আনন্দ। আমরা সবাই বুঝি তাই। সাঁতার না জানা মানুষ যেমন 'কুটিগাছ'টা অবলম্বন করেও বাঁচতে চায়; আমরাও কাটা হোক, গোটা হোক, একটা সেলিব্রিটিকে হিরো বানিয়ে দিব্যি ছাপোষা জীবনটা পার করে দিতে চাই। কখনো হিরোকে 'গুরু' জ্ঞানে পুজো করে, কখনো বা হিরো-ভাবে ভাবিত হয়ে। পুজো করলে মুশকিল নেই, কিন্তু হিরো ভাবের উদয় হলেই বিপদ। আয়নায় নিজের মধ্যে 'তেনা'কে খুঁজতে গেলেই ঢাকি-ঢুলি সব সমেত যায়। এত যে কথা বলছি, প্রশ্ন উঠতেই পারে, বলবেন তো মশাই ছাপোষা, পেটরোগা, পিত্তিপড়া কোনো এক ভেতো বাঙালির গল্প। তা এত ভূমিকার দরকার কি?

কথাটা ঠিক। আমাদের নরেন পেটরোগা, পিত্তিপড়া তাতে সন্দেহ নেই; তবে ছাপোষা আটপৌরে আর দু'-দশটা বাঙালি যুবার মতো নয়।

তাহলে আপনার নরেনের বিশেষত্ব কোথায়? সেরকম চোখে পড়ার মতো কিছু নেই। তবে গতানুগতিক নয় সে।

তো নরেনের একটা চিঠি—ওর হাতের লেখাটি খুব সুন্দর, মুসাবিদাও মন্দ নয়—আমার ঠিকানায় এসেছে। অনেকদিন পর ওর কোনো চিঠি পেলাম। অথচ একসময় ও প্রায় নিয়মিত লিখত। ওর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয় বছর দেড়েক আগে, ওর ছেলের জন্মদিনে। একটাই ছেলে। নিশ্চিন্ত। ওর আর এক বন্ধুর বোনকে ও বিয়ে করেছিল। তারপর বেশ ক'বছর বসে থেকে আমি চাকরি পেলাম কোচবিহারে। ও নিজের জেলায়। যাদবপুরে নামকরা একটা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে—নরেন আমার উচ্চমাধ্যমিকের বন্ধু ছিল। আর্টস পড়ার পর ও গেল বাংলায়, আমি ইতিহাসে। অতীত আমাকে টানে, নরেনকেও টানতো। কিন্তু আবেগে ও গেল সাহিত্যে, আমি ইতিহাসে।

ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাট নেওয়ার পর থেকে ওর সঙ্গে আমার আর তেমন যোগাযোগ নেই। ওর ঠিকানা বা কোনো নম্বর আমাকে দেয়নি। আমিও সংসারের জাঁতায় পড়ে ভাঙছি প্রতিনিয়ত। ঠিক খোঁজ নেওয়ার সময়ের অভাব নয়, মানসিক সাড়া পাইনি।

কিন্তু, আজ এভাবে কেন যে নরেনের চিঠিটা এলো, আমি বুঝতে পারছি না। চিঠি আসতেই পারে, এতদিন কোন কারণে হয়তো লেখা হয়নি, আজ লিখেছে, তাই এলো। কিন্তু এমন লিখেছে কেন, সেটাই কাঁটা হয়ে খোঁচাচ্ছে আমাকে।

ক্রিকেট খেলা আমিও দেখি। ভাইপোরা সব শচীন-সৌরভের ভক্ত। তবে নরেনের খেলা দেখাটা একটু বাড়াবাড়ি ছিল। সাহিত্যের ছাত্র হয়েও মানুষ এমন ক্রিকেট পাগল হয় কি করে, বুঝতাম না। ও বলতো, দ্যাখ, সাহিত্য হচ্ছে সহিতের ভাব। যা সহিতত্ব স্থাপন করে, জীবনে জীবন যোগ করে, তাই সাহিত্য। সাহিত্যের সঙ্গে ক্রিকেটের যোগ অঙ্গাঙ্গিভাবে।

প্রশ্ন করতাম আমরা বন্ধুরা মিলে, 'কেমন যোগ শুনি, দেখি তোর ব্যাখ্যা!'

নরেন বলতো, যে দ্যাখ ইনিংস ওপেন করা অর্থাৎ একজন ব্যাটস্‌ম্যানের ক্রিজে এসে ব্যাটধরা মানে এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়া—জীবন শুরু। বোলার মানে প্রতিকূল পৃথিবী, শত্রুপক্ষের আক্রমণ। তুই জন্মালি মানে ক্রিজে আস্‌লি, জানবি লড়াই শুরু হয়ে গেল। তারপর শত্রুকে পিটিয়ে এক-একটা রান মানেই জীবনের এক একটা দিন পার করা। মানুষ যেমন বলতেই পারে না, কতদিন সে বাঁচবে, ঠিক তেমনি, এ বলে হয় তো পরের বলে বোল্ড হয়েও যেতে পারি।

আমরা হেসে মজা পেতাম, আর ক্রিকেট প্রসঙ্গ উঠলেই নরেনকে জিজ্ঞাসা করতাম— যারা ঠুকে খেলে, তাদের কি বলে? আর যারা মেরে?

নরেন বলতো, ঠোকা মানে হোমিওপ্যাথি। মারা মানে অ্যালোপ্যাথি। ঠোকা ব্যাটস্‌ম্যান সোনার বেনে, মারকুটে হলো কামার।

আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, তুই কি?

নরেন বেশ আবেগের সঙ্গে বলতো, শিল্পী ব্যাটস্‌ম্যান।

সেই শিল্পী ব্যাটস্‌ম্যানের চিঠি পেয়ে কেমন যেন খট্‌কা লাগলো। আবেগতাড়িত সমস্যা বোধ হয়।

কিন্তু জীবনে কত আবেগ এইরকম আসে, কত আবেগ ভেসে যায়। ইতিহাসে আবেগের জায়গা কোথায়। তাই নরেনের চিঠির ভাষায় যে কাঁপন ছিল অন্তরের, তাকে তেমন পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হলো না। কারণ জানি, ও চিরকালই একটু আবেগী। তাছাড়া কী-ই বা করতে পারি, তার ভাবের ভাষার জবাবে। তাছাড়া স্কুলে তখন উচ্চমাধ্যমিক চলছে, ইনচার্জের দায়িত্ব আমার। এখন সময় কোথায়। সামনের গরমের ছুটিতে সপরিবারে দেশের বাড়িতে যাব যখন, তখন ভালো করে 'কড়কে' দেওয়া যাবে ভেবে, এখন আর মস্তিষ্ক ব্যয় করার কোনো গুরুত্বই অনুভব করলাম না।

রাজ্যজুড়ে উচ্চমাধ্যমিক, দেশজুড়ে ক্রিকেট। যেমন প্রচণ্ড গরম, প্রশ্ন কড়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও

তুমুল। বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়া স্টিভ ওয়ের নেতৃত্বে টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। টানা ষোলোটা টেস্ট জয়ী অপরাজিত অস্ট্রেলিয়া ভারতে এসেছে। বঙ্গসন্তান তার ভারতীয় দল নিয়ে কতটা টক্কর দিতে পারে, সেদিকে তাকিয়ে দেশ। কিন্তু প্রথম টেস্টে উড়ে গেল ইন্ডিয়া—ঝড়ের মুখে খড়ের মতো। দ্বিতীয় টেস্ট ইডেনে। সেখানেও যায়-যায় অবস্থা। টিচার্সরুমে তুমুল আলোচনা। তার মধ্যে নরেনও বাদ যায় না।

স্টাফরুমের অনেকে নরেনকে নামে চেনেন। না-চিনে উপায় আছে, এমন ক্রিকেটীয় চরিত্র। ক্রিকেট তো এখন বারোমেসে; তাই নরেন আমাদের লম্বা স্টাফরুমটাতে আসেই, সারাবছর না হলেও মাঝেমাঝেই। আজ তেমনি এলো সে। বারিদদা, বয়স পঞ্চাশের উপর হলেও ব্যাড্‌মিন্টন ভালোই খেলেন। সেই তিনিই প্রথম তুললেন কথাটা—কি হে সৌগত, তোমার সেই ক্রিকেট বন্ধু নিশ্চয়ই মাঠে।—মনে মনে বললাম, মাঠে না ঘাটে জানি না, তবে তটে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।—সত্যি কি, চিঠিটা পাওয়ার পর নরেনের প্রতি ভালোবাসাটা আমার ঠিক বিতৃষ্ণা হয়তো নয়, নিস্পৃহতায় ভরে গেছিল। জবাব হয়তো দিই নি। কিন্তু চিঠিটা পেয়ে অনেক ভেবেছি। মানুষ জীবনে প্রথম প্রেমপত্র পেলেও এত ভাবে কিনা বলতে পারি না। শত হোক্ একসময়কার ভালো বন্ধু বলে কথা। তবে একটা কথা নরেনের চিঠিতে বারবার যেন ধ্বনিত,—ঘৃণার বিষয় যে এমনভাবে বুমেরাং হয়ে বিঁধবে, স্বপ্নেও ভাবিনি সৌগত।—স্বপ্নে কোন অতি বড়ো দেশপ্রেমিক ভারতীয়ও কি ভেবেছিল যে, লক্ষ্মণ আর দ্রাবিড় এমন লড়াইটা দেবে? ফলো-অন করানোটা এমন বুমেরাং হবে, স্টীভ ও কি ভেবেছিল?

কিন্তু এমনই বোধহয় হয়, ফলোঅন করে খেলতে নেমে লক্ষ্মণ আর দ্রাবিড় কী লড়াইটা না দিল! ইনিংস হারের খেলায় ঐতিহাসিক জয়। এই জন্যই বোধহয় ক্রিকেটকে বলে অনিশ্চয়তার খেলা। ঠিক জীবনের মতো—নরেনের ব্যাখ্যায়—গেম অফ আনসার্টেন্‌টি, লাইক আ লাইফ।

টিমে অনিশ্চিত লক্ষ্মণ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভালো খেলল—তাই বলে এমন ঐতিহাসিক ইনিংস! এরকম খেলা জীবনে একের অধিক কি খেলা যায়! দেশকে এমন জয়ের মধ্যে দেখলে যেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয়, জয়ের নেশার রেশ কেটে যাওয়ার পরও যেমন চিম্‌টি কেটে দেখতে ইচ্ছা করে, নরেনের চিঠিটা পেয়ে পড়ার পর ঠিক সেই অবিশ্বাস্য ঘোর যেন ঘিরে ধরেছে আমায়। এও কি হতে পারে? এমন একটা ঘটনা! মনকে বারবার বুঝিয়েছি, এ নিশ্চয়ই মিথ্যা। মিথ্যা না হলেও নিশ্চয়ই মিথ্যা শুনবো।

নরেন আমার বন্ধু, কিন্তু সে কারণে আবেগতাড়িত হয়ে সাদামাটা গল্পের ভাঁওতা দিয়ে কোনো তত্ত্ব কথায় নিয়ে যাচ্ছি না। নিয়ে কেউ কাউকে যেতে পারে না। যে যার যাওয়া, সেই-ই যায়। মায়ের মুখে আজও একটা কথা শুনি, 'যার যাওয়া সেই যায়, তার হাত-কপাল নিয়ে। কেউ সঙ্গে যায় না, নিয়ে যেতেও পারে না।'

তবু নরেনের নয়, নরেনের বউ নন্দিতার ফোন পেয়ে আমাকে যেতে হলো।

সেদিন হায়ার-সেকেন্ডারির ইংরাজি পরীক্ষা। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় তথা সিরিজ

ফয়সালার চূড়ান্ত ম্যাচের শেষদিন। ইডেনের অবিশ্বাস্য জয়ের পর ভারত আবার জয়ের দোরগোড়ায়। শেন ওয়ার্নের লেগস্পিন আর স্টিভ ওয়ের লোভ চুরমার করে দিয়ে ভারত এ ম্যাচটাও জিতল। জিতে নিল সিরিজ। আমাদের স্টাফরুমে সেদিন নরেনও এলো—কি সৌগত, বন্ধু নিশ্চয় খুব খুশি এই জয়ে।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু ঠিক সেই দিনই, সেই দিনই নরেন হেরে গেল ম্যাচটা।

অগত্যা, ফোন পেয়ে, সপরিবারে আর সম্ভব নয় বলে একাই চলে গেলাম কলকাতা।

পাঠক যে এক বোকা নন্, সে বোধ আমার আছে। নরেন যে আর হার-জিতের খেলায় নেই, সে আপনারা বেশ ধরে ফেলেছেন। কিন্তু আপনাদের সুবিধা কোথায় জানেন, আপনাদের কাঠ-খড় কিছুই পোড়াতে হয় না। আপনারা তথ্য পেলেই খুশি। সে সত্য হোক্ বা না-হোক্। কিন্তু এক-একটা তথ্যের যে হাজারটা হ্যাপা, তা কি মানেন? একটা স্বপ্নের জন্যে যেমন, কত হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে হয়; তা সে যতই বানানো মনে করুন না কেন, বানানোরও একটা জ্বালা আছে।—মনে করুন থানা আছে, পুলিশ আছে, প্রতিবেশীর নিন্দা-মন্দ আছে, মর্গ আছে, আছে শ্মশান। কিন্তু এহো বাহ্য।

যেজন্য বেশ কয়েকটা সি.এল. যায়, কিংবা পকেট থেকে কয়েশ' টাকা, তাকে কি আপনি জ্বালা বলবেন, না-কি যে যন্ত্রণার কথা লিখেও প্রকাশ করা যায় না, তাকে?

তবে, যন্ত্রণাও একটা আপেক্ষিক বিষয়। ব্যক্তিগত ব্যাপার। কার কিসে যন্ত্রণা, কার কিসে নয়, সেও বোধ হয় বলা একটু কঠিন। না হলে কেনই বা সংসদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই আমাকে কলকাতা যেতে হলো? নরেন আমার কে? বন্ধু বৈ তো নয়, হয়তো একটু ভালো বন্ধু।

কিন্তু অঞ্জনা, অঞ্জনা নরেনের কে? পাড়াতুতো বোন বৈ তো নয়। তাহলে? নরেনের এত জ্বালা কি করে আসে? তার তো বউ আছে, ছেলে আছে। তাদের তো নরেন কোনোদিন কম ভালোবাসে বলে জানিনি,—তাহলে?

তার চিঠির ভাবের ভাবাগুলোর অর্থ—ইতিহাস শিক্ষকের কাছে—একদিন আবেগ, ন্যাকামো বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু মোমিনপুর মর্গের মানুষ পচা গন্ধে দাঁড়িয়ে সব কেমন যেন ছবির মতো স্পষ্ট আর অনিবার্য বলে মনে হল আমার। ঠিক ছ'মাস আগে নরেনেরও বোধহয় এরকম মনে হয়েছিল, অঞ্জনা যখন মর্গে শুয়েছিল ফিলু কাটাবে বলে।—কিন্তু আমি যে ইতিহাস পড়াই। অতীতের কারবারী হলেও কি হবে, সময় যে তার কাছে নদীর স্রোতের মতো গতিশীল।

তবে কি জানেন, গণমাধ্যমগুলো না (মুখটা সামলে নিলাম), খুব খুব বাজে। ওরা তিলকে তাল করতে পারে, জলকে দুধ, আর জনমানসে ওদের প্রভাব ব্যাপক। আপনাদের বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না, তবু দেখবেন—খবরের কাগজগুলো সামাজিক সমস্যাগুলো যেন পালা করে ছাপে। যখন ধর্ষণ, তো পরে পর ধর্ষণ, এছাড়া মানুষের আর যেন কোনো কাজ নেই। খুনও তেমনি, আত্মহত্যাও তাই। তার মানে আমি বলতে চাইছি না,

যে, এসব ঘটে না, কাগজগুলো মিথ্যে করে ছাপায়। তবে ঘটে যেমন ঠিক, তেমন কাগজের ছাপা দেখে দেখে ঘটানোর প্রবণতা তৈরি হওয়াও সঠিক।

যেমন দেখুন না, অঞ্জনা মেয়েটা কি করত জানি না, নরেনদের অ্যাপার্টমেন্টের অন্য একটা ফ্ল্যাটে মা-বাবার সঙ্গে থাকতো। তবে, দু লিটার কেরোসিন আর একটা দেশলাই কাঠির স্ফুলিঙ্গ নিজের ওপর ব্যয় করার পর পুলিশ যখন এসেছিল, ওর বিছানার নীচ থেকে নাকি ত্রিশটারও বেশি সুইসাইডের পেপার-কাটিং উদ্ধার করেছিল। আর অঞ্জনারটা আমি পেলাম নরেনের একটা ডায়েরির পাতায়, সঙ্গে অঞ্জনার ডায়েরির একটা পাতা ছেঁড়া।

যার হাতে অস্ত্র থাকে সেই কেবল যোদ্ধা নয়, আবার কলম আমার হাতে মানেই, আমি তো নিজেকে লেখক বলতে পারি না। তবে এক লাইন লেখায়, নরেন কিন্তু নন্দিতাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। যদিও বেচারির কোনো দোষ আছে বলে আমার অন্ততঃ মনে হল না।

ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙতেই পারে, নায়ক-মহানায়ক তত্ত্ব এখন বস্তাপচা ত্রিকোণ প্রেমের গন্ধভরা গল্প।

অভিযোগ অস্বীকার করবো না। সত্যি কথা কি, এ আমার বিনয় নয়—আমার অপারগতা। আর গল্প বলতে তো আমি বসিনি। ইতিহাস পড়াই। ছেলেমেয়েরা ইতিহাস খুব একটা পড়ে না, গল্প করে শোনালেও শোনে না। কারণ ইতিহাসের অতীত তাদের কাছে মিথ্যা। তারা জানে ইতিহাস নদীর স্রোতের মতো গতিশীল। জীবনও তাই।

সেই গতির টান আমাকে আবার সি.এল.কে ই.এল না করার জন্যে কোচবিহার এনে ফেলল। আসার আগে নন্দিতা আর তার ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে ইতিহাসের আত্মত্যাগী মহান পুরুষেরা বইয়ের পৃষ্ঠা ছেড়ে একবার মাথার চাপতে চেয়েছিল—এসব ক্ষেত্রে যেমন হয় আর কী। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। তারপর যথারীতি কিছু শুকনো সান্ত্বনা আর আশ্বাসের আভাস দিয়ে বিদায় নেওয়ার সময় নন্দিতা আর কান্না চাপতে পারলো না। এ'কদিনের অবরুদ্ধ শোকের পাথরটা বানভাসি হলো। দরকারও। তবে, একটাই সান্ত্বনা—নন্দিতার বাপ-ভাইয়েরা আছে, আর তার একটা চাকরি আছে। সে স্কুলে ভূগোল পড়ায়।

সারা ট্রেনটা মৃত্যুর আকস্মিকতা, নরেনের স্মৃতি, তার অবিবেচকের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া, তার চিঠির হেঁয়ালিভরা ভাবা মনটাকে শুধু অস্থির রাখলো, তাই নয়; মনের কোণে অণুশোচনার একটা কাঁটা যেন বিঁধতে লাগলো সারাক্ষণ। বারবার মনে হলো, ওর চিঠিটা পেয়ে আমার কিছু করা উচিত ছিল।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় অতীত ঘেঁটে ঘেঁটে, অতীতে যেন বিরাগ এসে গেছে। তাই নরেনকে অন্তরে রেখে টিউশান আর স্কুলের জঙ্গলে হারিয়ে গেলাম অচিরেই। তবে নন্দিতার ফোন নম্বর এনেছিলাম এবার। দু'একদিন রাতে ফোনও করলাম তাকে সান্ত্বনার বাণী দিয়ে, সে কেবল সামাজিক জীবের দায়িত্ব পালনের মতো।

এভাবে দিন পনেরো কেটেছে বোধ হয়। স্কুল থেকে ফেরার পথে কোচবিহার বড় পোস্টঅফিসের পোস্টমাস্টার শিবপদবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি একবার আমাকে পোস্ট অফিসে যেতে বললেন, একটা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ঠিকানাওয়ালা চিঠির প্রাপক শনাক্ত করণের জন্যে।

স্কুল, সংগঠন, টিউশনি, বাজার, বাচ্চা সামলানোর ভিড়ে চিঠির কথাটা ভুলে গেছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন পর মাইনে পেয়ে কয়েকটা মানি অর্ডার করতে গিয়ে চিঠির কথাটা মনে পড়ে গেল।

প্রাপকের নাম-ঠিকানা দেখে চিঠি চেনা মুশকিল। সেখানে শুধু সৌগত, ডাক ও জেলা— কোচবিহার। প্রেরকের স্থানে এন. এন. রায়, যাদবপুর দেখেই মনে হলো, নরেনের চিঠি। পোস্টমাস্টার পরিচিত বলে দিলেন, না হলে এ চিঠির স্থান তোর্সার খরস্রোত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। চিঠি না খুলেই একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল মনে—হয়তো নরেনের চিঠি, কিংবা নয়, ভৌতিক কাণ্ড নয় তো। কলকাতা থেকে কোচবিহার—কতদিন লাগতে পারে?

স্কুল ছুটির পর ফাঁকা স্টাফরুম, একা একা খুললাম চিঠিটা। নরেনেরই লেখা, মুম্বাই টেস্টের শেষদিন লেখা। ভারত জিতলেও এক পরাজিত ভারতবাসীর কাহিনী।—গল্প এখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু পাঠককে আমার অক্ষমতা জানিয়ে বলি, গল্প কিছুই নয়। গল্প ওই চিঠিটা। কথার খেলাপ না করে তাই চিঠিটা তুলে দিলাম—

'সৌগত',

শিল্পী ব্যাট্সম্যান আউট হয়ে প্যাভেলিয়নের পথে। আমাকে ক্ষমা করিস এই কাপুরুষতার জন্য। ব্রাহ্মণদের নাকি দু'বার জন্ম হয়, তাই তাদের বলে দ্বিজ, কিন্তু যার দু'বার মৃত্যু হয় তাকে কি বলে জানিস? তাকে বলে নরেন। মানুষের জীবন ক'দিনের? বেশি দিনের নয়। আমার জীবনও বেশি দিনের নয়। একটা ঘটনা আমাকে বছরখানেক আগে শেষ করে দিয়েছে। আর এ চিঠি যখন তুই পাবি, তখন দেখবি আমি আর একবার শেষ হয়ে গেছি।

সৌগত, তোকে আমি বোধহয় অনেকদিন চিঠি লিখিনি। কেন লিখিনি জানিস! আমি নিজেই নেই, তো কি লিখবো! আমি ঠিকানা পাল্টাচ্ছি। এ চিঠি পাওয়ার আগে কাগজে হয়তো সেই নতুন ঠিকানা পেয়ে যাবি। তোকে ক'দিন আগে বোধ হয় একটা চিঠি লিখেছি, আর এই শেষ লিখছি। কাউকে বলতে পারিনি, তাই তোকে অন্ততঃ বলছি। দোষ কারুর নয়, সব দোষ আমার। তুই অঞ্জনাকে জানিস। সম্পর্কে আমার পাড়াতুতো বোন। ছ'মাস আগে অঞ্জনা গায়ে আগুন দিয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা কি জানিস, অঞ্জনাকে খুন করা হয়েছে। খুনী কে জানিস? সভ্যতার ছদ্মবেশী আজকের সমাজ! আমি সে তালিকার শেষ জন। আজ বলতে দ্বিধা নেই, নন্দিতাকে আজও আমি ভালোবাসি। সে তো বোঝানোর ব্যাপার নয়। তবু আমাদের বিয়ের পরে পরেই অঞ্জনাকে প্রথম শাড়ি-পরা দেখার পর মনটার মধ্যে কেমন একটা দুর্বলতা তৈরি হয়েছিল, তারপর অবশ্য সে কবে, কখন চাপাও

পড়ে গেছিল মনের মধ্যে। কিন্তু অঞ্জনার জীবনের একটা ঘটনা অনেকদিন পর আমাকে কেমন আবেগমথিত করে তুলেছিল—হয়তো একটু স্বার্থপর। কিন্তু সে আবেগেরও একটা বাঁধ ছিল। সে বাঁধ ভাঙল একটা ঘটনায়, যেখানে আমার কোনো হাত ছিল না। তোকে কি বলব সৌগত, ক্রিকেটই আমার জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছে। তুই তো জানিস্, কানাঘুষো একটা চলছিল বেটিং নিয়ে। কিন্তু বলতে পারিস তুই, হ্যাডলি ক্রোনিয়ে কেন ধর্মযাজক বন্ধুর পরামর্শে তার বেটিং করাটাকে স্বীকার করলো? অন্য কেউ স্বীকার করলো না, আমি জানি আর কেউ স্বীকার করবে না। কিন্তু হ্যাডলি, হ্যাডলির কি এটা ঠিক কাজ হলো? তার কি একবারও বোঝা উচিত ছিল না, তার এই স্বীকারোক্তি কত মানুষের বিশ্বাসের বাঁধটাকে চুরমার করে দিতে পারে?......আমি প্রথমে বুঝিনি। বোঝার মতো অবস্থায় ছিলাম না। মানুষ যে এমন নীচ হতে পারে, তা আমি কোনদিন ভাবিনি। অথচ অঞ্জনার মতো একটা নিষ্পাপ মেয়ে এভাবে কারুর অভিজ্ঞতা অর্জনের শিকার হতে গিয়ে রেপড্ হয়েছে—এ ঘটনা তার মুখে শোনার পর, কি বলব সৌগত, যে টালমাটাল অবস্থায় ছিলাম, হ্যাডলি সেখান থেকে আমাকে এক খাদে ফেলে দিল। সে খাদ থেকে আমি আর উঠতে পারলাম না। উঠলে অঞ্জনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে, না উঠতে পারলে নন্দিতা আর নিশ্চিন্তকে ঠকানো হবে। আর—আর আমি ঠকাতে চাইনা রে। কিন্তু হ্যাডলি, তুমি কেন এত সাধু সাজতে গেলে? যদি সাধু সাজলে, তো আগে থেকে সাধু হলে না কেন? তাহলে আজ সব কিছু ফেলে আমাকে ঠিকানা পাল্টাতে হতো না।—নরেন।

পুঃ শুধু একটা অনুরোধ সৌগত, এ চিঠি পেলে ছিঁড়ে ফেলিস। শুধু ক্ষমা করে মনে রাখিস। কাউকে বলিস না। নন্দিতাকে তো নয়ই। তোকে বললাম এই জন্যে যে, অঞ্জনার সঙ্গে আমার সম্পর্কের তুই একমাত্র সাক্ষী থাকলি। তবে বড় হলে নিশ্চিন্তকে বলিস সব খুলে। বড়ো মায়ারে সৌগত, জীবনের বড়ো মায়া। খুব বাঁচতে ইচ্ছে করছে রে, কাঁদতে ইচ্ছে করছে ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে। বুকটার কাছে কতকগুলো কান্নার বল খেলা করছে জাগলিং-এর মতো। কিন্তু কী করলো যে হ্যাডলিটা। কী করলো।'

কী বলবো? পাঠক, বন্ধু, না সহবোদ্ধা? যা-ই বলি না কেন, গুরুর কথা তুলে আর জ্বালাবো না। বিশ্বায়নের অসংখ্য চ্যানেল, আমাদের মনও মৌমাছির চাকের মতো। তা থেকে একটা প্রকোষ্ঠের অভিজ্ঞতা তুলে দিলাম। গল্প হয়নি ভেবে লজ্জা দেবেন না; গল্প বলে মিথ্যা ভাবার দায়ভার আপনাদের। আমি ইতিহাস পড়াই মাত্র। বিচার করার দায় আমার নয়।

পেজমার্ক

দেবেশ রায়

'তুমি বলো তো—'

'না, না, তুমি বলো—'

'তুমিই বলো'

'তুমি বলো'

খণা হেসেই ফেলে, হঠাৎ। বেলা দশটায় বাড়িতে টিভি এমন পুরোদমে চালাল কে? অফিস-যাওয়ার শাড়ি বাছতে-বাছতে গানটির ঐ জায়গায় অফ-হোয়াইটের ওপর লেমনগ্রিনে বাঁশপাতা-ছাপা শাড়িটা টেনে বের করে পর্দার দিকে তাকিয়ে পাত্রপাত্রীর কাণ্ডে না-হেসে হাসিমুখেই একটু নিচু হয়ে ব্লাউজের হুকটা হাঁটকে যেটা টানল, সেটা শাড়ির সঙ্গে না মেলায় আর একটা অফ হোয়াইটের দিকে আঙুল বাড়িয়েও ডুবিয়ে দেয় রঙিনেই। খণা হাসেই কিন্তু—হয়তো গানের অশেষ পুনরাবৃত্তিতে বা হয়তো খণার স্বাভাবিক মজায়—প্রতিদিনই বেরতে হয় আর প্রতিদিনই সাজতে হয়—কত যে জট সেই সাজায়। একবার যদি মনে হয়, আর সাজতে-সাজতেও যদি মনে হয়, 'বা—জে', এই বাজেটার জ খণা উচ্চারণ করে z। ফলে অনেক সময় অফিসে ছোটরা একটু খেপায়, যেন এটা খণার মুদ্রাদোষ—ব্লাze বলা। সত্যিই তা মনে হলেও সাজতে বসে কোনো মেয়ে না সেজে পারে না। দূর, এটা আবার হাতকাটা। তাদের অফিসে চলে। কিন্তু এই ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলোর মুখের কোনো আটক নেই। সেদিন নিৎ হঠাৎ বলে বসে, 'দিদি, মেয়েদের বয়স কী সে বোঝা যায়?' 'সে কী রে, ভালই তো ছিলি, আবার এই স্ল্যাগ ধরলি কেন।' 'ধরি নি দিদি, ধরিয়ে ছাড়ল।' 'কে ধরাল নেশা?' 'দেখুন-না, বর্ণা আজ স্লিভলেস টপ পরেছে, ওর আর্মসটা যে কী ঝোলার ঝোলা সে এই প্রথম দেখা গেল। যত বয়স বাড়ে, মেয়েদের স্লিভ ছোট হতে থাকে, পেট বড় হতে থাকে—'। নিৎ-এর কথার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, মনে হয়েছে, বলে দিয়েছে। কিন্তু বর্ণা হঠাৎ মেয়ে হয়ে গিয়ে বেরসিকের মত বলল, 'ছেলে হয়ে মেয়েদের এত দেখিস কেনরে?'

খণা রায় দেয়, 'অ্যাডভ্যানটেজ নিৎ।'

খণা ব্লাউজটা গুঁজে রেখে আর-একবার ঠোঁটের ভাঁজে হাত রেখে দেখে—তা হলে কি অন্য শাড়ি পরবে? অমন তাকিয়ে ছিল বলেই যেন যে-রঙটা খুঁজছে তার আভাস পায়। বের করে এনে ব্লাউজটা সামনে মেলে এক ঝলক দেখে নেয়, কোনো সেলাই-টেলাই বা ক্লিপ খুলে গেছে কীনা। একটু ইস্তিরি লাগবে। খণার এ-ঘরটা এখনকার ফ্ল্যাটের মাপ-অনুযায়ী অর্থাৎ একটা ডবলবেড, একটা ওয়াড্রোব, একটা টিভির পর চল্লিশ বর্গফুটের মত ফাঁকা। সেই কারণে ইস্তিরি-টিস্তিরির জন্য একেবারে মেঝের কাছে প্লাগপয়েন্ট করে নেয়া হয়েছে। ইস্তিরিটা লাগিয়ে খণা খাড়া হয় নীচের জামাটা পরতে। তখনো,

'তুমি বলো'

'তুমিই বলো।'

চিবুকে শাড়ির কোনাটা চেপে খণা নীচের জামাটা ঘাড়ে গলিয়ে নিল। মেয়েদের এখন সারা দিনের মত তৈরি হতে হয়, কতরকম যে কাজ, রাতে ফেরাটাও শেষ মুহূর্তে অনিশ্চিত হয়ে যায়। তাও তো এখন মেয়েদের শরীরের কত সাপোর্ট বেরিয়েছে, বেসিক জামা-কাপড়ের, ইনারঅয়্যারস। খণাদের সময় তো যেন মেয়েদের পোশাক বলে একটা বস্তা ছিল, সব মেয়েদেরই সেই বস্তায় পুরে দেয়া হত বছর তের হলেই। খণা আবার লম্বা হয়ে যাচ্ছিল বলে ক্লাশ সেভেনেই শাড়ি পরতে হয়েছিল। মাথামুণ্ডু ছিল না কিছুর। শাড়িতে কি লম্বা ঢাকা পড়ত? আর, বাড়িতে, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে, নমাস-ছমাসে মিনিট পাঁচ-দশের জন্য দেখা-হওয়া বাবার খুড়তুতো ভাইয়ের বড় ছেলে বা মা-র বালিগঞ্জের বাড়ির মামাদের কেউ জানিয়ে দিত যে মেয়েটি কাল, না ফর্সা, খাটো না লম্বা, বুকের মাপ শরীরসই কী না, হাঁমুখ বড় কী না, দাঁতের লাইন সিধে কী না, চোখের পাতা কি কমই না আইল্যাস, নাকটা একটু বেশি খাড়া না—আর সে সব মতামত ইতিমধ্যে বাড়িতে এতই স্থায়ী যে মেয়েটির সব প্রাইভেট ও পাবলিক প্রদর্শন ঐ ধারণাগুলি দিয়েই মাপা হত ও সে নিজেও তাই মাপত। কিন্তু মেয়েরাও কেমন লায়েক হয়ে উঠেছে, নন্দিনী দাশ, ফিল্ম আর্টিস্ট, কুচকুচে কাল, টিভি ইন্টারভিউয়ে কেমন বলে দিল—মেক-আপ আর্টিস্টদেরই আমার ভয়, যাঁরা আমাকে ফর্সা করতে চান।

সারা জীবন ও এখনো খণারা তো বুক ঢাকতে-ঢাকতেই গেল। এখনকার মেয়েরা বুকসুক তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। কোনো ঢাকনাই নেই, জামা-গেঞ্জির স্বাভাবিক ঢাকনা ছাড়া।

বেনেবাড়ির ছেলেদের মত উত্তমের হাসি আর টেড়ি। কী খ্যাপান খেপিয়ে দিয়েছিল তখন বাঙালি সংসারগুলোকে। এখন তো একটা ফিনাইল-বিজ্ঞাপনের জোড়াও এর চাইতে বেশি রোম্যান্টিক হতে চায়। শুধু জানে না কতটা হওয়া যায়। কিন্তু তাতে তো আবার গন্ধ নেই। কাপড় কাচাতেই শুরু, কাপড় কাচাতেই শেষ। সুচিত্রা সেনের আগে কারো তো কোনো ফিগার ছিল না। তখন। এখন ফিগার ছাড়া চলে না। ফিগারও কি সত্যি আছে? নাকী ভার্চুয়্যাল ফিগার।

খণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল—সে টিভিটা বন্ধ করে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবে—কবে যেন হয়েছিল সিনেমাটা? 'সপ্তপদী'র সঙ্গে তো তার জীবন বা জন্ম জড়ানো। বাট না বাবটি? বাট হলে তো দিদির নামই মা রাখত রীনা। দিদির চার বছর পর সে, মানে, সিক্সটি ফোর। এমনও তো হতে পারে যে দিদিকে মা নামটা দেয় নি। মা কী করে জানবে যে দ্বিতীয়বারও তার মেয়েই হবে? দ্বিতীয় সন্তান তো সাধারণত হয়, প্রথম সন্তান মেয়ে হয়ে থাকলে।

যে-রীনা নামটা সেই একেবারে আদ্যি থেকে সে দুকানে শুনতে পারে না, যে-রীনা নামটাকে সে বদলে নিয়েছে খণায়, আর ইংরেজিতে শুরু করে W দিয়ে, ফলে অবিশ্যি অনেকে বেশি বিলিতি করে ডাকে, 'রাইনা', সেই নামটাতে সে কেমন ডগমগ হয়ে উঠেছিল জেনে যে তার মায়ের মনে এই নামটুকু ছিল 'সপ্তপদী' দেখার পর থেকেই।

এক তরুণী মা, কতই-বা মা-র বয়স তখন, যদিও খণা মা-কে বেশি বয়সের, বেশি হলেও কতই-বা বেশি। মা-র পঁচিশে দিদি, উনত্রিশে খণা এই সব শোনা গল্প টল্প নানাভাবে সাজাতে খুশি হয়। উনত্রিশ বছর বয়সের এক মেয়ে কেবল উছলে উঠে না-জেনেই সন্তানধারণ করে ফেলেছিল আর সেই উছলে ওঠার উপলক্ষকে স্মরণীয় করতে নাম রেখেছিল খণা। এটা ভাবতেই খণার মজা লাগে যে তাঁর জন্মটার সঙ্গে আনন্দ, উচ্ছলতা, ইচ্ছে সব জড়িয়েছিল। এখন তার সত্তর-বায়াত্তরের মা যখন হাঁটুর ব্যথায় একটু দুলে-দুলে রাস্তা দিয়ে আসে, ধবধবে শাদা শান্তিপুরি শাড়িতে, একটুখানি ঘোমটায় মাথা ঢেকে, তখন কি কেউ হিসেব কষতে পারবে যে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে এই মহিলারই তো সুচিত্রা সেনের মত হওয়ার কথা। তাঁর ইচ্ছে হয় নি? না কী ইচ্ছে হয়েছিল, তাঁর ছেলেমেয়ে যেন অমন সুন্দর ও ভঙ্গিম হয়ে উঠুক। কেন? এখন যে তারা সবাই কোনো-না-কোনো ফিল্মস্টারের অবিকল্প হয়ে ওঠে?

আমার মা আর বাবা সুচিত্রা-উত্তমের সিনেমা দেখে ভেবেছিল? হলের ঘন্টা দুই-আড়াইয়ের পরও ভেবেছিল? ঘন্টা দুই-আড়াইয়ের পরের আধঘন্টা পরও ভেবেছিল? ভেবেছিল, জীবনটা এমন হলে বেশ হয়। তেমন কিছু কি বলেছিল আমার তখনো তিরিশ না-পেরনো মা, তখনো মধ্যতিরিশ না পেরনো আমার বাবাকে? বলেছিল?

—বলেছিলে মা, কখনো, বাবাকে?

খণার মা চাপা রঙের সুন্দরী। সেটা তার খুঁত। তাই মা তাঁর মুখটুকু ফর্শা দেখাতে এটা-ওটা-সেটা মাখতেন। ফলে, মা ফর্শা হননি কিন্তু বুড়ো বয়সেও মুখটা ছিল টলটলে। খণার কলেজ যখন শেষ হচ্ছে, মা তখন, এই এখনকার খণার সমবয়েসি। চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। তখনই মা শাদা ছাড়া পারেন না। কান পেতে চুল। মাকে দেখে মনে হত, সেজে আছেন। এটা মা-দের সময়কার শাস্ত্র—সব সময় সেজেগুজে থাকবে। মা-র নাক-চোখে-চিবুকে একটু ধরাও পড়ত—সাজতে মা-র ভাল লাগে। মা, বলেছিলে কখনো বাবাকে, মা, বলেছিলে।

এ আবার একটা বলার কথা ওঁকে? আমাদের সময় এ-সব কথা বলাবলি ছিল না।

বললেই হবে, তোমরা সবাই সতীসাধ্বী ছিলে? মাছের একপিঠ খেতে? ছেলেপিলে হত গণ্ডায় গণ্ডায়।

অসভ্যের মত কথা বলো না ছুটকি। ছেলেমেয়েরা ভগবানের দয়া। যাদের একটিও নেই, তাদের দুঃখ জানো?

তা বলি নি মা। তোমরা স্বামী-স্ত্রী হয়েও কেমন যেন গুরু-শিষ্যা ছিলে—

ঠিকই তো। আমাদের সময় তো সে-রকমই ছিল। গুরুজনই তো। আমার চাইতে বয়সে-বিদ্যায় বড়। তাঁর সঙ্গে ও-সব আজেবাজে কথা বলা যায়? উত্তম-সুচিত্রা? কী যে বলিস।

এদিকে তো দেখতে গেছ একসঙ্গে? তখন গুরুজন নেই?

সবাই যেত না। জোড়ে সিনেমা দেখাটা চালু ছিল না। বাড়ির সবার সঙ্গে যেতে

হত। তবে, তোর বাবা তো আবার মডার্ন ছিলেন, ওঁরা একটু দেখাতে ভালবাসতেন যে ওঁরা জোড়ে সিনেমা দেখেন।

অথচ জোড়ে কোনো কথা হবে না সিনেমা নিয়ে?

তখন তো আর কাউকে দেখানোর নেই। আমাদের কর্তাবাবুদের একটু কেমন গুমর ছিল। দু-চারটি বাচ্চা হওয়ার পর সম্পর্কটা একটু স্বাভাবিক হত। আমার কি সাহস ছিল তোর দিদির নাম 'রীণা' রাখার। সবাই ধরে ফেলবে। উনি কী ভাববেন। বছর চার পর তোর বেলায় তা মনে হয়নি। তাই তোকে ঐ নামটা দিতে পারলাম।

—সেটা খুব খারাপ ছিল মা। তোমাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। মেয়ের নাম রাখারও না।

—হয়তো তাই। আবার এখনকার ছেলেদের স্বামী বলে কোনো গাম্ভীর্য নেই, ছুটকি। এদের একটু হ্যাবলা মনে হয়। বিয়ের বয়স হয়তো হয়েছে, সামর্থ্যও হয়তো আছে, কিন্তু একেবারেই ভার-ভারিক্কি নয়। এদের ওপর সংসারের দায়-দায়িত্ব দেওয়া যায় না। আজকাল তো মনে হয়, কারো আর বিয়ে করতে বাকি নেই। যে-ছেলে-কে জিজ্ঞাসা করি, সে-ই বলে, হ্যাঁ, বিয়ে করেছি। কী করো? কিছু না।

তুমি বলো, তুমিই বলো—গানটা আচমকা শুনে মজা পেয়ে খণা এত কিছু ভেবে নিতে পারে শুধু ছবিটির সঙ্গে এই গোপন সংযোগে যে সুচিত্রা সেনের এই সিনেমার ফিল্মি নামটা থেকেই তার নাম তৈরি।

চাকরি করতে-করতে, এতগুলো বছর চাকরি করতে-করতে যুক্তি-সাজানোটা হয়ে গেছে খণার মনেরই গড়ন। অফিসে নামতে হবে, এসে গেছে, নামতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি সে দুটো যুক্তি, সাজিয়ে বা সাজাতে-সাজাতে, নেমে যায় তার ভারী ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে। যুক্তি যে সাজানো হল ঠিক, তা নয়। বরং, সে তার চিন্তার একটা বা দুটো পেজমার্ক দিয়ে রাখতে চাইল। তেমন দরকারে যাতে এক বটকায় খুলতে পারে। তাদের, খণাদের জেনারেশনের, যাদের বয়স এখন বড়জোর মধ্যচল্লিশ তাদের জেনারেশনের, মা-বাবা কি একটা বদলি—জীবনই কাটাত? নিজের বাসনাসম্মত কামনা পরস্পরকে জানাতে পারত না? সারোগেট পেরেন্টস?

অফিসে খণা তার ব্যাগ বা বই বা প্যাকেট কাউকে বইতে দেয় না। নিজেই বয়। কোনো কারণ নেই, একেবারেই নেই। নিজেকে অকম্মা মনে হয়। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা তো কম হয়নি। এখন সকলে জেনে গেছে ও মেনে নিয়েছে। তাই কেউ আর এগিয়ে আসে না, লিফটম্যানও হাত বাড়ায় না।

একটা বড় কাচের দরজা ঠেলে খণাদের অফিস—তারপরেও একটা কপাটছাড়া ফাঁক, রাইট টার্ন, লেফ্‌ট টার্ন, বাঁ-হাতের সারির একেবারে শেষে বাঁয়ের ঘেরে খণার বসার জায়গা। এখন তো এটাই অফিস স্টাইল। চার ফুটি টানা বেড়ার এক-একটা ঘের।

ব্যাগপত্তর টেবিলে নামিয়ে খণা যায় বাথরুমে—তার ঘেরের মুখোমুখি। মুখটা ধুয়ে,

হাতটা ধুয়ে, জায়গায় ফিরে, ব্যাগ থেকে ছোট তোয়ালে বের করে জল মুছে, একটা টিউব বের করে, 'হ্যান্ড ক্রিম'। ঋণার বিলাসিতা। হাতের পাতায় কবজিতে মেখে নিলে, হাতদুটো নাড়াচাড়া করলে খুব আবছা একটা বাস পাওয়া যায়। তাজা লাগে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে একবার দুলে ঋণা মনে-মনে তার দ্বিতীয় পেজমার্কটা ভুল পৃষ্ঠায় গুঁজে দেয়। ভুল পৃষ্ঠায় পেজমার্ক মানে কোনো মার্কই আর থাকল না, তার চিন্তার। সাক্ষীও না। যেন ঋণা মনে রাখার মত কোনো কিছু ভাবেনি। তা হলে পেজমার্ক না দিলেই তো হত ভাবনায়। সেটা দিয়েছে—ভাবনাটার সঙ্গে মা জড়ানো বলে। মা-কে কি আর লস্ট করা যায়? দিলই যখন ভুল জায়গায় কেন? ভাবনাটার সঙ্গে তার জড়িয়ে থাকাটা লস্ট করতে। সুচিত্রা-উত্তম, মেয়েরা, স্বামী-স্ত্রীরা—এইসব জগাখিচুড়ি করে ভাবছে বলে।

কথাই ছিল, দি আইস ক্রেজ কোম্পানির এক অফিসার লাঞ্চের আগেই আসবেন। আজকাল সব কোম্পানিই এম-এন-সি। বিদেশে স্থায়ী থাকেন এমন একজন আত্মীয় বা বন্ধুকে ডিরেক্টর রাখলেই হল। মুভার্স, মালপত্র সরান। ওদের একটা ক্যাম্পেন করবে ঋণারা। ঐ অফিসার আসছেন—প্রথম আর্টপুলটা ওকে করতে।

ঋণার আন্দাজ ছিল, এই অফিসারের পছন্দ হবে না। প্রথম দেখেই ও-কে করায় ইগো-প্রবলেম নেই? ঋণা ঠিক করে নিল—

তাই যদি হয় ঋণা আর ভ্যাজাবে না।

যথাসময়ে ভদ্রলোক এসে অপছন্দ করলেন।

বা, অতটা না-হলেও, ভদ্রলোক নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। ঋণা বুঝে গিয়েছিল উনিও তারই মত এক অফিসার। তাঁর পছন্দটা যদি শেষ পর্যন্ত তার কোম্পানি না নেয়, তিনি তাই একটু নিরাপদ থাকতে চান। বুঝতে পারছেন না, এই কাজটায় তাঁর খুঁতখুঁতের কী আছে। অথচ খুঁতখুঁত যে আছে, এটা নিশ্চিত। ক্লায়েন্ট তো আর ছাড়া যায় না। ঋণা কমপিউটারটা থেকে কাজটা সরিয়ে দিতেই টকটকে সব রঙে পর্দা ছেয়ে থাকে। ঋণা তার বসার চেয়ারটা ঘুরিয়ে দুই কনুই টেবিলে রেখে, তার চিবুকটা কাছাকাছি রাখে কিন্তু আঙুলে ছোঁয়ায় না। ক্লায়েন্ট তাঁর দিকে এই বিশেষ মনোযোগটা কী ভাবে নেন, তার ওপর নির্ভর করে তার জোড় বাঁধা আঙুলগুলোর ওপর চিবুকের ভর দেবে কী দেবে না। তার আত্মবিশ্বাস আরো কয়েক ডিগ্রি বাড়ানো দেখাতে হবে। তাকে বোঝাতে হবেই যে তারা কত ভাবনাচিন্তা করেও ঘাম ঝরিয়ে কাজটা করেছে। সেই কারণেই সে কাজটা পর্দা থেকে মুছে দিল ও এখন কাজটার এমন কিছু বিশদ মনে রাখল, যে-বিশদগুলি দিয়ে ভদ্রলোককে স্ট্রেট সেটে হারাবে। মনে হয় না, অতদূর যেতে হবে। ঋণা তার ঐ নতুন ভঙ্গিতে বলল, 'কাজের কথা তো আছেই। সে হবে'খন। আপনার কাছ থেকে অন্য একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। কিছু মনে করবেন না তো!'

'এটা আমি জানি যে আপনি এমন কিছু জিজ্ঞাসা করবেনই না যা আমার পক্ষে এমব্যারাসিঙ হতে পারে। আমিও করতাম না, আপনি যদি আমার ক্লায়েন্ট হতেন। কী জানতে ইচ্ছে করছে?'

'কী যেন একটা পুরনো প্রবাদ আছে—মেয়েদের বয়স আর ছেলেদের মাইনে জানতে চাইতে নেই।'

'সে সব কি আর এখন আছে নাকী? কোন কোম্পানি, কত টাকা বছরে ঘোরে এ-সব জানলেই তো জেনে নেয়া যায় মাইনে।'

খণার মনে হয়—ভদ্রলোক অতটা সরল নয়।

'সেটা অবিশ্যি সব সময় খাটে না, তবে নিশ্চয়ই একটা ভাল আন্দাজ দিতে পারে। আর, আর-একটা, মেয়েদের বয়স?'

'খোলাখুলি বলতে গেলে, মেয়েদের কোনো বয়েস নেই।' লোকটা কি সেকসিস্ট কথাবার্তা বলতে চায়। খণার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলেন, 'সত্যি কিন্তু। আমি আপনাকে উদাহরণ দিচ্ছি। পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাবসা কী?'

'না, না, আপনি আমাকে ও-জায়গায় ধরতে পারবেন না। আমি বলবই না, হেল্‌থ কেয়ার। আপনি যেটা বলবেন সেটাই আমি বলব, বিউটি বিজনেস।'

ভদ্রলোক আওয়াজ করে হেসে ওঠেন। খণা আওয়াজ করে না, কিন্তু বিস্তারে হাসে। সত্যিই সে ভাল বলেছে। ভাল কথা-বলা শুনতেও একটু মজা করে কথা-বলতে পারলে কেমন তরতাজা করে দেয়। না। বিস্কুট আর হর্লিক্স তরতাজা রাখে। ভাল করে কথা বলতে পারলে বা কারো ভাল করে বলা কথা শুনলে এমন ঝরঝরে লাগে।

'দেখুন, বিউটি বিজনেসের ইউ-এস-পি হচ্ছে ক্লায়েন্টকে ঠিক কথাটা জানানো। ঠিক কথা সবচে ঠিক বলে সায়েন্স। বিউটি বিজনেস এই সায়েন্স দেখাতে গিয়ে—না মেয়েদের সব গোপনতা ফাঁস করে দিয়েছে। ধরুন, একটা প্রোডাক্টে বলা হচ্ছে বা দেখানো হচ্ছে, চিবুকের ভাঁজ দেখে বয়স আন্দাজ করতে যাবেন না, সবচেয়ে কম-বয়েসি মানুষটির চিবুকের ভাঁজটাই সবচে বেশি আদর কাড়া।' কথাটা কী রকম সত্যি, না? কী রকম ভাল লাগে, না? কিন্তু যে-মহিলার বয়েসের কারণেই ভাঁজ পড়েছে তিনি যদি সেই ভাঁজ রক্ষণাবেক্ষণ করতে শুরু করেন, তিনি তো সেই শিশুটির মত উরুতে ভাঁজ, গোড়ালিতে ভাঁজ, গলায় ভাঁজ পাবেন না। চিবুক তাঁর ঝুলতেই থাকে। দেখে কী করে বয়েসটা না-বোঝা থাকে।'

খণা এবার এতটাই হেসে পড়ে যে তার খিলখিল প্রায় বেরিয়ে পড়ে, 'ব্রিলিয়ান্ট'। খণা ভিতরে-ভিতরে এতটাই আমুদে যে সেটা প্রায় ধরা পড়ে যেতে পারে। সে সামলে নেয়, 'আমি আপনার বায়োডাটা জানতে চাইছি।'

মানে, বয়স কোন দিকে সেটা আন্দাজ করতে চাইছেন তো? আমি সিক্সটি ফাইভে লখনৌ থেকে আই-সি-এস-ই পাশ করেছি।'

'না। তাহলে যা জানতে চাইছি তা বলতে পারবেন না।'

'তা হয়তো পারব না। জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। না-পারলে পারব না—এর বেশি কিছু তো আর ঘটবে না।'

'না। কী করে পারবেন। একে সিক্সটি ফাইভ। তার ওপর লখনৌ। তার ওপর আবার আই-সি-এস-ই? আপনি কী করে কিকটিদের কথা বলবেন?'

'আরে আমি পারব না তো কে পারবে। সিক্সটি ফাইভে আমার জন্ম নয়। স্কুল ছেড়েছি। জন্ম তো ফিফটিতে। তবে, হ্যাঁ, লখনউতেই, সেটা যদি একটা বড় বাধা হয়, তাহলে আর কী করব?'

'শুনুন—না। আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরবার সময় টিভিতে তারস্বরে সেই 'এই পথ যদি না শেষ হয়', চলছিল—'

'শুধু অডিয়ো, না ভিডিয়োও।'

'দুটোই।'

'ওহ্। আপনি সত্যি ফরচুনেট। মানে, আমি কতটাই আনফরচুনেট। শুধু ঐ সিকোয়েন্সটাই?'

'হ্যাঁ। কোনো প্রোমো-র ব্যাপার হয়তো। কিন্তু আপনাদের সত্যি এখনো এত ভাল লাগে? এটাই জানতে চাইছিলাম। কী ভাল লাগত?'

'এ কি যুক্তিবুদ্ধির ব্যাপার? ও হয় না, হয় না। ও একবারই হয়, জীবনে। কোনো দ্বিতীয়বার নেই।'

'কার জীবনে একবার? ওদের না আপনাদের?'

'ওদের কেন হবে? আমাদের, আমাদের। আমরা নার্গিস-রাজকাপুরে জন্মেছি, সুচিত্রা-উত্তমে বড় হয়েছি। লতার সেই প্রথম প্লেব্যাক—'লাল দোপাট্টা মলমল। ওহ্। জানেন, লখনউতে সিনেমা হলগুলো দুই শোর মাঝখানে মাইকে গান বাজাত, ঐ, লাল দোপাট্টা মল্‌মল্‌, কী যে মনপ্রাণ দিয়ে অপেক্ষা করতাম করতাম সন্ধে সাড়ে আটটার?'

'এই কথাটা কি কোনোদিন ভেবেছেন, কেন্ ভাল লাগত।'

'আমি কেন ভাবতে যাব? আপনি কি ফিল্মস্টাডিজ করছেন, নাকী সোস্যাল সায়েন্স করছেন? লখনউয়ের ঠুংরি কেন ভাল লাগে—এর কোনো উত্তর আছে? কলকাতার নলেনগুড়ের কোনো জবাব হয়? এগুলো এরকমই।'

'আচ্ছা বেশ। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা তো অনেক বেশি গান শোনে, অনেক বেশি সিনেমা দেখে, ওদের কোনো আয়ডল নেই কেন? বা ওদের কি নার্গিস-রাজকাপুর সুচিত্রা-উত্তম ভাল লাগে?'

'দেখুন স্যার। দিনরাত তো পেটের ধান্দায় শুধু যুক্তি খুঁজে বেড়াই। পেটের ধান্দাই-বা কেন? পেটের ধান্দা আর কতটুকু? দিন নেই, রাত নেই, শুধু যুক্তি খোঁজা, কারণ খোঁজা। কোম্পানির লাভ কী করে হবে, রাইভ্যাল কোম্পানি কেন দু-পয়েন্ট পেল। একমাত্র স্মৃতির কোনো যুক্তি নেই। আপনি সেই কাঁচা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলেন?'

'সরি, সরি, আমি একেবারেই তা চাই নি। সকালে বেরবার সময় তো—আমারও ভাল লেগে গেল। যেন আমি মেট্রো ঠেঙিয়ে অফিসে আসছি না। আমিও মোটর সাইকেলের পেছনে। সরি। আপনি যখন আমাকে স্যার বলছেন, বোঝাই যাচ্ছে, আপনি কষ্ট পেয়েছেন।'

'ভাল লেগে গেল তো ভাল লেগে গেল, তার আবার কারণ-টারণ থাকে না কী? আর লাগল না তো লাগল না—আমার কিছু করার নেই।'

'ঠিক বলেছেন। এখন থেকে ভাল হব। ভাল লাগলে ভাল, খারাপ লাগলে খারাপ। মানে, নিশ্চয়ই কাজের জায়গায় নয়।'

'কাজের জায়গায় নয় কেন?'

'কাজের কোনো ভাল-মন্দ নেই বলে।'

'নেই—না? থাকলে মনে হয় ভালই হত। কাউকে ভয়ে-ভয়ে থাকতে হত না। সব সময় ভয়—কাজটা বেরিয়ে আসবে তো ঠিক। এই আপনার এখানে আটকে গেলাম। আর-একটা ভিজিট সেরে অফিসে।'

'নঃ। আপনার সময় নষ্ট করলাম।'

'বলুন সময় বাঁচিয়ে আনলেন। কত ভাল-লাগা এনে দিলেন, বলুন তো।'

'কাজটা তো আপনার পছন্দ হয় নি।'

'পছন্দ হয়নি না। চার্জড হই নি, বলতে পারেন।'

'কী সাংঘাতিক দায় বলুন তো। প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টকে এমন চার্জ দিতে হবে। তাহলে, ওদের আর-একটা করে দিতে বলি। দেখু—ন।'

'আপনাদের আর্ট ডিপার্টের' ছেলেরা মানে কর্মীরা তো আবার আপনার মতই। আমাদের 'নো'-বলার অধিকার কী?'

'অফিস দিয়েছে তাই। নইলে অফিস তো আমাদের নো বলে দেবে।'

'কিন্তু চার্জ খেলাম না কেন, বলুন তো।'

'আপনার হয়তো ঐ চামরী-গরুর ভিসুয়্যালটা ভাল লাগে নি,' কম্পিউটার শূন্যই ছিল।

'চমরী? চমরী ছিল ঐ লে-আউটে?'

'হ্যাঁ, রাইট টপে ছিল। যে-কোনো ভিসুয়্যালে ওটাই তো সবচে অবসকিওর স্পেস। কেউ দেখতে পায় না। দেখলেও মনে থাকে না।'

'তা হলে আর কষ্ট করে দেয়া কেন—দেখাবেও না, মনেও থাকবে না। খাটনির দাম নেই।'

'খাটনি আর কী? ভাবতে পারাটাই আসল। জহুরি ঠিক চিনে নেবে। আর শোহন তো এখানেই আটকে যেতে চায় না।'

'শোহন কে?'

'যে এই কাজটা করেছে, আপনাদের। কাজটা এরকম শেষ করে আমার কাছে এসে বসে বলল, দেখো। আমি খুলে দেখাচ্ছি, শোহনও উঠে এল আমার চেয়ারের পাশে। দু-জনেই দেখছি। আমাদের দেখা তো। আর্ট শপের সব আয়টেম খুঁটিয়ে দেখা—রেজিস্ট্রেশন, রঙ-ছড়ানো, কোনো জায়গা আলগা হয়ে ঝুলছে কীনা, আর প্রথমে চোখ, তারপর মন টানে কী না, আমরা বলি সারপ্রাইজ পয়েন্ট। দেখো, সারপ্রাইজ করতে যেও না, মানে ক্লায়েন্ট একটু অর্থভক্ত চায়। তো, শোহন বলল, আচ্ছা, দিদি, চমরী গরুর লেজ কেটেই তো চামর হয়, না? আমি ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, এমনিতে তো জানি। এর মধ্যে আবার চমরী গাই ঢেকালি। দ্যাখ—' আবার বলা, 'প্রথমে তো মাথাতেই

ছিল না। তারপর ভাবলাম, কীসের কাজ করছি? তখন কাগজটা খুলে দেখি—মুভার-এর, মানে এক জায়গা থেকে অন্য কোথা। তা হলে তো দূর-দূরান্ত বোঝাতে পারলে জমে যেত। ঐ দূরদূরান্তের মোটিফ হয়ে এল, চমরী গাই। 'চামরের একটা হাওয়ার ট্র্যাডিশনও আছে। ঢোলের আওয়াজ দিলে তো কথাই নেই চামর বোঝাতে পারলে আর কী চাই? যখন ফাইন্যাল কপি পাঠাল, শোহন; নিজে আসে নি, চমরী গাইয়ের সঙ্গে ব্যালান্স করতে মাঝ বরাবর একটা তালগাছ লাগিয়ে দিয়েছে।'

'মাঝখানে তালগাছ? দেখি নি তো? চমরী গাই, তালগাছ—লাগিয়ে দিলেই হল।'

'এমন করে যদি লাগায় যে আপনার চোখেই পড়ল না, তাহলে লাগাবে না কেন?'

'চোখে তো পড়েই নি, দেখান তো একবার।' খণা বোতাম টিপতেই পুরো পর্দা জুড়ে কাজটা বেরিয়ে এল। সৌজন্যের কারণে খণা কিছু দেখিয়ে দিল না, পেন্সিলটা শুধু আঙুলে গড়াল। কী করে এমন পগারতুল্য চমরী গাই আর এক-পেয়ে তালগাছ চোখ এড়াল?

খণাকে এক অপ্রস্তুত তৃতীয় পেজমার্ক দিতে হল, 'এখানেই', একটু টলিয়ে।

খণা কি আজ ঐ কাস্টমার ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু মেয়ে হয়েছিল? বাইরে থেকে কোনো প্রমাণ নেই। ভিতরে একটু সন্দেহ যেন কাঁকরের মত বেঁধে। খণা যেন বুঝতে চায়; সে যদি পুরুষ হত, তা হলে কি ঐ ব্যবহার করতে পারত? হ্যাঁ, পারত, কাস্টমার ধরে রাখতে কোনো কৌশলই নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু পুরুষ হলে খণা কি অত সহজে সুচিত্রা-উত্তমের কথা তুলতে পারত? তুলতে হয়তো পারত কিন্তু সেটা কি সহজ হত—খণা যতটা সহজ হতে পারল? খণা ইয়োরোপিয়ান ক্লাবের ফুটবল নিয়েও বলতে পারত—ঐ খেলাগুলি নিয়মিত দেখে-দেখে সে সব জেনে গেছে। এটা অর্জুনের জন্যই। অর্জুনকে তো চাকরির জন্যই খেলা দেখতে হয় আর খেলা দেখার সময় কাছাকাছি কাউকে একটু-আধটু আবেগ জানাতেই হয়। হস্টেল থেকে এলে ছেলে অর্জুনের সঙ্গী হয় কিন্তু ডবলু-র ঝোঁকটা নিজে খেলার দিকে বেশি। হস্টেল থেকে যেদিন ফেরে সেদিনই পাড়ার ঐ পচা মাঠটায় নেমে দুর্গন্ধি কাদা মেখে আসে।

কিন্তু মেয়ে-হওয়া, না-হওয়া কথাটা খণার মনে এলই-বা কেন? হঠাৎ আজ? ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করার পর? সুচিত্রা-উত্তমের জন্যই? মনটা ফুর্তিতে ছিল। সে বুঝে গিয়েছিল—তাদের ঐ কাজটা ভদ্রলোকের ভাল লাগেনি। কিন্তু বেচারা জানেই না—কেন ভাল্ লাগছে না। এই কাজটা ভাল লাগা বা ভাল না-লাগার কোনো মন বা চোখ ওঁর যে-নেই, সেটা ওঁর দোষ নয়। কাজটা নেবে কী নেবে না, সে তো ঠিক করবে ওদের আর্ট ডিরেক্টর। না। ওদের তো আর্ট ডিরেক্টর থাকার কথা না। তা হলে অন্য কোনো এজেন্সিকে দিয়ে তাদের মত নেবে। আজকাল এমন এজেন্সি হয়েছে দুটো-একটা। নামও আছে—ব্যাপারটার : মার্কেট প্রমোশন্যাল কাউনসেলিং। বড়-বড় কোম্পানিকে এরা পরামর্শ দেয়—কোন প্রোডাক্টটা চেপে কোন প্রোডাক্টটাকে 'অ্যাসেনডেনসি' দিতে হবে, কী ধরণের ভিসুয়্যাল ক্যাম্পেন মার্কেট-ফ্রেন্ডলি। মার্কেটের সেগমেনটেশন কেমন

বদলাচ্ছে। যেন কঠিন কাজ—ইকনমিস্ট লাগে, ডাটা প্রসেসের দরকার, ভিসুয়ালাইজার তো চাইই, গ্রোথ স্পেশ্যালিস্ট—যারা বের করে সামনে পাঁচ-সাত বছরে কোন এরিয়ায় কী গ্রোথ হবে। অফিসার হিসেবে ভদ্রলোকের দায়, যেন তাঁর বাছাই নাকচ না হয়।

ঋণা তো আন্দাজই করেছিল, এটাই হবে। তাই আর ভ্যানতাড়া বকতে ইচ্ছে করছিল না। সে তাই কমপিউটারটা বন্ধ করে সুচিত্রা-উত্তমে চলে গেল।

এটা তো যুক্তি হিশেবে ভাল।

কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে সুচিত্রা-উত্তম করার একটু যুক্তিহীনতাও তো ছিল, আজ। ছিল না? সে-অযুক্তি যে ঋণার আকৈশোর।

এমন মেয়ে যার ঋজু, দীর্ঘ অবয়বে রামকিঙ্করের সুজাতার হাঁটা গাছপালার খাড়াই আর লতাপ্রত দাঁড়িয়ে থাকে বা চলে—

এই কথাগুলি ঋণা তার সেই কত কম বয়স থেকে এখনো শুনে আসছে, বিশ্বাসও করে আসছে, শান্তিনিকেতনে 'সুজাতা' দেখে বুঝে এসেছে—তারা কতই কম দেখেছে ঐ সুজাতাকে যারা ঋণাকে সুজাতা ভেবে নিয়ে জানাতে চেয়েছে—তারা কতই-না সুজাতাকে দেখেছে। অনেক অনেক পরে ঋণার মনে হয়েছিল—ঘন বনের পথ বেয়ে সেই সুজাতার হেঁটে যাওয়ার অনিশ্চয়—সে জানেই না সে অভিসারে, ঋণাতে কলকাতায় রাস্তায় বা কোনো আদিবাসিনীকে তার নিজের ভূখণ্ডের সেই পথে, যে-পথ তৈরি হয় শুধু তারই চলনে।

ঋণা নিজের কাছে অপ্রস্তুত হয়।

সে যে একটু বেশি মেয়ে, তেমন ঘটনাটাকে দলে মুচড়েই সে বড় হয়েছে, ভিতরে-ভিতরে দলে মুচড়ে। বিয়ের পর বিকেলে ক্লাশ করে ফটোশপ লেখা—প্রয়োজনে নয়, শেখার নেশায়। এমনই নেশা যে আড়াই বছরের ছেলেকে নিয়ে এক ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে থেকে হায়দারাবাদে সত্যিকারের প্রফেশন্যাল হওয়া। বিদেশে যেতে পারত। যায় নি। তিনটি চাকরি মাত্র বদলেছে—পেশার নিয়মে।

মেয়ে হওয়ার সীমা এমন করে ভেঙে ঋণা কি তার দর্শনীয়তা হারিয়েছে? তার এতই শারীরিক ও স্বাভাবিক যে তেমন কিছু ঘটলে ঋণা হয়তো সইতে পারত না। বাইরে কোনো অনুষ্ঠানে, বা বিয়ে বাড়িটাড়িতে, বা, না-করা যায় না এমন কোনা ক্লায়েন্টের পার্টিতে, ঋণা ঢুকলে তারই দিকে সবাই তাকাবে না, একবার, দুইবার ও বারবার, কোনো-কোনো সময় মুখের, ঠোঁটে কথাও ফুটিয়ে তুলবে ঋণা, বিনিময়ও ঘটে যেতে পারে হাসিতে, ঋণা সেই সম্মিলন থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে পূর্ণিমার চন্দ্রাস্তের মত—না-হলে ঋণার কী করে চলবে?

চলবে আবার না কেন?

চলেই তো যায় সব। কিন্তু কি থেমে থাকে, যদি তার বয়েসি মিড-ফরটি মাইনাস এক মেয়ে চায় যে, যে-দুনিয়া রোজ তার দশ দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সেটা তাকেও একটু দেখুক। একটু দেখুক তাকেও। এই এমন চাওয়ার কি ন্যায়-অন্যায় হয় না কী? ন্যায়-অন্যায় ব্যাপারটার কি কোনো ফিগার আছে? টল অথবা স্মল অথবা অ্যাভারেজ?

ঋণা যখন লম্বা হয়েই যাচ্ছিল তখন বাড়ির প্রায় সবাই আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার মা-দিদিরা, স্কুলের দিদিমণিরা, সব পরস্পরের অজ্ঞাতেই খুঁটে খুঁটে অস্থির করে তুলেছিল তাকে— 'এখন লফট থেকে জিনিস নামাতে আর লোক ডাকতে হবে না।' 'যে-সাইজে ভার্টিকাল হচ্ছে, সে-সাইজে তো আর হরাইজনট্যাল হবে না? হলে, ফ্ল্যাটের দরজা কাটতে হবে।'...

তারা যখন কলেজে, তখন কাগজপত্রে তো বিজ্ঞান নিয়ে লেখাজোখা শুরু। হর্মোন ইমব্যালান্স, নিউট্রিশন্যাল মিস-ম্যাচ, প্রোটিন, কার্বো-হাইড্রেট এ-সব রোজকার কথায় চলে এসেছে। আর ঐ মিড-ফরটি। যেন মানুষ জন্মেছে, অন্তত মেয়েরা, মেনোপজ করতে আর মিড-ফরটি হতে। একটু রোস বাবা, মেনোটা হতে দে, তারপর তো পজ দিবি। তখন কি ঋণ' ভেবেছে নাকী পরে ভেবে তখনকার সময়ে ঢুকিয়ে নিয়েছে—সেই তার বাড়তিমুখো শরীরের কোনো প্রশ্রয় ছিল না। শরীর তো একা বাড়ে না—মন বাড়ে। বাড়তিমুখে সেই মনকে কেউ প্রশ্রয় দিয়েছিল? তার মা-ও? তিনি তো অন্তত পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে সুচিত্রা-উত্তমের 'সপ্তপদী' দেখার গোপন রোম্যান্সে, স্বামীসহ গোপন রোম্যান্সে, স্বামী থেকে গোপন রোম্যান্সে, নিজের মেয়ের নাম রীনা দেবেন ঠিক করেও গোপন-রোম্যান্স প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রথম মেয়েকে ঐ নাম দেন নি, দ্বিতীয় মেয়েকে দিতে পারলেন, তখন 'রীণা' শুনলেই 'সপ্তপদী' মনে পড়ে না।

মেট্রোর সিঁড়ি ভেঙে উঠতে-উঠতে কোনো ক্লান্তি ছাড়াই, সুতরাং, একটু হাসির সঙ্গেই, না-হাঁফিয়ে ঋণা ভেবে নিতে পারে—সিঁড়িটাকে সুড়ঙ্গ করা যেত না? বেশ নতুন হত! এতটা গড়িয়ে নামা। বেশ মজাও হত। ঝিলমিক—মেয়েপুরুষ সবাই কত রকম করে সুড়ঙ্গে গড়াচ্ছে, গড়িয়ে নামছে, নেমে যাচ্ছে, নেমে আসছে, গড়িয়ে নামছে, নেমে যাচ্ছে, নেমে আসছে, গড়িয়ে পৌঁছনোটাই যেন আধুনিকতম পরিবহণের আধুনিকান্তিক ভঙ্গি।

সিঁড়ি শেষ। ঋণা বাইরের আলোতে হঠাৎ নিজেকে জিগগেস করে ফেলে, গড়িয়ে না-হয় নামল কিন্তু উঠবে কী করে, সিঁড়ি না থাকলে? মেয়েটা তো যাবে কোথাও?

পাঁচ ফুট-আটের ঋণা একটু দাঁড়িয়ে, ডান-বাঁ দু-দিকে তাকায়, ভুরুটা সামান্য কুঁচকে—রাস্তা ফাঁকা নয় বলে নয়, ভিড়ের ঠেলাঠেলির কারণেও নয়, ভিড় থেকে সে আলগা হতে পারছে না বলেও নয়। সে সবে তো অন্যরকম ভ্রূবিলাস।

এটা আর—একরকম নিজেকে দেখে ভ্রূকুঞ্চন। সব সময়ই কি প্রশ্ন জানাতেই হবে? বা প্রশ্ন না-জেনেও উত্তরটা? ওঠার কথা না-ভেবে কি নামার কথা ভাবা যায় না? কী সুন্দর ভাবছিল—সবাই গড়িয়ে নামছে সুড়ঙ্গ দিয়ে। যেটা ভাবছি, সেটাই ভাবি।

তা না-ভেবে হঠাৎ ভেবে ওঠা—উঠবে কী করে?

'কী করে আবার? উড়ে।'

ঋণার ভ্রূকুঞ্চন মুছে যায়। রাস্তাটা সে পেরয় আর পেরতে-পেরতেই ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে।

হ্যাঁ। উড়ে।

ঋণা সেই ওড়ার ঝাপটে সারা দিনের সব পেজমার্ক উড়িয়ে দিল।